হৃষীকেশ সিরিজ নং ১৯

বঙ্গ পরিচয়

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা ৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস হইতে
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সরখেল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মূল্য—২॥০ টাকা

ভূমিকা

'বঙ্গপরিচয়' প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের ব্যবধানকাল প্রায় দুই বৎসর। নানা কারণে গ্রন্থ প্রকাশে বিলম্ব হইয়া গিয়াছে—তাহার দীর্ঘ কৈফিয়ৎ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

বাংলা ভাষায় বাংলা দেশ সম্বন্ধে একখানি তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ-রচনার জন্য রবীন্দ্রনাথ বহুবার উৎসাহিত করিয়াছিলেন; প্রথম খণ্ড তিনি আদ্যোপান্ত পড়িয়া বহু মন্তব্য করিয়া গিয়াছিলেন। আজ দ্বিতীয় খণ্ড তাঁহার হস্তে দিতে পারিলাম না, সে দুঃখ থাকিয়া গেল। তাঁহার টীকা-টীপ্পনী-মন্তব্য হইতে এই খণ্ড বঞ্চিত হইলেও আমি জানি, তাঁহার আশীর্বাদ ইহার উপর বর্ষিত হইয়াছে।

এই ধরণের বইকে আজতক্ করা খুবই কঠিন; তবে ইহার প্রত্যেকটি বিষয় ঐতিহাসিকভাবে আলোচিত হইয়া একটি জায়গায় আসিয়া থামিয়াছে। তাহার পর ইহাকে আজতক্ করিবার জন্য পরিশিষ্ট প্রকাশের ইচ্ছা আমাদের আছে। ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় বাংলা ভাষার বহু অভাব পূর্ণ করিয়াছেন; তিনিও ইচ্ছা করেন যে 'বঙ্গপরিচয়' একখানি বঙ্গ-বার্ষিকীরূপে প্রকাশিত হয়, কিন্তু যে সব কারণ আজ সভ্যতার মূলোৎপাটনের জন্য চারিদিক্ হইতে বিশ্ব-সংসারকে আক্রমণ করিতেছে, বাংলা দেশও সে সব হইতে রক্ষা পাইতেছে না। সুতরাং ডক্টর লাহার ইচ্ছা কতদিনে পূরণ হইবে জানি না।

এ গ্রন্থ রচনায় আমি বহুলোকের নিকট হইতে নানাভাবে সাহায্য পাইয়াছি, তাঁহাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি,—বিশেষভাবে উল্লেখ করা উচিত ডক্টর নলিনাক্ষ দত্ত ও শ্রীসুধাকান্ত দে মহাশয়দ্বয়ের নাম। ডক্টর দত্তর উৎসাহ এই গ্রন্থ মুদ্রণের জন্য যে কতখানি দায়ী তাহা আমি জানি।

শ্রীপ্রিয়নাথ দাশ মহাশয় গ্রন্থের প্রুফ প্রভৃতি দেখিয়া আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাকে তজ্জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শান্তিনিকেতন
২রা জুলাই, ১৯৪২

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

বিষয়		পত্রাঙ্ক
অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ	...	২৯৭-৩০৬
আয়-ব্যয়ের ইতিহাস	...	২৯৭
ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ	...	৩০৭-৩৩২
বাংলার রাজস্ব	...	৩০৭
বাংলার রাজস্ব হইতে আয়	...	৩১০
শুল্ক	...	৩১১
রপ্তানী মালের শুল্ক	...	৩১৫
বাংলাদেশের বন্দরে শুল্ক-কর	...	৩১৬
বাংলার আয়-কর	...	৩১৮
সুপার ট্যাক্স	...	৩২৩
লবণ-কর	...	৩২৯
ত্রিংশ পরিচ্ছেদ	...	৩৩৩-৩৫৫
প্রাদেশিক আয়-ব্যয়	...	৩৩৩
আবগারী আয়-ব্যয়	...	৩৩৫
জেলা হিসাবে আবগারী	...	৩৪০
ষ্ট্যাম্প	...	৩৪২
বনভূমি	...	৩৪৩
রেজিষ্ট্রেশন	...	৩৪৪
বিবিধ বিষয়	...	৩৪৬
বাংলার আয়	...	৩৪৯
বাংলার রাজস্ব	...	৩৫১
বাংলাদেশের আয় (মণ্টফোর্ড শাসন সংস্কারের পর)	...	৩৫২
বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত আয়-ব্যয়	...	৩৫৫

বিষয়		পত্রাঙ্ক
একত্রিংশ পরিচ্ছেদ	...	৩৫৬-৩৬৫
বাংলাব সবকাবী ব্যয়	..	৩৫৬
দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ	...	৩৬৬-৪৩১
কৃষি ও বাণিজ্য	..	৩৬৭
ভারতেব তুলনামূলক কৃষি	..	৩৬৭
বাংলাব কৃষি	..	৩৭৭
চালের রপ্তানী-আমদানী	..	৩৮৭
বপ্তানী ধান ও চালেব হিসাব		৩৮৭
তৈল বীজ		৩৯৫
তিল	..	৩৯৮
তিসি	.	৩৯৯
তিসিব ক্ষেত ও ফসল	..	৩৯৯
তৈলবীজ ও তৈলবপ্তানী	...	৪০০
ফলের চাষ	.	৪০২
মসলাপাতি	...	৪০৩
গুড় ও চিনি	...	৪০৪
আখ	..	৪০৫
তামাক	.	৪১৩
গাঁজা শন	...	৪১৭
তূলা	..	৪১৮
বাংলার রপ্তানী	..	৪১৯
গোপালন	...	৪২১
হাঁস ও মুরগীপালন	...	৪২৭
মাছ	...	৪২৯
ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ	...	৪৩২-৪৪৩
বাংলার খনিজ সম্পদ্	..	৪৩২

বিষয়		পত্রাঙ্ক
কয়লা	...	৪৩২
লবণ	...	৪৩৭
বাংলায় ব্যবহৃত লবণ	...	৪৪১
চতুস্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ	...	৪৪৪-৫০১
বাংলার শিল্প	...	৪৪৪
পাট শিল্প	...	৪৪৬
কাঁচা পাট	...	৪৬১
গানি চট	...	৪৬১
চা	...	৪৬৭
চা-এর রপ্তানী	...	৪৭০
বয়ন-শিল্প	.	৪৭২
সূতা	..	৪৮৮
বাংলার উৎপন্ন সূতা	.	৪৮৮
কাগজের কল	...	৪৮৮
বৃটিশ ভারতে কাগজের কল	..	৪৯২
দিয়াশলাই	...	৪৯৩
বাংলার শিল্প-কারখানা	...	৪৯৫
বাংলার কারখানার সংখ্যা	...	৪৯৬
খাদ্যের কারখানা	...	৪৯৮
কোন্ প্রদেশে কত শ্রমিক দৈনিক খাটে	..	৫০০
বাংলায় ফ্যাক্টরীর সংখ্যা	...	৫০০
পঞ্চত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ	...	৫০২-৫৩৭
বাংলার কুটীর শিল্প	. .	৫০২
ভারতে বস্ত্র আমদানী ও ভারত হইতে বস্ত্র রপ্তানী	...	৫০৪
রেশম	...	৫০৯
প্রাণীজ শিল্প	...	৫১৪
লাক্ষা	...	৫১৪

বিষয়		পত্রাঙ্ক
বাসন-পত্র	...	৫১৬
কামারের কাজ	...	৫২০
বাংলার বন্দরে ছুরি কাঁচির আমদানী	...	৫২২
আঁশাল সামগ্রী	...	৫২২
চামড়ার শিল্প	...	৫২৬
বিবিধ কুটীর শিল্প	..	৫৩৬
ষট্‌ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ	...	৫৩৮-৫৪৮
বাংলার মজুব	..	৫৩৮
সপ্তত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ	...	৫৪৯-৫৯৭
বাণিজ্য	...	৫৪৯
আন্তব বাণিজ্য	...	৫৫৩
আন্তর প্রাদেশিক বাণিজ্য	..	৫৫৩
সীমান্ত বাণিজ্য	...	৫৫৮
উপকূল বাণিজ্য	...	৫৫৯
বাংলার উপকূল বাণিজ্য	...	৫৬১
বৈদেশিক বাণিজ্য	...	৫৬২
বৃটেনের মোট আমদানী	...	৫৬৩
বাংলাদেশের আমদানী-রপ্তানী	..	৫৬৬
রপ্তানী বাণিজ্য	...	৫৬৮
বাংলার রপ্তানী	...	৫৭৪
বাংলার রপ্তানী মাল কোন্ দেশ কত অংশ ক্রয় করে	...	৫৮০
আমদানী	...	৫৮২
রেশম ও পশম আমদানী	...	৫৯১
অষ্টত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ	...	৫৯৮-৬০৩
বাংলার রাস্তাঘাট	...	৫৯৮

বিষয়		পত্রাঙ্ক
ঊনচত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ	...	৬০৪-৬০৮
বাংলার রেলপথ	...	৬০৪
চত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ	...	৬০৯-৬১২
জলপথ ও জলযান	...	৬০৯
একচত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ	...	৬১৩-৬১৪
পোষ্টাফিস	...	৬১৩
দ্বাচত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ	...	৬১৫-৬২৭
সমবায় আন্দোলন	...	৬১৫

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

আয়-ব্যয়ের ইতিহাস

১৭৭৩ অব্দের পূর্বে ঈস্‌ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য ও জমিদারী সংক্রান্ত সকল কাজকর্ম প্রাদেশিক গবর্নর বা প্রেসিডেন্টের অধীন ছিল; বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও কলিকাতার গবর্নরদের যাহা কিছু প্রশ্ন থাকিত, তাহা তাঁহারা বিলাতের কোর্ট অব্‌ ডিরেক্টরস্‌ বা পরিচালকবর্গের নিকটে লিখিয়া ঠিক করিতেন। এদেশে কেহ কাহারও অধীন ছিলেন না। ১৭৭৩এর রেগুলেটিং এক্ট অনুসারে বাঙলার গবর্নর কোম্পানীর সকলপ্রকার কাজকর্মের জন্য দায়ী হইলেন ও গবর্নর জেনারেলের পদ সৃষ্টি হইল; এবং বোম্বাই ও মান্দ্রাজ গবর্মেণ্ট ইহার অধীন হইলেন; কিন্তু এতৎসত্ত্বেও বিলাতের সহিত বোম্বাই ও মান্দ্রাজের গবর্নরের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধসূত্র রহিয়া গেল। বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী পাওয়ার পর গঙ্গা-উপত্যকার দিকে কোম্পানীর রাজ্য বাড়িতে থাকে। এইসব যুদ্ধের ব্যয় বাঙলাদেশ বহন করিত; এমন কি, বোম্বাই ও মান্দ্রাজের যুদ্ধের সময়ে টাকা জোগানোর যন্ত্র ছিল বাঙলাদেশ। এই যুগের বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও বাঙলার রাজস্ব-ইতিহাস দেখিলে বুঝা যায় যে, বাঙলা ছাড়া উভয় প্রদেশেই প্রতিবৎসর রাজস্ব ঘাটতি পড়িত; ১৭৭৩ হইতে ১৭৭৮ সালের মধ্যে বাঙলাদেশ ১,৮৫২,৫২৭ পাউণ্ড (সাড়ে আঠারো কোটি টাকা) উভয় প্রদেশকে দান করে! ১৮১৪-১৫ হইতে ১৮২৮-২৯ পর্যন্ত বোম্বাই-এর দশ লক্ষ পাউণ্ড ও মান্দ্রাজের দুই লক্ষ পাউণ্ডের ঘাটতি, বাঙলার উদ্বৃত্ত ১,৮৯১,৬৩৫ পাউণ্ড হইতে পূরণ করিতে হইয়াছিল। (J. N. Gupta, M. A., I. C. S., Retired. *Financial Justice to Bengal.* Calcutta University Press, 1931. p. 48).

১৮৩৩ সাল পর্যন্ত বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি বলিতে পঞ্জাব ছাড়া প্রায় সমস্ত উত্তর-ভারতবর্ষই বুঝাইত। এই বৎসর নূতন সনন্দ গ্রহণের সময় স্থির হইল, ভারতবর্ষের শাসনভার এখন হইতে বৃটীশ পার্লামেণ্ট গ্রহণ করিলেন, কিন্তু

শাসনের প্রত্যক্ষভার কোম্পানীর উপর ন্যস্ত থাকিল; কোম্পানীকে ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়িতে হইল। গবর্নর-জেনারেল স-কৌন্সিল (Governor-General in Council) সমগ্র ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিলেন; তাঁহার অধীন তিনটি প্রদেশ বোম্বাই, মান্দ্রাজ, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ (বর্তমান U. P.) সহ বঙ্গদেশ অর্থাৎ তিনি একাধারে বাঙলার শাসনকর্তা ও নিখিল ভারতের শাসনকর্তা। এই সময়ে স্পষ্ট নিয়ম হইল যে, কোনো প্রাদেশিক গবর্নর বড়লাটের অনুমতি ব্যতীত কোনো নূতন পদের সৃষ্টি, বেতন, ভাতা, বখশিশ ব্যবস্থা—কিছুই করিতে পারিবেন না। এই সময় হইতে প্রাদেশিক শাসনকেন্দ্রগুলি ভারতীয় শাসন সরকারের মুঠির মধ্যে আসিতে আরম্ভ করিল। Centralisation বা কেন্দ্রানুগ শাসনব্যবস্থা সুরু হইল এবং প্রায় চল্লিশ বৎসর এই কেন্দ্রীয় শাসনের জবরদস্তিতে প্রাদেশিক শাসনগুলি চলিয়াছিল। কেন্দ্রীয় শাসনের এমন কড়াক্কড়ি ছিল যে, দশটাকা মাহিনার একটা পেয়াদা পযন্ত নিয়োগের অধিকার ছোটলাটদের ছিল না। কিন্তু এত করিয়াও ঘাটৃতি কমাইতে কেহ পারে নাই। ঈস্‌ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৮৫৭এ লোপ পাইলে ভারতবর্ষকে অনেক দেনা ঘাড়ে করিয়া লইতে হয়; সিপাহী বিদ্রোহ দমনের ব্যয়, সীমান্ত রক্ষার ব্যয় সমস্তই নূতন; ঘাটৃতির ইহা প্রধান কারণ। তাছাড়া প্রাদেশিক গবর্মেণ্টের মিতব্যয়িতার কোনো কারণ ছিল না, নিজ নিজ প্রদেশের ব্যয়ের জন্য যে যত কাড়াকাড়ি, চেচামেচি করিতে পারিত, তাহারই জিত হইত। এইভাবে ভারতের আয়-ব্যয় ১৮৭১ সাল পর্যন্ত চলে।

১৮৭১এ বড়লাট লর্ড মেয়োর সময়ে প্রাদেশিক আয়-ব্যয়ের নূতন ব্যবস্থা হইতে Decentralization বা প্রাদেশিক অ-কেন্দ্রীকরণ সুরু হইল। রেজিষ্ট্রেশন, জেল, পুলিশ, শিক্ষা, চিকিৎসা (আংশিক), মুদ্রাযন্ত্র এবং পূর্তবিভাগের কয়েকটি শাখার আয়—বঙ্গীয় সরকারকে দেওয়া হইল। এছাড়া বাঙলাকে ১'১৭ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। মোট কথা, তখন পর্যন্ত আয়করী লাভজনক বিভাগ বাঙলাদেশের শাসন ব্যবস্থার হাতে দেওয়া হয় নাই; যে বিভাগগুলি দেওয়া হইয়াছিল, তার সবগুলিই ব্যয়করী লোকসানী বিভাগ; এ সত্ত্বেও এই প্রথা ভালই চলে। ১৮৭৭এ লর্ড লীটনের সময় কতকগুলি আয়-হওয়া বিভাগ বাঙলার হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইল; যেমন আবগারী,

স্ট্যাম্প, আইন ও বিচারের আয় ; সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি খরচের কোঠাও চাপানো হইল, যেমন রাজস্ব আদায়ের খরচ, সাধারণ শাসন, আইন ও বিচার এবং বিবিধ বিষয়। সরকারী রেলওয়ে ও মালের আয় ও ব্যয় প্রাদেশিক গবর্মেণ্টের উপর অর্পিত হইল ; কিন্তু এইসব নূতন রেলপথাদি করিতে যে ব্যয় হইল, তাহার বার্ষিক আয় হইতে মূল কর্জ-করা টাকার সুদ উঠিল না। ১৮৮২ সালে সমগ্র রাজস্বকে কেন্দ্রীয় খাশ, প্রাদেশিক খাশ ও উভয় বিভাগের মধ্যে বখেরায় বন্দবস্ত করা হইল (Imperial, Provincial, Divided)।

লর্ড লীটনের সময়ে যে ব্যবস্থার প্রবর্তন হইয়াছিল, তাহা ১৯০৪ সাল পর্যন্ত প্রত্যেক পাঁচ বৎসর অন্তর পুনঃপ্রবর্তিত হইয়া চলিয়া আসিয়াছিল। লর্ড কর্জনের সময় ঠিক হইল যে, পাঁচ বৎসর অন্তর ঐভাবে প্রাদেশিক শাসনকে আর বন্দবস্ত করিয়া টাকা লইতে হইবে না। তাঁহার ব্যবস্থানুসারে কতকগুলি বিষয়ের আয় পাকাপাকিভাবে প্রাদেশিক শাসনকেন্দ্রের হাতে অর্পিত হইল। ১৯০৭ সালে Welby কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্যদানকালে মহামতি গোখ্‌লে এই ভাগাভাগির মালিকানা সম্বন্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। (Gyanchand, *Financial System of India*, p. 147 fn.) ১৯১১ সালে প্রদেশগুলির সঙ্গে ভাগ-বাঁটোয়ারা পাকাপাকি ও চিরস্থায়ীরূপে হইল।

তারপর মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড-সংস্কারে আয়-ব্যয়ের আমূল পরিবর্তন হইল। এতদিন পর্যন্ত সমস্ত আয়ের কোঠার কতকগুলি কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট, কতকগুলি প্রাদেশিক সরকার, আর কতকগুলি বিষয় উভয়ের মধ্যে ভাগাভাগি চলিত। কিন্তু মণ্ট-ফোর্ড-শাসনসংস্কারের সবথেকে বড় কথা হইল—প্রাদেশিক শাসন-সরকার-সমূহকে অধিকতর দায়িত্বদান ; সেই দায়িত্বদান আর্থিক দায়িত্ব ছাড়া হইতে পারে না—একথা মণ্টেগু বুঝিয়াছিলেন। বহুকাল হইতে ভারতীয় রাজনীতিকরা বার বার বলিয়া আসিতেছিলেন যে, শাসন-দায়িত্ব ও আয়-ব্যয়-বিষয়ে স্বাধীনতা প্রাদেশিক শাসন বিভাগগুলির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু প্রশ্ন উঠিল প্রাদেশিক শাসনগুলিকে নিজ নিজ রাজস্ব দান করিয়া দিলে ভারত শাসনকেন্দ্র কেমন করিয়া চলে ; ভারত সরকারের মোটা খরচ—বড়লাটের ও তাঁহার অফিসের কর্মীদের বেতন, সৈন্য বিভাগ, রেলওয়ে, ডাক

ও তার, বিলাতের হোমচার্জ, জাতীয় ঋণের সুদ ও আসল শোধ প্রভৃতি বড় বড় বিষয়ের মোটা মোটা অঙ্কের খরচ। সেইজন্য পূর্বে সমগ্র ভারতের রাজস্ব ভারত গবর্মেণ্ট খাতেই জমা হইত।

১৯২১ হইতে বাঙলা সরকারের উপর কতকগুলি বিষয় সম্পূর্ণভাবে অর্পিত হইল—বিষয়গুলির ব্যবস্থা ও আয়-ব্যয় সবেরই দায় ও দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকার পাইলেন। কিন্তু প্রাদেশিক সরকার বলিতে দ্বৈরাজ্য বুঝায়,—কতকগুলি বিষয় লাটসাহেব ও অধ্যক্ষসভার খাশ এবং কতকগুলি দেশীয় মন্ত্রীদের উপর হস্তান্তরিত। প্রাদেশিক শাসনের উপর আয়-ব্যয়ের ভার দিবার সময় পার্লামেণ্ট পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিধি লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কোন্ কোন্ বিষয় বাঙলা সরকারের হাতে ছিল, তাহা পূর্বের এক তালিকায় প্রদত্ত হইয়াছে (পৃঃ ২৪৭)।

কিন্তু মণ্ট-ফোর্ড-শাসনসংস্কার প্রবর্তনের ফলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসন বিভাগের আয়-ব্যয়ের প্ল্যানটাই বদলাইয়া গেল, পূর্বে কেন্দ্রীয়-শাসন প্রাদেশিক-শাসনকে টাকা দিতেন, এখন স্থির হইল—প্রাদেশিক-শাসন বিভাগ কেন্দ্রীয় শাসনের খরচের জন্য একটা করিয়া বার্ষিক টাকা দিবেন। এই ব্যবস্থা করেন এক কমিটি; মেস্‌টন সাহেব ইহার সভাপতি ছিলেন বলিয়া ইহা Meston কমিটি নামে পরিচিত। এই কমিটির নির্দেশানুসারে ১৯২১-২২ সালে কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের জন্য ৬৩ লক্ষ টাকা বাঙলাকে দিতে হয়। মান্দ্রাজ দেয় ৩,৪৮ লক্ষ; যুক্তপ্রদেশ ২,৪০ লক্ষ, পঞ্জাব ১,৭৫ লক্ষ ইত্যাদি। বাঙলার এই ৬৩ লক্ষ ১৯২৫ সাল হইতে আর দিতে হয় নাই।

বাঙলার একদল লোকের বক্তব্য এই যে, বাঙলাদেশের শুল্ক ও আয় কর বাবদ যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় হয়, তাহার সবটাই কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের পোষণের জন্য দিতে হয় এবং এই যে টাকাটা দেওয়া হয়, তাহা অন্য সকল প্রদেশের প্রদত্ত টাকা হইতে অধিক।

মেস্‌টনী সিদ্ধান্তানুসারে আয়-কর ও সুপার ট্যাক্স, শুল্ক, লবণ, আফিম প্রভৃতির আয় ভারত গবর্মেণ্টের নিজস্ব। বাঙলার এইসমস্ত আয় মিলিয়া ভারত গবর্মেণ্টকে ১৯২১এ দিতে হইয়াছিল ২৩ কোটি, ১৯২৫এ ২৬ কোটি টাকা! বাঙলার ব্যয়ের জন্য থাকে ১০ কোটি টাকা মাত্র! এই দশ কোটি টাকা হইতে রক্ষিত, হস্তান্তরিত সকল বিষয়ের খরচ চালাইতে

হইত। আমরা অন্য সব প্রদেশের সহিত বাঙলার একটা তুলনামূলক তালিকা পরিশিষ্টে ছকিয়া দিয়াছি। মেস্‌টন কমিটির ৬৩ লক্ষ টাকা মাপ হওয়া সে-টাকার তুলনায় নগণ্য।

নূতন ব্যবস্থানুসারে ভারত গবর্মেণ্টের আয় কিভাবে বাড়িতেছে, তাহার একটা তালিকা দিতে চাই; কারণ এসবের আয় যথার্থভাবে প্রাদেশিক সরকারের। বাঙলাদেশ কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টকে ২৬ কোটি টাকা দিতেছে। ভারত সরকারের আয় প্রাদেশিক আয়ের তুলনায় কিভাবে বাড়িয়াছে, তাহা এই তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

	কেন্দ্রীয় আয় (লক্ষ টাকা)				প্রাদেশিক আয় (হাজার টাকা)				
	শুল্ক	আয়-কর	লবণ	আফিঙ	ভূমি-রাজস্ব	আবগারী	ষ্ট্যাম্প	বন	রেজিষ্ট্রেশন
১৯১১-১২	৯,৭০	২,৪৭	৫,০৮	৮,৯৪	৩১,১৪	১১,৪১	৭,২২	২,৯২	৬৬
১৯১৩-১৪	১১,৩৩	২,৯২	৫,১৬	২,৪৩	৩২,০৮	১৩,৩৪	৭,৭৯	৩,৩৪	৭৭
১৯২০-২১	৩১,৮৯	২২,১৯	৬,৭৬	৩,৫৩	৩১,৯৭	২০,৪৩	১০,৯৫	৫,৪১	১,১২
১৯২২-২৩	৪১,৩৪	১৮,১৩	৬,৮২	৩,৭৮	৩৫,৩৫	১৮,৫৫	১১,৯৫	৫,৫২	১,২০
১৯৩২-৩৩	৫২,৩১	১৮,৭৩	৯,৪৩	১,৩২	৩২,৮৬	১৩,৯৫	১২,০৯	৪,১১	১,০৮

১৯৩২-৩৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের আয়	১,২৯,৯৬ লক্ষ টাকা
প্রাদেশিক সরকারসমূহের আয়	৮৪,৬৩ লক্ষ টাকা
মোট	২১৪ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, যে-সব বিষয় হইতে আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে, তার অধিকাংশই কেন্দ্রীয় সরকারের ভাগে পড়িয়াছে; শুল্ক হইতে আয় বিশ বৎসর পূর্বে যেখানে ছিল ৯ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা, সেখানে হইয়াছে ৫২ কোটি ৩১ লক্ষ। অথচ সমগ্র ভারতের ভূমি-রাজস্ব—যাহা অর্পিত বিষয়, তাহার আয় ৩১ কোটি ১৪ লক্ষ হইতে ৩২ কোটি ৮৬ লক্ষ হইয়াছে অর্থাৎ প্রাদেশিক সরকারদের আয়ের বিষয়গুলির উন্নতির আশা শুল্কাদির অনুরূপ নয় বলিয়া মনে হইতেছে।

আর একটি তালিকা হইতে আমরা দেখাইব কোন্ প্রদেশে মাথাপিছু কত রাজস্ব আদায় হয় এবং তার কতখানি কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের জন্য প্রদত্ত হয়, আর কতটাই বা নিজেদের ব্যবহারের জন্য থাকে ; তালিকাটি ১৯২০-২১ সালের :—

	মান্দ্রাজ	বোম্বাই	বঙ্গদেশ	যুক্তপ্রদেশ	পঞ্জাব	বর্মা	বিঃ-উড়িষ্যা	মধ্যপ্রদেশ	আসাম
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১। মোট মাথাপিছু আদায় রাজস্ব	৫'৩	১৯'৩	৭'৩	৩'২	৫'৯	১৭'৮	১'৪	৩'২	৩'৭
২। কেন্দ্রীয় সরকারে মাথাপিছু কত দেওয়া হয়	২'৯	১৩'৬	৫'৫	১'২	২'৫	৫'৭	'৩৮	'৭৬	'৪৯
৩। ১নং ও ২নং এর সংখ্যানুপাত	৫৫%	৬৯%	৭০'৪%	৪০%	৪৩%	৩১%	২৫'৬%	২৩'৭%	১৬'৩%
৪। মাথাপিছু প্রাদেশিক রাজস্ব	২'৪	৫'৮	১'৮	১'৯	৩'৩	১২	১'১	২'৪	২'৫
৫। মাথাপিছু ব্যয়	২'৭	৬'৫	১'৯	২'২	৩'৭	৬'৭	১'৩	৩'১	২'৬
৬। সাধারণ শাসনের জন্য শতকরা ব্যয়	৭'৬	২৫'৬	৮'১	৭'৬	১৩'৪	২৩'১	৫'৬	১০'৩	১৩'৬
৭। সাধারণ শাসনের জন্য বর্গমাইল প্রতি ব্যয়	২০'১	৩৯'৮	৫০'৫	৩১'৯	২৭	১২'৯	২৭'৬	১৫	১৮'৬
৮। শিক্ষার জন্য শতকরা ব্যয়	৩২	৭৪'৫	২৩'৪	২৬'৫	৩৬'১	৩৫'৫	১৫'৯	৩০'৬	২৫
৯। আইন ও বিচারের জন্য ব্যয়	৩৫	৫৭	৩৬'১	২৮'৮	৪৪	৫৮'১	২৩'৪	৪০'১	২৩
১০। পুলিশের ব্যয়	৪১'৬	৯০	৩৫'২	৩৭'১	৪৭'৮	১৪০	২০'৪	৪০'২	৩৯'৩
১১। বর্গমাইলে পুলিশের জন্য ব্যয়	১৩২	১৪৩	২১৮	১৬২	৯৬	৭৮'৫	৮৩'৫	৫৬	৫৫'৬
১২। স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয়	১৬'৭	৩০	১০'৮	৮'৫	১৫'৮	২৬'৩	৫'৬	১১'৪	১৪'৩

দ্রষ্টব্য Gyanchand, *The Financial System of India*, Trubner, p. 435.

দেখা যাইতেছে, বাঙলাদেশের রাজস্বের শতকরা ৭০'৪% ভাগ কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের জন্য যায়। এত টাকা আর কোথাও হইতে আসে না। বোম্বাই ইহার পরেই। ইহার কারণ, বাঙলা ও বোম্বাই-এর বন্দর দিয়া শুল্কের আয় হয় বেশী; ধনী ব্যবসায়ীর বাসস্থান ও অপিষ বলিয়াও আয়-কর হয় বেশী।

বাঙলাদেশের আর্থিক অবস্থা ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য আমরা এতগুলি তালিকা উধৃত করিয়াছি; প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন লাভ করিতে হইলে, আর্থিক স্বাধীনতা বিবেচনার বিষয়; বাঙলাদেশের পাট হইতে যে মোটা আয় হইত, তাহার রপ্তানী শুল্ক এবং চা-এর শুল্ক সমস্ত হইতে বাঙলা ও আসাম বঞ্চিত। কিছু সুবিচারের কথা উঠামাত্র অন্যান্য প্রদেশ আপত্তি করিতেছে। বাঙলা এপর্যন্ত ভারত সরকারকে কিভাবে পোষণ করিয়া আসিতেছে, এবং এক সময়ে অন্য প্রদেশকেও অর্থ সাহায্য করিয়াছে, তাহা আমরা দেখাইয়াছি।

গত ১৫ বৎসরের মধ্যে ভারতের রাজস্ব বণ্টন লইয়া বহু কমিশন ও কমিটি বসিয়াছে, ইহাদের বিস্তৃত আলোচনা 'ভারত পরিচয়ে'র অন্তর্গত।

প্রদেশসমূহ হইতে ভারত সরকারের আয়

১৯২১-২২

(হাজার টাকা)

প্রদেশ	আয়-কর	সুপার ট্যাক্স	শুল্ক	লবণ	আবগারী আফিম	প্রাদেশিক দান (মেস্‌টনী সালিসি)	মোট ভারত সরকারকে প্রদত্ত
বঙ্গদেশ	৩,৮৯,৪৮	২,৬৮,৭৪	১৪,২৬,৭২	১,৫৫,৭৭	৮,২৭	৬৩,০০	২৩,১১,৯৮
যুক্তপ্রদেশ	৮৪,৮৯	৩৭,১৬	৫,৮৭		৭,০৬	২,৪০,০০	৩,৭৪,৯৮
মান্দ্রাজ	১,২৬,৪৪	৪৪,০৯	২,১২,৪৫	১,৩৯,০২	৮,৬৪	৩,৪৮,০০	৮,৮৫,৮৮
বিহার-উড়িষ্যা	৩০,৮৪	১০,০৩	১		৭,৬৪		৪৮,৫২
পঞ্জাব	৪৭,১৫	৯,৯৭	৫		৯,৩২	১,৭৫,০০	২,৪১,৪৯
বোম্বাই	৪,৯১,৬৮	৩,৪৪,৬২	১৪,৩৬,৪১	১,২১,৩৫	১২,০৩	৫৬,০০	২৪,৬২,০৯
মধ্যপ্রদেশ	৩৮,১২	১৮,৪১	৮,৯০		৬,৪২	২২,০০	৯৩,৮৫
আসাম	৮,৪৭		১,৯৮		৮,৪২	১৫,০০	৩৩,৮৭
						১৯২১ মোট	৬৪,৫২,৬৬

(হাজার টাকা)

১৯২৫-২৬

প্রদেশ	আয়-কর	সুপার ট্যাক্স	শুল্ক	লবণ	আবগারী আফিম	প্রাদেশিক দান (মেস্‌টনী সালিসি)	মোট ভারত সরকারকে প্রদত্ত
বঙ্গদেশ	৩,৪১,৭২	২,৫১,৮৭	১৮,৪৩,৪১	১,৭১,৬৪	১৫,৬৩		২৬,২৪,২৭
যুক্তপ্রদেশ	৬৩,২৩	১৭,৩১	৫,১৭		৭৮,৮৭	১,৮৩,৮৩	৩,৪৮,৪১
মাদ্রাজ	১,১৯,০৭	২২,৩১	৩,৬৮,৬৯	১,৪৭,৫৯	৬,৪৮	২,২১,৯৮	৮,৮৬,১২
বিহার-উড়িষ্যা	৩২,৮১	৪,২৪	১		৭,৪৭		৪৪,৫৩
পঞ্জাব	৫৯,০৬	৬,১৭	৪,১৩		২,২৩	১,১৩,৮৪	১,৮৫,৪৩
বোম্বাই	২,৬৪,৩০	৮৬,১৯	১৮,৭৮,৭৩	১,৫২,২০	৬,৬২	৩৪,০০	২৪,২২,০৪
মধ্যপ্রদেশ	৩০,৫৭	৭,৫৭	৫,৭৮		৩,১৭	১৩,০০	৬০,০৯
আসাম	১৬,৫৭	২,৪৭	১০,০৯	১	৫,০২	৯,০০	৪৩,১৬
						১৯২৫ মোট	৬৬,১৪,০৫

প্রাদেশিক শাসনের আয় (১৯২৮-২৯)

(লক্ষ টাকা)

প্রাদেশিক	মান্দ্রাজ	বোম্বাই	**বঙ্গদেশ**	যুক্ত প্রদেশ	পঞ্জাব	বর্মা	শান রাজ্য	বিহার-উড়িষ্যা	মধ্য প্রদেশ	আসাম	মোট
ভূমি-রাজস্ব	৫২৫	৪৮৫	৩২৭	৬০৪	২৭৮	৫৪০	৫	১৭৪	২১৯	১১৭	৩২,৭৪
আবগারী	৫৫৯	৩৯২	২২৬	১৩১	১২১	১৩৩	১	১৮৯	১২৩	৬৬	১৯,৪০
ষ্ট্যাম্প	২৫১	১৬৮	৩৫৫	১৭৩	১২১	৭১	—	১১০	৭০	২২	১৩,৪১
আয়-কর	৫	—	—	—	৪	১২	—	৫	২	৬	৩৫
জলসেচন	১৮৩	৬৬	১	৮৫	৩৭৪	৩৩	—	২১	—	—	৭৬১
বনবিভাগ	৬২	৭৩	৩১	৬২	৩৫	১৬১	২০	১১	৫৪	৩৮	৫৪৭
অন্যান্য	১৯৮	৩৩৮	১৬৭	৯০	১৮২	১০৬	৩২	৬৮	৬৮	২৪	১২,৩৫
	১৭,৫৩	১৫,২২	১০,৯৭	১১,৪৫	১১,১৫	১০,৫৫	৫৮	৫,৭৮	৫,৩৬	২,৭৪	৯১,৩৩
প্রদেশে সংগৃহীত কেন্দ্রীয় আয়											
শুল্ক	৪৬৯	১৯২১	১৮৫০	—	৯	৬৫৭	—	—	—	২৩	৪৯,২৯
আয়-কর	১৩১	৩১৭	৬১৫	৯০	৬১	১৮৫	—	৯১	৩৩	১৫	১৫,৩৮
লবণ-কর	১৪৮	১৫৮	১৭৬	—	—	৩৫	—	—	—	—	৫১৭
আফিম	—	—	—	৩২৭	—	—	—	—	—	—	৩২৭
অন্যান্য	১৯	৮৮	৩৬	৫	৩১	১০	—	৩	৩	১	১৯৬
মোট	৭,৬৬	২৪ ৮৪	২৬,৭১	৪,২২	১,০১	৮,৮৭		৯৪	৩৬	৩৯	৭৬,০৭
সর্বসাকুল্যে	২৫,১৯	৪০,১৮	৩৭,৭৪	১৫,৬৭	১২,১৬	১৯,৪২		৬,৭২	৫,৭২	৩,১৪	১৬৭,৪০

J. N. Gupta. *The Case for Financial Justice to Bengal* দ্রষ্টব্য। ১৯৩৫-৩৬এ ভারত সরকারের আনুমানিক আয় ৮২,৭২ কোটি।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বাঙলার রাজস্ব

রাজস্ব দুই রকমে সংগৃহীত হয়। এক হইতেছে ট্যাক্স বা কর বসাইয়া, দ্বিতীয় হইতেছে খাজনা আদায় করিয়া। ট্যাক্স দুই রকমে ধরা হয়, যথা—প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর। আয়-কর হইতেছে প্রত্যক্ষ কর; নির্দিষ্ট আয়ের উপর টাকাপ্রতি সরকার একটা ট্যাক্স নগদ আদায় করেন। আমদানী রপ্তানীর উপর যে-কর আছে, তাহাও নগদ টাকায় দিতে হয় বটে, কিন্তু তাহার ট্যাক্স দেয় ক্রেতাই; সুতরাং শুল্ককে পরোক্ষ কর বলা যায়। পরোক্ষ করে আমরা যে টাকা দিতেছি, সেটা বোঝা যায় না; যেমন লবণ, আবগারী মাল, আফিম প্রভৃতির উপর যে ট্যাক্স আছে, তাহা আমরা আমাদের অগোচরে জিনিষ কিনিবার সময়ে দিই। এইসব সামগ্রীর মূল্য সামান্য। কিন্তু সেগুলির উপর ট্যাক্স থাকাতে লোককে বেশি দাম দিয়া কিনিতে হয়। আসল দাম ও বিক্রয়ের দামের মধ্যের লভ্যাংশ সরকারের পরোক্ষ (indirect) কর। ট্যাক্সের নানারকম পদ্ধতি আছে; সেগুলি সবিস্তারে বলা এখানে সম্ভব নয়।

খাজনাকে আমরা একপ্রকারের ভাড়া বলিতে পারি। চাষী জমি চাষ করে; সে চাষের জমির জন্য খাজনা দেয়; খাজনা বন্ধ করিলে জমিতে তাহার অধিকার থাকে না। তখন গবর্মেণ্ট অন্য চাষীকে জমি বন্দবস্ত করিয়া দিতে পারেন। গবর্মেণ্টের সঙ্গে জমিদারের সম্বন্ধও সেইরূপ। কাহারো কাহারো মতে জমির খাজনাও ট্যাক্স; কারণ, তাঁহারা বলেন সেটি হইতেছে—উৎপন্ন শস্যের মূল্যের উপর কর। জমির চাষ ছাড়া আরও নানাবিষয়ে গবর্মেণ্ট খাজনা লইয়া কাজ বিলি করেন, যেমন খোঁয়াড় রাখা, পারাণী ঘাট রাখা, আবগারী দোকান রাখা ইত্যাদি। আবগারী ব্যাপারে গবর্মেণ্ট একবার ট্যাক্স আদায় করেন, আর একবার দোকান বিলি করিয়া খাজনা আদায় করেন।

গবর্মেণ্টকে এইসব ট্যাক্স ও খাজনা আদায় করিয়া রাজ্য পরিচালনার ব্যয় নির্বাহ করিতে হয়। এই আয় ও ব্যয়কে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করিতেছি, যথা (১) ভারতীয় গবর্মেণ্টের আয়-ব্যয়, (২) প্রাদেশিক গবর্মেণ্টের আয়-ব্যয়, (ক) রক্ষিত, (খ) অর্পিত; (৩) স্থানীয় স্বায়ত্ব-শাসন বিভাগের আয়-ব্যয়, (ক) জেলা-বোর্ড, (খ) ম্যুন্সিপালটি বা ইঁনিয়ন বোর্ড। এই তিন দফা শাসনের জন্য অধিকাংশ প্রজাকে কোনো না কোনোভাবে—প্রত্যক্ষই হউক আর পরোক্ষই হউক, অর্থদ্বারা গবর্মেণ্টের পরিচালনায় সাহায্য করিতে হয়।

বর্তমানে ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় ব্যয়ের জন্য প্রদেশগুলি হইতে নিম্নলিখিত আয়গুলি সম্পূর্ণরূপে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে, যথা—শুল্ক, আয়-কর, লবণ-কর, আফিম, করদ রাজকর ইত্যাদি।

ভারত গবর্মেণ্টের আয়ের এককালে এমন অবস্থা ছিল, যখন জমির খাজনাই ছিল গবর্মণ্টের প্রধানতম আয়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ভারতের সমগ্র আয়ের ৫৩'১৫% ভাগ ছিল ভূমি-রাজস্ব; ব্যবসা-বাণিজ্য তখনও তেমন উন্নতিলাভ করে নাই। আয়-কর সম্বন্ধে গবর্মেণ্টের নীতি উদাসীন ছিল। সুতরাং সে-সময়ে (১৮৮৩-৮৪) শুল্ক ছিল সমগ্র আয়ের শতকরা তিনভাগেরও কম। কিন্তু ব্যবসা-ব্যাণিজ্যের প্রসার ও শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লোকের আয় বাড়িয়াছে এবং গবর্মেণ্টও সেইসব আয় হইতে নানাভাবে রাজস্ব আদায়ের সুবিধা পাইয়াছেন। কোন্ বিষয় হইতে সমগ্র রাজস্বের শতকরা কতখানি উঠিয়াছে, তাহার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল :—(১)

মোট রাজস্বের শতকরা অংশ

	১৮৮৩-৮৪	১৮৯৩-৯৪	১৯০৩-০৪	১৯১৩-১৪	১৯২৩-২৪	১৯৩২-৩৩(২)
ভূমি-রাজস্ব	৫৩'১৫	৪৬'৭১	৪২'৭৬	৩৫'৪২	২০'৭৫	২১'১৭
শুল্ক	২'৯৮	৬'২৭	৯'২১	১২'৯৯	২৪'৩০	৩৫'৬৩

(১) Report of the Indian Taxation Enquiry Committee 1924-25, Vol. I, p. 352.

(২) শেষেরটি Financial Statement of Br. India for 1932-33 হইতে কসিয়া বাহির করা।

	১৮৮৩-৮৪	১৮৯৩-৯৪	১৯০৩-০৪	১৯১৩-১৪	১৯২৩-২৪	১৯৩২-৩৩
আয়-কর	১'৩২	৩'৩৯	২'৯২	৩'৫২	১২'৩০	১২'৬৪
আবগারী, আফিম	২৫'০৭	২৬'৫১	২৪'৯৭	২২'৯২	২১'৬৭	১০'৮২
স্ট্যাম্প, রেজিস্ট্রেশন প্রোবেট্ ইত্যাদি	৯'৪৭	৯'৫৯	৯'৩৯	{ ১০'৮৯ '১৮	৯'০৩ '১৫	৮'৯৫
স্থানীয় ট্যাক্স ইত্যাদি	৮'০১	১০'৫৩	১০'৭৫	১৪'০৮	২১'৭০	{ ৭'০১ লবণ ২'৫৮ বন ১'০০ বিবিধ

উপরের এই তালিকা দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, ভূমি-রাজস্ব হ্রাস পাইযাছে। তালিকায় দেখা যাইতেছে, ভূমি-রাজস্ব মাত্র সমগ্র আয়ের বিশভাগ। স্থানীয় ট্যাক্স বিশেষভাবে বাড়িয়াছে। শুল্ক ও আয়-করের আয় যে বাড়িয়াছে, তাহা স্বাভাবিক সমৃদ্ধি হেতুই বটে, তবে বিশেষভাবে ট্যাক্স-হারের বৃদ্ধি ইহার জন্য দায়ী। বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, বর্তমানে ভারতশাসন বিষয়ে ভূমি-রাজস্ব গবর্মেণ্টের প্রধান অবলম্বন নহে। ভূমি-রাজস্ব এমন একটা জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, তাহার আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। জমির taxable ক্ষমতা চরমে উঠিয়াছে।

মেস্টন কমিটির নির্দেশানুসারে ভূমি-রাজস্ব সম্পূর্ণরূপে প্রাদেশিক হইয়াছে এবং শুল্ক, আয়-কর প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপেই কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের খাশ আয় হইয়াছে ; ইহাতে অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাঙলার ক্ষতি অধিক। প্রথমত বাঙলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দবস্ত থাকায় এখানকার ভূমি-রাজস্ব প্রায় নির্দিষ্টই হইয়া আছে ; অন্যান্য প্রদেশে যেখানে সরকারের সঙ্গে রায়তের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ, সেখানে বিশ বৎসর অন্তর ও নূতন বন্দবস্তের সময়ে ভূমি-রাজস্ব বাড়িয়া থাকে। তাই বলিয়া কেহ যেন মনে করেন না, বাঙলার চাষীর খাজনা বাড়ে নাই। তাহার খাজনা দশ বৎসর অন্তর বাড়ে, কিন্তু সে লাভ বঙ্গীয় সরকার পান না। দ্বিতীয়ত, বাঙলা ও আসামের প্রধান দুইটি রপ্তানী মাল পাট ও চা-এর শুল্ক, এ দুইটি এই দেশের গবর্মেণ্ট কখনো পায় নাই। বর্তমানে নানা কারণে চা-এর রপ্তানী-শুল্ক উঠাইয়া দিতে হইয়াছে, কিন্তু পাটের শুল্কও সম্পূর্ণরূপে বাঙলাকে দেওয়া হয় নাই। লবণ

বাঙলার সমুদ্রোপকূলে প্রস্তুত হয় না; ইহাও বাঙলাকে অন্য প্রদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। কাথিবাড় এখন লবণের মস্ত রপ্তানীর স্থান।

বাঙলাদেশের রাজস্ব ও আয়-ব্যয়ের ইতিহাস আলোচনা করিয়া আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি যে, এখানকার ভূমি-রাজস্ব আদায় হয় ১৬ কোটি টাকার কিছু উপর; তাহা হইতে মাত্র তিন কোটি টাকা বাঙলা গবর্মেণ্ট পাইয়া থাকেন রাজস্ববাবদ। ১৯৩২ সালে বাঙলা হইতে সকল প্রকারে আয় হয় প্রায় ৩২।৩৩ কোটি টাকা; ইহার মধ্যে কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের খরচের জন্য তাঁহারা শুল্ক, আয়-কর, লবণ প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ের আয় হইতে প্রায় ২১ কোটি টাকা আদায় করিয়া লন; বাঙলার জন্য অবশিষ্ট থাকে কোটি এগারো টাকা; এই টাকার মধ্যে ভূমি-রাজস্ব ৩ কোটি টাকা স্থির আছে; তাহার বৃদ্ধি নাই। সুতরাং বাঙলার খরচের জন্য শুল্ক, আয়-কর, লবণ-কর, আফিম ও ভূমি-রাজস্ব ছাড়া অন্যান্য বিষয় হইতে রাজস্ব বাড়াইতে হইতেছে। সেইজন্য নূতন কর বসাইবার প্রয়োজন হইয়াছে।

বাঙলাদেশের আয়-ব্যয়ের কথা বিস্তৃতভাবে বলিবার পূর্বে বাঙলাদেশ ভারত সরকারকে যেভাবে অর্থ দান করিয়া সাহায্য করিতেছে, তাহাব কথা বলিব।

বাঙলাদেশ হইতে আয়

বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা

গড়ে	বাদশাহী আয়	প্রাদেশিক (হাজার)	মোট (হাজার)
১৮৮০-১৮৯০	১২ কোটি	৪,৪১,৯৩	১৮,৩৬,৪০
১৮৯০-১৯০০	১৫ কোটি	৪,৭৪,০৩	২০,৪৪,৪৯
১৯০১	১৮·২০ কোটি	৪,৮১,৬১	২৩,৭৪,২৩
১৯০৪	১৮ কোটি	৬,৩৪,২০	২৫,১৮,৮০
বাঙলা প্রেসিডেন্সি			
১৯১২-১৩	১০,৬৭,৫০,০০০	৭,১৬,১৫,০০০	১৭,৮৩,৬৫,০০০
১৯১৯-২০	২৬,২৯,০৩,০০০	৮,৪২,১৬,০০০	৩৪,৭১,১৯,০০০
১৯২০-২১	২৫,৯৭,১৭,০০০	৮,৬১,১৯,০০০	৩৪,৫৮,৩৬,০০০

	বাদশাহী আয়	প্রাদেশিক	মোট
গড়ে		(হাজার)	(হাজার)
নূতন শাসনসংস্কার প্রবর্তিত হইল।			
১৯২১-২২	২৫,৮৩,০৯,০০০	৯,৮৭,৮২,০০০	৩৫,৭০,৯২,০০০
১৯২৪-২৫	১১,১০,২২,০০০ (১) ১৮,৬৩,৪৪,০০০ (২)	১০,৩২,৩০,০০০	৩৯,৮৪,০৯, ০০০
১৯২৯-৩০	৬,৫৮,৫৫,০০০ (১) ১৮,৪৮,৯৪,০০০ (২)	১৭,০১,১৯,০০০	৩৯,০৮,৬৮,০০০
১৯৩১-৩২	২১,২২,০৯,০০০ (৩)	১১,৮৬,৯০,০০০	৩৩,০৮,৯০,০০০
১৯৩২-৩৩	২১,৮০,৫৫,০০০ (৩)	১১,৮৪,৭৪,০০০	৩৩,৬৫,১৯,০০০

ভারত সরকার বাঙলাদেশ মারফত যেসব আয় পাইয়া থাকেন, আমরা প্রথমে সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

শুল্ক

প্রথমেই লওয়া যাক্ শুল্ক। বোম্বাই, করাচী, মান্দ্রাজ, ভিজাগপট্টম্, কলিকাতা, চট্টগ্রাম হইতেছে ভারতবর্ষের প্রধান বন্দর; ভারতের মধ্যে যা কিছু মাল সমুদ্র পথ দিয়া প্রবেশ করে বা ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী হয়—তাহার প্রধান বন্দর এই কয়টি। সুতরাং কলিকাতার বন্দরে যে কেবল বাঙলারই মালপত্র যায়-আসে তাহা নহে। সমগ্র যুক্ত-প্রদেশ, বিহার-উড়িষ্যা, আসামের বন্দর হইতেছে কলিকাতা; চট্টগ্রাম ক্রমশই বড় হইতেছে। সুতরাং শুল্ক বাবদ যে আয় কলিকাতা ও চট্টগ্রামে হয়, তৎসংক্রান্ত বাণিজ্যের সকল কৃতিত্ব বাঙলার একলার নহে; তবে অনেকখানিই যে তাহার, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহরূপে বলা যাইতে পারে।

যতদিন প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় শাসন ও আয়-ব্যয়ের ভাগাভাগি স্পষ্ট করিয়া আজকালের মত হয় নাই, যখন সমস্ত প্রাদেশিক আয়কেও নিখিল

---

(১) শুল্কবাদে অন্যান্য খাতে আদায়

(২) শুল্ক

(৩) অন্যান্য ও শুল্ক যোগ হইতেছে

ভারতের আয় বলিয়া ধরা হইত, এবং প্রাদেশিক সরকারের ব্যয়ের জন্য বরাদ্দমত টাকা দেওয়া হইত, তখন কোন্ দফায় কত আয় হইত, সে বিষয়ে ভাবিবার কিছু ছিল না; কিন্তু যখন প্রাদেশিক শাসনকেন্দ্রগুলিকে প্রবল করিবার কথা উঠিয়াছে, তখন হইতে রাজনীতিকরা নিজ নিজ দেশের আয় ও তাহার ব্যয় সম্বন্ধে সজাগ হইয়া উঠিয়াছেন। শুল্ক সম্বন্ধে সেই কথা খাটে। শুল্কের ইতিহাস নিখিল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সহিত যুক্ত; ভারতের রাজস্বের ঘাটতি অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় সঙ্কুলান না হইলেই শুল্কহার বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এ বিষয়ে আমরা 'ভারত-পরিচয়' গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি; এখানে সংক্ষেপে শুল্কের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইল।

সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে বহুবার শুল্কের সামগ্রীর তালিকা ও শুল্কহারের অদল-বদল হইয়াছিল। তখন সাধারণত শতকরা ৬% হারে শুল্ক আদায় হইত। বৃটীশ পার্লামেণ্ট এদেশেব শাসনভার গ্রহণ করিলে প্রথম প্রথম ভারত-সরকারের অর্থের নিদারুণ কষ্ট হয়। সেইজন্য শুল্ক-হার ১০ ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ২০ হারে বৃদ্ধি করা হয়। ইতিমধ্যে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলি মাথা চাড়া দিয়া উঠে; ইংলণ্ডে সেই সময়ে অবাধ বাণিজ্য নীতির পৃষ্ঠপোষকগণ ও ল্যাঙ্কাসায়ারের মিলমালিকগণ ভারতে আমদানী শুল্ক তুলিয়া দিবার জন্য জোর আন্দোলন সৃষ্টি করেন। ফলে ১৮৮২ সনে সকলপ্রকার আমদানী শুল্ক রদ হইয়া গেল। কিন্তু একস্‌চেঞ্জের অসুবিধায় ও অর্থকৃচ্ছতায় বাধ্য হইয়া ভারত গবর্মেণ্ট ১৮৯৫ সালে ৫% শুল্ক বসাইলেন এবং ১৮৯৬ সালে ভারতীয় মিলের কাপড়ের উপর ৩½ হারে শুল্ক বা এক্‌সাইজ ধার্য করিলেন। ১৯১০-১১ সালে চীন দেশে আফিম বিক্রয় করিয়া যে প্রচুর লাভ হইত, তাহা অত্যন্ত হ্রাস পাইল; সেই ঘাটতি পূরণ করিবার জন্য পেট্রোলিয়াম, মদ, তামাক, রূপা প্রভৃতির উপর শুল্ক ধরা হয়।

যুদ্ধের সময় আয় বৃদ্ধির জন্য ১৯১৬-১৭ সালে শুল্কের তালিকা ও হার সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করা হয়। সাধারণ আমদানী শুল্ক ৫ হইতে ৭½ হইল; চিনির উপর ১০ হইতে ১৫%। বিনা শুল্কে যেসব জিনিষ আসিত, তাহার তালিকা হইতে অনেক জিনিষ বাদ পড়িল। এই বৎসরে চা ও পাটের উপর রপ্তানী শুল্ক ধরা হয়। এতকাল কাঁচামাল সবই প্রায় বিনা শুল্কে বিদেশে রপ্তানী

হইত, তখন প্রধান মাল ছিল চাউল। নূতন রপ্তানী শুল্কে চা-এর উপর একশ পাউণ্ডে ১॥০ টাকা, কাঁচা পাট ৫ মণে-বস্তা পিছু ২।০, পাটের সামগ্রীর উপর ১০৲ ও হেসিয়ানের উপর ১৬৲ টন-প্রতি শুল্ক হইল।

১৯১৭-১৮-এ পুনরায় শুল্ক বাড়ানো হইল; আমদানী বস্ত্র ৩½ হইতে ৭½, রপ্তানী পাটের উপর বস্তা-পিছু ৪॥০, থলিয়া ২০৲ টাকা, ও হেসিয়ান্ ৩২৲ টাকা টন হইল। ১৯১৫-১৬-এ যেখানে রপ্তানী-শুল্ক হইতে সরকারী আয় হইত ৬·২৯ লক্ষ টাকা, সেখানে ১৯১৭-১৮-এ আয় হইল ২,২১·৬৯ লক্ষ টাকা। বলা বাহুল্য, বাঙলার পাটই ভারত সরকারের এই আয় বৃদ্ধির জন্য দায়ী।

১৯২১-২২-এ পুনরায় আর একবার তালিকার পরিবর্তন ও শুল্ক হারের বৃদ্ধি হইল। সাধারণ আমদানী-শুল্ক হার ৭½ হইতে ১১, দেশলাইয়ের গ্রোসের উপর বারো আনা, বিদেশী চিনির উপর ১০ হইতে ১৫ ও তামাকের উপর শুল্ক হইল ৫০ হারে।

১৯২২-২৩-এ শুল্ক-হার পুনরায় বৃদ্ধি পাইল। সাধারণ সামগ্রী ১১ হইতে ১৫ হইল; চিনির শুল্ক ১৫ হইতে ২৫-এ উঠিল, বিলাসের সামগ্রী ৩০% হইল। ১৯৩২-এ কানাডার অটোয়া কন্‌ফারেন্স অনুসারে বৃটিশ ও অবৃটিশের বাণিজ্যের মধ্যে শুল্কের তারতম্য সৃষ্টি করা হইল। জাপানী বস্ত্রশিল্পের বিরুদ্ধে যে বিশেষ শুল্ক স্থাপিত হইয়াছে তাহার আলোচনা আমরা অন্যত্র করিয়াছি।

কলিকাতায় কাস্‌টাম হাউসে বিদেশী আমদানী মালকে পরীক্ষা করা হয়; এবং কোন্ মালে কত শুল্ক দিতে হয়, তাহার বিস্তৃত তালিকা ও বর্ণনা দেখিয়া বিদেশী মাল মিলানো হয় ও শুল্ক ধার্য করা হয়।

১৯২১-২২ সালে সমগ্র ভারতের (আমদানী ও রপ্তানী) শুল্ক হইতে নেট্ আদায় হইয়াছিল ৩৪ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা, ইহার মধ্যে বাঙলাদেশ হইতে ১৫ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা উঠিয়াছিল। ঐ বৎসরে ভারত সরকারের কেবলমাত্র রপ্তানী শুল্ক হইতে ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা রাজস্ব হয়; ইহার মধ্যে বাঙলাদেশ ৩ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা রপ্তানী-শুল্কের জন্য দায়ী। এই রপ্তানী-শুল্ক বাঙলার একেবারে নিজস্ব সামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ টাকা হইতে প্রদত্ত; পাট ও

পাটের সামগ্রী রপ্তানীর শুল্ক হইতে ২ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা, চাল রপ্তানীর শুল্ক হইতে ৮০ লক্ষ, চা-রপ্তানীর শুল্ক হইতে ৪৬ লক্ষ টাকা শুল্ক-ভাণ্ডারে প্রদত্ত হয়। আমদানী শুল্ক হইতে যা উশুল হয়, তা বাদ দিয়া বাঙলার ও আসামের অতি ন্যায্য প্রাপ্য—চা, চাল ও পাটের রপ্তানীর শুল্ক—ইহাদের পাওয়া উচিত ছিল। বর্তমানে চা-রপ্তানীর উপর শুল্ক উঠিয়া গিয়াছে। পাটের শুল্ক হইতে বাঙলাকে কিছু দেওয়া হইতেছে। এবিষয় অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে।

নিম্নের তালিকায় রপ্তানী সামগ্রী হইতে কি পরিমাণ শুল্ক আদায় হয় তাহা প্রদত্ত হইল :—

রপ্তানী মালের শুল্ক

	১৯২১-২২	১৯২২-২৩	১৯২৩-২৪	১৯২৪-২৫	১০২৫-২৬	১৯২৬-২৭
			(০০০ টাকা)			
চামড়া ও ছাল ...	৩৩,২৫	২৬,৩৩	১৪,৮৭	১৮,০০	২০,৬৪	১৯,৯২
কাঁচা পাট ...	১,০৬,০৯	১,৪৫,৩৩	১,৫৮,৬৯	১,৬৬,২৯	১,৫৮,৫০	১,৭২,২৬
তৈয়ারী পাট সামগ্রী...	১,৬২,২৭	১,৮২,৯৬	১,৯৮,৩৮	২,০৮,৬৮	২,০৯,১৬	২,২২,২৯
চাল ...	৫৫	৯,৯৪	১৫,২২	১৮,১৯	৭,৪৮	৫,৭৮
চা ...	৪২,৯১	৩৮,৫৫	৪৫,২৩	৪৫,৪০	৪২,৫৯	৪৫,৯৪
	৩,৪৫,০৯	৪,০৩,১৩	৪,৩২,৪২	৪,৫৬,৫৮	৪,৩৮,৩৯	৪,৬৬,১৯

	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯	১৯২৯-৩০	১৯৩০-৩১	১৯৩১-৩২	১৯৩২-৩৩
			(০০০ টাকা)			
চামড়া ও ছাল ...	২৪,৬৪	২২,২২	২০,৮৫	১৪,১৬	১১,৭৫	৮,১৬
কাঁচা পাট ...	২,১৮,৬৮	২,১১,৫১	১,৯৮,৮৪	১,৪৮,৫১	১,৪৪,০৭	১,৩৬,৬৮
তৈয়ারী পাট সামগ্রী ...	২,৪০,৬৮	২,০৯,৯২	২,৬৬,৮৯	১,৯৫,১৪	১,৬৫,৬০	১,৭০,৪৫
চাল ...	৫,৯২	৫,০৫	৬,৬৮	৪,৯৮	৪,৬১	৫,১৭
চা ...	৮·১	—	—	—	—	—
	৪,৯০,০৩†	৪,৪৮,৭২	৪,৯৩,২৭	৩,৬৩,১০	৩,২৫,০৫	৩,২০,৪৮

* Finance and Revenue Account of Government of India No. 14 Table.

† গবর্ণেমেন্ট সটোর্স ১৬,০০০।

বাঙলাদেশের বন্দরে শুল্ক-কর

(০০০ হাজার টাকা)

		আমদানী শুল্ক	রপ্তানী শুল্ক	মোট শুল্ক
১৯৩৪-৩৫	...	৯,৮৫,৪৮	৩,৫৮,৮৪	
১৯৩৩-৩৪	...	৯,১৩,৫৭	৩,৫১,২৯	
১৯৩২-৩৩	...	১১,১৭,৯০	৩,২০,৪৮	১৪,৪১,৪৬
১৯৩১-৩২	...	১০,৫৪,৮৩	৩,২৫,০৫	১৩,৮৩,০০
১৯৩০-৩১	...	১১,৭২,১১	৩,৬৩,১০	১৫,৩৯,৭৩
১৯২৯-৩০	...	১৩,৭১,৬৩	৪,৯৩,২৭	১৮,৭১,০৩
১৯২৮-২৯	...	১৩,৯৯,৭৬	৪,৪২,৯৯	১৮,৪৮,৯৪
১৯২৭-২৮	...	১৩,৮৪,২১	৪,৮৩,৪৯	১৮,৭৪,৬৩
১৯২৬-২৭	...	১৪,১৬,৫২	৪,৬৬,২৯	১৮,৮৮,৬৮
১৯২৫-২৬	...	১৪,০০,২৭	৪,৩৪,৩৯	১৮,৪০,০৯
১৯২৪-২৫	...	১৩,৬৯,৯০	৪,৫৬,৫৮	১৮,৩৩,৪৪
১৯২৩-২৪	...	১০,৭৫,৪১	৪,৩২,৪২	১৫,১৩,৬৯
১৯২২-২৩ (১)	...	১১,৬৭,৬০	৪,০৩,১৩	১৫,৭৬,৬২
১৯২১-২২ (২)	...	১০,৭০,১৪	৩,৪৬,০০	১৪,২০,৬১
১৯২০-২১	...	৯,১২,৭৪	৩,৮৪,৩১	১২,৯৭,০৫
১৯১৯-২০	...	৭,২৭,০৪	৩,৮৯,৫৭	১১,১৬,৬১
১৯১৮-১৯	...	৫,৯১,১৩	২,৫১,৭০	৮,৪২,৮৩
১৯১৭-১৮ (৩)	...	৫,৫৯,৩১	২,২১,৬৭	৭,৮০,৯৮

---

(১) ১৯২২-২৩ সালে চিনি ১৫ হইতে ২৫%, বিলাসের সামগ্রীর উপর ২০ হইতে ৩০%।

(২) ১৯২১-২২ সালে সর্ববিধ সামগ্রীর উপর শুল্ক ৭॥০ হইতে ১১ হইল। দেশলাই ১২ আনা গ্রোস্। বিলাসের সামগ্রী ৭॥০ হইতে ২০। চিনি ১০ হইতে ১৫, সিগারেট ৫০%।

(৩) ১৯১৭-১৮তে পাটের জিনিষের শুল্ক দ্বিগুণ হয়। আমদানী বস্ত্র ৩॥০ হইতে ৭॥০ হইল। দেশীয় কলের উপর ৩॥০ হার এক্সাইজ্ পূর্ব্বের মত থাকিল।

	আমদানী শুল্ক	রপ্তানী শুল্ক	মোট শুল্ক
১৯১৬-১৭ (১) ...	৪,৫৯,১৬	১,৪৭,৬৯ (২)	৬,০৬,৮৫
১৯১৫-১৬ ...	৩,৭০,৬৬	৬,২৯ (৩)	৩,৭৬,৯৫
১৯১২-১৩ ...	৩,৯২,০৪	২৪,১০ (৩)	৪,১৭,৯২
১৯০৩-০৪	...	...	৩,৮৪,০০
১৮৯০-১৯০০ (গড়)	...	...	৩,৫২,০০
১৮৮১-৯০ (গড়) ...	...	...	২,৪৭,০০

১৯০৩-০৪ হইতে ১৯২৮-২৯ অব্দ পর্যন্ত পঁচিশ বৎসরে বাঙলার আমদানী-রপ্তানী শুল্ক ৩'৮৪ কোটি টাকা হইতে ১৮'৪৮ কোটি টাকা হয়, অর্থাৎ ৪'৫ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু সেই সময়ের এদেশে বহির্বাণিজ্য যাহার উপর এই শুল্ক ধার্য হইয়াছিল, তাহা সে-হারে বাড়ে নাই। ১৯০৩-০৪ সালে মোট বাণিজ্যের মূল্য ছিল ৯৩'৬০ কোটি, ১৯২৮-২৯ সালে ২৫৮ কোটি টাকা, অর্থাৎ পঁচিশ বৎসরে এখানে ২'৪ গুণ বাণিজ্য বৃদ্ধি হইয়াছে। যেখানে বাণিজ্যের মূল্য বাড়িয়াছে ২'৪ গুণ, সেখানে শুল্ক বাড়িয়াছে ৪'৫ গুণ।

কেবল আমদানীর দিক্ দিয়া বিষয়টাকে বিচার করা যাক্। ১৯০৩-০৪ সালে আমদানী পণ্যের মূল্য ছিল ৩৩'৬৯ কোটি, ১৯২৮-২৯ সালে ৯১'৩৯ কোটি টাকা অর্থাৎ পঁচিশ বৎসরে ২'৬ গুণ বাড়িয়াছে। সেই সময়ে আমদানী শুল্ক বাড়িয়াছে ৪ গুণ।

জিনিষের যে দাম বাড়ে তাহার একটা কারণ শুল্ক চড়া-হারে দেওয়া। এই চড়া শুল্ক ক্রেতাই দেয়। সুতরাং এদেশবাসীর প্রয়োজনের ও স্বাচ্ছন্দ্যের যেসব জিনিষ আমদানী হয়, তাহার জন্য যে মূল্য তাহারা ২৫ বৎসর পূর্বে দিয়াছিল, তাহা অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক মূল্য পরে সে দিয়াছে। অথচ

---

(১) যুদ্ধের সময় এই বৎসর শুল্ক তালিকা ও হার নূতন করা হয়। পাট ও চায়ের উপর রপ্তানী শুল্ক হয়। বিনাশুল্কের ফর্দ হইতে অনেক জিনিষ বাদ পড়ে। পাট বস্তা পিছু ২।০; থলে ১০৲ টন, হেসিয়ান্ ১৬৲ টন। সাধারণ হার ৫৲ হইতে ৭।০। চিনি ১০%।

(২) পাট—১ কোটি ১৩ লাখ। চা—২৯ লাখ। নূতন রপ্তানী শুল্ক বসানো হয়।

(৩) চাল প্রভৃতির উপর শুল্ক। পাট চা-এর উপর শুল্ক ছিল না।

রপ্তানী মালের মূল্য ছাড়া বিক্রেতা আর কিছু পায় নাই; আমদানী মালে ক্রেতা জিনিষের মূল্য ও শুল্ক উভয়ই দিয়াছে।

বাঙলার আয়কর

বর্ত্তমানে 'আয়কর' বা ইন্‌কামট্যাক্স ভারত গবর্মেণ্ট কেন্দ্রীয় ব্যয়নির্বাহের জন্য সমস্তটাই স্বয়ং গ্রহণ করেন। নিখিল আয়কর বিভাগের কার্যাদি দেখিবার জন্য সপার্ষদ গবর্ণর-জেনারেল একজন 'কমিশনর' নিযুক্ত করিয়াছেন; তাঁহার অধীনে প্রাদেশিক কমিশনরগণ কাজ করেন; প্রাদেশিক শাসন বিভাগের সহিত ইহার এখন প্রত্যক্ষ কোনো যোগ নাই। পূর্বে এই বিভাগ প্রাদেশিক সরকারের অধীন ছিল। কারণ, তখন যে-আয় এই বিভাগ হইতে হইত, তাহার অর্ধেক পাইতেন প্রদেশিক শাসন বিভাগ; অপরার্ধ পাইতেন ভারত সরকার। মণ্ট-ফোর্ড শাসন সংস্কারের পর রাজস্ব ভাগ-বাঁটোয়ারা করিবার জন্য যে কমিটি বসে (মেস্‌টন্ সাহেব ইহার সভাপতি ছিলেন বলিয়া ইহা মেস্‌টন্ কমিটি নামে পরিচিত) তাহার নির্দেশ অনুসারে স্থির হয় যে, আয়কর সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের নিজস্ব আয়রূপে পরিগণিত হইবে।

আয়করের ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। সিপাহীবিদ্রোহের পর ভারতের আর্থিক অবস্থা নানা কারণে অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে। এই সঙ্কটের সময়ে ভারত সরকারের প্রথম রাজস্ব সচিব মিঃ জন্ উইলসন গবর্মেণ্টকে দেউলিয়া হওয়ার বিপদ্ হইতে বাঁচাইয়া দিবার জন্য যে-সব ব্যবস্থা করেন, তাহারই অন্যতম হইতেছে আয়কর। ১৮৬০ সনে এই কর সর্বপ্রথম প্রবর্তিত হয়। তখন ২০০৲ টাকা ও তদূর্ধ্ব সকল শ্রেণীর আয়ের উপর কর ধার্য হয়। ১৮৬২ সনে উহা বাড়াইয়া ৫০০৲ টাকা করা হয়। উক্ত আয়ের উপর শতকরা ৪% হারে কর ধার্য হয়; তখন ইহাকে বলিত 'এসেস্‌ড ট্যাক্স', চাষী, জমিদার বেতনভোগী কর্মচারী সকলকেই এই কর দিতে হইত।

ইতিমধ্যে ১৮৭১ সনে পাবলিক্ সেস্ বা রাস্তাকর প্রবর্তিত হওয়ায় চাষী ও জমিদারদের উপর চাপটা গিয়া বেশী পড়িল। প্রায় ২৫ বৎসর ধরিয়া আয়কর সম্বন্ধে সামান্য সামান্য পরিবর্তন চলিয়াছিল; কিন্তু ১৮৮৬ অব্দের আয়কর আইন প্রবর্তনের ফলে এ বিভাগের আয় অনেকটা সুনির্দিষ্ট আকার ধারণ

করিল। কৃষি-সংশ্লিষ্ট আয়কে এই সময় হইতে আয়কর হইতে মুক্তি দেওয়া হইল; অর্থাৎ চাষী ও জমিদাররা আয়কর হইতে (১৮৮৬ সনে) অব্যাহতি পাইলেন। এছাড়া ৫০০৲ বার্ষিক আয় হইতে ২০০০৲ পর্যন্ত আয়ের উপর টাকায় ৪ পাই, ও তদূর্ধ্বে টাকায় ৫ পাই করিয়া আয়কর ধার্য হইল। বার্ষিক ৫০০৲ টাকা আয়ের অর্থ— যে লোক মাসে ৪২৲ টাকা রোজগার করিত, বা বেতন পাইত, তাহাকে বৎসরে ১০।৵৮ পাই কর দিতে হইত।

১৯০৩ সনে ভারত গবর্মেণ্ট বুঝিলেন যে, মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে এই আয়কর অত্যন্ত পীড়াদায়ক; সেই জন্য সর্ব্বনিম্ন করদেয় আয় ৫০০-র পরিবর্তে ১০০০৲ টাকা করিলেন, ইহাতে মধ্যবিত্তদের সুবিধা হইল বটে; কিন্তু গবর্ন্মেণ্টের আয় কমিল। বহুকাল হাজার টাকাই সর্বনিম্ন করদেয় আয় ছিল।

বিগত য়ুরোপীয় মহাসমরের সময় ভারত সরকারের রাজকোষে অর্থের অনটন হয়। সেই অর্থাভাব দূর করিবার জন্য গবর্মেণ্ট শুল্ক, আয়কর প্রভৃতি নানা বিভাগে আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। ১৯১৬-১৭ অব্দে আয়করের তালিকার আমূল পরিবর্তন সাধিত হইল। এইবারকার পরিবর্তনের মধ্যে প্রধান কথা হইতেছে আয়ের কম বেশীর উপর করের গ্রেড সৃষ্টি। পূর্বে দুই হাজারের উপর যতই আয় হউক না কেন, তাহাকে টাকায় ৫ পাই-এর অধিক দিতে হইত না। এই নূতন বিধি অনুসারে পাঁচ হাজার টাকা আয় পর্যন্ত কোনো পরিবর্তন করা হইল না। পাঁচ হইতে দশ হাজারের উপর টাকায় ৬ পাই, দশ হাজারের উর্ধ্বে টাকায় ৯ পাই, পঁচিশ হাজারের উপর টাকায় ১ আনা হার প্রবর্তিত হইল। ইহার পর বৎসরে 'সুপার ট্যাক্স' নামে নূতন গ্রেড ধার্য হইল; 'সুপার ট্যাক্স' বলিতে বুঝায় ৫০ হাজার টাকার উপর আয় হইতে নূতনতর হার। এই গ্রেড ও হার পরিচ্ছেদের শেষে দেওয়া হইয়াছে।

ইহার পর যখনই রাজস্বের ঘাটতি হইয়াছে, তখনই তাহা পূরণ করিবার জন্য গবর্মেণ্ট আয়করের হার বাড়াইয়াছেন। যুদ্ধের পর ১৯২১-২২ সনের বাজেটে বার্ষিক ১০০০৲ টাকায় আয়ের পরিবর্তে ২০০০৲ টাকা আয়ের উপর কর হইল; ইহাতে বহু বেতনভোগী কর্মচারী ও সামান্য ব্যবসায়ীর সুবিধা হইল। দশ বৎসর এই আইন মতই কাজ চলে।

১৯৩১ সনে আয়কর সম্বন্ধে নূতন আইন পাশ হয়, এই আইনের বলে

২০০০৲ টাকার স্থানে ১০০০৲ টাকা আয়ের উপর পুনরায় কর ধার্য করা হইল। এছাড়া এই সময়ে সার্-চার্জ নামে একটি নূতন কর ধরা হয়; বাৎসরিক ২০০০৲ টাকা আয়ের উপর যে-কর দেয় হয়, তাহার উপর পুনরায় টাকায় দুই আনা (১২½%) অতিরিক্ত কর ধরা হইল। অর্থাৎ যে-লোক বৎসরে ২৫৲ টাকা আয়কর দেয়—তাহাকে আরও ৫০ আনা (৩/০) কর দিতে হইল। ১৯৩২ সনে এই সার্-চার্জের হার টাকায় চারি আনা (২৫%) করা হয়। অর্থাৎ ২৫৲ টাকা আয়করের উপর ১০০ আনা বা ৬।০ অতিরিক্ত কর দিতে হইল। ইহাকে সার্-চার্জ বলে। এই নূতন আইন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা অগ্রাহ্য করেন; পরে রাষ্ট্রসভায় (কৌন্সিল অব ষ্টেটে) উহা পাশ হয় ও বড়লাট বাহাদুরের 'সার্টিফাই' করিবার ক্ষমতাবলে আইনে পরিণত হয়।

১৮৮৬ সনে ভারতীয় আয়কর সম্বন্ধে যখন আইন পাশ হয়, তখন বাঙলাদেশ বলিতে বুঝাইত বিহার-উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশ। সেই সময় হইতে বাঙলার আয়কর কিভাবে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছে, তাহার আলোচনা করা যাক। ১৮৮৬-১৮৯০ সন পর্যন্ত পাঁচ বৎসরে গড়ে আয়করের সরকারী আয় হইয়াছিল ৩৭·৫ লক্ষ টাকা; তারপর দশ বৎসরে গড়ে বার্ষিক আয় হয় ৪৫·৭ লক্ষ টাকা; বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বৎসরে আয় ছিল ৫৬·৫ লক্ষ। ১৯০৩ সনে আয়কর ৫০০৲ স্থলে ১০০০৲ টাকা হওয়ায় রাজস্ব হ্রাস পাইয়া ৪৭·৭ লক্ষ টাকা হয়।

	করদাতার সংখ্যা	জন সংখ্যার হাজার করা	মোট কর	করদাতার গড় কর
১৮৮৬—১৮৯০ গড়ে	১,০৯,০০০	১·৬	৩৭·৫ লক্ষ	৩৪।/০
১৮৯০—১৮৯৫ ,,	১,১৯,০০০	১·৭	৪৫·৭ লক্ষ	৩৬৸০
১৮৯৫—১৯০০ ,,	১,৩৪,০০০	১·৮		
১৯০০—০১ ,,	১,৩৫,০০০	১·৮	৫৬·৫ লক্ষ	৪২৲
১৯০৩—০৪ ,,	৫৬,০০১	০·৮	৪৭·৭ লক্ষ	৮৬৶০

বর্তমান বাঙলাদেশ ১৯১২ সনে যখন পুনর্গঠিত হয়, তখন আয়কর পূর্বের হারে ছিল এবং স্বাভাবিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হেতু আয়কর হইতে রাজস্ব

দাঁড়াইয়াছিল ৫৫·৭৫ লক্ষ টাকা। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পুঁজিপতি ব্যবসায়ী শিল্পীদের আয় বাড়িয়াছিল এবং ১৯১৫-১৬ সনে অর্থাৎ আয়কর সম্বন্ধে নূতন আইন প্রণীত হইবার পূর্বে বাঙলাদেশ হইতে আয়কর রাজস্ব আদায় হইয়াছিল ৭২·২৬ লক্ষ টাকা।

১৯১৭ সনে নূতন আয়কর প্রবর্তিত হওয়ায় বাঙলা হইতে আয় হয়, ১,৬৮,৫৫০০০ টাকা, অর্থাৎ পূর্ব বৎসরের দ্বিগুণ। পর বৎসরে সুপার ট্যাক্স প্রবর্তিত হওয়ায় আয় হইল ৩,৩৯,৬০০০০। সেই হইতে কিভাবে আয়কর বাড়িয়াছে কমিয়াছে তাহা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

বাঙলাদেশের সাধারণ লোকের নিকট হইতে সামান্যই আয়কর আদায় হয়। জমির আয়ের উপর ট্যাক্স হয় না, জমিদারদের আয়ের উপর ট্যাক্স ধরা যায় না। বেতনভোগী কর্মচারী, শিল্পী, ব্যবসায়ী ও বিষয়ভোগী (জমিদার ছাড়া)—ইহাদের আয়ের উপর কর ধরা হয়। বাঙলার আয়কর প্রধানত কলিকাতা হইতে আদায় হয়; কলিকাতা শুধু বাঙলার নয়, সমগ্র ভারতের প্রধানতম বাণিজ্য ও ব্যবসায়ের কেন্দ্র। চটের কলের আফিস, চা-বাগিচার আফিস, বীমা কোম্পানীর আফিস, আমদানী রপ্তানীর হাউস, শাসন-বিভাগের অধিকাংশ আফিস এইখানে স্থাপিত। অনেক কারবারের হেড আফিস কলিকাতায়; সেসব কারবারের মালিক বা অংশীদাররা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবাঙালী বা য়ুরোপীয় এবং তাহাদের কর্মক্ষেত্র বাঙলায় সীমাবদ্ধ নহে; সুতরাং তাহারা যে আয় করে, তাহার সমস্ত গৌরব বাঙলার নহে। ইহার ফলে বাঙলার সমগ্র আয়করের মোটা অংশ আদায় হয় কলিকাতায়। ১৯২১ সনে ৩·৮২ কোটি আয়করের মধ্যে কলিকাতায় আদায় হয় ৩·৫১ কোটি টাকা, অর্থাৎ সমগ্র আদায়ের শতকরা ৯১·৮ ভাগ। ঐ বৎসরে সুপার ট্যাক্স আদায় হয় ২·৭৪ কোটি টাকা, ইহার মধ্যে ২·৭১ কোটি টাকা অর্থাৎ ৯৯·৭৪ ভাগ কলিকাতা হইতে পাওয়া যায়।

১৯২১ সনে কলিকাতার বাহিরে প্রতি ২৭৪৯ জন লোকের মধ্যে একজন মাত্র আয়কর দিত, ও কলিকাতার প্রতি ৪৩ জন লোকের মধ্যে একজন দিত। কলিকাতার বাহিরে মফস্বলে মাথা পিছু কর দিত ১৮৭৲ টাকা, কলিকাতায় (হাওড়া লইয়া) মাথা পিছু কর ছিল ১৩৮৫৲।

বিশ্বব্যাপী বাজার মন্দার পূর্ব পর্যন্ত বাঙলার আর্থিক অবস্থা, বিশেষভাবে যাঁহারা আয়কর দেন, তাঁহাদের অবস্থা খারাপ ছিল না। নিম্নে আমরা একটি তালিকা দিলাম। এই তালিকা হইতে পাঠক দেখিবেন, বাঙলাদেশে কতগুলি লোক আয়কর দিত, তাহাদের মোট আয় কত ছিল এবং সরকারই বা কত টাকা রাজস্ব পাইতেন।

	করদাতা	আয়	আয়কর
১৯২৫-২৬	৪১,৬২১	২৬'৬৯ কোটি	১'২৭ কোটি
১৯২৬-২৭	৪২,০৩৬	২৬'৩৯ ,,	১'২৯ ,,
১৯২৭-২৮	৪৫,৪৪৭	৪৫'৮৪ ,,	৩'০৩ ,,
১৯৩০-৩১	৪৬,৪৭৩	৫০'৬৬ ,,	৩'৬৫ ,,

১৯৩১ সনে গবর্মেণ্ট আয়বৃদ্ধির জন্য পুনরায় আয়করের তালিকা ও হার পরিবর্তন করিয়া ২০০০৲ স্থলে ১০০০৲ টাকার উপর আয়কর ধার্য করিলেন। ফলে আয়করদাতার সংখ্যা বাড়িয়া গেল। কিন্তু দেশের দুর্গতি হেতু করদাতৃগণের আয় বাড়ে নাই এবং গবর্মেণ্টের রাজস্বও বাড়িল না, বরং কমিল। কিন্তু বিশ্বব্যাপী মন্দার জন্য হয়ত এই আয় আরও কমিত; সময়মত নূতন আইন করায় সে পরিমাণ কমিল না, কারণ হাজার টাকা আয়ের লোকেরা আয়কর দিয়া সে ঘাটতি কিয়ৎ পরিমাণে পূরণ করিল।

১৯৩১-৩২	৬৪,৬১০	৩৭'৩২ কোটি	৩'১৩ কোটি
১৯৩২-৩৩	৭৭,৭৮৩	৩৪'৯৮ ,,	২'৬৯ ,,

এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় হইতেছে ১৯৩২-৩৩ সনে ৭৭,৭৮৩ জন লোকের যে আয়, পাঁচ বৎসর পূর্বের ১৯২৭-২৮ সনের ৪৫,৪৫৭ জনের আয় হইতে উহা প্রায় ১১ কোটি টাকা কম। ১৯২৭-২৮ সনের প্রতি-কর-দাতার গড় আয় ছিল ১০,৭৪৪৲ টাকা। ১৯৩২-৩৩ সনে উহা হইয়াছিল ৪৪৯২৲ টাকা। প্রথম বৎসরে গড় করদাতার নিকট হইতে আয়কর ছিল ৬৪৩৲ টাকা ও শেষ বৎসরে ৩৫০৲ টাকা করিয়া আদায় হইয়াছিল।

১৯৩১-৩২ সনে আয়কর ও সুপার করদাতার সংখ্যা ছিল ৮৬,৫৭৪, ১৯৩২-৩৩ সনে ৭৫,৬০৭। ইহার মধ্যে কলিকাতার লোক ও আফিস

হইতেছে যথাক্রমে ৪৮,৯৫১ ও ৪৫,৮৫০। যাহাদের আয় দুই হাজার টাকার কম, তাহাদের সংখ্যা বাঙলাদেশে মাত্র ২০ হাজার।

১৯৩২-৩৩ সনে বাঙলাদেশে কোন শ্রেণীর কত লোক কত কর দিয়াছিল তাহার একটা হিসাব নিম্নে দিলাম।

সংখ্যা	বর্ণনা	মোট আয় (হাজার টাকা)	আয়কর (হাজার টাকা)
	বেতনভোগী	১৩,০০,৫৪,	৭২,০২,*
৪১,৩০৫	ভারত সরকারের চাকুরী	১০,২৭,	১,৪১,
	প্রাদেশিক ও কোং চাকুরী	১,২৭,৫২,	১৬,২৬,
১০৫২	কোম্পানী	৬,৮১,৮৩,	৯২,২৩,
১৭৯	রেজিষ্টার্ড ফার্ম	১,৭০,৪৩,	২৪,১৪,
৬৩৩৫	হিন্দু একান্নবর্ত্তী পরিবার	২,৭৮,৬১,	১৬,১৩,
৪০৪০	বে-রেজিষ্টারী ফার্ম	১,৮১,৩৮,	১০,৪৮,
২০৫	এসোসিয়েশন	১৩,৭৯.	৪৮,৭৯,
২৪,৬৬৭	ব্যক্তি	৮,৮৫,১৭,	৪৮,৭৯,
৭৭,৭৮৩		৩৬,৫৮,১৫,	২,৮৮,৮২,
	বাদ	১,৫৯,৪৭,	১৭,৪৯,
	মোট	৩৪,৯৮,৬৭,	২,৬৯,৮৩, ...

সুপার ট্যাক্স বা ৩০ হাজার টাকার বেশী আয়ের উপর কর

		আয় (হাজার টাকা)	(সুপার ট্যাক্স হাজার টাকা)
৭২৪	ব্যক্তিবিশেষ	৬,৩৭,১১,	৫৩,৬৯,
২৪৯	কোম্পানী	১১,৮৭,৬৫,	৫০,৮৮,
৪১	বে-রেজিষ্টারী ফার্ম	২৮,৩৭,	১,৪৭,
২৬০	হিন্দু পরিবার	৩২,৩৪	১,১৮,
১০৪০	জন	১৮,৮৫,৫০,	১,০৭,২২,
		রিফাণ্ড—	৬,১৮,
	মোট		১,০১,০৪

* ৫,৩২ ০০০ পূর্বের পাওনা

উপরের আয়কর হিসাবে ফাইন, সার-চার্জ ধরিয়া ও রিফাণ্ড বাদ দিয়া মোট ২,৯২,৭৪,০০০ টাকা হয়। এই সংখ্যায়ও সুপার ট্যাক্সের ১,০১,০৪,০০০ একত্র যোগ করিলে ৩,৯৩,৭৮,০০০ টাকা মোট আয়করের রাজস্ব হইয়াছিল।

মণ্ট-ফোর্ড শাসন সংস্কার প্রবর্তিত হইবার পূর্বে আয়করের রাজস্ব প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে ভাগাভাগি হইত। ১৯১৬-১৭ সনের আয়কর সংক্রান্ত আইন পাশ হইবার পূর্বে প্রাদেশিক আয়কর আধাআধি ভাগ হইত; কিন্তু ঐ বৎসরের পর আয়কর যখন বাড়িয়া গেল, তখন হইতে সে টাকার আধাআধি আর বাঙলাকে দেওয়া হইল না। নিম্নের তালিকা হইতে এইটি স্পষ্ট হইবে :—

সন	মোট আয়কর	কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টকে প্রদত্ত	বাঙলা গবর্মেণ্টের প্রাপ্য
১৯০০-০১	৫২'৭৬ লক্ষ	২৬'৩৮ লক্ষ	২৬'৩৮ লক্ষ
১৯০৩-০৪	৫০'৩৬ ,,	২৪'৭৩ ,,	২৪'৭৩ ,,
		বর্তমান বাঙলা প্রেসিডেন্সি	
১৯১১-১২	৫৩'৪৭	২৬'৭৪	২৬'৭৪ ,,
১৯১২-১৩	৫৫'৫২	২৭'৭৬	২৭'৭৬ ,,
১৯১৫-১৬	৭৩'২৬	৩৬'১৬	৩৬'১৩ ,,
১৯১৬-১৭	১,৬৮'৫৪	৮৪'২৮	৮৪'১৮ ,,
১৯১৭-১৮	৩,৩৯'৬০	২,৩৫'৬৪	১,০৩'৯৬ ,,
১৯১৮-১৯	৩,৫০'৮৪	২,৩৮'৫৭	১,১২'০১ ,,
১৯১৯-২০	৯,৫১'২৬	৭,৭৭'৫৭	১,৭৩'৬৯ ,,
১৯২০-২১	৮,৪১'০২	৬,২৩'৭৫	২,১৭'৫৭ ,,
১৯২১-২২	৬,৫২'৬২	৬,৫২'৬২	*

১৯২১ ২২ সন হইতে মণ্ট-ফোর্ড শাসনবিধি অনুসারে আয়কর সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের নিজস্ব আয় বলিয়া ঘোষিত হইল। তবে মেস্‌টন কমিটি

* মেস্‌টন্ কমিটির নির্দেশে বাঙলাদেশ আর আয় আয়কর পাইল না।

একটুখানি আশার কথা বলেন যে, যদি বাঙলার এসেস্‌মেণ্ট কখনো ৬২ কোটি টাকার বেশি হয়, তবে সেই টাকার উপর যে আয়কর হইবে তাহা বাঙলা সরকারের আয় বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু গত চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে বাঙলার এসেস্‌মেণ্ট সেরূপ হয় নাই, এবং নিকট ভবিষ্যতে হইবে বলিয়াও ভরসা নাই। ১৯৩১-৩২ সনে সমগ্র ভারতে ১৮০ কোটি টাকা আয়ের উপর ট্যাক্স ধার্য করা হয়; ইহা হইতে ১২.৮০ কোটি টাকা আয়কর আদায় হয়; ইহার মধ্যে বাঙলাদেশের আয় ছিল ৩৯.৩৭ কোটি টাকা ও আয়কর ছিল ৩.৩৪ কোটি টাকা।

সমগ্র ভারতে ৩৯২৮ জন লোক ও কোম্পানীর আয় ছিল ৬৯.২৭ কোটি টাকা ও কর ধার্য হইয়াছিল ৩.৪৪ কোটি। ইহার মধ্যে বাঙলাদেশে ১১৪৯ জন ও বোম্বাইতে ১১৭৬ জনের আয় ছিল যথাক্রমে ২২.৯৭ কোটি ও ১৫.৯৫ কোটি টাকা। সরকারী আয়কর ছিল যথাক্রমে ১.৫৯ কোটি ও ৩৭ লক্ষ। সাধারণ আয়কর হইতে সুপার কর বাঙালাদেশ বেশি দেয়।

দেশের লোকেব আয় ব্যবসায় বাণিজ্য শিল্প উন্নতির সহিত বাড়িয়াছে একথা নিশ্চিত। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে অধিবাসীদের আয় যে পরিমাণে বাড়িয়াছে আয়কর কি সেই অনুপাতেই বাড়িয়াছে? ১৯০১ সনে বঙ্গদেশের জনসংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৮৪ লক্ষ। তখনকার আয়কর ছিল ৫২.৭৬ লক্ষ টাকা। ১৯২০-২১ সনে বঙ্গদেশ ও বিহার-উড়িষ্যার সমবেত জনসংখ্যা ৮ কোটি ৭ লক্ষ ও উভয় দেশের আয়কর দাঁড়াইয়াছিল ৮.৪১ কোটি টাকা +৪০.৮৬ লক্ষ টাকা অর্থাৎ উভয় দেশের আয়কর হয় ৮.৮২ কোটি টাকা।

১৯০১ সনের জনসংখ্যার অনুপাতে আয়কর ছিল মাথাপিছু /১ (একআনা একপাই); ১৯২১ সনে বঙ্গ-বিহার উড়িষ্যার কর দাঁড়াইয়াছিল ১/০ (একটাকা একআনা)।

১৯১১ সনে বর্তমান বাঙলার আয়কর ছিল ৫৫.৭৫ লক্ষ টাকা; জনসংখ্যার অনুপাতে মাথাপিছু এই কর ছিল /১১ (একআনা এগারো পাই)। ১৯২১-২২ সনের আয়কর হয় ৬.৫২ কোটি টাকা; জনসংখ্যার অনুপাতে ইহা হয় মাথা-পিছু ১৸০ (একটাকা বারোআনা)। ১৯২১-২২ সনটি আর্থিক দিক্‌ হইতে খুবই অস্বাভাবিক। সুতারাং ১৯৩০ সন ধরা যাক। তখন জনসংখ্যা

৫ কোটির কিছু উপর; আয়কর ৬·১৮ কোটি। সুতরাং মাথাপিছু আয় দাঁড়ায় ১৶১০ করিয়া। অর্থাৎ বিশ বৎসরে মাথাপিছু আয়কর বাঙলাদেশে দশগুণ বাড়িয়াছে—/১১ পাই হইতে ১৶১০ পাই।

যে পরিমাণে আয়কর বাড়িয়াছে সে অনুপাতে ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছে আশা করা উচিত। অর্থাৎ বিশ বৎসরে ব্যবসা বাণিজ্য দশগুণ এবং লোকের আয় দশগুণ ও স্বাচ্ছন্দ্যও দশগুণ হইয়াছে, নতুবা আয়কর বৃদ্ধির অর্থ হয় না। কিন্তু সত্যই কি বাঙালাদেশের ধনসম্পদ, স্বাচ্ছন্দ্য বিশবৎসরে দশগুণ হইয়াছে ?

পরিশিষ্ট ১

বাঙলার আয়কর

বৎসর		বাঙলার আয়কর (হাজার টাকা) (০০০ টাকা)	ভারতের আয়কর (লক্ষ টাকা) (০০ টাকা)
১৮৮৬–১৮৯০	গড	৩৭,৫০,	১,২৮·০০ (১৮৮৬) ১,৫৭·০০ (১৮৯০)
১৮৯১–১৯০০	গড়	৪৫,৭০,	
১৯০০-০১		৫২,৭৬,	১,৯৪·০০ (১৯০০)
১৯০২-০৩ (ক)		৫৬,৫০,	২,০৭·০০
১৯০৩-০৪ (খ)		৪৭,৭০,	১,৮৬·০০ (১৯০৪-০৫)
১৯১১-১২ (গ)		৫৫,৭৫,	২,৪৯·৯৯
১৯১২-১৩		৫৫,৭৭,	২,৬১·৩৫
১৯১৩-১৪		৬৬,৩৭,	২,৯২·৫৩
১৯১৪-১৫ (ঘ)		৬৯,৪০,	৩,০৫·৫০

(ক) নূতন আইনানুসারে ১০০০৲ টাকা স্থলে ২০০০০৲ টাকা আয়ের উপর কর হইল।

(খ) আয়কর হ্রাস পাইবার কারণ পূর্বের আইন।

(গ) বর্তমান বাঙলার হিসাব।

(ঘ) যুদ্ধ আরম্ভ।

বৎসর	বাঙলার আয়কর (হাজার টাকা)	ভারতের আয়কর (হাজার টাকা)
১৯১৫-১৬	৭২,৩৬,	৩,১৩'৫১
১৯১৬-১৭ (ক)	১,৬৮,৫৫,	৫,৬৫'৯৪
১৯১৭-১৮ (খ)	৩,৩৯,৬০,	৯,৪৬'২১
১৯১৮-১৯ (গ)	৩,৫০,৮৪,	১১,৬৩'৭৬
১৯১৯-২০	৯,৫১,২৬,	২৩,২০'৭৮
১৯২০-২১ (ঘ)	৮,৩৯,৭৫,	২২,১৯'২৮
১৯২১-২২ (ঙ)	৬,৫২,৬২,	১৮;৭৪'১৩
১৯২২-২৩	৩,২৪,৭৮,	১৭;৯৯'৪১
১৯২৩-২৪	৬,০৩,১৪,	১৮,২৩'৫৫
১৯২৪-২৫	৫,৫৮,৫৯,	১৬,০১'৪৮
১৯২৫-২৬	৫,৯৩,৫৯,	১৫;৮৫'৯৩
১৯২৬-২৭	৫,৬৯,৮৯,	১৫,৬৪ ৯৬
১৯২৭-২৮	৪,৮৮,৩৩,	১৫,০৬ ৩৯
১৯২৮-২৯	৬,১৪,৮১,	১৬,৭০'৩৩
১৯২৯-৩০ (চ)	৬,১৮,২৪,	১৬,৭০'৬০
১৯৩০-৩১	৫,৫৭,৩৫,	১৬,০০'৩৩
১৯৩১-৩২ (ছ)	৪,৫৯,১৫,	১৭,৪৮ ৭৩

(ক) এই সনে নূতন হারে আয়কর ধায হয়। গ্রেড হয়। এই পযন্ত আয়কর বাঙলার সহিত আধাআধি ভাগ হইত।

(খ) ১৯১৭ সনে সুপার ট্যাক্স বসিল। (গ) যুদ্ধ শেষ।

(ঘ) এই সন পর্যন্ত আয়কর কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবমেণ্টের মধ্যে ভাগাভাগি হইত।

(ঙ) আয়কর সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় সরকারের হইল। ১০০০৲ টাকা আয়ের স্থানে ২০০০৲ টাকা আয়ে কর ধার্য্য হইল।

(চ) বিশ্বব্যাপী আর্থিক দুর্গতি আরম্ভ।

(ছ) ১৯৩১ সেপ্টেম্বর মাসে নূতন আইন বলে ২০০০৲ টাকার স্থলে ১০০০৲ টাকা আয়ের উপর আয়কর ধরা হয়। অন্যান্য হার বাড়ে। সার-চার্জ্জ হইল।

বৎসর	বাঙলার আয়কর (হাজার টাকা)	ভারতের আয়কর (হাজার টাকা)
১৯৩২-৩৩	৩,৯৩,৭৯	১৭,৭৪,০০,
১৯৩৩-৩৪	৩,৭০,০০	১৭,১৬,০৯,
১৯৩৪-৩৫ (ক)	২,৬৬,৭৪	১৭,০৪,৭৫,
১৯৩৬-৩৭	...	১৭,৬০,০০

পরিশিষ্ট—২

আয়করের হার

ক। ব্যক্তিবিশেষ, হিন্দু একান্নবর্তী পরিবার, ও আন্‌রেজিষ্টার্ড ফার্ম বা অন্য কোনোরূপ সমবায় নিম্নলিখিত হারে আয়কর দিবে।

২০০০৲ টাকার নীচে ও ১০০০৲ টাকার উপর বার্ষিক আয় ১৯৩১-৩২ সনের আইনানুসারে টাকায় ২ পাই ছিল; ১৯৩২-৩৩ সনে উহা বাড়াইয়া টাকায় ৪ পাই করা হয়। ১৯৩৩-৩৪ সনে ঐ হারই বজায় থাকে, তবে ১০০০৲—১৫০০৲ টাকার উপর টাকায় ২ পাই কর স্থির হয়।

(১)	১০০০৲ হইতে	১৫০০ আয়	টাকায়	২ পাই
(২)	১৫০০৲	২০০০৲ ,,	টাকায়	৪ পাই
(৩)	২০০০৲	৫০০৲ ,,	,,	৬ পাই
(৪)	৫০০০৲	১০,০০০৲ ,,	,,	৯ পাই
(৫)	১০,০০০৲	১৫,০০০৲ ,,	,, ১ আনা	
(৬)	১৫,০০০৲	২০,০০০৲ ,,	,, ১ ,,	৪ পাই
(৭)	২০,০০০৲	৩০,০০০৲ ,,	,, ১ ,,	৭ পাই
(৮)	৩০,০০০৲	৪০,০০০৲ ,,	,, ১ ,,	১১ পাই
(৯)	৪০,০০০৲	১,০০,০০০৲ ,,	,, ২ ,,	১ পাই
(১০)	একলক্ষ ও তদুপরি	,,	,, ২ ,,	২ পাই

খ। রেজিষ্টার্ড কোম্পানী বা ফার্ম হইলে আয় যাহাই কেন হউক টাকায় ২ আনা ২ পাই।

(ক) পুনরায় সর্বনিম্ন আয়কর ২০০০৲ উপর স্থির হইল।

গ। সার-চার্জ ১৯৩১-৩২ সনের নূতন আইনে স্থির হয় প্রদত্ত আয়করের উপর শতকরা ১২½ ভাগ অতিরিক্ত কর দিতে হইবে। ১৯৩২-৩৩ সনে উহা বাড়াইয়া শতকরা ২৫৲ করা হয় এবং এখনো তাহা চলিতেছে। ইহার পর কিছু কিছু বদল হইয়াছে। সার-চার্জের হার কমিয়াছে।

সুপার ট্যাক্স

১৯১৭-১৮ সনের বাজেটের সময় এই অতিরিক্ত কর ধার্য হয়।

১। ১৯৩১ সনের আইনানুসারে ত্রিশ হাজার টাকার উপর আয় হইলে এই সুপার ট্যাক্স আইন প্রয়োজ্য। এই আইন এইভাবে প্রযোজ্য :—কোম্পানী সম্বন্ধে ত্রিশ হাজারের উপর প্রথম বিশ হাজার টাকার উপর কোনো বিশেষ কর নাই ; তবে ইহার উপর প্রত্যেক টাকায় ১ আনা।

২। (ক) হিন্দু একান্নবর্তী পরিবারে নিয়ম এইভাবে প্রযোজ্যঃ—প্রথম ৪৫,০০০৲ আয়ে টাকায় ১ আনা ৩ পাই ; (খ) ইহার পর দ্বিতীয় ২৫,০০০৲য় কোনো কর নাই ; কিন্তু তাহার অধিক হইলে পূর্বের হার প্রযোজ্য।

৩। ব্যক্তিবিশেষ, আন্‌রেজিষ্টার্ড ফার্মের প্রথম বিশ হাজার টাকার আয়ের প্রতি টাকায় ৯ পাই, পরবর্তী পঞ্চাশ হাজারে প্রতি টাকায় ১ আনা ২ পাই।

৪। সকল ক্ষেত্রে পরবর্তী পঞ্চাশ হাজার টাকায় ১ আনা ৯ পাই ; ইহার পর প্রতি পঞ্চাশ হাজারে যথাক্রমে প্রতি টাকায় ৵৩ পাই, ৵৯ পাই, ৶৩ পাই, ৶৯ পাই, ।৩ পাই, ।৴৩ পাই, ।৴৯, ।৵৯, ।৵৩ পাই সুপার ট্যাক্স আছে।

লবণ-কর

লবণ ভারত সরকারের একচেটিয়া ব্যবসায় ; লবণের খনি ইজারা, সমুদ্রকূলে লবণ প্রস্তুতের লাইসেন্স প্রভৃতি হইতে সরকারের আয় হয়। বাঙলার বন্দর দিয়া বহু কোটি মণ লবণ প্রতিবৎসর এদেশে প্রবেশ করে ; সেজন্য যে শুল্ক আদায় হয়, তাহা শুল্ক কর খাতে ভারত সরকারের আয়।

আমরা অন্যত্র বাঙলাদেশের লবণশিল্পের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছি ; লবণের উপর শুল্কের ইতিহাস খুব প্রাচীন। বর্তমান যুগে ১৮৮১ হইতে ১৯০২ পর্যন্ত লবণ কর ছিল মণ প্রতি ২৷৷০ ; ইহার পর ১৯০৩এ ২৲, ১৯০৫এ ১৷৷০,

১৯০৭এ ১৲ শুল্ক হয়। বিলাতী লবণের দরও এই সময়ে খুব কমে; ১৯০৯-১০এ ১০০ মণ লবণের পাইকারী দাম ছিল ৩৭॥৶০ অর্থাৎ ১৵০এর দাম মাত্র ।৶০ আনা; তবে মণ প্রতি ১৲ শুল্ক সমেত দাম হয় ১।৶০। যুদ্ধের সময় জাহাজের অভাবে লবণের দর খুব বাড়ে; ১৯১৭-১৮এ ১০০ মণের দাম হয় ২৩৭।৶৫; যুদ্ধান্তে পুনরায় বৈদেশিক লবণ আমদানী হইতে আরম্ভ করিলে মূল্য হ্রাস হয়।

লবণের দর ও আমদানীর সহিত দেশে লবণ ব্যবহারের পরিমাণের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। মানুষের দেহের জন্য পর্যাপ্ত লবণের প্রয়োজন; এ ছাড়া কৃষিপ্রধান দেশে কৃষিক্ষেত্রের জন্য প্রচুর লবণের প্রয়োজন হয়। সুতরাং বাঙলাদেশে যে পরিমাণ লবণ ব্যবহৃত হয় বলিয়া হিসাব আমরা পাই, তাহা যে কেবল মানুষে খাইয়াছে তাহা নহে, পশুতে খাইয়াছে, সারের জন্য মাঠেও ব্যবহৃত হইয়াছে।

একদল লোকের মত যে, যদি লবণের দাম কম হইত, তাহা হইলে এই ব্যবহারের পরিমাণ বাড়িত; তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে, যখনই লবণের দাম কমিয়াছে, তখনই উহার ব্যবহার বাড়িয়াছে। তাঁহারা আরও বলেন—এই কর ধনী-নির্ধন সকলকে সমভাবে বহন করিতে হয়; দরিদ্রের আহার্যের মধ্যে লবণই একমাত্র পদার্থ, যাহা তাহার খাদ্যকে স্বাদু করে, ধনীর খাদ্যোপকরণের মধ্যে নানা রসের সমাবেশ থাকে। সুতরাং দরিদ্রের উপর লবণ-কর চাপাইলে তাহার দুঃখকেই বাড়ানো হয়। তাঁহাদের মতে প্রকৃতি-প্রদত্ত জল, বায়ুতে যেমন সকলের অধিকার আছে, তেমনি সমুদ্রের জলেও সকলের অধিকার থাকা উচিত। কিন্তু ভারতের ইতিহাসে এই কর নূতন নহে, ইংরেজ পূর্বতন শাসনকর্তাদের নিকট হইতে উত্তরাধিকার স্বত্বে এই অধিকার পাইয়াছে। মহাত্মা গান্ধীজি পরিচালিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পর গবর্মেণ্ট সমুদ্র-উপকূলস্থ লোকদের নিজ ব্যবহারের জন্য লবণ তৈয়ারীর অনুমতি দিয়াছেন।

বাঙলাদেশে লবণ তৈয়ারীর কারখানা এতকাল ছিল না; সুতরাং লবণ তৈয়ারীর লাইসেন্স হইতে গবর্মেণ্টের কোনো আয় এদেশে নাই। বাঙলাকে বিদেশ বা অন্য প্রদেশ হইতে আনীত লবণের উপর শুল্ক দিতে হয়, লবণের

দাম, জাহাজ ভাড়াত লাগেই। বাঙলার বন্দর হইতে লবণ বাবদ শুল্ক যে পরিমাণ আদায় হয়, তাহা অন্য কোনো প্রদেশে হয় না; ইহার কারণ বাঙলার বন্দর হইয়া আসাম, বিহার, যুক্তপ্রদেশে লবণ যায়।

লবণ-শুল্কের ইতিহাস ১৯১৬ হইতে ১৯৩১ পর্যন্ত বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই অর্থাৎ ১৯২৩এ একবৎসর মাত্র ২॥০ টাকা মণ শুল্ক হইয়াছিল, অন্য সব বৎসরেই ১।০ করিয়া ছিল। ১৯৩১এর মাঝে উহা ১॥/০ হয়, এ ছাড়াও মণ প্রতি আরো ।১০ আনা একটা শুল্ক ধার্য হয়। এই আয়টা প্রাদেশিক শাসনকেন্দ্রর পাওনা, কিন্তু ১৯৩৩এ ।১০ আনার স্থলে ৵১০ হয়। এ ছাড়া বহু নিয়ম-নিষেধ হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। তবে প্রাদেশিক সরকারের কিছু সুবিধা হইয়াছে, ১৯৩৩এ বাঙলা সরকার উদ্বৃত্ত লবণ-শুল্ক হইতে ২,১১৮০০৲ পাইয়াছিল।

	বাঙলার লবণের আয় (হাজার টাকা)	ভারতের মোট আয়	বিলাতী লবণের পাইকারী দর (১০০ মণের)
১৮৮১ হইতে ১৮৯০ গড়ে	২,০৮,৬৩	৬·৪৮ কোটি (ক) (১৮৮১-৮২)	
১৮৯১ হইতে ১৯০০ গড়ে	২,৪৫,১০	৭·৭২ কোটি (১৮৯১-৯২)	
১৯০১	২,৫৪,৩৫	৮ কোটি (খ)	
১৯০৪	২,১৮,০১	৭·১২ কোটি (গ)	
১৯১১-১২	১,২৬,৪৫	৫,০৮ কোটি	৪৫৲
১৯১২-১৩	১,১৫,৪৫	৫ কোটি ৩ লক্ষ	৬২৶৩
১৯১৬-১৭	১,৩৪,০৪	২৩ কোটি	১৪৫॥/৫ (ঘ)

(ক) ১৮৮১ অব্দ হইতে ১৯০৩ পর্যন্ত লবণের উপর শুল্ক ছিল মণপ্রতি ২॥০

(খ) ১৯০৩ অব্দে হ্রাস হইয়া ২৲ মণ হয়।

(গ) ১৯০৫এ শুল্ক হ্রাস হইয়া ১॥০ হয়। ১৯০৭এ হ্রাস হইয়া ১৲ হয়।

(ঘ) ১৯১৬এ বৃদ্ধি করিয়া ১।০ হইল।

১৯১৭-১৮	১,০৯,১৩	৮'১৪ কোটি	২৭৩।৶৪
১৯১৮-১৯	১,১১,৭৮	৬'৪১ ,,	১৮৬৸/৪
১৯১৯-২০	১,৩৮,৫৯	৫'৭৪ ,,	১৭২৶৫
১৯২০-২১	১,৪০,১০	৬'১৮ ,,	১৩০৻৭
১৯২১-২২	১,৫৫,৭৭	৬'৩৪ ,,	১১৩৲
১৯২২-২৩	১,৮৪,১১	৬'৮২ ,,	১২১৲
১৯২৩-২৪	১,৮১,৬১	১০'০১ ,,	৮৯৲ (ক)
১৯২৪-২৫	২,৩৫,৯০	৭'৩৯ ,,	৯২৲
১৯২৫-২৬	১,৭১,৬৪	৬'৩২ ,,	৬৯৲ (খ)
১৯২৬-২৭	১,৭৬,৭৮	৬'৬৯ ,,	১২৫৲
১৯২৭-২৮	১,৬৩,৭৪	৬'৬৩ ,,	১২১৲
১৯২৮-২৯	১,৭৬,০১	৭'৫৯ ,,	১০০৲ (গ)
১৯২৯-৩০	১,৮৪,০৮	৬'৭৬ ,,	৮২৲
১৯৩০-৩১	২,০৭,৯৮	৬'৮০ ,,	৬৮৲
১৯৩১-৩২	২,৫৪,৯২(১)		৫৯৲ (ঘ)
১৯৩২-৩৩	২,৭৫,১৬(১)		৬০৲ (ঙ)
১৯৩৩-৩৪	২,৩৯,৮৮	৮'৮৫ কোটি (চ)	
১৯৩৪-৩৫	২,০৮,৬৩	৮,০০ কোটি	
১৯৩৫-৩৬	২,২৩,৭২	৮'৪৬ ,,	

(ক) ১৯২৩ অব্দে শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া ২৷৹ টাকা মণ হইল।

(খ) ১৯২৪ পুনরায় হ্রাস করিয়া ১।০।

(গ) ১৯৩১ সেপ্টেম্বরে লবণে শুল্ক হয় ১৷/০; আমদানী লবণের উপর ১৸/১০।

(ঘ) কলিকাতা ও চট্টগ্রামে পৃথক দর থাকে; তাহার গড় ধরা হইয়াছে।

(ঙ) "The increase is due mainly to the levy of an all round surcharge at 25 p. c. in the rate of duty on imported articles from the 30th Sep. 1931," (Administration Report of Bengal, 1932-33, p. 34.)

(১) Financial Statement & Accounts অনুসারে—২,৬০,২৮,০০০
২,৮১,২০,০০০
অর্থাৎ প্রাদেশিক আয় সমেত।

(চ) ১৯৩৩এ ।১০ প্রাদেশিক আয় হইতে ৶১০ মণ প্রতি শুল্ক।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

প্রাদেশিক আয়-ব্যয়

আমরা এতক্ষণ যে সব রাজস্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম সেগুলি নিখিল ভারতের আয়; শুল্ক, আয়কর, লবণকর হইতে ভারত গবর্মেণ্টের মোটা টাকা আয় হয়। মেস্‌টনী ব্যবস্থার মোট কথা ছিল প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট সমূহকে অধিকতর দায়িত্ব অর্পণ এবং সেজন্য কতগুলি নির্দিষ্ট বিষয়ের আয় তাহাদের হস্তে ন্যস্ত করা। ভারতের কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের ব্যয় নির্বাহের জন্য শুল্কাদি কর ছাড়াও প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট সমূহকে একটা বরাদ্দ মত টাকা নিজ আয় হইতে দিতে হয়। মেস্‌টনী রীতি অনুসারে প্রাদেশিক গবর্মেণ্টের উপর দায় পড়িয়াছিল বেশি, কিন্তু আয় ছিল সব বাঁধা, অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের আয় বেশি, দায় কম। নূতনতর শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্মেণ্টের সম্বন্ধাদি বিষয় দায়িত্ব-সম্পন্ন প্রভৃতি আলোচনার জন্য ১৯৩০ এ সাইমন কমিশনের নিয়োগ হয়। সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের রাজস্ব সম্বন্ধে উক্ত কমিশনকে সাহায্য করিবার জন্য লণ্ডনের ইকনমিক পত্রিকাব সম্পাদক লেটন্ সাহেবকে লইয়া একটি তদন্ত কমিটি বসানো হয়। উক্ত কমিটি বহু সুপারিশ করেন, কিন্তু বিশ্বব্যাপী দুর্গতি সুরু হওয়াতে ভারতে রাজস্ব ভীষণভাবে কমিতে থাকে; তখন নূতন কর ধার্য করার প্রস্তাব কার্যে পরিণত করা সম্ভব হইল না।*

নূতনতর শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তনের সময় ভারত-সচিব মহাশয় স্যর ওটো নেমিয়ার নামে একজন বিচক্ষণ অর্থশাস্ত্রীকে রাজস্ব ও উহার বাঁটোয়ারা বিষয়ে তদন্ত করিয়া একটি প্রতিবেদন পেশ করিবার জন্য আহ্বান করেন। নেমিয়ারের রিপোর্টের (১৯৩৬ এপ্রিল) আসল কথা হইতেছে যে, কেন্দ্রীয় বা ফেডারেল গবর্মেণ্টের শক্তিকে তিল মাত্র ক্ষুণ্ণ না করিয়া আয়ের ভাগাভাগি করা। বর্তমান রাষ্ট্রশাসনের মূল নীতি হইতেছে ফেডারেল গবর্মেণ্টকে দুর্বল না করা।

---

* শ্রীসুধীশরঞ্জন বিশ্বাস ভারতীয় রাজস্বের ভবিষ্যৎ, আর্থিক উন্নতি ১৩৩৭, পৌষ, বাংলায় ধনবিজ্ঞান পৃঃ ৬৩৩—৬৬৩। এই প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনা আছে।

এই নীতি অনুসরণ করিয়া নেমিয়ার সাহেব কতকগুলি সুপারিশ করিয়াছেন; প্রাদেশিক শাসনকেন্দ্রের উপরে জাতিগঠনের সমস্ত ভার পড়িয়াছে, অথচ আয় বাড়িবার মত বিষয়গুলি তাহার হাতে নাই। এইজন্য নেমিয়ার সাহেবের প্রস্তাব যে, নগদে কিছু টাকা প্রাদেশিকদের হাতে দেওয়া ভাল; মেসটনী ব্যবস্থানুসারে প্রাদেশিকরা কেন্দ্রীয়কে টাকা দিতেন, এখন কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিককে অর্থ সাহায্য করিবার প্রস্তাব করিতেছেন। দ্বিতীয় প্রস্তাবে তিনি কেন্দ্রীয় সরকার হইতে প্রাদেশিক যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা মকুব করিবার জন্য বলিয়াছেন। বাঙলাদেশের পাটের রপ্তানি শুল্ক হইতে যে আয় হইত, তাহা সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট পাইতেন; মেসটনী ব্যবস্থায় পাট উৎপন্নকারী দেশ সমূহ অর্ধেক আয় এবং নেমিয়ারের প্রস্তাবে আরও ১২½% ভাগ অর্থাৎ মোট রপ্তানি শুল্কের আয়ের ৬২½% বাঙলা সরকার পাইবে। ১৯৩৬-৩৭এর পাট-শুল্ক হইতে ভারত গবর্মেণ্টের আয় হইবে ৩ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। ইহার অর্ধেক পাট উৎপন্নকারী দেশগুলি পাইতেছিল; নূতন ব্যবস্থায় ১২½% বৃদ্ধি হওয়ায় বাঙালার আরও ৪২ লক্ষ টাকা আয় বাড়িবে, বিহারের বাড়িবে ২½ লক্ষ, আসামের ২¼ লক্ষ, উড়িষ্যায় ¼ লক্ষ পাইবে।

নগদ টাকার সাহায্য বাঙলা পাইবে না * বটে, তবে পাট শুল্ক, ঋণ মকুব প্রভৃতি হইতে বাৎসরিক ৭৫ লক্ষ টাকা বাঙলার বেশি আয় হইবে বলিয়া আন্দাজ করা হইয়াছে। এছাড়া নেমিয়ার সাহেব পাঁচ বৎসর পরে আয়-করের অর্ধেক প্রাদেশিক শাসনকে বণ্টন করিয়া দিবার জন্য বলিয়াছেন; সেই অর্ধেকের বাঙলা বোম্বাই পাইবে ২০% করিয়া, মাদ্রাস ও সংযুক্ত প্রদেশ ১৫% করিবে, বিহার ১০%, পঞ্জাব ৮% মধ্যপ্রদেশ ৫% আসাম, উড়িষ্যা ও সিন্ধু ২% করিয়া, সীমান্ত প্রদেশ ১%। অর্থশাস্ত্রী মহাশয় অনুমান করেন ৫ বৎসর পরে গড়ে বাৎসরিক ১২ কোটি টাকা আয়-কর হইতে আয় থাকিবে; ৬ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট ৬ কোটি প্রদেশের মধ্যে বণ্টন হইবে।

---

* সংযুক্ত প্রদেশ ২৫ লক্ষ; আসাম ৩০ লক্ষ; উড়িষ্যা ৪০ লক্ষ; সীমান্তপ্রদেশ ১ কোটি টাকা ৫ বৎসরের জন্য; সিন্ধু ১ কোটি ৫ লক্ষ ১০ বৎসরের জন্য পাইবে।

বাঙলার প্রাদেশিক আয় কয়েক বৎসর হইতে ১০।১১ কোটি টাকার মধ্যে আছে। অধিকাংশ বৎসরেই ব্যয় সঙ্কুলান হয় না বলিয়া কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট হইতে ধার এবং নানাভাবে নূতনকর ধার্য করিয়া গবর্মেণ্ট চালাইতে হইয়াছে। বাঙলার প্রধান আয়ের কোঠা (১) ভূমিরাজস্ব, (২) আবগারী, (৩) ষ্ট্যাম্প, (৪) বনভূমি, (৫) রেজিষ্ট্রেশন ও (৬) শিডুইলড ট্যাক্স ইত্যাদি।

(১) ভূমিরাজস্ব সম্বন্ধে আমরা পূর্বে জমি 'বন্দবস্ত' পরিচ্ছেদে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি।

আবগারী আয়-ব্যয়

(২) আবগারী বলিতে মদ, ভাঙ, গাঁজা, চরস প্রভৃতি নেশার জিনিষ বুঝায়। আফিম আবগারীর মধ্যে পড়িলেও উহা বরাবর ভারত সরকারের নিজস্ব আয় ছিল। চীনদেশ ইহার প্রধানতম খরিদ্দার ছিল; কিন্তু সেখানে রিপাবলিক শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার পর হইতে আফিম রপ্তানী প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে; এই খাতে ভারত গবর্মেণ্টের মোটা রকম আয়ও আর নাই। বাঙলাদেশে বর্তমানে আফিমের চাষ নাই; ঔষধ ও সেবনার্থ যাহা প্রয়োজন হয়, তাহা বিহার-গাজিপুর হইতে আসে।

মদ্যাদি অবশিষ্ট নেশার সামগ্রী প্রাদেশিক শাসনের অধীন। মদ প্রস্তুত বা বিক্রয় করিতে হইলে গবর্মেণ্ট হইতে লাইসেন্স বা অনুমতি-পত্র লইতে হয়; সে-সময় টাকা জমা দিতে হয়। আবার দেশী মদের ভাঁটি, পচুইখানা বা তাড়িখানা রাখিতে হইলে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে নিলাম ডাকিয়া পানশালা কিনিতে হয়। বিলাতী মদের উপর পৃথক্ কর লাগে না; আমদানীর সময় শুল্ক হিসাবে যাহা আদায় হয়, তাহা শুল্কখাতে জমা হয়, সুতরাং বিলাতী মদ হইতে আয় ভারত সরকার পান।

তালগাছের রস বা নারিকেলের রস হইতে 'তাড়ি' নামক মাদক প্রস্তুত হয়; ভাত পচাইয়া 'বাখর' নামে একপ্রকার ভেষজ পদার্থ দিয়া যে মদ পশ্চিম-বঙ্গে হয় তাহাকে 'পচুই' বলে। আর এক শ্রেণীর মদ দেশী চোলাইখানায় প্রস্তুত হয়।

দেশের মধ্যে মগ্যাদি নেশা কিভাবে বাড়িতেছে তাহা তালিকা পর্যালোচনা করিলে বুঝা যাইবে। প্রথমে আমরা বঙ্গদেশের পূর্বে বিহার-উড়িষ্যা সমেত বাঙলার অবস্থা তালিকা দেখাই :—

মগ্যাদি	১৮৮১-৯০ বাৎসরিক গড়	১৮৯১-১৯০০	১৯০০-০১	১৯০৩-০৪
		(০০০ টাকা)		
আমদানী মদ	২,০৭	২,৬৭	৩,৩০	৩,৭৭
দেশী মদ	৪৮,০৫	৫৫,৩৬	৬৭,৬৭	৭৯,০৩
দেশী মদ	১,০১	৩,৫৮	৩,৪৮	২,৩৪
তাড়ি	৭,০০	৯,৮৯	১০,৩৯	১০,৯৬
পচাই	১,৮২	৩,৮৩	৫,৩৪	৫,৯৮
সকলপ্রকার মদ	৫৯,৯৫	৭৫,৩৩	৯০,১৮	১০২,১৮
গাঁজা	২০,২৬	২৬,২৬	৩০,২০	৩৪,৫৫
আফিম	১৯,৮৫	২৩,০৯	২৫,৯১	২৫,৯২
অন্যান্য	৭	১৪	১৯	৪১
মোট আয়	১,০০,১৩	১,২৪,৮২	১,৪৬,৪৮	১,৬২,৯৬
আমদানী বিলাতী মদ হইতে শুল্ক বিভাগের আয়	১৪,২০	১৮,৪৯	১০,৯৯	২২,৩২
মাথা পিছু নেশার জন্য ব্যয়	৵৩ পাই	৵৬ পাই	৶২ পাই	৶৬ পাই

আমরা দেখিয়াছি যে, বঙ্গচ্ছেদের পূর্বে ১৯০৪ সালে আবগারীর আয় ছিল ১'৬২ কোটি টাকা ; বিহার-উড়িষ্যা বাদ দেওয়া বাঙলায় ১৯১৩-১৪এ আয় দেখি ১'৫৩ কোটি। ইহা বাড়িতে বাড়িতে ১৯২৫-২৬এ ২'২৮ কোটিতে উঠে। মাথা পিছু আয় ।৶৯ পাই দাঁড়ায়, যেখানে ছিল ৵০ বা ৶০ মাত্র। একটা জিনিষ বিশেষ ভাবে লক্ষ্যনীয় যে আথিক দুর্গতি আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে আবগারী আয়ও কমিতে থাকে। ১৯৩২-৩৩ মাথা পিছু সরকারী আয় দাঁড়ায় ।৬ পাই, অর্থাৎ ২০ বৎসর পূর্বে ১৯১২-১৩র ।১০ পাই এর প্রায় সমান।

তবে বাঙলার পক্ষে একটা আশার কথা—বাঙলা এখনো অন্য কয়েকটি প্রদেশের ন্যায় মদ্যপ হয় নাই। আবগারী হইতে ১৯৩০-৩১ বোম্বাইএর আয় ছিল ৩·৪ কোটি টাকা, মাথা পিছু আয় ছিল ১।৶২ পাই; মাদ্রাজের আয় হয় ৫·২৪ কোটি, অর্থাৎ মাথা পিছু ১৴১১ পাই, সেই সময়ে বাঙলার মাথা পিছু আয় ছিল ।৴৯ পাই। বোম্বাইতে ঐ বৎসর ছাড়া কোনো বৎসরই ২৲ টাকার কম মাথা পিছু আয় দেখা যায় না। যুক্তপ্রদেশ ও সীমান্ত প্রদেশের মাথা পিছু আয় বাঙলা হইতেও কম।

আবগারী আয় বরাবর বাড়িয়া আসিতেছে; উহা চরমে ওঠে ১৯২৯-৩০এ; তারপর আর্থিক দুর্গতির দিনে কমিতে থাকে। কিন্তু এই বিভাগের ব্যয় উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯১৪-১৫এ এই বিভাগ পুনর্গঠিত হয়। আবগারী বিভাগের কর্তা হইতেছেন একসাইজ্ কমিশনর; তাঁহাকে সহায়তা করেন দুইজন ডেপুটি কমিশনর; এ ছাড়া ২১ জন জেলা সুপার, ৬১ জন ইন্সপেক্টর, ২৩৫ জন সব-ইন্সপেক্টর আছেন; ছোট কর্মচারীদের কথা বাদ দিলাম। ১৯১১-১২এ যেখানে ব্যয় ছিল ৬·২৬ লক্ষ টাকা, ১৯১৫-১৬এ হইল ৭·৭৫ লক্ষ, ১৯২২-২৩এ হইল ১৫·৩৭ লক্ষ টাকা। এই সময়ে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার চালু হইয়াছিল। নানা কারণে খরচ কমাইবার দিকে সরকারের দৃষ্টি পড়িতে বাধ্য হয়। রিট্রেঞ্চমেণ্ট কমিটির সুপারিশে খরচ কিছু কমে বটে। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে বাড়িয়া ১৯২৯-৩০এ ১৬·২০ লক্ষ হইল। ১৯৩৪-৩৫এ ১৭·২৪ ও ১৯৩৫-৩৬এ ১৮·৪৮ লক্ষ ব্যয় বাজেটে ধরা হইয়াছিল।

এই বিভাগের আয় ও ব্যয় আমরা পরিশিষ্টে দিয়াছি; এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যীয় যে, ১৯১২-১৩ সালে আয় ছিল ১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা ও ঐ বিভাগের ব্যয় ছিল ৫,৯৮,০০০৲; কিন্তু ২০ বৎসর পরে আয় হইতেছে ১ কোটি ৪০ লক্ষ, কিন্তু ব্যয় হইতেছে ১৭ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ব্যয় তিনগুণ বাড়িয়াছে; অথচ আয় প্রায় সমান।

পরিশিষ্ট ১

আবগারী বিভাগের আয় ও ব্যয়

	আয়	ব্যয়
	(০০০ হাজার)	
১৯১২-১৩	১,৩৭,৬০	৫,৯৮
১৯১৩-১৪	১,৫৩,৮৮	৬,২৬
১৯১৪-১৫	১,৫৩,৫৯	৬,৯৪
১৯১৫-১৬	১,৫১,৩০	৭,৭৫
১৯১৬-১৭	১,৪৪,০৭	৯,৪৩
১৯১৭-১৮	১,৫৬,৩৬	১০,০০
১৯১৮-১৯	১,৭৬,৬৪	১০,৫৮
১৯১৯-২০	১,৮১,৪৯	১১,৭৫
১৯২০-২১	১,৯৬,৩৬	১৩,৩১
১৯২১-২২	১,৮৩,০০	১৫,৪২
১৯২২-২৩	২,০১,০৯	১৫,৩৭
১৯২৩-২৪	২,০৯,৮৫	১৩,১৬
১৯২৪-২৫	২,১৫,০৭	১২,৯৩
১৯২৫-২৬	২,২৮,০২	২৬,০২
১৯২৬-২৭	২,২৫,১৭	২৪,৯২
১৯২৭-২৮	২,২৪,৩০	২৩,৮৭
১৯২৮-২৯	২,২৪,৯০	২২,৯৩
১৯২৯-৩০	২,২৬,২৪	২২,২৫
১৯৩০-৩১	১,৮০,১৬	২১,৮০
১৯৩১-৩২	১,৫৬,০০	১৯,৫৫
১৯৩২-৩৩	১,৪০,৩২	১৭,০০
১৯৩৩-৩৪	১,৩৪,০৬	১৭,৫৪
১৯৩৪-৩৫	১,৩৬,৬৫	১৬,৬০
১৯৩৫-৩৬	১,৩৮,০০	১৭,৮৮

পরিশিষ্ট ২

(০০০ হাজার)

	মদের দোকান	গাঁজার দোকান	মদ হইতে আয়	গাঁজা-আফিম হইতে আয়	মোট আয়	মাথা পিছু আয়
১৯১২-১৩	৫২৮১	২৮৪৯	৮২,৭৮*	৫৪,৪৬	১,৩৭,৬০	।১০
১৯১৩-১৪	৫৩০৩	২৭৯৫	৮৯,৩২	৬৪,১৭	১,৫৩,৮৮	।/৫
১৯১৪-১৫	৫১৭৪	২৬৮৯	৮৭,৪২	৬৫,৭৫	১,৫৩,৫৯	।/৫
১৯১৫-১৬	৪৮৯৯	২৫৫৮	৮৪,০৩	৬৬,৭৩	১,৫১,৩০	।/৩
১৯১৬-১৭	৫০৫৬	২৫৫৭	৭৮,২৯	৬৫,২১	১,৪৪,০৭	।/১
১৯১৭-১৮	৫৪১৬	২৫৬৩	৯০,৩৪	৬৫,৪১	১,৫৬,২৫	।/৫
১৯১৮-১৯	৫৪৯৪	২৬০৬	১,০৭,৫৫	৬৮,৩৪	১,৭৬,৩৮	।৵২
১৯১৯-২০	৫০৮১	২৬১৬	১,০৯,১৪	৭১,৩৫	১,৮১,০৮	।৵৪
১৯২০-২১	৩৬৩৮	২৩৯২	১,২১,১৪	৭৪,৬৩	১,৯৬,৩৩	।৵১০
১৯২১-২২	৩৫১৭	২৩২২	১,১৩,৭৫	৬৯,৩০	১,৮৩,৫০	।৵৩
১৯২২-২৩	৩৪১০	২৩০৪	১,২৯,৩৩	৭১,৩৮	২,০১,১৭	।৵৯
১৯২৩-২৪	৩৪৬০	২৩৬২	১,৩৪,২৮	৭৪,৮৫	২,০৯,৬৬	।৶১
১৯২৪-২৫	৩৫৫৮	২৩৮৯	১,৩৪,৪১	৮০,৫৭	২,১৫,৫৩	।৶৪
১৯২৫-২৬	৩৬০৬	২৪২৯	১,৩৩,০৯	৯৪,৬৮*	২,২৮,০০	।৶৯
১৯২৬-২৭	৩৬৮৯	২৪২৯	১,২৩,৮৯	৪৮,৪০ আফিম ৫২,৭০ অন্যান্য	২,২৫,১৭	।৶৯
১৯২৭-২৮	৩০৩০	২৪১২	১,২২,৫০	৪৮,০৮ আ ৫২,২৯ অ	২,২৪,৩০	।৶৮
১৯২৮-২৯	৩০০১	২৪১৫	১,২১,৫১	৪৮,২৩ আ ৫৪,৮৭ অ	২,২৪,৯০	।৶৮
১৯২৯-৩০	২৯৯৭	২৪১৮	১,২৩,৩৮	৪৮,৩৫ আ ৫৪,৩২ অ	২,২৬,২৪	।৶৯

* ১৯১২ হইতে ১৯২৭ পর্যন্ত গাঁজা আফিম পৃথক্‌ভাবে দেখানো হয় নাই।

	মদের দোকান	গাঁজার দোকান	মদ হইতে আয়	গাঁজা-আফিম হইতে আয়	মোট আয	মাথা পিছু আয়
১৯৩০-৩১	২৯৭৫	২৪৩৫	৯৩,০৬	৪৬,৫৬আ ৪০,৪১অ	১,৮০,১৬	।/৯
১৯৩১-৩২	২৯৪৫	২৪৪১	৮০,৪৮	৩৪,২১আ ৪২,০৪অ	১,৫৫,৯৯	।১১
১৯৩২-৩৩	২৯১২	২৪৫৪	৭০,৭৪	৩৮,৩২আ ৩১,১৬অ	১,৪০,৩১	।৫
১৯৩৩-৩৪	২৯৩২	২৪৭০	৬৯,০১	৩৫,১৬আ ২৮,৮৩অ	১,৩৪,০৬	।২
১৯৩৪-৩৫					১,৪২,০০	।৫
১৯৩৫-৩৬					১,৩৮,০০	।৪

পরিশিষ্ট ৩

জেলা হিসাবে আবগারী

বাঙলা দেশের কোন্ জেলায় কতগুলি আবগারী দোকান আছে ও আবগারীর আয় কত তাহা নিম্নে দেখানো গেল :—

	আয়তন বর্গ মাইল	দোকানের সংখ্যা	আবগারীর আয় (হাজার টাকা)	আবগারী আইন-ভঙ্গ মোকদ্দমা
বর্ধমান	২৭০৩	৬১৯	১৬,৬৫	১৪৮২
বীরভূম	১৭৫৩	৩৬৯	৪,০৬	৫৩৫
বাঁকুড়া	২৬২৫	২৮৮	২,২০	৫২৪
মেদিনীপুর	৫০৫৫	৪৯৫	১০,৩৩	১২৪০
হুগলী	১১৮৮	৩৪৪	১০,৩৩	৩৬৪

	আয়তন বর্গ মাইল	দোকানের সংখ্যা	আবগারীর আয় (হাজার টাকা)	আবগারী আইন-ভঙ্গ মোকদ্দমা	কত লোক নিজ বাড়ীতে মদ তৈরীর অনুমতি পায়
হাওড়া	৪৯৮	১৭৫	৪,৭৬	২৫২	
২৪ পরগণা	৪৮৩৪	৫৩২*	২০,১৪	৩৬৯	*১০৭৬
নদীয়া	২৭৭৮	১৪০	২,৪০	১২৮	
মুর্শিদাবাদ	২১২১	১৯১	২,০০	১১৩	.
যশোহর	২৯০৪	১০৭	১,৫৯	১৮	
খুলনা	৪৭৩০	১১৭	১,৪২	৩	
ঢাকা	২৭০৩	১৪০*	৫,৫৯	৩৬	*২১৯
মৈমনসিংহ	৬২৩৮	২০২*	৪,০৫	২৩	*২০৫৭
ফরিদপুর	২৩৭১	৭৪	১,৯৫	২	
বাখরগঞ্জ	৩৪৯০	১০৪*	৩,০৭	২২	*২৪
চট্টগ্রাম	২৪৯৭	৯৭*	৩,০৬	৬২	*২৯
নোয়াখালী	১৫১৫	৩৩	৫০	৪	
ত্রিপুরা	২৫৬০	৮৫	১,৭৮	১২	
পাবনা	১৬৭৮	৬৪*	১,৪৮	১১	*৭৬
রাজসাহী	২৬২০	৯৩*	১,৯৭	৪৯	*৮৩৫
মালদহ	১৮৩৩	১১৮*	১,৯৬	৬৯	*৯১০
দিনাজপুর	৩৯৪৬	১১৭*	১,৬৭	৪৯	*২৭৯১
জলপাইগুড়ি	২৯৩১	১১৭*	৪,৯৭	৯৬	*৩৪,০০৫
রঙ্গপুর	৩৪৯৬	১৬১*	২,৪৭	৪১	*৫১৯
বগুড়া	১৩৭৯	৬৩*	১,০৬	১১	*১৬০
দার্জিলিঙ	১১৬৪	৭৮*	৩,০৫	২৮১	*১০,৭৪০

উত্তর বঙ্গের আদিম জাতির লোকদের লাইসেন্স দিয়া মদ তৈরীর অনুমতি দেওয়া হয়। বর্ধমান, মেদিনীপুর, বীরভূম ও বাঁকুড়ায় বহু সহস্র সাঁওতাল

ও নিম্ন শ্রেণীর লোকের বাস। সে সব জেলায় আবগারী আইন বলবৎ থাকায় লোকে চোলাই করিয়া মদ বোঝাই করে ; ফলে, সেখানে এতবেশী আবগারী মামলা হয়। অন্যান্য জেলায় এই মামলা কম।

৩। ষ্ট্যাম্প

বাঙলা সরকারের তৃতীয় দফা মোটা আয় হইতেছে ষ্ট্যাম্প বিক্রয় হইতে ; আদালতে মামলা মোকদ্দমা করিতে হইলে 'কোর্ট ফী' বা ষ্ট্যাম্প কিনিয়া দিতে হয়। বর্ত্তমানে ইহা হইতে বাঙলা সরকারের আয় ৩ কোটি টাকার উপর। ১৯৩৪ সাল হইতে নিয়ম হইয়াছে যে, রসিদ হ্যাণ্ডনোট প্রভৃতির জন্য পূর্ব্বের পোষ্টাল ষ্ট্যাম্প ব্যবহার চলিবে না, ইহার জন্য পৃথক্ রেভেনিউ ষ্ট্যাম্প হইয়াছে।

বাঙলা দেশে ১৯১১-১২এ ষ্ট্যাম্প খাতে আয় ছিল ১,০০,৫৬,০০০৲ টাকা ; ১৯২১-২২এ ২,৭৩,৮৪,০০০৲ ; ১৯৩১-৩২এ ২,৭১,০৯,০০০৲ ; ১৯৩২-৩৩এ ৩,১৩,৯১,০০০৲ হয়। ১৯৩৪-৩৫এ ২,৯৪,০০,০০০৲ ; ১৯৩৬-৩৭এ ২,৯৪ কোটি।

এই বাবদ গবর্মেণ্টের ব্যয় বেশি হয় না।

১৯১১—১২	...	৩,২২,০০০৲
১৯২১—২২	...	৭,৬৭,০০০৲
১৯৩১—৩২	...	৪,১০,০০০৲
১৯৩২—৩৩	...	৪,৬১,০০০৲
১৯৩৪—৩৫	...	৪,৯৫,০০০৲
১৯৩৬—৩৭	...	৫,২৪,০০০৲

মাদ্রাজে ১৯৩০-৩১এ ষ্ট্যাম্প হইতে ২,৩৪ লক্ষ টাকা, যুক্ত প্রদেশে ১,৬৯ লক্ষ, বোম্বাইএ ১,৫৮ লক্ষ টাকা ছিল ; সমগ্র ভারতের আয় ছিল ১২ কোটি ৬০ লক্ষ। ঐ সময়ে ব্যয় ছিল ২৬,৪৫,০০০৲। বাঙলার আয় সমগ্র ভারতের

Report of the Retrenchment Committee, 1932, p 17.

$\frac{১}{৪}$ অংশ, ব্যয় হয় অনুপাতানুসারে $\frac{১}{৫}$ অংশ। বাঙলার জন-সংখ্যা বৃটীশ ভারতের জন সংখ্যার $\frac{১}{৫}$ অংশ। সে দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যাইবে বাঙলায় ষ্ট্যাম্প বিক্রয় বেশি এবং ব্যয় কম।

১৯৩৩-৩৪এ ভারতের নানা প্রদেশে ষ্ট্যাম্প বাবদ্ কিরূপ আয় হয় তাহা নিম্নে দিলাম।

ষ্ট্যাম্পের আয় (০০০ টাকা)

মান্দ্রাজ	...	২,২৮,১১
বোম্বাই	...	১,৫৬,৩৫
বঙ্গদেশ	...	২,৮৭,১৪
যুক্তপ্রদেশ	...	১,৭৪,৯৭
পাঞ্জাব	...	১,০৮,১৫
বর্মা	...	৪৬,১২
বিহার-উড়িষ্যা	...	১,০৬,৪৮
মধ্যপ্রদেশ	...	৫৮,০৩
সীমান্ত প্রদেশ	...	৯,৫৩
আসাম	...	১৭,২৬
মোট	...	১১,৯৩,০১

৪। বনভূমি

হিমালয় ও ময়মনসিংহের বনভূমি ছাড়া বাঙলা দেশে সরকারী বন নাই। ১৮৭৩-৭৪ অব্দে বাঙলা দেশে এই বিভাগ গঠিত হয়। তখন ইহার আয় ছিল প্রায় পৌণে দুই লাখ টাকা। সমগ্র ভারতের তুলনায় বাঙলার বনভূমি হইতে আয় সামান্যই ; বাঙলায় জঙ্গল আছে বিস্তর, কিন্তু তাহা অর্থকরী নহে। অর্থকরী বনভূমি গঠনের চেষ্টা বাঙলায় হয় নাই ; পশ্চিম বঙ্গে ইহার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে এবং অনাবৃষ্টি হইতে উহাকে রক্ষা করিতে হইলে বৈজ্ঞানিক-

ভাবে বনভূমি প্রসারের বিশেষ প্রয়োজন। বাঙলা দেশে বনভূমি হইতে আয় :—

১৯১২—১৩	...	১৬,০১,০০০৲
১৯২২—২৩	...	২৩,১১,০০০৲
১৯৩২—৩৩	...	১৫,১২,০০০৲
১৯৩৩—৩৪	...	১৫,০৩,০০০৲
১৯৩৪—৩৫	...	১৫,২৬,০০০৲
১৯৩৫—৩৬	...	১৮,০৩,০০০৲

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সহিত তুলনা করা যাক্ :—

১৯৩৩—৩৪ সনের তালিকা

প্রদেশ		হাজার টাকা
বর্মা	..	৭৯,৯৯
বোম্বাই	...	৫৪,৩০
যুক্তপ্রদেশ	...	৪৫,১৯
মধ্যপ্রদেশ	...	৪৪,০৬
মান্দ্রাজ	...	৪১,৫৮
পাঞ্জাব	...	১৯,৩৮
বঙ্গদেশ	...	১৫,০৩
আসাম	...	১৪,৫৭
বিহার-উড়িষ্যা	...	৬,৮৫
সীমান্ত প্রদেশ	...	৪,৩৫
মোট	...	৩,৩৮,১১

৫। রেজিষ্ট্রেশন

জমি কেনা-বেচা, বন্ধক, দান প্রভৃতি হস্তান্তর আইন-সঙ্গত করিতে হইলে দলিলপত্র রেজিষ্টারী অফিষে রেজিষ্টারী করিতে হয়। সমগ্র বাঙলা দেশে

৪১৯টি রেজেষ্টারী অফিষ আছে। এগুলি সব-রেজিষ্ট্রারের অধীন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট জেলার রেজিষ্ট্রার। সমগ্র প্রদেশের বড় কর্তাকে ইন্সপেক্টর-জেনারল অব্ রেজিষ্ট্রেশন (I. G.) বলে।

১৯৩০ অব্দের বাঙলা দেশের রেজিষ্টারী অফিষের হিসাব-নিকাশ দেওয়া গেল :—

			সমগ্র ভারতে
অফিষের সংখ্যা	...	৪৯৯	২৩০৫
অস্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিল দস্তখতের সংখ্যা	...	১১,৪৭,১৩৫	৩৯,৬৫,৫৫২
স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিলাদি	...	১,১৩,৮৪০	২,৪৯,৪৯০
মোট দলিল সংখ্যা	...	১২,৬০,৯৭৫	৪২,১৫,০৪২
দলিলের দ্বারা কৃত স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য	...	৩০,৯৪০০০৲	২০৯,৪৮০০০৲
সরকারী নেট রাজস্ব	...	২৭,০৭,০০০৲	১,২৪,৭৫,০০০৲
রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের ব্যয়	...	১৮,৬১,০০০৲	৭৫,৮৪,০০০৲

বাঙলা দেশের জন-সংখ্যা মান্দ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই হইতে অধিক; মান্দ্রাজে ৬৫ কোটি টাকা, বোম্বাইতে ২৯ কোটি, যুক্তপ্রদেশে ১৮ কোটি টাকা মূল্যের দলিলাদি সাধিত হয়। মান্দ্রাজে সব থেকে বেশি হস্তান্তরিত হয়; জন-সংখ্যা হিসাবে বোম্বাইএ বেশি হইয়াছে।

কোন্ প্রদেশে কিরূপ আয় হয় দেখা যাক্ :—

১৯৩৩—৩৪এর তালিকা

মান্দ্রাজ	...	৩১,১৫,০০০
বঙ্গদেশ	...	১৯,৬৭,০০০
বোম্বাই	...	১৬,২১,০০০
বিহার-উড়িষ্যা	...	১২,৫৮,০০০
যুক্ত প্রদেশ	...	১১,৮৬,০০০

পাঞ্জাব	...	৮,৮৯,০০০
মধ্যপ্রদেশ	...	৫,০৪,০০০
বর্মা	...	৯,৯৪,০০০
আসাম	...	১,৫৫,০০০
সীমান্ত প্রদেশ	...	৭০,০০০
মোট	...	১,১১,৬৫,০০০ টাকা

রেজিষ্ট্রেশন হইতে বাঙলার আয় ছিল :—

১৯১২—১৩	...	১৮,২৩,০০০৲
১৯২২—২৩	...	২২,৬৬,০০০৲
১৯৩২—৩৩	...	১৮,৬৭,০০০৲
১৯৩৩—৩৪	...	১৯,৬৭,০০০৲
১৯৩৫—৩৬	...	১৯,০০,০০০৲

এই বিভাগের ব্যয় কিভাবে বাড়িয়াছে দেখা যাক্ :—

১৯১২—১৩	...	১০,৫১,০০০৲
১৯২২—২৩	...	১৭,৫৭,০০০৲
১৯৩২—৩৩	...	১৭,৪৭,০০০৲
১৯৩৪—৩৫	...	১৭,২১,০০০৲
১৯৩৬—৩৭	..	১৮,৮২,০০০৲

৬। বিবিধ বিষয়

পূর্বোল্লিখিত পাঁচ দফা কর ছাড়া মণ্ট-ফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রবর্তনের সময় হইতে প্রাদেশিক গবর্মেণ্টসমূহকে কতকগুলি বিষয়ের উপর ট্যাক্স ধার্য করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে এবং কতকগুলি নূতন কেন্দ্রীয় আয়ের ভাগ দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

প্রথমে কেন্দ্রীয় আয়ের নূতন দফার কথা বলা যাক্। মেষ্টনী ব্যবস্থানুসারে ভাগাভাগির কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। পাট উৎপন্নকারী প্রদেশসমূহকে

পাটের রপ্তানী শুল্ক হইতে অর্ধেক দান করায় কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের আয় কমিয়াছে; তাছাড়া চা, চামড়া, ছালের রপ্তানী শুল্ক রদ, ও রৌপ্যের উপর আমদানী শুল্ক হ্রাস করায় ভারত গবর্মেণ্টের আয় কমে। ইহার উপর ভারতের মধ্যে চিনি-শিল্প বিশেষভাবে উন্নতি লাভ করায় বৈদেশিক চিনি আমদানী খুবই কমিয়া গিয়াছে এবং সেই কারণে আমদানী শুল্কও কমিয়াছে। কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের এই সকল খাতে আয় কম হওয়ায় তাহাকে অন্য দিকে পোষাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিতে হইল;

চিনির কারখানার উপর (১৯৩৪ মার্চ) কর সম্পূর্ণরূপে ভারত গবর্মেণ্টের হইলেও তাঁহারা প্রাদেশিক সমবায় বিভাগের হাতে ইক্ষুর চাষ প্রভৃতি উন্নতির জন্য কিঞ্চিৎ অর্থ দিতেছেন।*

দিশলাইয়ের উপর শুল্ক বসাইবার কারণও ঐরূপ দিক হইতে গবর্মেণ্ট সমর্থন করিতে পারেন—কারণ দেশে বহু কারখানা হওয়ায় আমদানী শুল্ক হইতে কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট বঞ্চিত হইতেছেন। গবর্মেণ্ট সে-যুক্তি না দিয়া বলিলেন, বঙ্গদেশাদিকে পাট শুল্ক বাবদ অর্ধেক আয় দিয়া তাঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন এবং সেই ক্ষতির উশুল নিখিল ভারতের সকলের উপর দিশলাই-শুল্ক চাপাইয়া আদায় করিতেছেন; এই লইয়া প্রাদেশিক সরকারদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করা হইয়াছে। দিশলাই-এর উপর ৪০ কাঠি বাক্সের গ্রোসে ১৲, ৬০ কাঠিতে ১।০ ও তদূর্ধ্বে ২৲ শুল্ক ধরা হয়। এ কথা বলা বাহুল্য যে, এই শুল্ক দেয় যে নিত্য ব্যবহার করে সেই।

ইহার পর প্রাদেশিক সরকারের আয় বাড়াইবার জন্য কর্তৃপক্ষ একটা লম্বা তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন; যেমন তামাক, বিনোদন, ইলেক্‌ট্রিসিটি, কৃষিজাত সম্পদ, বাড়ী ঘর, ব্যবসায়, পেশা, চাকুরী, গুড়, নৌকা, মাল বিক্রয়, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি; এমন কি উনুন, জানালা পর্যন্ত তালিকায় ধরা আছে। তামাক-কর বর্তমানে প্রাদেশিক সরকার লইতেছেন। কিন্তু ইহার দাবী হইতেছে কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের; তবে তাহা এখনি করিবেন না এবং

* ১ হন্দর খণ্ডসার চিনির উপর ॥৴০ আনা, অন্যান্য চিনির উপর ১।৴০ আনা শুল্ক। প্রাদেশিক সমবায় বিভাগ হন্দরে এক আনা পায়।

করিলেও তাহার অংশ প্রাদেশিকদের দিবেন (The federalisation of tobacco excise would not preclude the Federal Government from assigning the proceeds to the units, if so desired).

প্রাদেশিক তালিকাভুক্ত (Scheduled) বিষয়গুলির মধ্যে বাঙলা দেশে রেস্ বা ঘোড় দৌড় খেলা হইতে কিছু আয় হয়। আমরা যে তালিকা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার সকলগুলির উপর কর এখনো ধার্য হয় নাই; তবে (১) বিদ্যুৎ কারখানার উপর Unit প্রতি কর, (২) থিয়েটর, সিনেমা প্রভৃতি বিনোদন কর, (৩) উইল প্রোবেট লইবার ফী বৃদ্ধি, (৪) কোর্টফী বৃদ্ধি, (৫) তামাকের উপর কর প্রবর্তিত হইয়াছে। তালিকাভুক্ত কর হইতে

	বাঙলার আয়		ভারতের সকল প্রদেশের আয়
১৯২৩—২৪	২০'৭৬ লক্ষ	...	৩৩'১৩ লক্ষ
১৯২৪—২৫	১৪'৩৫ ,,	...	৩০'৫৫ ,,
১৯২৫—২৬	১৪'৪৩ ,,	...	৮৫'১১ ,,
১৯২৯—৩০	১২'০০ ,,	...	৪০'৫৫ ,,
১৯৩১—৩২	৮'৯৬ ,,	...	৩২'৪৪ ,,
১৯৩৩—৩৪	১১'২২ ,,	...	৪১'১৯ ,,
১৯৩৪—৩৫	১২'৫০ ,,	...	—

আমরা বাঙলা দেশের আয়ের বিভিন্ন দফা আলোচনা করিলাম; এইবার আয় কিভাবে বাড়িয়াছে তাহা দেখা যাক। ১৮৮১—৯০এ গড়ে বাঙলা দেশের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনের যৌথ আয় ছিল ১৮'৩৬ কোটি। ১৮৯১—১৯০০এ গড়ে ছিল ২০'৪৪ কোটি। ১৯০৩—০৪এ বঙ্গচ্ছেদের পূর্বে আয় ছিল ২৫'১৮ কোটি। তারপর বিহার-উড়িষ্যা পৃথক্ হইয়া গেলে ও নূতন বাঙলা প্রদেশ গঠিত হইলে ১৯১২—১৩এ আয় হয় ১৭'৮৩ কোটি। ঐ আয় বাড়িতে বাড়িতে মণ্টফোর্ড সংস্কারের পূর্বে ১৯২০-২১এ হয় ৩৪'৫৮ কোটি। নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইলে ১৯২১—২২এ ৩৪'১৭ কোটি, ১৯২৬—২৭এ ৪০'৪৬ কোটি পর্যন্ত ওঠে। ইহার পর পুনরায় কমিতে থাকে এবং ১৯৩১—৩২এ ৩০'২৪ কোটি টাকা হয়।

কিন্তু কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের শুল্ক-আয়-করাদি বাদ দিয়া বাঙলার শাসন বিভাগের জন্য যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহার তালিকা নিম্নে দিতেছি :—

বাঙলার আয়

		বাঙলাব আভ্যন্তরীণ আয়	কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টকে প্রদত্ত
১৯১২—১৩	...	৭,১৬,১৫,০০০৲	১০,৬৭,৫০,০০০৲
১৯২১—২২	...	৮,৮৬,৫৭,০০০৲	২৫,৩১,১৬,০০০৲
১৯২৬—২৭	...	১০,৪৯,৬২,০০০৲	২৮,৪০,২৬,০০০৲
১৯৩১—৩২	...	৯,০০,৮২,০০০৲	২১,২৭,৪৮,০০০৲
১৯৩৩—৩৪	...	৯,০৫,৭৪,০০০৲	
১৯৩৪—৩৫	...	৯,১৯,৪৭,০০০৲	
১৯৩৫—৩৬	...	১১,০২,৩৩,০০০৲	

পরিশিষ্ট (ক)

বঙ্গদেশের আয়

ছোটলাটের অধীন বঙ্গদেশ

[বঙ্গ, বিহার-উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর]

		জন-সংখ্যা	আয়তন
১৮৮১	...	৬·৯৫ কোটি	
১৮৯১	...	৭·৪৬ ,,	১,৯০,০০০
১৯০১	...	৭·৮৪ ,,	বর্গমাইল

(গড় বাৎসরিক আয়)

	১৮৮১—১৮৯০		১৮৯১—১৯০০		১৯০৩—০৪	
	মোট আয় (ইম্পিরিয়াল ও প্রাদেশিক)	প্রদেশকে দেওয়া হয়	ইম্পিরিয়াল মোট আয়	প্রদেশকে দেওয়া হয় বা প্রাদেশিক আয়	ইম্পিরিয়াল মোট আয়	প্রদেশকে দেওয়া হয় বা প্রাদেশিক আয়
আফিম	৪,৫০ কোটি		৩ কোটির উপর		৩·৮৮ কোটি	
শুল্ক	২·৪৭ ,,		৩·৫২ ,,		৩·৯৪ ,,	
	লক্ষ	লক্ষ	লক্ষ	লক্ষ	লক্ষ	লক্ষ
ভূমি কর	৩,৮০·৭৩	১,১২·৪৫	৩,৯২·৮৭	৯১·৫১	৪,১০·০৩	২,১০·৪৩
লবণ	২,০৮·৬৩	১·১৭	২,৪৫·১০	১·১২	২,১৮·০১	
ষ্ট্যাম্প	১,২৯·৮১	৮৭·০৯	১,৬৫·৩৪	১,২৪·০০	১,৯৮·৩৬	১,৪৮·৭৭
আবগারী	১,০০·১৩	৫০·৯৭	১,২৪·৮২	৪১·২৪	১,৬২·৯৬	৮১·৪০
প্রাদেশিক রেট	৭৭·৫০	৩৮·৮২	৮৯·৭২	৪৫·২৪	১,০২·৯৯	৫০·৪০
এসেসড্ ট্যাক্স	২৪·৭২	১০·৪১	৪৬·৫২	২৩·২৬	৫০·৩৬	২৪·৭৩
বন	৬·৫১	২·৬৬	৯·৪৫	৪·৭২	১০·৬৬	৫·৩৩
রেজিষ্ট্রেশন্	১০·৬০	৬·৩২	১৪·১৫	৭·০৭	১৬·৬৬	৮·৩৩
ষ্টেটরেলওয়ে	৮৪·৯৬	৬৩·৬৮	২,০৫·৪৯	৭২·১৩	৩,২৬·৫৭	
বিবিধ	১,১৬·০০	৬৮·৩৬	৯১	৬৩·৬৪	২,৪০	১,০৪·৭৩
মোট	১৮,৩৬·৪০	৪,৪১·৯০	২০,১৪·৪৯	৪,৬৭·০৩	২৫,১৮·৮০	৬,৩৪·২০
প্রাদেশিক শাসনের জন্য বাদ দিয়া কেবল ইম্পিরিয়ালের জন্য থাকে	১৩,৯৪,৪৭		১৫,৭০,৪৬		১৮,৮৪,৬০	

বাঙলার রাজস্ব

[লাট সাহেবের অধীন বঙ্গদেশ]

(সংস্কারের পূর্বে)

		জন-সংখ্যা
১৯১২	...	৪,৫০ লক্ষ
১৯২২	...	৪,৬০ ,,
১৯৩১	...	৫,০১ ,,

(হাজার টাকা)

	১৯১২—১৩		১৯২০—২১	
	ইম্পিরিয়াল	প্রাদেশিক	ইম্পিরিয়াল	প্রাদেশিক
১। ভূমিকর	—২৭,৩৭	৩,০৭,১৩	১,৩২,৭৮	১,৭১,২৩
২। আফিম	৫,০৪,৫৬		২,৯৮,৫৮	
৩। লবণ	১,১৮,৮৫		১,৪০,১০	
৪। ষ্ট্যাম্প	১,০৩,৭৩	১,০৩,৭৩	১,৪১,১৫	১,৪১,১৫
৫। আবগারী		১,৩৭,৫৯		১,৯৬,৬৮
৬। প্রাদেশিক		৩২,০২		৯৭
৭। শুল্ক	৩,১৯,৫১		১২,০৯,১৯	
৮। এসেস্ড্ ষ্ট্যাম্প বা আয়কর	২৭,৭৬	২৭,৭৬	৬,২৩,৭৫	২,১৭,২৭
৯। বন		১৬,০১		২১,৮৫
১০। রেজিষ্ট্রেশন		১৮,২৩		২৬,৮৪
১১। রাজকর	৬৮		৬৮	
১২। সুদ	১২,১১	৫,০১	সুদ সিবিল বিভাগের আয়	
সিবিল বিভাগের আয়		৪৯,১৯	১০,৯৫	৮৪,৩১
বিবিধ	৩৯	৯,৪০	১,৭৮	৫৬
জল সেস	৪,৯৮	৪,৮২	৫,৯৯	৫,৯৯
পূর্ত কার্য	৮৫	৫,২৬	১,২৫	৭,৬৮
	১০,৬৭,৫০	৭,১৬,১৫	২৫,৯৭,১৭	৮,৬১,৬৮
	১৭,৮৩,৬৮		৩৪,৫৮,৩৬	

বাঙলাদেশের আয়

(মণ্টফোর্ড শাসন সংস্কারের পর)

(হাজার টাকা)

	১৯২১-২২		১৯২৬-২৭		১৯৩১-৩২		১৯৩৬-৩৭
	কেন্দ্রীয়	প্রাদেশিক	কেন্দ্রীয়	প্রাদেশিক	কেন্দ্রীয়	প্রাদেশিক	প্রাদেশিক
ভূমিকর		৩,০১,৯৭		৩,১১,১৮		৩,০৬,২১	৩,২৮,৪৫
আফিম	২,৩৯,০০		১,৪২,৬৫				
আবগারী		১,৮৩,০০		২,২৫,১৭		১,৫৬,০০	১,৬৪,৬৬
লবণ	১,৫৫,৭৭		১,৭৬,৭৮		২,৬০,২৮		১,১০
ষ্ট্যাম্প		২,৭৩,৮৪		৩,৩১,৬০		২,৭১,০৯	২,৯৪,৯০
শুল্ক	১৪,২৬,৭২		১৮,৭৫,৫২		১৩,৭৪,১১		
আয়কর	৬,৬২,৭৬		৫,৮৮,৬৬		৪,৫৯,১৬		
বন		১৯,২৪		৩১,৪৯		১৬,৯৪	২০,০২
রেজিষ্ট্রেশন		২৫,৪৮		৩৮,৪৯		১৯,৩৩	২৫,০০
তালিকাভুক্ত বিষয়				১৬,৯০		১৩,০৩	১৫,৯২
রাজকর	৬৮		৬৭		৬৭		

খ

	১৯২১-২২		১৯২৬-২৭		১৯৩১-৩২		১৯৩৬-৩৭
	কেন্দ্রীয়	প্রাদেশিক	কেন্দ্রীয়	প্রাদেশিক	কেন্দ্রীয়	প্রাদেশিক	প্রাদেশিক
			(হাজার টাকা)				
কোম্পানীর সাবসিডি		১,৬৮		১,২৪		৭৬	৪৯
জলসেচন		-২,০৬		৪৫		-২,৬৯	—৩,৫২
পয়ঃপ্রণালী		১,৮৭				২,৬৯	২,২৯
সুদ	১২,২২	৪,২৩	১০,০৫	৩,২৪	১০,৪৮	৪,৩০	৫,৮৫
বিচার বিভাগ		১১,৬২		১৪,৪৮		১৩,০৭	১২,৬১
জেল		১৪,৪২		১১,৭০		৯,২৫	৬,৬৩
পুলিশ		৩,৫৩		৫,৮৩		১৩,৮৬	৭,৮৩
পাইলট	১৩,৭২	২২	১৬,২৪	৪২	১৬,৯৫	৭৫	৯,০২
শিক্ষা		১০,৬৫		১২,৬০		১৩,৪১	১৪.৬২
মেডিক্যাল		৫,৪৫		৮,১৬		১০,২২	৯,১৮
স্বাস্থ্যবিভাগ		১০		৯৭		১,০৪	১,২৯
কৃষি		২,২৯		৩,৫৫		৫,৮৭	৬,৯০
শিল্প		১৫,৫০		৫,১৪		৭,১১	১১,৫০
বিবিধ	১,০৯	৫	৮০	১৯	৮৪	১৯	২২,৩৮

	১৯২১-২২		১৯২৬-২৭		১৯৩১-৩২		১৯৩৬-৩৭
	কেন্দ্রীয়	প্রাদেশিক	কেন্দ্রীয়	প্রাদেশিক	কেন্দ্রীয়	প্রাদেশিক	প্রাদেশিক
			(হাজার টাকা)				
কারেন্সি	১৩		১৫		১০		
এক্সচেঞ্জ	...	...	...	৫,৬৭	...		
পূর্তবিভাগ	...	...	১,০৩	...	২,৮৬	১৭,৩৬	২৬,৩৬
পেনশন	২,০৯	২,১১	১,৯৪	৯,১৭	১,৬৭	১,৪৮	১,২৭
ষ্টেশনারী	...	...	...	১,৭২	...	৪,৪৬	৪,৪৯
বিবিধ	১৫,৪৯	২,৩৩	২২	৯,২২	৭১	৭,৯৬	২৭,৮৫
কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত বিবিধ হিসাব নিকাশ							১,৭০,২৮
বিশেষ আয়							১,০০
ইংলণ্ডের আয়							১
	২৫,৩১,১৬	৮,৮৬,৫৭	২৮,৭০,২৬	১০,৪৯,৬২	২১,১৭,৪৮	৯,০০,৮২	
	৩৪,১৭,৭৩,০০০		৪০,৪৬,১৬,০০০		৩০,২৪,৯২,০০০		১১,৫০,৫৩

পরিশিষ্ট

বাঙলা দেশের সংক্ষিপ্ত আয়-ব্যয়

ছোটলাটের অধীন

বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা লইয়া প্রদেশ

বৎসর	আয়	ব্যয়	উদ্বৃত্তি বা ঘাটতি
১৮৮১ হইতে ১৮৯০ গড়ে	৪,৪১,৯৩	৪,৪৩,৩৫	—১,৪২
১৮৯০ হইতে ১৯০০ গড়ে	৪,৪৭,০৩	৪,৭৩,৮৯	—২৬,৮৬
১৯০৩-০৪	৬,৩৪,২০	৫,৪৬,৯৬	+৮৭,২৩
লাটের অধীন বঙ্গদেশ			
১৯১২-১৩	৭,১৬,১৫	৫,৭০,০৪	+১,৩৬,১১
মণ্টফোর্ড-শাসন প্রবর্তিত হইবার পর			
১৯২১-২২	৮,৩২,৪৪	১০,৪৭,৯০	−২,১৫,৪৬
১৯২৩-২৪	১০,১৩,১৬	৯,৭৭,৯৪	+৩৫,২১
১৯২৪-২৫	১০,৩৪,২৩	৯,৭৬,০১	+৫৮,২১
১৯২৫-২৬	১০,৯০,১৭	১০,৩০,৬৩	+৩৯,৫৩
১৯২৬-২৭	১০,৫০,০৬	১০,৭০,৯৪	−২০,৫৯
১৯২৭-২৮	১০,৮১,২৮	১০,৮৫,৫৬	−৪,২৭
১৯২৮-২৯	১০,৯৮,৬৭	১০,৯০,৪৬	+৮,২০
১৯২৯-৩০	১১,৩৫,৮৭	১১,৩৩,৬৩	+২,২৩
১৯৩০-৩১	৯,৬৬,২৬	১১,৪০,৭৯	−১,৭৪,৫২
১৯৩১-৩২	৯,০১,০৬	১১,০০,৫১	−১,৯৯,৪৫
১৯৩২-৩৩	৯,৩৮,০৩	১০,৬৭,৮২	−১,২৯,৭৮
১৯৩৩-৩৪	৯,০৫,৭৩	১০,৮১,৬৬	−১,৭৫,৯৩
১৯৩৪-৩৫			
১৯৩৫-৩৬	১১.০২.৩৩	১১.৭০.০৪	
নূতনতম শাসনের পর			
১৯৩৬-৩৭	১১,৫০,৫৩	১১,৯০,৭৭	

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বাঙলার সরকারী ব্যয়

বাঙলা দেশের আয় যেমন বাড়িয়াছে ব্যয়ও তেমনি বাড়িয়া চলিয়াছে, অথবা ব্যয় বৃদ্ধি হইতেছে বলিয়া গবর্মেণ্টকে নূতন নূতন আয়পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইতেছে। বঙ্গচ্ছেদ রদ হইবার পর (১৯১২) হইতে বাঙলা দেশের বর্তমান আয়তন হইয়াছে। ছোট লাটের বাঙলা দেশে বোম্বাই মান্দ্রাজের অনুকরণে গবর্ণর নিযুক্ত হইল; ইতিপূর্বে ১৯১০এ ৪ জন সদস্য লইয়া প্রথম অধ্যক্ষ-সভা গঠিত হইয়াছিল। তারপর ১৯২১ মণ্টফোর্ড-সংস্কার অনুসারে ব্যবস্থাপক সভা বড় হইল। তিনজন অধ্যক্ষ ছাড়া তিনজন মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন; সঙ্গে সঙ্গে প্রকাণ্ড দপ্তরখানায় কাজ বাড়িল। এই সব ব্যাপারের জন্য সাধারণ শাসন বিভাগের ব্যয় বাড়িয়াছে। তিন বা চারি জন মন্ত্রী ও অধ্যক্ষ-সভার তিন বা চারি জন সদস্যের প্রত্যেকের বেতন বার্ষিক ৬৪,০০০ৎ টাকা করিয়া; ছোট লাট হইতে বড়লাটের মাহিনা বেশী—১ লাখ হইতে ১ লাখ ২০ হাজার হইল; বেলভেডিয়ার হইতে গবর্মেণ্ট প্রাসাদের খরচ বেশী; ছুটিতে লাটের ও সদস্যদের বেতনও বেশী দিতে হয়; ইহার পর রাজনৈতিক অশান্তি নিবারণের অজুহাতে পুলিশ, পেয়াদা, জেল, অন্তরীণ প্রভৃতিতে খরচ অসম্ভব বাড়িয়াছে। আবার নূতন শাসন পরিবর্তনে খরচ বাড়িয়াছে; মন্ত্রীর সংখ্যা, মন্ত্রীদের সেক্রেটারীদের সংখ্যা, সদস্যদের সংখ্যা, বেতন, ভাতা প্রভৃতি বাবদ্ খরচ বাড়িয়া চলিয়াছে। আমরা পরিচ্ছেদ শেষে একটি তালিকায় কোন্ দফায় কি ভাবে খরচ বাড়িয়াছে, তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

বাঙলা দেশে যে-রাজস্ব আদায় হয় তাহার মোটা অংশ যায় ভারত সরকারের ধনভাণ্ডারে, অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা ১৯৩৬ পর্যন্ত অর্থাৎ নূতনতম শাসন প্রবর্তিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত দুইভাগে ভাগ হইত—রক্ষিত বা reserved এবং অর্পিত বা transferred বিষয়ের মধ্যে। অর্থাৎ যে বিষয়গুলি লাট

সাহেব ও অধ্যক্ষ-সভার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে, সেগুলির ব্যয়ের জন্য গবর্মেন্ট বাজেট হইতে টাকা পাইতেনই, ব্যবস্থাপক সভা তাহার নীতি, ঔচিত্য, প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারিতেন, কিন্তু বরাদ্দ বন্ধ বা কম করিতে পারিতেন না। হস্তান্তরিত বিষয়ের বাজেট সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভার গ্রহণ বা বর্জন বা ছাট্ করিবার অধিকার ছিল। ঘাট্‌তি পড়িলে তাহারা Scheduled বা তালিকাভুক্ত বিষয়ের উপর কর স্থাপন করিয়া আয় বাড়াইতে পারিতেন।

রিজার্ভ বা রক্ষিত বিষয়ের প্রধান ব্যয় ছিল (১) সাধারণ শাসন বিভাগ বা administration: লাট সাহেব ও তাঁহার কর্মচারীদের বেতন, অধ্যক্ষ-সভা ও মন্ত্রীদের বেতন, কমিশনর, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির মাহিনা ইহার অন্তর্গত; (২) বিচার বিভাগ (Administration of Justice) অর্থাৎ হাইকোর্ট ও অন্যান্য বিচারালয়ের ব্যয়; (৩) শান্তি ও শৃঙ্খলা (Peace and Order); ইহার অন্তর্গত হইতেছে পুলিশ, মিলিটারী পুলিশ, জেল, অন্তরীণ। মোট কথা, এই কয়টি বিভাগের জন্য ১৯৩৪-৩৫এ ১১·২৮ কোটি টাকার মধ্যে ব্যয় ৫·০৬ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়।

অর্পিত বিষয়গুলির ব্যবস্থা, পরিদর্শন, আদায়াদি ব্যাপারে প্রায় ৩ কোটি টাকা খরচ হইত; ইহাকেও সরকারী ব্যয়ের অন্তর্গত করা যায়। ফলে ১১ কোটি টাকার ৮ কোটি টাকা এইসব খাতে ব্যয়িত হইবার পর জাতীয় জীবনের উন্নতির জন্য অর্থাৎ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, কৃষি, শিল্প প্রভৃতির জন্য কোটি তিন টাকা মাত্র উদ্বৃত্ত থাকে।

বাঙলা দেশের আয়-ব্যয়ের ধারা কি ভাবে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহা এইখানে দেখা যাক ১৯১২-১৩এ বাঙলা সরকারের মোট রাজস্ব হয় ১৭·৮৩ কোটি টাকা; ইহার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেন ১০·৬৭ কোটি ও বাঙলার নিজস্ব ব্যয়ের জন্য থাকে ৭·১৬ কোটি টাকা। ইহার পর দশ বৎসরের মধ্যে মহাসমর হইয়া গেল; এবং যুদ্ধের পর ভারতে নূতন শাসন-সংস্কার প্রবর্তিত হইল। মণ্টফোর্ড-শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের ফলে শাসন কার্য জটিল, ব্যয়সাধ্য হইয়া উঠিল। বাঙলার আয় হইল ৩৪·১৫ কোটি টাকা; মোটা আয় সবই শুল্ক, আয়কর প্রভৃতি হইতে;

ফলে ২৫'৩১ কোটি টাকা গেল কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের অর্থভাণ্ডারে। বাঙলার হাতে থাকিল মাত্র ৮'৮৬ কোটি। মেষ্টনী বাঁটোয়ারা অনুসারে সমস্ত আয়জনক বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারকে অর্পণ করা হইয়াছিল এবং তদুপরি বাঙলাকে তাহার নিজস্ব আয় হইতে ৬৩ লক্ষ টাকা দিবার কথা হয়। এদিকে চারিজন মন্ত্রীর বেতন, তাঁহাদের দপ্তরখানার খরচ, বৃহত্তর ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের জন্য খরচ প্রভৃত বাড়িয়াছিল। সুতরাং নূতন শাসন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই রিট্রেঞ্চমেণ্ট কমিটি বা ব্যয়-সঙ্কোচন সমিতি বসিল। তাঁহাদের বিরাট চেষ্টায় যাহা হইল তাহা উল্লেখযোগ্য নহে, কারণ তাহার অধিকাংশই গবর্মেণ্টের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হইল না। নূতন শাসন ঘাটতি লইয়া সুরু হইল।

১৯২৬-২৭এ বাঙলার রাজস্ব চরমে উঠে, ৪০'৪৬ কোটি; ইহার মধ্যে বাঙলার নিজস্ব থাকিল ১০'৫ কোটি। ইহার পর আয় আর এত বাড়ে নাই; '২৬-২৭এর পর কমিতেই থাকে; মাঝে '২৯-৩০এ সামান্য বাড়িয়া পুনরায় কমিতে আরম্ভ করে, তখন পৃথিবীব্যাপী মন্দার বাজার চলিতেছে। ১৯৩১এ দেড় কোটি টাকা ঘাটতি হইল; পুনরায় ১৯৩২এ রিট্রেঞ্চমেণ্ট কমিটি বসিল। সরকারী কর্মচারীদের বেতন শতকরা ৫% কাটা হইল। এখানে সেখানে লোক ছাটাই করিয়া লোকের দুর্দশা ও বেকার সমস্যা বাড়ানো হইল—যথার্থ ব্যয় সঙ্কোচন হইল না। ১৯৩১এর শেষাশেষি Lord Eustace Percyর সভাপতিত্বে ফেডারেল ফিনান্স কমিটি বসিল; প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট সমূহের আর্থিক দুর্গতি দূর করিবার জন্য এই কমিটি বহু বিস্তৃত রিপোর্ট পেশ করেন। এই সময়ে বাঙলার পাট রপ্তানীর শুল্কের অর্ধেক বাঙলা সরকার পাইল।

১৯৩১-৩২এ বাঙলার আয় ছিল ৩০'২৪ কোটি, উহার মধ্যে কেন্দ্রকে প্রায় ১৯ কোটি দিয়া নিজের জন্য ১১'৮৬ কোটি অবশিষ্ট ছিল। ঐ ১১'৮৬ কোটি টাকা কি ভাবে খরচ হয়, তাহা দেখা যাক —

(১) সাধারণ শাসনকার্য—

লাট, লাটভবন, মন্ত্রী, কমিশনর,

প্রভৃতির খরচ ... ১,২৩,২৯,০০০

(২) বিচার বিভাগ (হাইকোর্টে প্রভৃতি)	...	১,০১,৬৮,০০০
(৩) পুলিশ	...	২,২০,৯৫,০০০
(৪) জেল	...	৩৬,৯১,০০০
(৫) সাহেবদের শিক্ষা	...	১৩,৩৮,০০০

অন্যান্য ছোটখাটো বিষয় লইয়া প্রায় ৫ কোটি। অর্পিত বিষয়ের মধ্যে শিক্ষার জন্য ১,২০,৪২,০০০৲, স্বাস্থ্যাদির জন্য ৮৯ লক্ষ টাকা খরচ হয়। বিস্তৃত হিসাব পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে।

এখন দেখা যাক্ বাঙলা দেশের সরকারী ব্যয় কিভাবে বাড়িয়াছে। ১৯০৫এর পূর্বে বাঙলা দেশ বলিতে বর্তমান বঙ্গদেশ, বিহার এবং উড়িষ্যা লইয়া একটি প্রদেশ বুঝাইত। সে-সময়ের জন-সংখ্যা ছিল ৮ কোটি এবং বাঙলা সরকারের ব্যয় ছিল ৫½ কোটি টাকা। ১৮৮১এ বাঙলার আয়তন ছিল ১,৯০ হাজার বর্গ মাইল, সরকারী ব্যয় ছিল গড়ে ৪,৪৩ কোটি (১৮৮০-৯০এর গড়), ১৮৯১এ ৪'৭৩ কোটি (গড়), ১৯০৩-০৪এ ৫'৪৬ কোটি। ইহার পর বঙ্গচ্ছেদ হয় এবং সাত বৎসর পর ১৯১২ এপ্রিল হইতে নূতন প্রদেশ গবর্ণরের তত্ত্বাবধানে আসে; বিহার-উড়িষ্যা বাদেই তখন খরচ দাঁড়ায় ৫'৭০ কোটি। কিন্তু মণ্টফোর্ড-সংস্কারের পর ১৯২১-২২এ খরচ বাড়িয়া হইল ১০'০৩ কোটি টাকা এবং সেই হইতে এই খরচ ১০।১১ কোটির কম হয় নাই। ১৯১২এ এক প্রদেশ দুই হইল, ১৯৩৬এ দুই প্রদেশ তিন হইল; অর্থাৎ ২৫ বৎসরের মধ্যে একটি প্রদেশের স্থানে তিন প্রদেশ হইয়াছে এবং প্রত্যেক প্রদেশের সম্মানের জন্য লাট, মন্ত্রী, দপ্তরখানা প্রভৃতি সর্বাঙ্গ-পূর্ণ আমলাতন্ত্রের আসবাব পত্র করিতে হইয়াছে; বর্তমান বাঙলার জন-সংখ্যার ও ব্যয়ের সহিত বিহার-উড়িষ্যার জন-সংখ্যাদি যোগ করিলে সংখ্যাগুলি কিরূপ দেখায় দেখা যাক।

		জন-সংখ্যা	আয়	ব্যয়
		কোটি	কোটি টাকা	কোটি টাকা
১৯০৩-০৪ বাঙলা বিহার উড়িষ্যা একত্র	...	৭'৮৪ (১৯০১)	৬'৩৪	৫'৪৬
১৯১২-১৩ বাঙলা দেশ	...	৪'৫০ (১৯১১)	৭'১৬	৫'৭০
,, বিহার-উড়িষ্যা	...	৩'৪৪ ,,		
		৭'৯৫		

১৯২১-২২ বাঙলা দেশ	...	৪'৬৬	৮'৮৬	১০'০৩
,, বিহার-উড়িষ্যা	...	৩'৪০	৪'৪২	৪'৫৭
		৮'০৬	১৩'১৮	১৪'৬০
১৯৩১-৩২ বাঙলা	...	৫'০১	৯'০০	১১'০০
,, বিহার-উড়িষ্যা	...	৩'৭৬	৫'১৫	৫'৫০
		৮'৭৭	১৪'১৫	১৬'৫০

উপরি উক্ত তালিকা একটু ধীরভাবে দেখিলেই পাঠক বুঝিবেন যে, ত্রিশ বৎসরে বঙ্গ ও বিহার-উড়িষ্যার সমবেত জন-সংখ্যা ৯৩ লক্ষ বাড়িয়াছে। ১৯০৩-০৪এ আয় ছিল ৬'৩৪ কোটি টাকা; ১৯৩৩-৩৪ বঙ্গদেশ ও বিহার-উড়িষ্যার সমবেত আয় ১৪'১৫ কোটি; ঐসময়ে ব্যয় উভয় প্রদেশে ৫'৪৬ কোটি টাকা হইতে ১৫'৮৫ কোটি টাকা হইয়াছে, অর্থাৎ ৩০ বৎসরের মধ্যে ব্যয় ১০'৩৯ কোটি বাড়িয়াছে অর্থাৎ প্রায় তিনগুণ হইয়াছে।

ব্যয়ের কোঠাগুলি আর একটু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখিতে গেলেই চোখে পড়িবে সাধারণ শাসন (General Administration) ও পুলিশের ব্যয় বৃদ্ধি। সাধারণ শাসন বলিতে বুঝায় লাট সাহেব ও সিভিলিয়ান্, মন্ত্রী প্রভৃতিদের বেতন, ভাতা ইত্যাদি বাবদ্ ব্যয়।

১৮৮১-১৮৯০ সালের মধ্যে গড়ে যেখানে শাসনবিভাগের ব্যয় ছিল ১৫'৫২ লক্ষ টাকা ১৯০৩এ সেখানে হয় ১৯'০৫ লক্ষ। নূতন লাট প্রভৃতির বেতন ইত্যাদি বৃদ্ধি, অধ্যক্ষ-সভার সৃষ্টি হেতু ১৯১২-১৩এ ২৫'১৭ লক্ষ দাঁড়াইল। কিন্তু মণ্টফোর্ড শাসন প্রবর্তিত হইলে ব্যয় বাড়িয়া ১৯২১এ ১ কোটি ৭ লক্ষ হইল। ১৯৩০-৩১এ ১ কোটি ২৩ লক্ষ হইল! এইভাবে ৫০ বৎসরের মধ্যে সাড়ে পনের লক্ষর স্থানে সওয়া কোটি হইয়াছে।

বিচার বিভাগের ব্যয় ১৯১২-১৩ ছিল ৯৬'৪৩ লক্ষ টাকা; বিশ বৎসর পরে ১৯৩১-৩২এ ১ কোটি ১ লক্ষ হয়; এ বৃদ্ধি তেমন কিছু নয়। কিন্তু সব থেকে বাড়িয়াছে পুলিশ বিভাগের ব্যয় ১৯১২এ যেখানে ছিল ৮৩'৬০ লক্ষ, ১৯৩১-৩২এ হইল ২ কোটি ২০'৯৫ লক্ষ। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ছিল ৩৭'৪ লক্ষ টাকা মাত্র। (দ্রষ্টব্য পৃঃ ২৪৫-৬)

এইরূপ নানাভাবে বাঙলার ব্যয় বাড়িয়া চলিয়াছে; ব্যয় বহন করা লোকের পক্ষে ক্রমেই দুঃসাধ্য হইয়া উঠিলেও গবর্মেণ্ট নূতন নূতন করভার চাপাইবার কথা ভাবিতেছেন এবং নূতন কর চাপাইবার অস্ত্রসমূহ তাঁহাদের হাত হইতে এখনো নিঃশেষিত হয় নাই।

পরিশিষ্ট ১

বাঙলা সরকারের ব্যয়

	অখণ্ড বাঙলা			গবর্ণর-শাসিত বাংলা		
	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১২	১৯২১	১৯৩১
				(কোটি)		
জন-সংখ্যা	৬.৯৫	৭.৪৬	৭ ৮৪	৪.৫০	৪.৬০	৫.০১

(লক্ষ টাকা)

	১৮৮১-১৮৯০ গড়ে	১৮৯১-১৯০০ গড়ে	১৯০৩-০৪	১৯১২-১৩	১৯২১	১৯৩১	১৯৩৬-৩৭
সাধারণ শাসন	১৫.৫১	১৬.৯৯	১৯.০৫	১৫.১৪	১,০৭,১০	১,২৩,২৯	১,৩৭,২০
বিচার বিভাগ }	৯৪.০৬	১,১০.২২	১,২৩.৮২	৯৬.৪৩	১,০৫,২৩	১,০১,৬৮	৯৬,২৪
জেল বিভাগ }				১৯.৬২	৩৭,১৩	৩৬.৯১	৪৩,৮০
পুলিশ	৪৬.৩৭	৫৯.৮৬	৬৫.৭২	৮৩.৬০	১,৮৯,৯৬	২,২০.৯৫	২,৩৩৪৯
পাইলট				১২.১৩	১,৩৩	৪,৩২	৪;৭০

(লক্ষ টাকা)

	১৮৮১-১৮৯০ গড়ে	১৮৯১-১৯০০ গড়ে	১৯০৩-০৪	১৯১২-১৩	১৯২১-২২	১৯৩১-৩২	১৯৩৬-৩৭
বিবিধ, পেনশন				২৯,২৬	৪৩,৮৭	৪৯,৪৮ / ৬,২২	
রাজস্ব আদায়ের ব্যয়—							
ভূমিরাজস্ব	৪৯·৯৮ (ভূমিরাজস্ব, আবগারী, ষ্ট্যাম্প, বনভূমি, রেজিষ্ট্রেশন একত্রে)	৬১·৫৫	৬৯·০৩	৩৩·৪৮	৩৫·৯২	৪১·২৪	
আবগারী				৫·৯৮	১৫·২৯	১৯·৫৫	
ষ্ট্যাম্প				৩·৫৪	৭·১৭	৪·১০	
বনভূমি				৬·৬১	১২·০৮	১৪·৯৭	
রেজিষ্ট্রেশন				১০·৫১	১৫·৬২	১৮·৯৪	
জল সেচন	৪১·৬৭ (জল সেচন ও পয়োপ্রণালী একত্রে)	৫২·৯৯	৫২·৩৭	১০·৯৪	১৩·৯৫	১০·৫৯	
পয়োপ্রণালী					১১·৫৭	২০	
শিক্ষা	২৮·৯৩	২৬·৫৫	৩৪·৪২	৭৩·৫৯	১,১৮,৭২	১,২০,৪২ / ১৩,৩৮ য়ুরোপীদের	১,১৮,৮২ / ১২,২২

চিকিৎসা	১৩'৭৪	১৮'৩৩	২১'৪৮	২৬'৪২	৪৯'৪৯	৫১'৫২	৪৯,৯২
স্বাস্থ্য					১৫'৩০	৩৮'২৪	৩৬,৭৮
বৈজ্ঞানিক					১৬	৩৪	৩০
কৃষিবিভাগ				১৬'৬২	২০'২৪	২৫'৩৮	২৫,৬৫
শিল্প					১০'৯৩	১১'৫৯	১৪,৫০
বিবিধ					১'৯৯	২'২৭	৪,৩১
দুর্ভিক্ষ	'৩২	৪'৯৪				২'৩৩	২,০০
নিবারণ						১'১২	
পূর্তকার্য	৪২'৮৭	৩৩'৬৭	৭৬'০৫	৮৯'৯৫	১,৫০,০০	৮৮'৪৪	১,০৫,৯২
ষ্টেশনারী	৬৪'৭৩	৪২'৪৪	২৫'৪৯	১৩'৩৪	২৪'১১	২০'৯৩	১৯,২৫
বিবিধ					৮'৪৩	১০'৩৮	২৩,০৬

ছোট ছোট কয়েকটি বিষয় বাদ দেওয়া হইল

মোট ব্যয়	৪,৪৩'৩৫	৪,৭৩'৮৯	৫,৪৬'৯৭	৫,৭২'০৪	১০,০৩'১৭	১১,০০'৫২	১১,৯০,৭৭

পরিশিষ্ট ২

বঙ্গদেশের সাধারণ শাসনবিভাগের ব্যয়

১৯৩০-৩১

		টাকা
ক। বেতন ও অন্যান্য ব্যয়		
১। লাট সাহেব	...	১,২০,০০০
২। ভাতা	...	২৫,০০০
৩। লাট সাহেবের প্রাসাদ প্রভৃতির ব্যয়	...	৫,৩৫,০০০
৪। বিলাত হইতে সর্তবদ্ধভাবে আনিবার দরুণ ব্যয়	...	১,০৯,০০০
৫। ভ্রমণ ব্যয়	...	১,০৪,০০০
মোট লাটের জন্য খরচ		৮,৯৫,০০০
৬। অধ্যক্ষ সভার সদস্য	...	২,৮৭,০০০
৭। মন্ত্রী	...	২,০২,০০০
খ। ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের জন্য ব্যয়	...	২,৬০,০০০
গ। সেক্রেটারিয়েট	...	১৫,৬১,০০০
মন্ত্রীদের দপ্তর	...	৩,৭১,০০০
ঘ। কমিশনার সাহেবদের জন্য ব্যয়	...	৪,৩৯
ঙ। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, মহকুমা ইত্যাদি	...	৮৪,১৮,০০০
চ। বিবিধ	...	৭৪,০০০
মোট	...	১,১৯,৩৫,০০০
ইংল্যাণ্ডের ব্যয়	...	৭,১৪,০০০ + ২৮,০০০ অর্পিত
এক্সচেঞ্জ	...	৮,০০০ + ৩৬৫ ...
		১,৩২,৬৩,০০০
হস্তান্তরিত বিষয়ের জন্য ব্যয়	...	৬,০৩,০০০

পরিশিষ্ট ৩

সাধারণ শাসন বিভাগের ব্যয়

১৯২১-২২	...	১,১২,৬৮,০০০ মন্ত্রীদের জন্য ব্যয়
১৯২৪-২৫	...	১,১২,২৩,০০০ + ৩,৮৪,৯৩৪ = ১,১৬,০৮,৬০০৲
১৯২৭-২৮	...	১,২০,০৬,০০০ + ৫,০৩,৮০০ = ১,২৫,০৯,০০০৲
১৯২৯-৩০	...	১,২৬,৬৭,০০০ + ৪,৩৯,৪৯৬ = ১,৩১,০৭,০০০৲
১৯৩০-৩১	...	১,২৬,৫৯,০০০ + ৬,০৩,৭৪৫ = ১,৩২,৬৩,০০০৲
১৯৩৩-৩৪	...	১,১৭,১৪,০০০ + ৫,২৯,০০০ = ১,২২,৪৪,০০০৲

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কৃষি ও বাণিজ্য

ভারতের তুলনামূলক কৃষি

ভারতের মোট আয়তন ১,৮২৪,০০০ বর্গ মাইল বা ১,১৬৭,০৮১,০০০ একর ; সমগ্র ভারতের জন-সংখ্যা ১৯৩১ সালে এপ্রিল মাসে ছিল ৩৫ কোটি ২৭ লক্ষ। ইহার মধ্যে—

		একর (হাজার)	জন-সংখ্যা (হাজার)
১।	বৃটিশ শাসিত প্রদেশগুলির বর্গফল	৭,৪৫,৫২৫	২,৮৬,৯৯৩
২।	দেশীয় রাজ্য (খাশ ভারত গবর্মেণ্টের তত্ত্বাবধানে	৩,৬০,৬১২	৬৪,১৯৮
৩।	উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ	১৬,২৩৯	২,১০২
৪।	বৃটিশ বেলুচিস্থান	৩৪,৭০৬	৪৬৪
	মোট একর	১১,৬৭,০৮১,০০০	৩,৫২,৭৫৭,০০০

বৃটিশ প্রদেশের ৭৪·৫৫ কোটি একরের মধ্যে ৭,৬১,৭৯,০০০ একর প্রাদেশিক গবর্মেণ্টের তত্ত্বাবধানস্থ দেশীয় রাজ্য। সেগুলির জন-সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। এই শ্রেণীর দুইটি রাজ্য বাঙলা দেশে আছে—কুচবিহার ও ত্রিপুরা।

প্রাদেশিক গবর্মেণ্টের এলাকাধীন দেশীয় রাজ্যগুলির আয়তন বাদ দিলে বৃটিশ ভারতের মোট আয়তন হয় ৬৬,৯৩,৪৫ হাজার একর ; গ্রাম্য সার্ভের হিসাবে হয় ৬৬,৭৫,২২ হাজার।

এই ৬৬ কোটি ৭৫ লক্ষ একর বৃটিশ ভারতের মধ্যে

		(হাজার একর)	শতকরা
বন	···	৮,৭৯,৬২	১৩·২%
চাষের অনুপাত	···	১০,৬৮,১০	২২·২%

		(হাজার একর)	শতকরা
অনাবাদী জমি	...	১৫,৪০,১৭	২৩.১%
চাষের পতিত জমি	...	৪,৯৬,১৮	. ৭.৪%
চাষের জমি	...	২২,৯১,১৫	৩৪.৩%

দেখা যাইতেছে বৃটিশ শাসিত ভারতের মাত্র ৩৪.৩% বা একতৃতীয় অংশ জমিতে ১৯৩০-৩১ সালে চাষ হয়। যদি দো-জমি অর্থাৎ যে জমিতে বছরে একাধিক চাষ হয়, সে অঙ্ক ধরা যায়, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে ঐ বৎসরে ২৬ কোটি ১৯ লক্ষ একর জমিতে চাষ হয়।

এই ৩৪% ভাগ চষা জমির কত অংশ কোন প্রদেশে চাষ হয়, তাহা এইবার দেখা যাক।

		সমগ্র জমির কত অংশ চাষ হয়	প্রতি একশত চষা জমিতে কত লোক নির্ভর করে
দিল্লী	...	৫৬%	৩০৭
যুক্তপ্রদেশ	...	৫২%	১৩৬
বঙ্গদেশ	...	৪৮%	২১৪
বিহার-উড়িষ্যা	...	৪৬%	১৫৪
পাঞ্জাব	...	৪৪%	৮৮
বোম্বাই	...	৪১%	৬৭
মধ্যপ্রদেশ	...	৪০%	৬১
মাদ্রাজ	...	৩৮%	১৩৭
উ-পঃ সীমান্ত প্রদেশ	...	২৪%	১২৫
মানপুর পরগণা	...	২৩%	৯৫
আজমীড়	...	১৮%	১৭৫
আসাম	...	১৭%	১৪৪
কুর্গ	...	১৪%	১১৮
বর্মা	...	২২%	৮১
বৃটিশ ভারত		৩৪%	১১৮ জন

বাঙলার মোট জমির প্রায় অর্ধেক (৪৮%) জমিতে চাষ হয় এবং এই জমির উপর নির্ভর প্রতি এক শ' একরে ২১৪ জন লোকের। কোনো প্রদেশে চাষের উপর এত লোক নির্ভর করে না।

বৃটিশ ভারতে বনভূমি ৮ কোটি ৮০ লক্ষ একর; ইহার মধ্যে শতকরা ২৪% বর্মায়, ১৯% মধ্যপ্রদেশে, ১৫% মাদ্রাজে, ১৪% বাঙলায়, ১১% যুক্তপ্রদেশে, ১০% বোম্বাইতে ও অবশিষ্ট ৭% অন্যান্য প্রদেশে।

কৃষির প্রাণ হইতেছে জল-সেচনের ব্যবস্থা। বৃটিশ ভারতের ১৯৩০-৩১ সালে মোট ২২.৯১ লক্ষ একর চাষের জমির মধ্যে মাত্র ৪.৯৭ কোটি একর জমিতে জল সেচন হইত; অর্থাৎ ১৮ কোটি একরের জল সেচন ব্যবস্থা ছিল না। ইহার মধ্যে ২,২১,৭০ হাজার একর জমি গবর্মেণ্ট খাল হইতে, ৩৭,১৬ হাজার একর বেসরকারী খাল হইতে, ১,১৭,৪৫ হাজার একর জমি কূপের জল হইতে, ৬৭,৭৫ হাজার পুকুর হইতে, ৫৩,১১ হাজার একর অন্যভাবে সিঞ্চিত হইয়াছিল। অনেক ক্ষেত্রেই এই সেচ নামে মাত্র হয়। ১৯৩০-৩১ সালে সমগ্র ভারতকে ১০০ ধরিলে পাঞ্জাব ৩০%, সংযুক্ত প্রদেশ ২১%, মাদ্রাজ ১৮%, বিহার-উড়িষ্যা ১১%, বোম্বাই ৮%, অপর দশটি প্রদেশ ১২% জল সেচন পাইয়াছিল। এখন দেখা যাক্ ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশের কতখানি চষা জমির কত অংশে জল সেচন হয়।

পাঞ্জাব	...	৫৬%
উ-প-সীমান্ত প্রদেশ	...	৪৭%
আজমীড়	...	৪৪%
দিল্লী	...	৩২%
সংযুক্ত প্রদেশ	...	২৯%
মাদ্রাজ	...	২৭%
বিহার-উড়িষ্যা	...	২১%
বোম্বাই	...	১৩%
আসাম	...	১০%
বর্মা	...	৮%
বঙ্গদেশ	...	৭%

মধ্যপ্রদেশ	...	৪%
কুর্গ	...	৩%
সানপুর পরগণা	...	১%

সেচ পাওয়া চাষজমির শতকরা ৮৫% ভাগ জমিতে খাদ্যশস্য, অবশিষ্ট জমিতে অন্যান্য ফসল উৎপন্ন হয়।

বাঙলা দেশের চষা জমির মাত্র ৭% ভাগ জমিতে জল সেচনের ব্যবস্থা আছে। এক পূর্ববঙ্গ ও সুন্দর বন ছাড়া বাঙলার প্রত্যেক জেলাতেই উপযুক্ত জল সরবরাহের ব্যবস্থা থাকিলে কৃষির উৎপন্ন অনেক বাড়িবে, সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। বাঙালা দেশে বৃষ্টির জল বা নদীর জলের অভাব নাই,— প্রয়োজন হইয়াছে ইহাকে সুনিয়ন্ত্রিত করা। বন্যার জন্য যে ক্ষতি হয়, সে সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

জলসেচনের সুব্যবস্থা না থাকিলে কৃষিকার্য ভাল হইতে পারে না। বহুবৎসর ভারত সরকার এ বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। তারপর তাঁহারা সবিশেষ মনোযোগ সহকারে ভারতের নানা স্থানে পয়ঃপ্রণালী খননের সুব্যবস্থা করিয়াছেন; পঞ্জাবে মণ্ডীপাল ব্যবস্থা, সিন্ধুদেশের সক্কর বরাজ, মাদ্রাজে মেতুর বাঁধ প্রভৃতির পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা ইঞ্জিনিয়ারিং দিক্ হইতে বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। এ জন্য গবর্মেণ্ট ১৯৩১ সাল পর্যন্ত ১৩৬ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন। গবর্মেণ্টের ইহাতে লোকসান হয় নাই; তাঁহারা যে টাকা দিয়াছেন, তাহা হইতে শতকরা ৫।৭৲ টাকা করিয়া সুদ বরাবর পাইতেছেন; রেলওয়েতে এমনভাবে আয় বরাবর হয় নাই।

কিন্তু তাঁহারা এত যে টাকা ব্যয় করিয়াছেন, তাহার অতি সামান্য অংশই বাঙলা দেশে ব্যয়িত হইয়াছে। ১৯৩৩-৩৪ পর্যন্ত ১৪৮ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ভারত সাম্রাজ্যের নানা প্রদেশে জল সেচনের জন্য ব্যয়িত হইয়াছে। কোন্ প্রদেশে কত টাকা খরচ হইয়াছে তাহা নিম্নের তালিকায় প্রদত্ত হইল।*

	জলসেচন	লোকসানী খাল	শতকরা লাভ
পঞ্জাব	৩৩·৭০ কোটি	৫৯ লক্ষ	১৪·৪২%
বোম্বাই	২৬·৬৩ ,,	১৩,১৩ ,,	১·৭

* Statistical Abstract, 13th issue, 1936, No. 293

	জলসেচন	লোকসানী খাল	শতকরা লাভ
যুক্তপ্রদেশ	২২·১৮ ,,	৩,৭১ ,,	৫·২৬
মাদ্রাজ	১৪·৭০ কোটি	৪,৩৭ লক্ষ	৬·৯২
বর্মা	২·০৬ ,,	১,৯৯ ,,	৬·৪০
বঙ্গদেশ	**৯·৯০** ,,	**৮৪** ,, ৬০ হাজার টাকা লোকসান	
মধ্য প্রদেশ		৬,৮৩ ,,	
বিহার-উড়িষ্যা		৬,২৭ ,,	
সীমান্ত প্রদেশ	·৭৫ ,,	২,২০ ,,	৭·৪২%
রাজপুতানা		৩৫,৬ ,,	
বেলুচিস্থান		৩৫,৭ ,,	
	১০১,১৩,৯৪,০০০	৪০,৬৮,৪৭,০০০	
অন্যান্য খাল	১,০২,৫৪,০০০	৫,৫২,৭৩,০০০	
	১০২,৫৪,৩৯,০০০	৪৬,২১,২০,০০০	

এ পর্যন্ত জলসেচনের জন্য ১৪৮ কোটি টাকা ভারত গবর্মেণ্ট ব্যয় করিয়াছেন, কিন্তু বাঙলার ভাগ্যে পড়িয়াছে মাত্র ১ কোটি ৯৪ লক্ষ। বাঙলার সমস্যা—জলসেচনের জন্য পয়ঃপ্রণালী খননের পর উদ্বৃত্ত জলরাশি নিষ্কাষণের জন্য নদীপথ ঝালাই করা এবং বাঙলার অসংখ্য পুষ্করিণী, ডোবা ও বিলের পঙ্কোদ্ধার করিয়া উদ্বৃত্ত জলরাশি সঞ্চিত করা।

ভারতের ৩·০২ কোটি একর জমিতে জল সেচন পায় এবং তাহার আয় ১৪ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা। বাঙলা দেশে ৪৭ হাজার একর জমিতে সেচ হয়। আয় ১,৭২,০০০ টাকা, একর প্রতি গড়ে আয় ৩·৬৩ টাকা।

আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি বৃটিশ ভারতে ১৯৩০-৩১ সালে ২৬,১৯,১৩০০০ একর জমিতে চাষ হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ২১,৩৪,৪৬০০০ একর জমিতে খাদ্যশস্য ও ৪,৮০,৬৭,০০০ একর জমিতে অন্যান্য ফসল জন্মিয়াছিল। অর্থাৎ যথাক্রমে ৮১·৬ ও ১৮·৪% ।

খাদ্যশস্যের চাষ জমি

বৃটিশ ভারত	(হাজার একর)	শতকরা
খাদ্য ফসল	২০,২৭,৩৬	৭৭'৪
মশলাপাতি	১৩,৭০	০'৫
আখ ও চিনি	২৮,৬৯	১'১
ফলমূল তরকারী	৫১,৪৭	২'০
অন্যান্য	১৭,২৪	০'৬
	মোট খাদ্যশস্য	৮১'৬

অন্যান্য ফসলের চাষ জমি

	হাজার একর	
তৈল বীজ	১৬,৪৫৮	৬'৩
আঁশান (পাট)	১৮,৩২২	৭'০
রঙ ও চামড়ার কাজ	৬৪৩	০'২
ঔষধ, নেশা	২২,৭৪	৩'৬
গো-খাদ্য ফসল	৯৩,০০	৩'৬
	বিবিধ	০'৪
	মোট অন্য ফসল	১৮'৪

কিন্তু ১৯৩৪-৩৫এ খাদ্য শস্য ৮২'১% ও অন্যান্য ফসল ১৭'৯% হইয়াছে দেখা যায়।

সমগ্র বৃটিশ ভারতে খাদ্য ফসল উৎপন্ন হয় ২১ কোটি ৩৮ লক্ষ একর জমিতে। ইহার মধ্যে ১৯৩০-৩১ সালে ২০,২৭,৩৬,০০০ একর জমিতে খাদ্য-শস্যের চাষ হয়। দশ বৎসর পূর্বে ১৯২১এ বৃটিশ ভারতে খাদ্য শস্যের চাষ ছিল ২০,৪৭,৯০ হাজার একর অর্থাৎ দশ বৎসরে ২০ লক্ষ একর খাদ্য-শস্যের জমি কমিয়াছিল। প্রত্যেকটি খাদ্য-শস্য কি ভাবে হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

একর (হাজার)

	১৯২১-২২	১৯৩০-৩১	১৯৩৪-৩৫
ধান	৭৯,৬৯৯	৮০,৬৩১	৭৯,৫২০
গম	২২,৪০৩	২৪,৭৯৭	২৫,৬৫৫
যব	৭,৩৫৬	৬,৬৯২	৬,৫৪৮
জোয়ার	২৪,২১৪	২২,৮০৮	২১,৮৫৩
বাজরা	১৫,৯০০	১৩,৬৯৮	১৩,১০২
রাগি	৪,২১১	৩,৯৭২	৩,৭৩৮
ভুট্টা	৬,৩৩৪	৬,৪১৭	৬,১৮১
ছোলা	১৫,০৫৪	১৩,৬৪৩	১৩,৭৩২
অন্যান্য খাদ্য	২৯,৬১৫	৩০,০৩২	৩০,২৬৩
	২০,৪৭,৯০,০০০	২০,২৭,৩৫,০০০	২০,০৬,৩৫,০০০*

খাদ্য-শস্যের চাষে সংযুক্ত-প্রদেশ ১৯% ভাগ, মাদ্রাজ ১৫% ভাগ, বোম্বাই ও বিহার-উড়িষ্যা ১২% করিয়া, বাঙলা ও পঞ্জাব ১১% ভাগ করিয়া, মধ্য প্রদেশ ১০% ভাগ ও অন্যান্য প্রদেশগুলি অবশিষ্ট ১১% ভাগ পূর্ণ করিয়াছে। উপরের তালিকা হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, খাদ্য-শস্যের পরিমাণ ও একর হ্রাস পাইতেছে; কিন্তু পাট বাড়িয়া ১৯২১ সালের ১৫ লক্ষ একর হইতে ১৯২৬ সালে ৩৬ লক্ষ একরে দাঁড়ায়; পরে কমিয়াও ১৯৩০-৩১ সালে ৩৪ লক্ষ একর ছিল। খাদ্য-শস্যের উৎপন্ন কমিতেছে বলিয়া ভারতবর্ষকে ক্রমশই বর্মা, শ্যাম প্রভৃতি দেশের চালের উপর ও গমের জন্য অষ্ট্রেলিয়ার উপর নির্ভর করিতে হইতেছে।

বৃটিশ ভারতে ১৯৩০-৩১ মোট চষা জমির ৬·৩% ভাগ মাত্র জমিতে তৈলবীজ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ ১,৬৪,৫৮ হাজার একর।† ১৯২০ সালে ছিল ১,৪১,৯৬ হাজার একর। ১৯৩০-৩১ সালে মাদ্রাজ ৩৪% ভাগ, বর্মা ও মধ্য-

*Agricultural Statistics of India, 1934-35, Vol. I, 51st Issue P. V.

† ১৯৩৪-৩৫এ ১,৪৫,৪২,০০০ একর।

প্রদেশ ১২% ভাগ করিয়া, বোম্বাই, বিহার-উড়িষ্যা ১১% ভাগ। বঙ্গদেশ ৭% ভাগ, পঞ্জাব ও সংযুক্ত প্রদেশ ৬%, অবশিষ্ট অন্য প্রদেশ ৩% ভাগ তৈলবীজ উৎপন্ন করিত।

মশলাপাতি মাদ্রাজ প্রদেশেই বেশির ভাগ হয়; অন্যান্য প্রদেশে যাহা হয় তাহা নগণ্য।

১৯৩০-৩১ বৃটিশ ভারতে গুড় উৎপন্ন হয় ২৮ লক্ষ ৬৯ হাজার একর জমিতে; ইহার মধ্যে ২৭ লক্ষ একর জমিতে আখ হইত; কিন্তু পাঁচ বৎসরে ইক্ষুক্ষেত্র বাড়িয়া ৩৩'৫৭ লক্ষ একর হইয়াছে। ১৯৩৫-৩৬এ ৪০ লক্ষ একর হয়। ১৯২০-২১ সালে সমগ্র বৃটিশ ভারতে ২৫ লক্ষ ২২ হাজার একর জমিতে চাষ হইয়াছিল; দশ বৎসরে ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার একর চাষ বাড়িয়াছিল। ১৯৩০-৩১ সালে মোট গুড়ের জমির ৫৫% সংযুক্ত প্রদেশে, ১৬% পাঞ্জাবে, ১০% ভাগ বিহার-উড়িষ্যায়, ৭% ভাগ বঙ্গদেশে, ৫% মাদ্রাজ প্রদেশে ছিল। তাল ও খেজুর গাছ হইতে গুড় হয়; ইহার ৫৫% মাদ্রাজে ও ৩২% বাঙলাদেশে উৎপন্ন হয়; অন্যান্য প্রদেশে মাত্র ১৩% খেজুর গুড় হয়। মাদ্রাজে তালের রস হইতে গুড় হয়। বৃটিশ ভারতে মোট গুড় ১৯২১-২২ সালে উৎপন্ন হয় ২৬,১৪,০০০ টন ও ১৯৩০-৩১ সালে হয় ৩২,২৮,০০০ টন।

১৯৩৪-৩৫ সালে আঁশাল উদ্ভিজ উৎপন্ন হয় ১,৮৩,২২ হাজার একরে। ইহার মধ্যে প্রধান হইতেছে তুলা ও পাট। তুলার চাষ ১৯২০-২১ সালে ছিল ১,১৬,৬৫ হাজার একর; ১৯২৫-২৬ সালে ১,৮১,৮৬ হাজার একর পর্যন্ত উঠে; ১৯২৯-৩০ সালে ১,৬১,৪১ হাজার ছিল, ১৯৩৪-৩৫ সালে ১,৪৪,৮৪,০০ একর হয়। মোট তুলা ক্ষেত্রের বর্গফলের ৩৩% মধ্যপ্রদেশে, ২৭% বোম্বাইতে, ১৫% পঞ্জাবে, ১৪% মাদ্রাজে, ৬% সংযুক্ত প্রদেশে চাষ হয়। বাঙলায় তুলার চাষ নগণ্য; বাঙলার বিশেষত্ব তাহার পাট। মোট পাটের জমির ৮৯% বাঙলায়; অবশিষ্ট বাঙলার সংলগ্ন আসাম ও বিহার-উড়িষ্যার কয়েকটি জেলায় হয়। ১৯২১-২২এ ১৫,০৫,৫২৭ একর জমিতে ও ১৯৩০-৩১এ ৩৪,০২,১৫৮ একর জমিতে চাষ হয়; ১৯২৬-২৭এ ৩৬ লক্ষ একর উঠিয়াছিল। চাষ নিয়ন্ত্রণের ফলে ১৯৩৪-৩৫ সালে ২৪,৭৬,১৬৯ একর হয়।

রঙ ও চামড়ার কশজাতীয় উদ্ভিদের চাষ হইয়াছিল ৬,৪৩,০০০ একর জমিতে। ইহার মধ্যে ৬৪,০০০ একর ছিল নীল; এই নীলের চাষ ১৯২০-২১ সালেও ভারতে ছিল ৩২৮,৮২৯ একর জমিতে। ১৯৩৪-৩৫ এ মাত্র ৬০,৩২০ একর দাঁড়ায়। বর্তমানে বাঙলাদেশে নীলের চাষ নাই; সমগ্র নীল চাষের ৭৩% মাদ্রাজে হয়; পঞ্জাবে ১৪%, বিহার-উড়িষ্যা ৭%, সংযুক্ত প্রদেশে ৫%। অন্যান্য রঙের চাষ হয় ৫,৭৯,০০০ একরে। বাঙলায় কোন কশায়িন উদ্ভিজ্জের চাষ নাই। এককালে নীলের চাষ হইতে বাঙলার চাষীদের বেশ পয়সা হইত।

নেশার সামগ্রীর চাষ হয় ২২,৭৪,০০০ একরে; কোন্‌টি কিভাবে বাড়িয়াছে বা কমিয়াছে তাহা দেখা যাক্‌ঃ—

	১৯২১-২২	১৯৩০-৩১	১৯৩৪-৩৫
	একর	একর	একর
আফিম	১,২২,৮৮৮	৪২,৫৬২	৯,৪৬৯
কফি	৯৬,৬১১	৯,২৬,৩৪৯	৯৬,০৪৭
চা	৭,১৩,৩৭৯	৭,৭৪,৬৮৩	৭,৮২,৯৭০
তামাক	১০,৫০,৬৮৫	১১,১২,১৮৩	১২,৫৬,৮৫৫
অন্যান্য		২,৫২,০০০	২,৬৩,৭৮১

অন্যত্র এইসব উৎপন্ন সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা হইয়াছে।

ভারতবর্ষে গোরুর খাদ্য বিশেষভাবে উৎপন্ন করা প্রায়ই হয় না। ওট, গিনি ঘাস প্রভৃতি কিছু কিছু হয়। মোট ১৯৩০-৩১এ '৯৩ লক্ষ একরে, ১৯৩৪-৩৫এ ১'০৩ কোটি একরে গো-খাদ্য ফসল বোনা হয়।

ভারতবর্ষের কৃষি নির্ভর করে গোরু-মহিষের উপর। সমস্ত বৃটীশ ভারতে ১৫,৩০ লক্ষ গো-মহিষ, ৬,১০ লক্ষ ছাগল-ভেড়া, অন্যান্য পশু ৩৬ লক্ষ ছিল। ইহার মধ্যে সংযুক্ত প্রদেশে ২১%, বাঙলাদেশে ১৬%, মাদ্রাজে ১৫%, বিহার-উড়িষ্যায় ১৪%, পঞ্জাবে ৯%, মধ্যপ্রদেশ ও বোম্বাইতে ৮% করিয়া ও অবশিষ্ট স্থানে ৯% ভাগ। ছাগল-ভেড়া মাদ্রাজেই বেশী, শতকরা ৩৩% সেখানে; বাঙলাদেশে মাত্র ১০% ভাগ।

কোন্ প্রদেশে প্রতি একশ' একরকরা ও একশ' লোককরা কত পশু আছে তাহার একটা তালিকা দেওয়া যাক্—

প্রদেশ	পশুর সংখ্যা একশত চষা-জমি প্রতি	পশুর সংখ্যা একশত বাসিন্দা প্রতি		পশুর সংখ্যা একশত চষা-জমি প্রতি	পশুর সংখ্যা একশত বাসিন্দা প্রতি
আজমীড়	১৪০	৮০	কুর্গ	১০১	৮৫
আসাম	৯৫	৬৬	দিল্লী	৬১	২০
বঙ্গদেশ	১০৮	৫০	মাদ্রাজ	৬৬	৪৮
বিহার-উড়িষ্যা	৮৭	৫৭	মানপুর পরগণা	৯৬	১০১
বোম্বাই	৩৬	৫৪	উ-প-সীমান্ত প্রদেশ	৫২	৪২
বর্মা	৩৫	৪৩	পঞ্জাব	৫৪	৬১
মধ্যপ্রদেশ	৫০	৮১	সংযুক্ত প্রদেশ	৮৯	৬৫

সমগ্র বৃটীশ ভারতে প্রতি একশত চষা জমিতে ৬৭টি পশু আছে, আর প্রতি একশ' জন লোকের কাছে ৫৬টি পশু আছে।

বাঙলাদেশ ও নিখিল ভারতের পশু, গাড়ী প্রভৃতির সংখ্যা নিম্নে দিলাম,—সংখ্যাগুলি ১৯২৯-৩০এর।

	বঙ্গদেশের সংখ্যা	ভারতবর্ষ (লক্ষ)		বঙ্গদেশের সংখ্যা	ভারতবর্ষ (লক্ষ)
ষাঁড়	১১,৫৫,৮০০	৪৬	ঘোড়া	৭০,০০০	৭,৪৫
বলদ	৮৩,৮৯,৪০০	৪,৭১	ঘুড়ী	৩৪,১০০	৬,৯৯
গোরু	৪২,৫০,৬০০	৩,৭৯	বাচ্ছা	৯,৪০০	২,৩৭
বাছুর	৬৪,০২,৯০০	৩,১৭	খচ্চর	১,০৩৫	৭৫
মহিষ	৬,৮৯,১০০	৫৫	গাধা	১,২৪৭	১৩,৭১
মহিষী	২,৭৫,৯০০	১,৪৭	উট	২৭২	৫,২৫
বাছুর	১,২২,৯০০	১,১১		—	
ভেড়া	৬,১৩,৬০০	২,৫২	লাঙল	৪৫,৯২,২০০	২,৫৪
ছাগল	৫৪,৩৫,২০০	২,৫৭	গো-গাড়ী	৮,৬০,০০	৬,৭১

কৃষির সহিত দেশের জমি বন্দবস্ত বিশেষভাবে জড়িত। যদিও আমরা

অন্যত্র এবিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি, তবুও এইখানে সংক্ষেপে সমগ্র বৃটীশ ভারতের ও অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙলার স্থান কোথায় তাহাই দেখাইবার জন্য নিম্নে তালিকাটি দিলাম :—

	জমি হইতে রাজস্ব (হাজার টাকা)	মোট জনসংখ্যা (হাজার)	মাথা পিছু
আজমীড়-মেরবারা …	৩৫৮	৪০৮	৸৵০
আসাম …	১,২৮,৬৪	৮,৬২২	১॥০
বঙ্গদেশ …	৩,০০,৭৩	৪৫,১৯৩	॥৵০
[রাজস্ব নিট আদায়	১৬,৯০,০০	—	৩॥৶০*]
বিহার-উড়িষ্যা …	১,৬৩,৮১	৩৪,০০৪	॥০
বোম্বাই …	৪৮,৩১৪	২০,৬০৭	২।/০
বর্মা …	৫,৬৬,৭৩	১৪,৬৬৬	৪।৵০
মধ্যপ্রদেশ …	২৩,৩১৯	১৩,৯১৩	১॥৶০
কুর্গ …	৪১৩	১৬৪	২॥০
দিল্লী …	৪৭০	৬৩৬	৸০
মাদ্রাজ …	৭,৫৩,৪৭	৪২,৩১৯	১৸০
মানপুর পরগণা …	১৭	৭	২॥০
উ-প-সীমান্ত প্রদেশ …	২৩,৩৯	২,৩৩৯	১৵০
পঞ্জাব …	৪,৬৪,৭৭	২৩,৫৭১	১৸৶০
সংযুক্ত প্রদেশ …	৭,১৯,৪০	৪৫,৩৫৯	১॥/০
মোট	৩৮,৫২,৮৫,০০০	২৫,২৪,১৯,০০০	১॥০

* দেখা যাইতেছে ভূমির রাজস্ব বাবদ সরকার ৩৮॥০ কোটি টাকা পাইয়া থাকেন; সে-হিসাবে ২৫ কোটি লোকে ১॥০ হিসাবেই দেয়। কিন্তু বাঙলার চাষী ইহার চেয়ে অনেকগুণ বেশি দেয়। তাহা আমরা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। সরকারী মতে দশ আনা করিয়া মাথা পিছু খাজনা পড়ে বটে; কিন্তু তাহা সরকারী প্রাপ্যর হিসাব। জমিদারকে রায়ত যা দেয় তার হিসাব করিলে দেখা যায় প্রত্যেক **বাঙালী রায়ত দেয় ৩॥৶০ উপর। ভারতবর্ষের কোনো প্রদেশে রায়তে এত খাজনা দেয় না।**

জনসংখ্যার দিক হইতে বাঙলাদেশের অধিবাসীকে সাড়ে তিন টাকার উপর খাজনা মাথাপিছু দিতে হয়। তবে চষাজমির একর প্রতি ৭৶০ করে খাজনা চাপে আর তা না ধরিয়া যদি সমগ্র বাঙলার একর মাপানুসারে ধরা হয়, অর্থাৎ ৪·৫৭ কোটি একর তবে একর প্রতি খাজনা হয় ৩।৶০। আমরা gross rental-এর উপর সমস্ত হিসাব করিয়াছি, সরকারী Revenueএর উপর নহে।

বাঙলার কৃষি

বৃটীশ ভারতবর্ষের মোট আয়তন ৭৪ কোটি ৫২ লক্ষ একর; ইহার মধ্যে বাঙলার আয়তন ৫,২৬,৬৪,৬৬৯ একর। ইহার মধ্যে ৩৪,৭৭,৭৬০ একর হইতেছে ত্রিপুরা, কুচবিহার ও সিকিমের আয়তন। ১৯৩০-৩১ সালে সার্ভে ও গ্রামের খতিয়ান অনুসারে বৃটিশ বাঙলার নেট্ আয়তন ছিল ৪,৯১,৮৬,৯০৯ একর।

কর্ষিত	চাষ জমি	...	২,৩৪,৬০,৩০০ একর
	অনাবাদী জমি	...	৫৫,৭৩,৬৮৯ ,,
অকর্ষিত	চাষের উপযুক্ত পতিত	...	৫৯,৭১,৪২৮ ,,
	চাষের অনুপযুক্ত	...	৯৫,৮৭,০৩৫ ,,
	বনভূমি	...	৪৫,৯৪,৪৫৭ ,,

অনেক জমিতে একাধিকবার চাষ হয়; সে রকম চাষের জমি হিসাবে দুইবার ধরা হয়। সেই হিসাবে মোট চাষ জমি ২,৮৩,৯৮,৮০০ একর অর্থাৎ ৫৪,৩৮,৫০০ একর জমিতে মাত্র একাধিকবার চাষ হয়। অবশিষ্ট ২ কোটি ৩৪ লক্ষ জমিতে বছরে একবার চাষ হয়; অর্থাৎ চাষাকে একবার ফসল তুলিয়া বছরভোর অন্য কাজের সন্ধানে ফিরিতে হয়। কৃষি কৃষকের প্রধান উপজীবিকা নহে; বাঙলাদেশ নদী-বহুল ও বৃষ্টিপ্রধান হওয়া সত্ত্বেও যে প্রায় আড়াই কোটি একর জমিতে দোচাষ হয় না ইহার কারণ জল সেচনের অভাব। জল সেচনের ব্যবস্থা আছে মাত্র ১৭,৩৪,৮৯২ একর জমির জন্য; অবশ্য দক্ষিণতম বঙ্গ, ও পূর্ববঙ্গের কিয়দংশে সেচের

প্রয়োজন হয় না। অন্যত্র সেচের ও সারের ভাল ব্যবস্থা থাকিলে চাষারা একাধিক ফসল ক্ষেত হইতে তুলিতে পারিত।

১৯৩৪-৩৫ অব্দে বাঙলাদেশে কোন্ শস্য বা উদ্ভিদ কতখানি জমিতে চাষ হইয়াছিল, তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল :—

		একর
ধান	...	২,০৭,৩৯,৭০০
গম	...	১,৫৪,৭০০
যব	...	৯১,৩০০
জোয়ার	...	৬,২০০
বজরা	...	২,১০০
রাগি বা মরুয়া	...	৪,৮০০
ভুট্টা	...	৭৫,২০০
ছোলা	...	২,০৬,৯০০
অন্যান্য	...	১১,০১,৫০০
মোট খাদ্যশস্য	...	২,২৩,৮২,৪০০
তিসি	..	১,২৫,৮০০
তিল	...	১,৫৮,৫০০
সরিষা	...	৭,২৩,৮০০
চিনাবাদাম	...	৪০০
নারিকেল	...	১৩,২০০
রেড়ি	...	৪০০
অন্যান্য	...	২৮,৫০০
মোট তৈলবীজ	...	১০,৫০,৬০০
মশলাপাতি	...	১,৫৩,৩০০

		একর
শর্করা ইক্ষু	...	২,৭৬,২০০
অন্য	...	৫৩,৪০০
		———
তুলা	...	৫৮,৭০০
পাট	...	২১,৬০,৪০০
অন্যান্য আঁশাল	...	৪২,৪০০
চা	...	১,৯৯,৯০০
তামাক	...	৩,০৭,৬০০
সিংকোনা	...	২,৫০৭
গাঁজা শন	...	৩০০
অন্যান্য নেশা	...	৮০০
গরুর খাদ্য	...	১,০০,৫০০
বিবিধ খাদ্য	...	২,৪৪,৪০০
বিবিধ খাদ্যাতিরিক্ত ফসল	...	৯৫,৭০০
		———
		২,৭৯,২১,২০০

বাঙলার মোট চষা জমি ১৯৩০-৩১ সালে ছিল ২ কোটি ৩৪ লক্ষ একর; ইহার মধ্যে ধানের জমি ২ কোটি ৫ লক্ষ ৮২ হাজার একর। এই একটি সংখ্যার দ্বারাই বুঝা যাইবে বাঙলাদেশে ধানের চাষ বাঙালীর পক্ষে কত প্রয়োজনীয়। চষা ভূমির শতকরা ৯০ ভাগ বা মোট জমির ৪৬ ভাগ জমিতে ধান হয়। ইহা বাঙ্গালীর খাদ্য। সমস্ত ভারতে যে পরিমাণ জমিতে ধান উৎপন্ন হয় (৮ কোটি ৬১০ একর) তাহার এক চতুর্থাংশ বাঙলাদেশে হয়। ১৯২৮-১৯৩১ এই তিন বৎসরে বাঙলায় সমগ্র ভারতের শতকরা ২৯% ধান রোপিত হয়। বিহার-উড়িষ্যায় সমগ্র ভারতের শতকরা ১৭% জমিতে ধান পোতা হয়। আরও একটু বড় করিয়া দেখা যাক্; সমগ্র পৃথিবীর ধান ক্ষেত হইতেছে ৫৬ মিলিয়ন্ হেক্টর জমি; ইহার মধ্যে ভারতে আছে ৩৩ মিলিয়ন হেক্টর। হিসাব করিলে দেখা যায়, সমগ্র পৃথিবীর ধানের

জমির ১/৪ ভাগ বাঙলাদেশে আছে। সুতরাং পৃথিবীর চাষের দিক হইতে বাঙলার ধানের চাষ নগণ্য নহে।

পৃথিবীর মধ্যে ধান কোথায় কি পরিমাণ উৎপন্ন হয়, এই সঙ্গে একটা তুলনা করা যাক্। পৃথিবীর মধ্যে ভারতেই চাল সব চেয়ে বেশী উৎপন্ন হয়। এবং তার মধ্যে জমি হিসাবে বাঙলার ধান-ক্ষেত ভারতের সমস্ত ক্ষেতের সিকি, এবং সমগ্র উৎপন্ন ধানের এক-তৃতীয়াংশ।

পৃথিবীর চাল উৎপন্নের হিসাব করিলে দেখা যায়, ১৯৩০-৩১ সালে

বাঙলাদেশ	...	৯২ লক্ষ টন্
জাপান	...	৮৪ ,, ,,
বিহার-উড়িষ্যা	...	৫৬ ,, ,,
জাভা দ্বীপ	...	৫৪ ,, ,,
মাদ্রাজ	...	৫৩ ,, ,,
বর্মা	...	৫১ ,, ,,
শ্যাম	...	৪৪ ,, ,,
কোরিয়া	...	২৯ ,, ,,
আনাম	...	২২ ,, ,,
যুক্তপ্রদেশ	...	১৭ ,, ,,
মধ্যপ্রদেশ	...	১৪ ,, ,,
বোম্বাই	...	১৪ ,, ,,
আসাম	...	১৩ ,, ,,
ফরমোসা দ্বীপ	...	১৩ ,, ,,
মার্কিন দেশ	...	৭·৯১ ,, ,,

ভারতবর্ষে প্রায় পাঁচ হাজার রকমের চাল আছে বলিয়া অনুমান হয়; অবশ্য সকল রকমের ধান চাষ হয় কিনা বলা শক্ত; তবুও আন্দাজ দুই, আড়াই হাজার রকমের ধান চাষ হয়। (Watt, Commercial Products of India, p. 828)।

বাঙলাদেশে ধান দুই প্রকারের প্রধান, আউস ও আমন। আমন ধান প্রায় বার আনি (৭৪%), আউস সিকি (২৪%); এ ছাড়া বোড়ো ধান

সামান্য (২%)। রবিশস্য চৈত্রমাসে কাটিবার পরেই বৈশাখ মাসে প্রথম বৃষ্টির সঙ্গে আউস ধান বোনা হয় ; রাঢ় অঞ্চলে পরে বোনা হয়। শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন বা কার্ত্তিক মাসে এই আউস ধান কাটা হয় ; বৃষ্টির তারতম্যভেদে ধান কাটার সময় স্থানভেদে বদলায়। আউসের ফলন কম ; অল্প জলে খারাপ জমিতে এই জাতের ধান হয়। আমন ধান অনেক রকমের ; আষাঢ় শ্রাবণ মাসে আমন ধান বীজক্ষেত থেকে উঠাইয়া রোপা হয়। অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে এই ধান পাকে।

বাঙলাদেশের কয়েক প্রকার চালের নামডাক আছে, যেমন বাখরগঞ্জের 'বালাম চাল', ২৪ পরগণা ও সুন্দরবনের 'পাটনাই', বর্দ্ধমান, বীরভূমের 'রাঢ়ি', রাজশাহীর 'উত্তরা', 'কাটারিভোগ' ইত্যাদি। চাল দু'রকমের, এক সিদ্ধ আর এক আতপ। কলের চাল সবই সিদ্ধ; ইহার মধ্যে আবার কাঁড়া আকাঁড়া আছে। রপ্তানীর সময় কাঁড়া, আকাঁড়া ভেদ করা হয়। ক্ষুদ বিদেশে রপ্তানী হয় ; অল্‌কোহল ও মদ্য চোলাইর জন্য ব্যবহৃত হয়।

গত বিশ বৎসরের মধ্যে বাঙলাদেশে চালের কল ব্যাপকভাবে নির্মিত হইয়াছে। পূর্বে ধান ঢেঁকিতে ভানিয়া বাজারে বিক্রয় হইত। এখন ঢেঁকি ছাটা চাল দুষ্প্রাপ্য। গ্রামে গরীব বিধবারা এই কাজ করিয়া জীবিকা অর্জন করিত। এখন কল হওয়ায় নিম্ন শ্রেণীর মজুর ও মজুরাণীরা সেখানে কাজ করে ; গ্রামের হিন্দু বিধবারা ও মুসলমান মেয়েরা কলে কাজ করিতে পারে না। ফলে ধানকল বাঙলাদেশে নূতন সামাজিক ও আর্থিক সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে। কলীয়তার সকল পাপই ধানকলের কেন্দ্রে দেখা দিয়াছে ; সবথেকে মারাত্মক হইয়াছে এই যে, যে-ব্যবসায়টা কুটীর-শিল্প ছিল, সেটা ধনিকদের হাতে গিয়া পড়িয়াছে ; এবং চালের দর, ধানের দর তাহাদের কয়েকজনের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

বাঙলার সরকারী কৃষি বিভাগ এ দেশের ধানের উন্নতির জন্য বহু বৎসর হইতে চেষ্টা করিতেছেন ; এবং তাঁহারা বহু পরীক্ষার পর কয়েক জাতের ধান বাছিয়াছেন। প্রধানত ঢাকা ও চুঁচুড়া গবর্মেণ্ট ফার্মে এই পরীক্ষাগুলি হইয়াছিল। তাহাদের পরীক্ষার ফলে স্থির হইয়াছে—পশ্চিম বঙ্গের পক্ষে ইন্দ্রশাল হইতে দুধসার বেশী উপযোগী ; ভাসামাণিকের ফলন সব থেকে

বেশী। ঝিঙেশালও ভালই উৎরায়। এই ধরণের বিস্তর পরীক্ষা হইয়াছে এবং গবর্মেণ্টের বাছাই-করা বীজ লইয়া প্রায় ২·২৩ হাজার একর জমিতে ধান চাষ হইতেছে ; ইহাদের ফলনও ভাল।

ধানের ফলন নির্ভর করে বীজ বাছাই, সময় মত বৃষ্টি, সময় মত সেচ ও পর্যাপ্ত সারের উপর। পূর্ববঙ্গে জল ও সারের প্রশ্ন ধানের চাষে নাই ; সেচও অজ্ঞাত। পশ্চিমবঙ্গে এগুলির দরকার। সময়মত বৃষ্টি না হইলে বা অসময়ে বৃষ্টি হইলে বা অতিরিক্ত বৃষ্টি হইলে যে ক্ষতি হয়, তাহার উপর মানুষের হাত কম। কিন্তু মানুষ প্রকৃতির এই খামখেয়ালির হাত হইতে উদ্ধারের জন্য বুদ্ধির দ্বারা নানারূপ ব্যবস্থা করিয়াছে। যাহারা পশ্চিম বঙ্গের মাঠগুলিকে একটু চোখ দিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারাই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, মাঠের মধ্যে শতশত সেচের পুকুর এখনো আছে। যে পরিমাণ বৃষ্টি হয়, তাহা যদি পুকুর-গুলিতে ধরা থাকে, তবে সেচের অভাব হয় না। কিন্তু বর্তমানে এই পুকুরগুলি প্রায় মাঠের সমান হইয়া গিয়াছে ; জলাশয় নাই ; সুতরাং সামান্য জলই তাহাতে ধরে। খরতাপে শুকাইয়া যায়, প্রয়োজনের সময় জল পাওয়া যায় না।

রেলের দুই পাশে মাটি কাটিয়া যে ঝিলমত হয়, সেগুলিতে কিছু জল থাকে ; কিন্তু সেগুলিকে একটু গভীর করিয়া কাটিয়া দিলে গবর্মেণ্টের একটা মোটা আয় হইত সেচের জলকর ও মাছ হইত। গ্রামের পুষ্করিণীগুলিরও তদ্রূপ অবস্থা। গবর্মেণ্ট নূতন করিয়া খাল কাটাইতেছেন, ইহার ভবিষ্যৎ কি তাহা বলা কঠিন এবং নদীর স্বাভাবিক বহতা ও স্রোত মারিয়া খাল কাটিলে সমগ্র দেশের মঙ্গল হয় কিনা তাহার পরীক্ষা শেষ হয় নাই। সুতরাং জলসেচনের সহিত পশ্চিম বাঙলার ধানের চাষ বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট।

ইহার পর সারের কথা। ধানের পক্ষে গোবর সারই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু পর্যাপ্ত সার জমিতে পড়ে না বলিয়া জমির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পাইতেছে ; জমি একবৎসরও বিশ্রাম পায় না। গোবর লোকে ঘুঁটে করিয়া পুড়াইয়া ফেলে ; যে গোবরকে সার করে তাহাও ভাল করিয়া রাখা হয় না বলিয়া ইহার অনেক রাসায়নিক গুণ নষ্ট হয়। কৃত্রিম রাসায়নিক সার জমির ক্ষতি করে—বিশেষভাবে ধানের জমির ; এক বৎসর ফসল ভালই হয়, কিন্তু পরে প্রতিক্রিয়া হয়। কাঁচাগাছের সার ভাল ; বিশেষভাবে ধনচের সার ; প্রথম

বৃষ্টির সঙ্গে ইহা বোনা হয়; বর্ষার সময় গাছ একটু বড় হয়, তখন লাঙল দিয়া কাদার সঙ্গে ঘুঁটিয়া দিলে তেজী সার পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার চলনও কম। হাড়গুঁড়া ভাল সার, কিন্তু প্রথমত হাড় বিদেশে চালান হয়; দ্বিতীয়ত মফঃস্বলে হাড়-কল খুব কম; তৃতীয়ত লোকের সংস্কার আছে, ধানের ক্ষেতে হাড়গুঁড়া দিতে নাই। মোট কথা, সারের অভাব জমির উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট করিতেছে; এবং ফলন কম হইতেছে বলিয়া পতিত ভাঙা জমি কাটিয়া লোক চাষ করিতেছে; কারণ বর্ধিষ্ণু কৃষিগত-প্রাণ জাতির পক্ষে জীবনধারণের অন্য পথ নাই। ধানের জমি যতই বাড়িতেছে, ততই গোচারণের পতিত জমি কমিতেছে; ইহার ফলে বাঙলার গোজাতির ধ্বংস হইতেছে।

বর্ধমান সরকারী কৃষি ফার্মে বারো বৎসর পরীক্ষা করিয়া কোন্ সার দিলে ধানের ফলন ও লাভ কি রকম হয়, তাহার একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন* :—

	একর প্রতি বারো বৎসরের গড় ফলন		একর প্রতি তিন বৎসরের হিসাবে গড়	সারের মূল্য তিন বৎসরের একর প্রতি
	ধান (পাউণ্ড)	খড় (পাউণ্ড)	লাভ টাকা	হিসাব টাকা
গোবর (১০০ মণ)	৩৫৫৬	৪৪৭৯	৮৬।/০	৪।৵০
বিনাসার	১৩৭৪	২১৭৪	১৬।৶০	০
রেড়ির খৈল (৬ মণ)	৩১২৩	৪৬২৮	৫০।/০	১২৲
গোবর (৫০ মণ)	৩৪৬১	৪৬৩০	৫৮৸০	২৶০
বিনাসার	১৪৯২	২৫৫৯	১৮৸/০	০
হাড়গুঁড়া (৬ মণ)	৩৯৬২	৫৫০৯	৮৪॥৵০	১১৲
হাড়গুঁড়া (৩ মণ)	৩৬৬৩	৫১২৪	৮০৸৶০	৫॥২
বিনাসার	১৫৪৯	২৫৪১	২১।/০	০
হাড় ৩ মণ ও সোরা ৩০ সের	৪৩৮৯	৬১৭৮	১০৫৲	৯।০

* S. C. Mitter, A Recovery Plan for Bengal, p. 45.

কৃষির জমি বাড়িতেছে, বিশেষভাবে ধানের ও পাটের। চাষ বহু বিস্তৃত হইতেছে, কিন্তু জমিকে বহু উৎপাদক (intensive) করিবার চেষ্টা তেমনভাবে হয় নাই ; অর্থাৎ ডাঙাজমি পতিত জমি কেবলই ভাঙিয়া নূতন ধানের জমি, পাটের জমি হইতেছে, যে জমি আছে তাহাতে ফলন বেশী করিবার চেষ্টা হয় নাই। চাষ বহু বিস্তৃত করিয়া লাভ নাই, কারণ তাহাতে পরিশ্রম বেশী, ব্যয়ও অনুপাতানুসারে অধিক পড়ে। সেইজন্য Imperial Institute of Agriculture হইতে ভাল জাতের ধান ও ভালজাতের পাট বুনিবার জন্য উপদেশ দিতেছেন। বহু পরীক্ষা করিয়া কৃষিবিভাগ সাত রকমের আমন ও পাঁচ রকমের আউসের নাম করিয়াছেন। এই সব ধানের ফলন বেশী ; ফলন বেশী হইলে চাষের জমির প্রয়োজন হইবে কম। পাট সম্বন্ধেও সেই কথা। কাকিয়া-বোম্বাই নামে একপ্রকার পাটের আঁশ খুব বেশী হয় ; ইহার চেয়েও ভাল আঁশাল-পাট আবিষ্কৃত হইয়াছে ; এই ধরণের উন্নততর পাট লাগাইলে অল্প জমিতে বেশী পাট হইবে। এই ধরণের একটা কোনো ব্যবস্থা না করিলে, সারা বাঙলাদেশ চষিয়া ফেলিলেও খাদ্যের অভাব ঘুচিবে না ; কারণ চাষের গোড়া হইতেছে গোজাতি ; গোচারণ ভূমির অভাবে, গোজাতির ধ্বংসে চাষের উন্নতি হইবে না, এবং দুগ্ধের অভাবে বাঙলার ভাবী মানুষও পুষ্ট হইবে না। কৃষি ও গোপালন তাই অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। খৈলসার বাঙলার মাঠে খুব কম পড়ে ; তার কারণ আমরা তৈলবীজ পরিচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছি।

ধান-উৎপন্নের দিক হইতে বাঙলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। বাঙলার অধিকাংশ অধিবাসী অন্নভোজী ; সুতরাং অধিকাংশ ধান দেশেই লাগে। কিন্তু এ সত্ত্বেও বাঙলাদেশ হইতে চাল বিদেশে রপ্তানী হয়, অবার বর্মা হইতে প্রচুর পরিমাণে আমদানীও হয়। এই আমদানী-রপ্তানীর কথা বলিবার আগে, বাঙলাদেশে ধানের চাষ কি ভাবে ওঠানামা করিয়াছে তাহাই দেখা যাক্। জনসংখ্যা বাড়িয়াছে, ধানের জমি বাড়িয়াছে, শস্যের পরিমাণ বাড়িয়াছে। এখন এই সবগুলিকে মিলাইয়া দেখা যাক্ অভাবটা কোথায়! এখানে একটা কথা নির্দেশ করিতে চাই ; সেটা হইতেছে এই যে, বাঙলাদেশে যে পরিমাণ ধানের জমি বাড়িয়াছে, সেই পরিমাণ কি শস্য উৎপন্ন হইতেছে ?

প্রথমেই দেখা যাক্ ভারতবর্ষের ধানের চাষ ও ফলন কি পরিমাণ হইতেছে ; ১৯৩১-৩২ সালের হিসাব—

	ধানের জমি	ধানের ফলন
বৃটিশ সাম্রাজ্য	৮,৭৩,৭৪,০০০ একর	৩,৩০ লক্ষ টন্
বৃটীশ ভারত (দেশীয় রাজ্য বাদ)	৮,০২,৯৯,০০০ ,,	৩,১৬ ,, ,,
বঙ্গদেশ ...	২,২১,২৯,০০০ ,,	৯৪,৯৩,০০০ টন্

সব বৎসরে ধান সমান উৎপন্ন হয় না। ধান বিক্রয় করিয়া চাষী খাজনা, মহাজনের টাকা ও নিজ সংসার খরচ চালায় ; সুতরাং চাষী চায় ধানের চড়া দর। কিন্তু সমস্ত পণ্যদ্রব্যের দর নির্ভর করে ধানের দরের উপর। ধান যদি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় ও বাহিরে চাহিদা না থাকে তবে ধানের দাম থাকে না। এবং যতই ধানের ব্যবসায় বণিকদের হাতে পড়িতেছে ততই ধানের দর নিয়ন্ত্রিত হইতেছে তাহাদের দ্বারা। দক্ষিণ বর্মায় অপর্যাপ্ত চাল হয় অধিবাসীর প্রয়োজনের অতিরিক্তই ; সেখানে ধান বাণিজ্য-কৃষির অন্তর্গত (commercial agriculture)। এছাড়া সেখানকার বাজার নিয়ন্ত্রণ করে বিদেশী পুঁজিপতিরা। সেখানকার বাজার দর দিয়া বাঙলার দর চলে। এছাড়া চালের কল ও পুঁজিওয়ালারা সঙ্ঘবদ্ধ, বাঙলার চাষীরা নহে। বাঙলা-দেশেও মাড়োয়াড়ী ও বাঙালী পুঁজিওয়ালারা ও কলওয়ালারা চাষীকে কোণঠাসা করিতেছে ; গ্রামের ও মফঃস্বলের খবর যাঁহারা রাখেন তাঁহারা এই কথা জানেন।

প্রথমে দেখা যাক্ বাঙলাদেশে কোন বৎসর কতখানি জমিতে কতখানি চাল হইয়াছিল, তারপর অন্যান্য তুলনা করা যাইবে।

	একর (লক্ষ একর)	টন্ (হাজার টন)	একর প্রতি উৎপন্ন	দর মণ প্রতি
১৯১১-১২	২,০৯·৬	...	৯৬৪ পাঃ —১১৳ মণ (বিঘাপ্রতি ৩·৫ মণ)	৪/৩
১৯২১-২২	২,১৮·৩	...	১০২৫ পাঃ —১২½ মণ (বিঘাপ্রতি ৩·৭ মণ	৭॥৬

	একর (লক্ষ একর)	টন্ (হাজার টন)	একর প্রতি উৎপন্ন	দর মণ প্রতি
১৯২৬-২৭	১,৯৮·৭	৭৩,৫৫,	৮২৯ পাঃ	৬৸৶৬
১৯২৭-২৮	১,৮৬·৮	৬৪,৯৩,	৭৭৯	৭।০
১৯২৮-২৯	২,১৪·০	৯৬,৮৪,	১০১৪	৭৶৬
১৯২৯-৩০	২,০২·২	৮২,০২	৯০৮	৬৵০
১৯৩০-৩১	২,০১·৪	৯২,০৬	১০০২	৫৸৵০
১৯৩১-৩২	২,১২·২	৯৪,৯৩	৯৬১	৪৵৯
১৯৩২-৩৩	২,১৭·৭	৯৩,৬১	৯৬৩	...

এই তালিকা হইতে একটি জিনিষ খুবই স্পষ্ট হইতেছে যে, গড়ে বাঙলা-দেশের এক বিঘা জমিতে ৩৵০ বা ৩৸৵০ মণের বেশী ধান হয় না। এক বিঘায় যদি ৩॥০ মণ ধান হয়, না হয় যুক্তির খাতিরে যদি ৬ মণ হয়ও স্বীকার করি—তবে দেখা যাক্ চাষীর কি থাকে। এক বিঘাতে ৬ মণ ধান হইলে অর্ধেক পায় যে চাষ করে সে, অর্থাৎ ভাগীদার। সুতরাং রায়ত পায় ৩ মণ; এই তিন মণ ধানের দর ১॥০ বা ২৲ করিয়া ধরিলে ৪॥০ বা ৬৲ হয়। এছাড়া যে খড় পায়, তাহার দাম খুব জোর ২৲ টাকা। জমির খাজনা বিঘাপ্রতি ২৲ হইতে ৩৲ টাকা গড়ে ধরা যাক্। এছাড়া গোরুর খরচ, ভাগীদারকে পূজাপার্বণে কাপড়চোপড় দেওয়ার খরচ, সারের খরচ আছে; বীজের ধান আছে, ইত্যাদি। একজোড়া হাল বলদে ও একজন লোকে ১৬ হইতে ২০ বিঘার বেশী চাষ তুলিতে পারে না। এইভাবে হিসাব করিলে চাষীর কি থাকে তাহা সহজে অনুমান করা যায়। সুতরাং জমির উৎপাদিকা শক্তি ও ফলন বাড়াইতে হইবে। নতুবা বাঙলার চাষ লোকসানী ব্যবসা।

এইবার দেখা যাক্ বাঙলাদেশে যে চাল উৎপন্ন হয়, তাহা বাঙালীর খাদ্যের পক্ষে পর্যাপ্ত কিনা। শ্রীযুক্ত লতিফ হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, সমগ্র ভারতে প্রায় দুই মিলিয়ন টন্ অর্থাৎ ৫ কোটি ৪০ লক্ষ মণ চাল ১৯৩২-৩৩ সালে কমতি পড়িয়াছিল; ১৯৩৩-৩৪ সালের ঘাটতি ১০ কোটি মণের উপর।

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র বেঙ্গল জেল কোড্ ও ফেমিন কোড নির্দিষ্ট অন্নের পরিমাপ হইতে হিসাব করিয়া বলিয়াছেন যে, গড়ে একজন লোকের বৎসরে

৫/৩০ সের চাল খাইবার প্রয়োজন। সে-হিসাবে বাঙলার পাঁচকোটি অধিবাসীর জন্য ১১ মিলিয়ন্ টন (২৯০ কোটি মণ) চালের প্রয়োজন; কিন্তু বাঙলায় উৎপন্ন হয় ৯·৬ মিলিয়ন টন্, অর্থাৎ প্রায় ২ মিলিয়ন টনের ঘাটতি হয়; ইহার থেকে আবার দেড় লক্ষ টন্ যায় বিদেশে চালান। এই ঘাট্‌তি পূরণ করে বর্মা। শুধু বর্মা কেন জাপান, শ্যাম, ফরাসী হিন্দু-চীন সকলেই বাঙলাদেশে চাল পাঠাইতেছে। বাঙলাদেশ যাহাতে নিজের খাইবার অন্ন নিজ ক্ষেতে উৎপন্ন করিতে পারে, তদ্বিষয়ে সকলের সচেষ্ট হওয়া উচিত।*

চালের রপ্তানী-আমদানী

বাঙলাদেশে যে পরিমাণ চাল উৎপন্ন হয়, উহা হইতে বহু লক্ষ মণ বিদেশে প্রতিবৎসর রপ্তানী হয়। ভারত সাম্রাজ্যের কোন্ প্রদেশ হইতে কতখানি চাল রপ্তানী হইয়াছে, তাহার তালিকা বাঙলার সঙ্গে তুলনায় দেখা যাক্। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় বাঙলাদেশ পূর্বের ন্যায় শস্য রপ্তানী করিতে সক্ষম হইতেছে না। ইহার কারণ অনুসন্ধান করা উচিত।

রপ্তানী ধান ও চালের হিসাব

(উপকূল বাণিজ্য বাদ)

বৎসর	প্রদেশ (হাজার টন্)				মোট	
	বর্মা	বঙ্গদেশ	মাদ্রাজ	বোম্বাই	পরিমাণ (হাজার টন্)	মূল্য (হাজার টাকা)
যুদ্ধের পূর্বে ১৯০৯-১০ হইতে ১৯১৩-১৪ পর্যন্ত গড়	১৮,১৪	৩৭৪	১২১	৬০	২৩,৯৮	
যুদ্ধপূর্ব (গড়) ১৯১৪-১৫ ১৯১৮-১৯	১২,৭১	১০৭	১৭৫	১৩১	১৬,৮৪	

* S. C. Mitter Recovery, Plan, p. 44

বৎসর	বর্মা	বঙ্গদেশ (হাজার টন্)	মাদ্রাজ	বোম্বাই সিন্ধু	মোট পরিমাণ (হাজার টন্)	মোট মূল্য (হাজার টাকা)
১৯১৯-২০	৪,৯২	৪৮	২	৭৬	৬১৮	
১৯২০-২১	৯,৩৪	১১	৬	১০৯	১০৬০	
১৯২১-২২	১২,১৪	১২	৫৩	৮৭	১৩৬৬	২৪,৯১,৭৫
১৯২২-২৩	১৭,৫৮	২০৭	৫১	৭০	২০,৮৮	৩৫,০৪,১২
*		*	*		*	*
১৯২৭-২৮	১৮,৯৫	১২৬	৯৭	১৯+৪৭	২১,৮৬	৫৩,৯৯,৩৪
১৯২৮-২৯	১৫,৪৪	১০৬	৯৮	১৬+৫০	১৮,১২	২৬,৪৫,৮৮
১৯২৯-৩০	২০,৪৮	১২০	৯৩	১৬+৪২	২৩,২৫	৩১,৫০,৬২
১৯৩০-৩১	২০,০০	১১৮	১০১	১৩+৪৩	২২,৭৯	২৫,৯৬,৫১
১৯৩১-৩২	২০,৬৫	১২৩	৬১	১৩+৩৭	২৩,০১	১৭,৮৪,৩৮
১৯৩২-৩৩	১৬,০২	১২০	৬৪	১১+২৮	১৮,২৮	১৪,১৮,৩৭
১৯৩৩-৩৪	১৫,১৬	১০৭	৭৮	১২+১৭	১৭,৭২	১০,৫২,১৪
১৯৩৪-৩৫	১৩,৮৯	৯৬	৭২	১২+৩২	১৫,৯২	১০,১০,২৮
১৯৩৫-৩৬	১২,০৫	৮০	৭০	১৩+২৪	১৩,৯৩	১০,৯৪,৭৪
১৯৩৬-৩৭						

বাঙলাদেশ হইতে যে পরিমাণ ধান ও চাল রপ্তানী হয়, তাহা বাঙলাদেশে বিদেশ হইতে যে পরিমাণ শস্য আমদানী হয়, তাহার তুলনায় সামান্য ; ধান, চাল, খুদ প্রভৃতি সকল পদার্থই বাঙলায় আসে ; ইহার মূল্য ১৯২৫-২৬ সালে ৪ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা ছিল ; ১৯২৮-২৯এ ৬ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত উঠে। কিন্তু তারপর কমিতে থাকে ১৯৩০-৩১ সালে ২ কোটি ১৭ লক্ষ টাকার মাল আমদানী হয়। এই শেষ বৎসরের বিশেষত্ব হইতেছে—বাঙলাদেশ ধান অধিক টাকার আমদানী করিয়াছিল। তৎপূর্ব বৎসরে তাহা হয় নাই। ইহার একটি কারণ কলিকাতা ও তাহার অন্তঃপাতী শহরতলী ধানকলের

Sea borne Trade of Br. India, 7cth issue, 1937, vol. I p. 559.

প্রধান কেন্দ্র; এইসব কলে বর্মার ধান শস্তায় আনিয়া চাল করা সহজ। বর্মার ধান বা চালের আমদানীর উপর বাঙলার ধানের দর নির্ভর করে। বর্মা হইতে বাঙলার বন্দরে কি পরিমাণ ধান, চাল খুদ প্রভৃতি আসে তাহার মূল্য দ্বারা ইহার ব্যাপকতা অনুভব করা যাইবে—১৯২৫-২৬ হইতে ১৯৩৫-৩৭ পর্যন্ত বৎসরে গড়ে ৩ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকার ধান চাল আসিয়াছিল। ১৯৩১-৩২ হইতে শেষ পাঁচ বৎসরে গড়ে ২ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা ছিল। কিন্তু এইখানেই বিদেশী চালধান আমদানীর অঙ্ক শেষ হয় নাই। পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ার সিয়াম, ফরাশী হিন্দুচীন, এমনকি দূরতর জাপানও বাজারে চাল আমদানী করে। ১৯৩১ হইতে ১৯৩৫এর মধ্যে এই পাঁচ বৎসরে গড়ে ভারতে ১,৫০,৮৪,০০০ টাকার চাল ঐসব দেশ হইতে আসিয়াছিল। বাঙলা-দেশের মধ্যে ঐ সময়ে গড়ে বৎসরে ২০ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকার চাল আসিয়াছে। হঠাৎ এই বিদেশী চাল আসিয়া পড়ে বলিয়া সমস্ত বাজার নামিয়া যায়।

ভারত সাম্রাজ্য হইতে ১৯২২ হইতে ২৭ পর্যন্ত গড়ে প্রায় ২৩ লক্ষ টন্ চাল বিদেশে রপ্তানী হইত; ইহার মধ্যে বর্মা একাই পাঠাইত ১৭ লক্ষ টন্। বাঙলার বন্দর হইতে এক লক্ষ হইতে তিন লক্ষ টন্ ধান ও চাল রপ্তানী হইয়াছিল।

সমগ্র ভারতের রপ্তানী চালের মূল্য ১৯২২-২৩ সালে ছিল ৩৪ কোটি, বাঙলার ভাগ ছিল ৪ কোটি, অর্থাৎ ১/৮ অংশের কম; ১৯২৪-২৫ সালে ১/৬ অংশ; কিন্তু তার পর হইতে কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। ১৯২৫-২৬এ ১/১৬ অংশ, ১৯২৬-২৭এ ১/১৫ অংশ হইয়াছিল।

বাঙলাদেশ হইতে যে চাল রপ্তানী হইত তাহা মরিশাস, নেটাল, ষ্ট্রেটস্ সেটলমেণ্ট প্রভৃতি নানা স্থানে যাইত। ধান রপ্তানী এখান হইতে হয় না বলিলেই চলে; সিদ্ধ চালই চৌদ্দআনি যায়। কিন্তু তাহার মূল্য ৬ কোটি টাকা হইতে ১ কোটি ৩২ লক্ষতে নামিয়াছে।

দেখা যাইতেছে, বিদেশে ভারতীয় ও বর্মী চালের চাহিদাও কমিতেছে; ইহার কারণ শ্যাম, ফরাসী, হিন্দু-চীন প্রভৃতি দেশ প্রচুর চাউল উৎপন্ন করিতেছে এবং বর্মায় একচেটিয়াত্ব ধ্বংস করিতেছে।

বাঙলাদেশের ধান চাল রপ্তানী সম্বন্ধে এই পরিবর্ত্তনের কারণ কি, তাহা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। এককালে বাঙলার গ্রামে গ্রামে যে পরিমাণ ধান উৎপন্ন ও চাউল প্রস্তুত হইত, তাহা গ্রামের বাসিন্দার পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল; পর্যাপ্ত না হইলে দুর্ভিক্ষে কষ্ট পাইত। কিন্তু ক্রমে নূতন নূতন শিল্পকেন্দ্রের বা নূতন শহরের সৃষ্টি হওয়ায় সেইসব স্থানের শিল্পনিষ্ঠ বা চাকুরীজীবী লোকের খাদ্যের চাহিদা হইয়াছে। শুধু বাঙলাদেশের মধ্যে নয়, বাঙলার বাহিরে কয়লার খাদে, অভ্রের খাদে, লোহার কারখানায় খাদ্য-শস্যের চাহিদা বাড়িয়া চলিল। এইসব স্থানে অবাঙ্গালী শিল্প শ্রমিকের উপনিবেশ। বিদেশে যে সব স্থানে লোকে প্রধানত নানারূপ ব্যবসায়িক কৃষি (commercial agriculture) করিত, সেখান হইতে খাদ্য শস্যের জন্য চাহিদা আসিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্রুত শিল্পোন্নতির ফলে শিল্পী ও শিল্প-শ্রমিকদের 'টাকা' হইয়াছিল বিস্তর; সুতরাং খাদ্যশস্যের প্রচুর চাহিদা হয় ও চাষীরা ধান্য বা গম উৎপন্ন করিতে থাকে। বাঙলাদেশের চাষী ধান উৎপন্ন করিয়া প্রচুর টাকা পাইতে লাগিল। ১৯০৯-১০ সালে বাঙলাদেশ হইতে ৩,৭৪,০০০ টন্ ধান বিদেশে রপ্তানী হয়। সে পরিমাণ ধান ইহার পরে কখনো রপ্তানী হয় নাই।

চাষীদের টাকা হইয়াছিল, তাই সে সরিষা বোনা ছাড়িয়া দিল, আখ বোনা ছাড়িয়া দিল। কারণ সরিষা ও আখের জন্য যে পরিমাণ মেহনত করিতে হয়, তাহা না করিয়া কেবল ধান করিয়া সে প্রচুর টাকা পাইতেছিল। বাঙলার ধানের খরিদ্দার ছিল—মরিশাস, জাভা, জাপান। মরিশাস ও জাভার লোকেরা আখের চাষ করিয়াছিল। কিন্তু ক্রমশঃ এইসব দেশে ব্যবসায়িক কৃষিজাত সামগ্রী উৎপন্নের সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যও উৎপন্ন করিবার দিকে তদ্দেশীয় গবর্মেণ্ট ও পুঁজিপতিদের দৃষ্টি গেল; অথবা নিকটের দেশ—যেমন সিয়াম বর্মা হইতে জাভার চাল সস্তায় পৌঁছাইতে লাগিল। ফলে বাঙলার ধান্যের চাহিদা হ্রাস পাইল। পাটের চাহিদা অপরদিকে বাড়িয়া চলিয়াছিল; সুতরাং লোকে ধানের ক্ষেতে পাট বুনিল, সরিষার ক্ষেতে, আখের ক্ষেতে পাট দিল। ধানের ক্ষেত কমিতে লাগিল; পাট হইতে সে টাকা পাইতেছিল প্রচুর সুতরাং সেই টাকা দিয়া সে খাদ্যশস্য কিনিল। তখন চাল আসিতে সুরু করিল বর্মা হইতে। বর্মা যত সস্তায় ধান-চাল দিতে

পারিত, বাঙলা তাহা পারিত না, ফলে বাঙলা বাহিরের বাজার হারাইল এবং সরিষা ও আক প্রভৃতির চাষ ছাড়িয়া দেওয়াতে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের চাষীরা বাজার কাড়িয়া লইল। ইহার ফল কি হইয়াছে, তাহা আমরা সরিষা ও ইক্ষু চাষের ইতিহাস দেখিলে বুঝিতে পারিব।

ধানের তুলনায় অন্যান্য খাদ্যশস্যের চাষ নগণ্য। গম লাখ দেড় একর ভূমিতেও পুরা দেওয়া হয় না। উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের এখানে সেখানে হয় মাত্র; বাঙলাদেশ থেকে যে গম রপ্তানী হয় তাহা উত্তর-পশ্চিম হইতে আসে। গমের আসল বন্দর হইতেছে করাচী। কিন্তু বাঙলাদেশে আটা ময়দা প্রচুর ব্যবহৃত হয়, অবাঙালীরা আটা খায়, বাঙালীও লুচি, ময়রার দোকানে খাবার খায়। অনেকগুলি ময়দার কল বাঙলায় চলে; এই সব কলের গম সবই বাহিরের, এমন কি অস্ট্রেলিয়া হইতেও আসে। যব বিহারে বেশী হয়; বাঙলায় মাত্র ৮৬ হাজার একরে উৎপন্ন হয়। ভূট্টা, চানা, জোয়ার, বাজরা সামান্যই হয়; 'পশ্চিমা'রা ও সাঁওতালরা এখানে সেখানে চাষ করে। ভূট্টা দার্জিলিঙে কিছু হয়।

চালের পর বাঙালীর প্রধান খাদ্য ডাল; বুট বা ছোলা, মসুরি, মাসকলাই মুগ, মটর, খেঁশারি, অড়হর প্রভৃতি ডাল বাঙালীর খাদ্য। যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব, বিহার-উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশে 'বুট' বেশী পরিমাণে হয়। সকল রকম ডাল বাঙলার ক্ষেতে মাত্র শতকরা ৭ ভাগ উৎপন্ন হয়। এই ডালে বাঙালীর কুলায় না; তাই তাকে বিহার যুক্তপ্রদেশ হইতে প্রতি বৎসর বহু লক্ষ মণ ডাল আমদানী করিতে হয়। অথচ নদীয়ার মুগ, বরিশালের মসুরি খুবই বিখ্যাত। সুতরাং চেষ্টা করিলে ডালের চাষ আরও বাড়ানো যায়।

বাঙলাদেশে খাদ্যশস্য কি পরিমাণ হয়, তাহা ভারতের তুলনায় নিম্নে দিলাম। ১৯৩০-৩১ সালের হিসাব :—

	বাঙলা	ভারতবর্ষ
	(০০০ একর)	
চাল	২,০৫,৮২	৮,০৬,৩১
গম	১,৬২	২,৪৭,৯৭
যব	৮৬	৬৬,৯২

	বাঙলা	ভারতবর্ষ
	(০০০ একর)	
জোয়ার চালা	৭	২,২৮,০৮
বজরা	২	১,৩৬,৯৮
রাগি, মরুয়া	৪	৩৯,৭২
ভুট্টা	৯৪	৬৪,৫৭
ছোলা	১,৫১	১,৩৬,৭৩
অন্য ডাল	১০,১৯	৩,০০,৩২
সকল প্রকার খাদ্যশস্য	২,২০,৮৯	২০,২৭,৩৫
সমগ্র চষা জমি	২,৩৪,৬০	২২,৭১,১৫

১৯৩৪-৩৫ এর তালিকা আমরা একটু আগেই দিয়াছি।

বাঙলাদেশে যেসব কৃষিজাত সামগ্রী উৎপন্ন হয় তাহার মধ্যে কতকগুলি খাদ্যশস্য, কতকগুলি অর্থকরী ফসল। বাঙলাদেশে ধানের জমিই ২ কোটি একরের উপর, অন্যান্য ফসল তার তুলনায় নগণ্য। কিন্তু এই নগণ্য আয়তনের ফসল হইতে যে অর্থ হয়, তাহা ধান্যের তুলনায় অধিক। বাঙলাদেশের চাষীরা নিজেদের জন্য খাদ্যশস্য রাখিয়া কি পরিমাণ শস্য বিক্রয় করিয়া কত টাকা পায়, এবং অন্য অর্থকরী ফসল হইতেই বা কত টাকা পায় 'পাট তদন্ত কমিটি' তাহার একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন :—

	উদ্বৃত্ত শস্য কাটিবার পর বিক্রয় করিয়া চাষী যে দাম পায়			
প্রধান শস্য	১৯২০-২১ হইতে ১৯২৯-৩০ এর গড়	১৯৩০-৩১	১৯৩১-৩২	১৯৩২-৩৩
খাদ্যশস্য (উদ্বৃত্ত)	২০,৮৩ লক্ষ	২১,২২ লক্ষ	১৭,০৪ লক্ষ	১৩,৬৪ লক্ষ
তিসি	৩৮ ,,	২৭ ,,	১৯ ,,	১৬ ,,
সরিষা	৯৬ ,,	২,০১ ,,	২,৪২ ,,	১,০৭ ,,
তিল	৬৫ ,,	৪৩ ,,	২০ ,,	৩৪ ,,
অন্যান্য তৈল বীজ	৯ ,,	১০ ,,	৬ ,,	৪ ,,
তামাকু	৪,৫৭ ,,	৩,৩০ ,,	২,৪৪ ,,	২,১৩ ,,
তুলা	৩৭ ,,	২১ ,,	২১ ,,	২০ ,,
পাট	৩৫,৭২ ,,	১৭,৬০ ,,	১০,২৯ ,,	৮,৬২ ,,
	৬৩,৫৭	৪৫,১৪	৩২,৭৫	২৬,০০

পাট তদন্ত কমিটির অন্যতম সদস্য ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ খৈতান একটি মূল্যবান্ তালিকা প্রতিবেদনের পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এই তালিকায় প্রথমে তিনি দেখাইয়াছেন বাংলাদেশে উৎপন্ন খাদ্যশস্যের পরিমাণ। তাঁহার হিসাবে ১৯২১-২২ সালে ৯৭,০১,০০০ টন্ খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়; ইহা হইতে শতকরা ৩ ভাগ অর্থাৎ ২,৯১,০০০ টন্ বীজের জন্য বাদ দিলে থাকে ৯৪ লক্ষ টন্। ঐ সনে বাঙলার জনসংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৭০ লক্ষ, ইহার মধ্যে ৩ কোটি ৬১ লক্ষ চাষী। ইহাদের খাওয়ার জন্য তিনি দৈনিক ১·১৮ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ॥৶০ (দশ ছটাক) করিয়া চাউল ধরিয়াছেন। সেই হিসাবে প্রায় ৭০ লক্ষ টন্ চাউল লাগে। ইহার পর চাষীর বিক্রয়ের জন্য উদ্বৃত্ত শস্য থাকে ১৪ লক্ষ ২৯ হাজার টন্; ইহার মূল্য ২৩ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা।

ইহার পর শ্রীযুক্ত খৈতান অন্যান্য অর্থকরী ফসলগুলির, যেমন তিসি, সরিষা, পাট, তুলা, তামাকের হিসাব লইয়া দেখাইয়াছেন যে, এই সব বিক্রয় করিয়া ১৯২১-২২ সালে ৩১ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা চাষীরা পায়; উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্যের মূল্য ধরা হইয়াছে ২৩ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা। উভয় মিলিয়া চাষীদের মোট টাকা হয় ৫৫ কোটি। কিন্তু ইহাই তাহাদের নিজস্ব নয়; কারণ, ইহা হইতে ধার শোধ, সুদ, খাজনা প্রভৃতি দায় শোধ দিতে হয়। সমস্ত দিয়া থুইয়া চাষীর ছিল ২৭ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। তিনি আরও দেখাইয়াছেন—চাষীর প্রয়োজন গুড় ৪,২২,০০০ টন্; কিন্তু উৎপন্ন হয় ৩,৩৯,০০০ টন্, অর্থাৎ ৮৩ হাজার টন্ গুড় ঘাট্‌তি পড়ে।

এইরূপ হিসাব খৈতান মহাশয় ১৯২০-২১ হইতে ১৯৩২-৩৩ পর্যন্ত বিস্তৃত-ভাবে করিয়াছেন। ১৯২০-২১ হইতে ১৯২৯-৩০ সাল পর্যন্ত হিসাবে দেখা যায় যে, মোট বিক্রেয় ফসলের দাম গড়ে ছিল ৭২,৬২ লক্ষ টাকা [সর্বোচ্চ ১৯২৫-২৬ এ ১১৭,১৫ লক্ষ টাকা, সর্বনিম্ন ১৯২৭-২৮এ ৪২,৫১ লক্ষ টাকা]; চাষীর আর্থিক দায় বা দেনার পরিমাণ গড়ে ২৯ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ধরা হয়। দায় বা দেনা দিয়া চাষীর হাতে গড়ে ৪৪,৭১ লক্ষ টাকা করিয়া বার্ষিক ছিল। এই টাকার মধ্যে ৩৫,৭২ লক্ষ টাকা সে পায় পাট বিক্রয় করিয়া, অর্থাৎ তাহার ক্রয় করিবার শক্তির প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ পায়

পাট হইতে। অর্থাৎ কৃষিলব্ধ সামগ্রীর মূল্য ধরিলে তিন কোটি চাষীর গড় বার্ষিক মাথাপিছু ফসল বিক্রয়ের আয় প্রায় ১৫৲; **অবশ্য** এ ছাড়া মেহনৎ করিয়া সে অন্য যে টাকা পায়, তাহার হিসাব আমরা এখানে ধরিলাম না। কোন্ বৎসরে কত চাষীর কত টাকা উদ্বৃত্ত ছিল, তাহার তালিকাটি আমরা নিম্নে থৈতান মহাশয়ের তালিকা হইতে সংক্ষিপ্তাকারে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

সাল	বাঙলার চাষী-সংখ্যা (হাজার)	ফসল বিক্রয় (লক্ষ টাকা)	নানারূপ দায় শোধ (লক্ষ টাকা)	উদ্বৃত্ত টাকা (লক্ষ টাকা)	মাথাপিছু বার্ষিক উদ্বৃত্ত (আমাদের করা)
১৯২০-২১	৩,৬১,০০	৬২,৯৬	২৬,৮১	৩৬,১৫	১০ টাকা
১৯২১-২২	৩,৬৩,৬৪	৫৩,০৪	২৭,৩০	২৭,৭৪	৮·৫ ,,
১৯২২-২৩	৩,৬৬,২৭	৭৪,৯৩	২৭,৪১	৪৭,৫২	১৩·০ ,,
১৯২৩-২৪	৩,৬৮,৯১	৬০,০৭	২৭,৯৭	৩২,১০	৮·৭ ,,
১৯২৪-২৫	৩,৭১,৫২	৭১,১১	২৮,০৫	৪৬,০৬	১২·৪ ,,
১৯২৫-২৬	৩,৭৪,১৩	১১৫,৪২	২৮,১৩	৮৭,২৯	২৩·৩ ,,
১৯২৬-২৭	৩,৭৬,৮২	৬৬,৭৬	২৮,০২	৩৮,৭৪	১০·৩ ,,
১৯২৭-২৮	৩,৭৯,৪৫	৫৫,৩৩	২৮,৫৪	১৩,৭০	৩·৬ ,,
১৯২৮-২৯	৩,৮২,০৯	১০২,০৭	২৮,৩০	৭৩,৭৭	১৯·৩ ,,
১৯২৯-৩০	৩,৮৪,৭২	৭০,৭৫	২৮,৫০	৪২,২৫	১১·১ ,,
১৯৩০-৩১	৩,৮৭,৩৬	৫২,০৫	২৯,৩৮	২২,৬৭	৫·৮৫ ,,
১৯৩১-৩২	৩,৯০,০১	৪১,৫৯	২৮,৩০	১৩,২৯	৩·৪ ,,
১৯৩২-৩৩	৩,৯২,৬৩	৩২,৭১	২৮,৩০	৪,৪১	১·১৩ ,,

চাষীর এত পরিশ্রমের পর তাহার উৎপন্ন ফসল হইতে মাথাপিছু ১৵১০ করিয়া ছিল। চাষীর দুর্দশা কি পর্যন্ত তাহা গত কয় বৎসরের উদ্বৃত্ত টাকা হইতে বুঝা যায়। ইহার পর যখন দৈবদুর্যোগে শস্য নষ্ট হইল, তখন সরকার বাহাদুরকে দুর্ভিক্ষ ঘোষণা ও রিলীফ কার্য খুলিতে হইল। ১৯৩৫ ও ১৯৩৬ সালে এই ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়; ধান বা চাউলের অভাব হয়

নাই,—এক স্থানের বাড়্তি অন্য স্থানের ঘাট্তি পূরণ করিয়াছিল; কিন্তু লোকের হাতে পয়সা একেবারে ছিল না।

তৈল বীজ

সমগ্র বৃটীশ ভারতে ১৯৩০-৩১ সালে মোট ১,৬৪,৫৭,০০০ একর জমিতে নানাবিধ তৈল বীজ বোনা হয়। ইহার মধ্যে বাঙলাদেশে মাত্র ১০,৮৬,০০০ অর্থাৎ মোট একরের $\frac{5}{75}$ জমিতে তৈলবীজ বোনা হইয়াছিল। সমগ্র বৃটীশ ভারতে ও বাঙলাদেশে কতখানি জমিতে কোন্ কোন্ তৈলবীজ ১৯৩০-৩১ সালে বোনা হইয়াছিল তাহা দেখা যাক্—

	১৯৩০-৩১			১৯৩৫-৩৬	
	একরে				
বীজ	ভারতবর্ষ	বাঙলাদেশ	শতকরা	বৃটীশ ভারতবর্ষ	বাঙলা
মসিনা	১৯,৯২,১২৫	১,১৬,৩০০	৬·৪%	২০,৬৩,০০০	৯৮,০০০
তিল	৩৬,৩৮,১০৩	১,৫২,৮০০	৪·১৬%	৩৬,২৩,০০০	১,৬৬,০০০
সরিষা	৩২,৯৬,৭৬৫	৭,৬৮,৬০০	২·৩%	২৮,৪৯,০০০	৭,১১,০০০
চিনে বাদাম	৫৩,১০,৪৫৪	৭০০	...	৪১,৩৩,০০০	
নারিকেল	৬,৩৯,৬৬৫	১২,৫০০	...		
রেড়ি	৪,৫৫,৮২৭	১০০	...	৫,৭৬,০০০	১০০
বিবিধ	১১,১৭,৬১৮	৩৫,০০০	...		
মোট	১,৬৪,৫৭,৫৫১	১০,৮৬,২০০	৬·৬%		

সমগ্র বাঙলাদেশের চষাজমি হইতেছে ২ কোটি ৩৪ লক্ষ একর, ইহার মাত্র ৪·৬% জমিতে তৈলবীজ রোপণ করা হয়; সমগ্র বৃটীশ ভারতের তৈলবীজের জমির মাত্র ৬·৬% ভাগ বাঙলাদেশে রোপণ করা হয়।

১৯২০-২১এ বাঙলাদেশে মোট তৈলবীজের চাষ হয় ১২,৬৭,০০০ একর জমিতে; ১৯৩০-৩১ সালে ইহা কমিয়া ১০,৮৬,০০০ একর হইয়াছিল। পরে আরও কমিয়াছে। অথচ সমগ্র ভারতে ১,৪১ লক্ষ একর হইতে ১,৬৪ লক্ষ একরে দাঁড়াইয়াছে; অর্থাৎ সমগ্র বৃটীশ ভারতে যেখানে তৈলবীজের চাষ দশ বৎসরে

বাড়িয়াছে ১০% এর উপর, সেখানে বাঙলায় কমিয়াছে ৮% এর বেশি। Statistical Abstract, 2nd Issue, No. 16, p. 302).

তৈলবীজ বাঙলার মাঠের একটা দামী ফসল। মসিনা, তিল, সরিষা, রেড়ি, সরগুজা প্রভৃতি নানা রকম তৈলবীজ বাঙলায় উৎপন্ন হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙলাদেশে তৈলবীজের চাষ ক্রমশই হ্রাস পাইতেছে। ১৯১১ সালে বাঙলাদেশে ২১ লক্ষ একর জমিতে চাষ হইত; কমিয়া ১৯২১ সালে হয় ১৬ লক্ষ একর (Bengal Administration Reort, 1921-22, p. 20) এবং ১৯৩০-৩১ সালে উহা মাত্র ১০ লক্ষ একর হইয়াছে। অর্থাৎ বিশ বৎসরে অর্ধেক হইয়াছে।

বাঙালী সরিষার তৈল খায়, মাখে; বাঙলার বাহিরে সরিষার তৈলের ব্যবহার খুব কম; বিহার, যুক্তপ্রদেশ ছাড়া রান্না খাওয়ায় খুব কমই এই তৈল ব্যবহৃত হয়। বিশ বৎসরের মধ্যে বাঙলাদেশে সরিষার চাষ খুবই কমিয়াছে—বাঙলা হইতে পঞ্জাবে সরিষার ক্ষেত বেশী; বাঙলার অল্প নীচেই বিহার-উড়িষ্যা। সমগ্র ভারতে ৩৩ লক্ষ একর জমিতে সরিষা হয়, তার মধ্যে বাঙলায় চাষ হয় ৭,৬৮ হাজার একরে। ১৯১১ সালে ১৫ লক্ষ একর, ১৯২১ সালে ১১ লক্ষ একর ও ১৯৩০-৩১ সালে ৭ লক্ষ ৬৯ হাজার একর। একর প্রতি ছয় মণ সরিষা হয়; মণে ১২।১৩ সের তৈল ও ২৭।২৮ সের খৈল হয়। এই ধারণায় বিশ বৎসরের হিসাব এইভাবে দাঁড়ায়ঃ—

		একরে ৬ মণ সরিষা হিসাবে	সরিষা তৈল	খৈল
	লক্ষ একর		লক্ষ মণ	লক্ষ মণ
১৯১১	১৫	৯০ লক্ষ মণ বা ৩,৩৩ হাজার টন্	৩০	৬০
১৯২১	১১	৬৬ লক্ষ মণ বা ২,৭৫ হাজার টন্	২২	৪৪
১৯৩১	৭,৬৮,৬০০	৪৬,১১,৬০০ মণ বা ১,৭০,৮০০ টন্	১৫,৩০,০০০	৩১

উপরের এই হিসাবটা আমাদের তৈয়ারী; ইহা হইতে রপ্তানী হয়; তবে রপ্তানীর মাল বাঙলার বাহির হইতেও আসিতে পারে। আমরা খাঁটি বাঙলার ক্ষেতের হিসাব দেখাইতেছি। সরিষার চাষ কমার অর্থ বহু-ব্যাপক; প্রথমত বাঙালীর 'তেল জলে' প্রাণ; সেই তৈল সে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করিতেছে না। উৎপন্ন না করিলে তাহাকে বাঙলার বাহির হইতে আমদানী করিতে হয়, না হয় কম তৈল ব্যবহার করিতে হয়, না হয় ভেজাল তৈল খাইতে হয়। বাঙলার বাহির হইতে প্রচুর পরিমাণে সরিষার তৈল বাঙালীর ব্যবহারের জন্য প্রতি বৎসর আসে। বাঙালী কলু বাঙলা-দেশে ক্ষয়িষ্ণু; বাঙলায় ১১,৫০০টি মাত্র দেশী ঘানিগাছ আছে। অথচ গ্রামের সংখ্যা প্রায় ৯০ হাজারের উপর। অর্থাৎ ৭।৮ খানা গ্রামের মধ্যে গড়ে একখানা করিয়া কলুদের ঘানি চলে। তেলের কলের সঙ্গে তাহারা প্রতিযোগিতা করিতে অপারগ। মেসিনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যে সব শিল্প নষ্ট হইয়াছে, কলুর কাজ তাহার অন্যতম। সাহেবগঞ্জ, কাণপুর হইতে বহু লক্ষ টাকার কলের তৈল বাঙলায় আসে।

খৈল গরুর খাদ্য ও চাষের সার। বাঙলাদেশে সরিষার চাষ কম হওয়াতে গরুর জন্য প্রচুর খৈল ও সারের জন্য খৈলের অভাব হইতেছে; বাঙলার সরিষার তৈল হিসাব করিলে দেখা যায়, মাথাপিছু বাঙালীর ভাগে পড়ে বছরে মাত্র ১·২ সের! বলা বাহুল্য মাথাপিছু বার্ষিক আঠারো ছটাক তেল অতি সামান্য; কিন্তু বোধ হয়, বাঙলার বাহির হইতে যে সরিষা ও সরিষার তৈল ও ভেজাল তৈল আসে তাহাতে করিয়া হয়ত একটু বেশি তেল মাথাপিছু পড়ে। এখন বাঙলার যে পরিমাণ ক্ষেতে সরিষা বোনা হয়, তাহার ১২ গুণ জমিতে সরিষা দিলে যে তৈল উৎপন্ন হইবে, তাহাও বাঙালীর পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। ইহার উপর যে খৈল হইবে তাহা বাঙলার কৃষিক্ষেত্রে ও বাঙলার গরুর দেহে নূতন প্রাণ দিবে। খৈলের সহিত চাষের গূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে। গ্রামে গ্রামে কলুতে তৈল পিশিলে খৈল নিকটেই চাষীরা পাইত; এখন ট্রেণ ভাড়া করিয়া তাহাকে আনিতে হয়।

একজন কলু একটি ঘানি ও একজোড়া বলদের সাহায্যে সারা দিন রাত্রে এক মণ ছয় সাত সের সরিষা পিশিষা সের পনের তৈল পায়। কামাই বাদ

দিয়া গড় হিসাবে মাসে ত্রিশ মণ ধরিলে বৎসরে ৩০০ মণ সরিষা পেশাই হইতে পারে বা ১০০ মণ তেল বাহির করিবে। ১১,৫০০ ঘানি যদি যথারীতি কাজ করে তবে ৩৪,৫০,০০০ মণ সরিষা পেশাই করিতে পারে। ইহা হইতে ১১,৫০,০০০ মণ বা ৪ কোটি ৬০ লক্ষ সের তৈল উৎপন্ন হয়; এই হিসাবে বাঙলার জনসংখ্যার মাথাপিছু এক সেরের কম করিয়া তেল বৎসরে পড়ে। কিন্তু মাথাপিছু ইহা অপেক্ষা বেশি তেল ব্যবহৃত হয়; সেটা পূরণ হয় কলের তেলের দ্বারা স্থানীয় ও আমদানী তৈল হইতে। গড়ে মাথাপিছু ৮।১০ সের তৈল বৎসরে ব্যয় করা উচিত ধরিলে ৫ কোটি লোকের জন্য যে পরিমাণ তৈলের প্রয়োজন, তাহা যদি গ্রামে উৎপন্ন করা যায়, তাহা হইলে বহু লক্ষ কলু প্রতিপালিত হয়। হিসাব করিলে দেখা যায়—গড পড়তা ১১,৫০০ ঘানিতে যে পরিমাণ তৈল হয়, তাহাতে ৫০ লক্ষ লোক তৈল পায়। ইহার দশ গুণ ঘানি অর্থাৎ ১,১৫,০০০ ঘানি হইলে বাঙলার প্রয়োজনীয় তৈলের উপযুক্ত হয়। এই ঘানিতে ৩৪ কোটি মণ সরিষা পেশাই হইবে; অথচ বাঙলাদেশে উৎপন্ন হয় মাত্র ৪৬ লক্ষ মণ!

তিল

সরিষার পর তিল বাঙলায় বেশি হয়। কিন্তু এখানেও দেখি চাষ কমিয়াছে; ১৯২১ সালে যেখানে ৩ লক্ষ একর জমিতে তিল বোনা হইত, সেখানে ১৯৩০-৩১ সালে ১½ লক্ষের কিছু বেশি জমি তিলের জন্য ছিল। এখানেও অর্ধেক। একর প্রতি ৬ মণ ৫ সের (৫০৪ পাউণ্ড) করিয়া তিল হয়। এক মণ তিলে ১৪ সের তেল হয়; ২৫।২৬ সের খৈল হয়। তিলের তেল বাঙলাদেশের লোকে খায় না; অবাঙালী কোনো কোনো জাত যেমন গুজরাটীরা তিলের তেলে রান্না করে। বাঙলায় তিল তরকারীতে দেওয়া হয়, তিলের লাড়ু হয়। আর তিলের তেল মাথায় দিবার জন্য, বিশেষভাবে সুগন্ধির সহিত মিশাইয়া বিক্রয় হয়। সমগ্র ভারতে ৩৬ লক্ষ একর জমিতে তিল বোনা হয়, ইহার মধ্যে বর্মায় ১৩ লাখের উপর একর জমিতে তিল হয়। ভারতবর্ষের মধ্যে মাদ্রাস, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, বিহার-উড়িষ্যায় বাঙলা হইতে বেশি তিল হয়।

তিসি

তিসির গাছে একপ্রকার শণ হয়; শীতকালে এই শস্য হয়। ১৯২১-২২ সালে ১,৬৭,০০০ একর জমিতে তিসির চাষ হইত; ১৯৩০-৩১ সালে হ্রাস পাইয়া ১,১৬,০০০ একরে আসিয়াছিল। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোহর, রাজশাহী, পাবনা প্রভৃতি জেলায় তিসি বেশি উৎপন্ন হয়। একর প্রতি ৫৪ মণ (৪৬৭ পাউণ্ড) তিসি হয়। বীজের সিকি তেল পাওয়া যায়। বীজের মধ্যে তিসির বীজই অধিক পরিমাণে রপ্তানী হয়। মধ্যপ্রদেশ ও বিহার-উড়িষ্যায় তিসি বেশি উৎপন্ন হয়। ভারতে প্রায় ২০ লক্ষ একর জমিতে তিসি হয়। তাহার মধ্যে বাঙলাদেশে মাত্রে ১,১৬,০০০ একর জমিতে চাষ হয়।

তিসির ক্ষেত ও ফসল

	বাঙলা		ভারতবর্ষ	
	একর	টন্	একর (হাজার)	টন্
১৯১৩-১৪	১৯৩,৭০০		৩০,৩১	৩৮৬,২০০
১৯২১-২২	১৬৩,০০০		৩০,১১	৪১৬,০০০
১৯৩০-৩১	১,১৬,০০	১৯,০০০	১৯,৯৯	২৪৪,০০০
১৯৩১-৩২	১২৬,০০০	২০,০০০	২২,১৫	২৭২,০০০
১৯৩২-৩৩	১,২৫,০০০	২০,০০০	২১,৫৫	২৬১,০০০
১৯৩৩-৩৪	১,২৪,০০০	২৪,০০০	২০,৫৭	২৪৩,০০০
১৯৩৪-৩৫	১,২৬,০০০	২৭,০০০	২১,১৫	২৬২,০০০
১৯৩৫-৩৬	৯৮,০০০	১৬,০০০	২০,৬৩	২১৬,০০০

পৃথিবীর মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকায় আর্জেন্টাইনে ১৯৩৪ সালে ৭১,০৫,০০০ একরে তিসির চাষ হয় ও ১৯,৯৩,০০০ টন্ তিসি বীজ উৎপন্ন হয়; মার্কিণ-রাজ্যে ঐ সময়ে ৯,৭৪,০০০ একর জমিতে ১,৩১,০০০ টন্ মসিনা হয়।

সেখানে ঐ চাষ খুব কমিয়াছে। ইহার পর উরুগয়ে ৮৫ হাজার টন্, পোল্যাণ্ড ৫৪ হাজার টন্, কানাডা ২৩,০০০ টন্ উৎপন্ন করে।

যত কিছু রঙের কাজে তিসির তেল লাগে; সেই জন্য য়ুরোপের রঙের শিল্প কারখানায় ইহার এত চাহিদা। অথচ বাঙলাদেশে ইহার চাষ কমিতেছে। সদ্‌ব্যবহারের জন্য তেমন চেষ্টাও দেখা যাইতেছে না। বাঙলায় রঙের কাজ বাড়িলে এই তিসির তেলের ব্যবহার বাড়িবে।

চিনে বাদাম, রেড়ি ও তুলার বীজ হইতে তৈল প্রস্তুত হয়। বাদামের তৈল খাদ্য, রেড়ির তৈল ঔষধ প্রস্তুতে ও পোড়াইবার জন্য ব্যবহৃত হয়; তুলার তৈল হইতেও খাদ্য-তৈল হয়।

চিনে বাদামের, চাষ বাঙলায় সামান্যই। রেড়ির চাষও কম। তুলার চাষও বর্তমানে নগণ্য। তুলার বীজ হইতে যে তেল হয়, তাহা হইতে একপ্রকার উদ্ভিজ ঘৃত হয়; তুলা বীজের খৈল খুব পুষ্টিকর গোখাদ্য। বাঙলাদেশে মাত্র ৫৮ হাজার একর জমিতে তুলা উৎপন্ন হয়; তাহার অধিকাংশই চট্টগ্রাম বিভাগে। তুলার বীজ প্রায় সমস্তই বিদেশে চালান হইত; ১৯২১-২২ সালে ১৪০৩ টন্ বীজ রপ্তানী হয়। এ ছাড়া মহুয়ার বীজ, সরগুজা, চালমুগরা প্রভৃতি নানা রকমের বীজ হইতে তেল হয়। বাঙলার দক্ষিণে নারিকেল গাছ হয়; বাঙলাদেশে নারিকেল তেলের ব্যবসায় অত্যন্ত মন্দা। কোচীন হইতে এই তেল আসে। প্রচুর পরিমাণে খনিজ হোয়াইট অয়েল মিশাইয়া উহা বাজারে বিক্রীত হয়। এই সব তেল বাঙলায় ভালভাবে প্রস্তুত করিতে পারিলে বাঙালীর কিছু অভাব ও বেকার-সমস্যা দূর হইবে।

তৈলবীজ ও তৈল রপ্তানী

ভারতবর্ষের চারিটা প্রধান বন্দর হইতে যে পরিমাণ তৈল বা তৈলবীজ বিদেশে রপ্তানী হয়, তাহার মধ্যে মাদ্রাস বন্দরই প্রধান। কলিকাতা ইহার পরে; উত্তর-ভারতের কাঁচামাল কলিকাতা, (কিছুটা চট্টগ্রাম), বোম্বাই ও করাচী দিয়া যায়। তৈলবীজের চাহিদা বিদেশে বেশি; তাহার কারণ স্পষ্ট। তৈলবীজ লইয়া যাওয়া সুবিধা; রপ্তানীর ভাড়া য়ুরোপীয় জাহাজ কোম্পানীরা পায়; বীজ হইতে তৈল পেশাই-এর কল তৈয়ারী করা, চালনা করা সবই

নিজ দেশের লোকের দ্বারা হয়; এবং সবথেকে লাভের কথা এই যে, খৈলটা তাহাদের নিজ দেশে থাকিয়া যায়। সরিষা, তিল ও তুলার খৈল গোখাদ্য; মসিনার খৈল সারে লাগে; বাদামের খৈল মানুষের সুস্বাদু খাদ্য। এতগুলি সামগ্রী হইতে য়ুরোপ বঞ্চিত হয়, যদি সে এদেশ হইতে তেল কেনে ও বীজ না কেনে। তাছাড়া বাঙালীর জাহাজ নাই; তাহাকে বিদেশীর জাহাজে মাল পাঠাইতে হয়; তেল পাঠাইবার যে ভাড়া লাগে তাহাতে তাহার মাল বিদেশে কাটে না; এ ছাড়া রাসায়নিক বিদ্যার চর্চার অভাব হেতু তেলের কলের কাজ অত্যন্ত গ্রাম্যধরণের হয় এবং য়ুরোপের কারখানাওয়ালারা যে জাতের মাল চায়, তাহা বরাবর সরবরাহ করা কঠিন হয়। ইহার ফলে বাঙলাদেশ হইতে ৭।৮ লাখ গ্যালনের বেশি তৈল রপ্তানী হয় না। ইহার মূল্য ছিল ১৯২২-২৩ হইতে ১৯২৬-২৭ পর্যন্ত যথাক্রমে ১৭, ২১, ২২, ২১, ১১ লাখ মাত্র; সেই জায়গায় তৈল বীজের রপ্তানীর মূল্যটা কোটিতে গিয়া পৌছায়।

	তৈলবীজ (টন্)		(লক্ষ টাকা)	
	বাঙলা	ভারত	বাঙলা মূল্য	ভারতবর্ষ
১৯২২-২৩	১,৬৪ হাজার	১১,৬৪ হাজার	৪,৩৭ লক্ষ	২৬,৮১ লক্ষ
১৯২৩-২৪	২,৫৩ ,,	১২,৪০ ,,	৬,৩৫ ,,	২৯,২৪ ,,
১৯২৪-২৫	২,১৯ ,,	১৩,১৫ ,,	৫,৫৭ ,,	৩২,৭২ ,,
১৯২৫-২৬	১,৬৮ ,,	১২,৩৮ ,,	৪,২৭ ,,	২৯,৩১ ,,
১৯২৬-২৭	১,২৫ ,,	৮,২৯ ,,	২,৫৩ ,,	১৮,৮৩ ,,
১৯৩১-৩২	৮৮ ,,	৯,৮৭ ,,	১,০৭ ,,	১৪,৫৮ ,,
১৯৩৫-৩৬	৯৪ ,,	৬,৭৩ ,,	১,২৩ ,,	১০,৩৩ ,,

তৈল ও তৈলবীজের সঙ্গেই খৈলের কথা উঠে; ভারতবর্ষ থেকে প্রায় দুইলাখ টন্ খৈল রপ্তানী হয়; বাঙলা থেকে ১৯২৪-২৫ সালে ৭৭ হাজার টন্ খৈল রপ্তানী হয়। মোট কথা তৈলবীজ, তৈল ও খৈল কৃষিপ্রধান দেশের মহাসম্পদ্; উদ্বৃত্ত তৈল নানা রাসায়নিক কারখানায় লাগিতে পারিত, যদি বাঙলায় সেরূপ বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও কারখানা থাকিত।

ফলের চাষ

বাঙলাদেশে নানাবিধ সুস্বাদু ফল উৎপন্ন হয় ; আম, কাঁটাল, কুল, পেয়ারা, পেঁপে, কলা, আনারস ইত্যাদি ; কলিকাতায় প্রতি বৎসর কালিফোর্ণিয়া হইতে ১,২০,০০০ টাকার আপেল আসে, জাপান হইতেও সেই পরিমাণ টাকার মাল আসিতেছে। এছাড়া কাশ্মীর হইতে আসে, তাহার হিসাব জানা যায় না। পার্বত্য স্থানে আপেল-নাসপাতি হয় ; বাঙলার উত্তরে হিমালয়ে প্রচুর পরিমাণ তাহা উৎপন্ন করা যায়।

কিন্তু বাঙলায় যে সব ফল প্রচুর উৎপন্ন হয়, তাহারও উন্নতি ও প্রসারের চেষ্টা নাই। পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশেরই খাদ্যের মধ্যে ভাইটামিন্ পাইবার জন্য ফলের আহার বাড়িয়াছে। বৃটনে মাথাপিছু এক মণ করিয়া ফল গড়ে বৎসরে ব্যবহৃত হয়। বৃটেনের এই ফল আসে নানা দেশ হইতে ; বোম্বাই হইতে ১৯৩২ সালে প্রথম আম বিলাতে চালান যায় এবং প্রত্যেকটি আম ১৲ করিয়া সেখানে বিক্রীত হয়। আনারস ও কলা গিয়াছে। কিন্তু বাঙলাদেশ এ বিষয়ে একেবারে অসাড়। মালদহ-মুর্শিদাবাদের আম ও রামপালের কলার চাষ বাড়াইয়া বিদেশে চালান ও দেশের মধ্যে প্রচলনের চেষ্টা করা উচিত। যেমনভাবে চা-এর নেশা বাঙলায় ঢোকানো হইয়াছিল, তেমনিভাবে প্রচুর ফল খাওয়ার অভ্যাস প্রচারের দ্বারা চল করা যায়।

বাঙলাদেশের বাহির হইতে আম আসিতেছে, আনারস আসে সিঙ্গাপুর হইতে, কলা আসে বোম্বাই হইতে ; যুক্তপ্রদেশ ও মধ্য প্রদেশ হইতে আসে পেয়ারা। অথচ এসব ফল অল্পায়াসে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের পতিত জমিতে উৎপন্ন হইতে পারে। সিলেটের আনারস, ঢাকা ও দক্ষিণবঙ্গের কলার চাষ আরও ব্যাপকভাবে করিয়া বিদেশীর ফল চালান বন্ধ করিতে পারা যায় এবং এমন কি, অন্যদেশে উদ্বৃত্ত চালান দেওয়াও যায়। আনারস অনায়াসে দক্ষিণবঙ্গে প্রচুর উৎপন্ন করা যায় ; এবং এক একর হইতে বৎসরে ৩০০।৪০০ টাকা লাভ করা যায়।

শুধু ফল-আহার ছাড়া ফলের অন্য প্রধান ব্যবহার হইতেছে জ্যাম্, জেলি, চাটনী, প্রিজার্ভ প্রভৃতি তৈয়ারী। প্রচুর ফল সস্তায় বাঙলায় উৎপন্ন হইলে

এই শিল্পও উন্নতি লাভ করিবে; এই শ্রেণীর খাদ্য হোটেলে, জাহাজে, ধনীদের গৃহে, সাহেবদের খানায় নিত্য প্রয়োজনে লাগে। সুতরাং ফলের বাগিচার প্রসার হইলে বাঙলার এই শিল্পটিও প্রসারতা লাভ করিবে।

আলুব চাষও অর্থকরী। বাঙলাদেশে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে আলুর ব্যবহার অতিশয় বাড়িয়াছে, অথচ আলুর অধিকাংশই আসে বাঙলাব বাহির হইতে। আলুব চাষে বৎসরে মাত্র চারিমাস মেহনৎ করিতে হয় ও তারপর সুব্যবস্থা করিয়া রাখিতে পারিলে ৭।৮ গুণ দামে বর্ষাকালে বিক্রয় হয়। এই চাষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে করা খুব কঠিন নয়।

কপি বাঙলাদেশে আজ অনেক জায়গায় হয়, কিন্তু বাঙলার বাহির হইতেও বিস্তর কপি চালান আসে। সুতরাং এদিকেও দৃষ্টি দিবার আছে।

ফলের মধ্যে পেঁপে কাঁচা পাকা দুই ভাবেই খাওয়া যায়। সিংহলদেশীয় বীজ আনাইয়া এই চাষ যাহাতে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে, সে বিষয়ে সরকার, লোকহিত প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যালয়সমূহ চেষ্টান্বিত হইলে বাঙালীর অশেষ কল্যাণ হইবে। প্রথমতঃ লোকে প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্য পাইবে, দ্বিতীয়তঃ উদ্বৃত্ত ফল শহরে বিক্রয় করিতে পারিবে। মোরব্বার জন্য প্রচুর কাঁচা পেঁপের প্রয়োজন। প্রচুর পেঁপে উৎপন্ন হইলে উহা শস্তা হইবে এবং শস্তা হইলে লোকে আহারও করিবে। রাঁচিতে ইহার ব্যবসায় কেহ কেহ করেন। (দ্রঃ Recovery Plan).

মশলাপাতি

মশলাপাতির মধ্যে আদা, মৌরী, জীরা, ধনিয়া ও হলুদ বাঙলাদেশেই হয়; সামান্য উদ্বৃত্ত বিদেশে রপ্তানীও হয় বলিয়া দুই হাজার টনের উপর প্রতি বৎসর রপ্তানী হয়। লঙ্কা ভারতবর্ষ থেকে দেড়লাখ হন্দরের উপর রপ্তানী হয়, তার মধ্যে বাঙলা থেকে যায় প্রায় লাখ হন্দর। রাজশাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম বিভাগে লঙ্কার চাষ খুব; নদীয়া ও যশোহরেও হয়। হলুদ গ্রামের আশে পাশেই বোনা হয়; বাঙলার বাহির থেকে হলুদ আমদানী করিতে হয়। আদা ও রসুন গ্রামের ক্ষেতে বোনে।

মশলা ছাড়া বাঙলার কৃষিক্ষেতে তরকারী ও পান হয়। পানের বরজ যাহারা করে, তাহাদিগকে বারুই বলে। তরি-তরকারীর মধ্যে আলু, পটল, বেগুণ, কপি, ফুলকপি, শালগম, ওলকপি, গাজর, মূলা, নানাবিধ শাক, কুমড়া, ঝিঙে, করলা, উচ্ছে প্রভৃতি তরকারী লোকে উৎপন্ন করে। প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ একর জমিতে ফল-মূল তরি-তরকারী হয়। তবে জলাভাবে অধিকাংশ গ্রামেই ইহাদের চাষ হয় না; গ্রামের লোকদেরও কিনিয়া খাইতে দেখিয়াছি।

চাউল, ডাল, তৈল, মশলা ও তরি-তরকারীর কথা হইল। এইবার বাঙালীর খাদ্যের আর একটি প্রধান জিনিষ বাকী আছে—সেটি হইতেছে গুড ও চিনি।

গুড় ও চিনি

বাঙলাদেশে গুড পাওয়া যায় খেজুর গাছ হইতে ও আখ হইতে। নারিকেলের ও তালের গুড় বড় বেশি হয় না। খেজুর গাছ একটি স্থায়ী সম্পদ্। ইহার কোন প্রকার যত্ন করিতে হয় না, বছর বছর সময় মত কাটিলে আপনি রস পাওয়া যায়; সেইরস জ্বাল দিলেই গুড় হয়। যশোহর, খুলনা, নদীয়ার অংশবিশেষে, ২৪ পরগণায় খেজুর গুড় হইতে দোলো চিনি হইত। বিদেশী রপ্তানী চিনির সহিত প্রতিযোগিতায় ইহারা পারে নাই; সেই জন্য চিনির ব্যবসায় প্রায় উঠিয়া গিয়াছিল; গুড় সবাৎ বা পাটালী গুড় স্থানীয় হাট-বাজারে গ্রামে বিক্রয় হয়; কলিকাতাতেও চালান যায়। অনুমান ৭০ হাজার টন্ খেজুর গুড় বাঙলাদেশে বৎসরে উৎপন্ন হয়। এক একর জমিতে ৪৫০টি খেজুর গাছ হয়; অত্যন্ত শুষ্ক জমিতে উহা হয়; ৫।৭ বৎসরের মধ্যে খেজুর গাছ 'কাটিতে' আরম্ভ করা যায়। বিশ ত্রিশ বৎসর রস দেয়। গাছ প্রতি ১০।১২ সের গুড় হয়। সুতরাং তিন বিঘা জমির খেজুর গাছ হইতে প্রায় ১২৫ মণ গুড় হয়; ইহার দাম খুব কম করিয়া ৪৲ মণ ধরিলেও আয় হয় ৫০০৲ টাকা। মধ্যবিত্ত বাঙালীর পক্ষে ইহা একটা লাভের কাজ হইতেও পারে। (দ্রঃ Recovery Plan)

আখ

বাঙলাদেশে রাসায়নিক বিজ্ঞানের উন্নতি তেমন হয় নাই বলিয়া খেজুর গুড়কে বেশি দিন রাখিবার মত কোনো ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হয় নাই। এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে। ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এ বিষয়ে দৃষ্টি দিয়াছেন।

বাঙলাদেশে অনেক জাতের আখের চাষ হয়। আখের চাষ এদেশে খুব পুরাতন। ভারতবর্ষের শর্করা শব্দ য়ুরোপে গিয়া Sugar হইয়াছে; 'খণ্ড' শব্দের অর্থ চিনি; 'খণ্ড' শব্দ ইংরেজিতে Candy হইয়াছে। শর্করা শব্দ মালয় ভাষায় 'চক্করা' এবং চক্করা হইতে পর্টুগীজরা তাহাকে Jaggery করিয়াছে; বর্তমানে ইহার অর্থ তালের গুড়। 'গৌড়' শব্দটি গুড় হইতে হইয়াছে বলিয়া প্রাচীনদের বিশ্বাস ছিল; 'পুণ্ড্র' নামে একপ্রকার আখ ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যুগে বাঙলাদেশ হইতে চিনি বিদেশে রপ্তানী হইত। ১৮৮২ সালে বাঙলাদেশ হইতে ১৫ লক্ষ টাকার চিনি বিদেশে রপ্তানী হয়। (Imp. Gaz. Ed. by W. W. Hunter; Bengal, Appendix)। ১৮৯১-৯২ সালে সমগ্র ভারতে ৩১ লক্ষ একর ভূমিতে ইক্ষুর চাষ হইত; তারপর কমিতে থাকে, ১৯০১-০২এ ২৫ লক্ষ একর; ১৯২১-২২ সালে ২৩ লক্ষ। ইহার পর বাড়িতেছে; ১৯৩০-৩১ সালে ২৮ লক্ষ। ১৯৩১-৩২ সালে ২৯·৭১ লক্ষ; ১৯৩২-৩৩ সালে ৩৩·০৫ লক্ষ।

পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষে ইক্ষুর ক্ষেত সব চেয়ে বেশি; কিন্তু বিঘা প্রতি উৎপন্ন আখের গুড় সব থেকে কম। গড়ে একরে এক টন্ ধরা যায়। কিন্তু জাভায় এক একরে ৩·৬ টন্, মিশরে ২·৮ টন্ উৎপন্ন হয়; ভারতের প্রায় সাড়ে ১১ লাখ হেক্‌টর জমিতে ১৯৩১-৩২ সালে ২৪ মিলিয়ন কুইনটন ওজনের ইক্ষু উৎপন্ন হয়; সেই জায়গায় জাভাতে ২·১২ লক্ষ হেকটর জমিতে এ বৎসর ২৪·৫ মিলিয়ন কুইনটন হয়। League of Nations, Statistical Abstract, 1931-32, p. 101 and 103.

ভারতবর্ষের চিনির যথার্থ অবনতি আরম্ভ হয় জার্মেনী হইতে বিটচিনির আমদানী সুরু হওয়ার সঙ্গে। ১৮৯১-৯২ সাল থেকে জার্মেনীর সরকারী

সাহায্যপ্রাপ্ত (Bounty-fed) চিনির ব্যবসায় খুব জাঁকাইয়া উঠে এবং ভারতের বাজারকে আক্রমণ করে। যেমন করিয়া জার্মেনী বাঙলা-বিহারের নীলের চাষের সর্বনাশ করিয়াছিল, তেমনি করিয়া এদেশের চিনির কারবার নষ্ট করিল। দেখিতে দেখিতে ভারতের চিনির ক্ষেত কমিতে লাগিল ১৮৯০-৯১ হইতে ১৮৯৮ পর্যন্ত আট বৎসরে গড়ে ২৮ লক্ষ একর জমিতে চাষ হইত। ১৮৯৯ সালে ভারত সরকার জার্মেনীর রাষ্ট্রসহায়-প্রাপ্ত আমদানী চিনির বিরুদ্ধে একটা শুল্ক চাপাইলেন; পুনরায় ১৯০২ সালে আরও শুল্ক বাড়ানো হইল। বর্তমানে জাপানের বিরুদ্ধে নানরূপ শুল্ক বসাইয়াও তাহাকে যেমন কাবু করা যাইতেছে না, তেমনি জার্মান সবকারের বাউন্টি খাওয়া চিনিব উপর মোটা পাল্টা-শুল্ক বসাইয়া ফল বিশেষ ফলে নাই। এদিকে মরিশাসে চিনির কারবার জমিয়া উঠিল। এই মরিশাস দ্বীপ ইংরেজেব সাম্রাজ্যান্তর্গত এবং সেখানকার কারবার ইংরেজেব। আইন করিয়া জার্মেনীকে আটকানো গেল বটে; কিন্তু মরিশাস দ্বীপ হইতে আমদানী ১৯০৩-০৪ সালেই দ্বিগুণ হইয়া গেল। ডাচদের জাভাতেও চিনির সামান্য কারবার ছিল; তারা এই পর্বের মধ্যে ৭০০০ টন্ হইতে ১৬,০০০ টন্ চিনি ভারতে আমদানী করিল। সুতরাং ভারতের ইক্ষুর চাষ বাড়িল না। ১৮৯৮-৯৯ সালে একটু মাথা তুলিয়া আবার নামিতে লাগিল। এ নামা পূর্বের থেকেও বেশি। জার্মেনীব আমদানী চিনির আমলে আট বৎসরে গড়ে ২৮ লক্ষ একরে চাষ হইত; মরিশাস ও জাভার আমদানী সুরু হইলে আখের ক্ষেত দাঁড়াইল আট বৎসরে গড়ে ২৪ লক্ষ একরে। ১৯০৫-০৬ সালে ২১ লক্ষ একরে আসিয়া দাঁড়ায়।

বাঙলাদেশে এককালে প্রচুর চিনি উৎপন্ন হইত। ১৮শ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে বাঙলার চিনি য়ুরোপে রপ্তানী হয়। ১৮৩০ সালে কলিকাতা হইতে ২,৮৭,১৭৩ মণ চিনি রপ্তানী হয়; ১৮৪৫ সালে ১৮,৭৯,৭৭৪ মণ, ইহার মূল্য ছিল ১ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা। তখন চিনির কারখানা ছিল কোটচাঁদপুর, তারপুব, গোবরডাঙ্গা, সুখচর, বগুড়া, ঢাকা প্রভৃতি নানা স্থানে। জার্মেনীর আমদানী চিনির বিরুদ্ধে শুল্ক ১৯০২ সালে বেশি করিয়া ধরা হইলে বাঙলায় কতকগুলি চিনির ছোট ছোট কারখানা হয়; স্বদেশী

আন্দোলন আসিলে, দেশী চিনির কারবার ভালই চলিতে থাকে। কিন্তু মরিশাসের চিনি ও জাভার চিনি আসিলে এই দামে-শস্তা দেখিতে-ভাল চিনির কাছে বাঙলার দোলো-চিনি টিঁকিতে পারিল না। সে-সময়ে বাঙলায় সরকারী কৃষি বা শিল্প এমন কোনো বিভাগ ছিল না যে, চিনির উন্নতি বিষয়ে উপদেশ ও ব্যাপকভাবে প্রচার করিতে পারিত। ফলে জার্মান চিনি গেল বটে, কিন্তু আসিল মরিশাসের ইংরেজ কুঠিয়ালদের ও জাভার ডাচ-মালিকদের চিনি। সুতরাং বাঙলার শিশু শিল্প উঠিতে না উঠিতে মারা পড়িল। কালে জাভাই চিনির কারবারে সর্বেসর্বা হইয়া উঠিযাছিল। যুদ্ধের সময় ও পরে য়ুরোপের বীট্ চিনি এদেশে আসা বন্ধ হয়, তখন জাভা ও মরিশাস একচেটিয়া করিয়া লইল। ফলে কোটচাঁদপুরের কারখানা ১৯২৫ সালে উঠিয়া গেল। বিদেশ হইতে তখন ভারতে ২ কোটি ৭০ লক্ষ মণ চিনি আমদানী হইত।

জার্মান Beet চিনি ১৮৯২ সাল হইতে এদেশে আমদানী হইতে থাকে; ভারতবর্ষে কড়া শুল্ক বসানো সত্ত্বেও জার্মান চিনির বাণিজ্য লোপ পাইল না। ১৯১৪ সাল পর্যন্ত জার্মানরা সমানে মরিশাস চিনির সঙ্গে টেক্কা দিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধ বাধিলে জার্মান চিনি বন্ধ হয়। ফলে মরিশাস ও জাভা চিনি, যার দর ছিল ৮৸৵০ হঠাৎ হইয়া গেল ১৫৸০। ১৯১৬ সালে ১৯৸৵০, ১৯১৭ সালে ২১।০, ১৯১৮তে ১৮।০, ১৯১৯এ ২৭।০, ১৯২০ সালে ৪৪।০ পর্যন্ত উঠে। ১৯২৪ সাল পর্যন্ত ২৫৴০ ছিল। কিন্তু ১৯২৫ সাল হইতে জার্মেনদের বীট চিনি পুনরায় দেখা দেওয়া মাত্রই চিনির দর কমিয়া হইল ১১৷৵০। সেই হইতে কমিতে কমিতে ১৯৩১ সালে ৮৷৵০ আনায় নামে। জাভা মরিশাসের একচেটিয়া সত্ত্বের ফলে তাহারা যা খুশী দাম চাহিত ও ভারতবর্ষকে বিনাবাক্যে সেই মূল্য দিতে হইত; কারণ তখন বাঙলাদেশে চিনি ছিল না।*

১৯৩১ সাল হইতে ভারতের চিনির ইতিহাসে নূতন পর্ব আরম্ভ হইয়াছে;

---

* Index Number of Indian Prices, 1861-1931—Delhi, 1937; Table V. p. 9.

ভারতীয় চিনির কারবারকে উন্নত করিবার জন্য ভারত গবমেণ্ট বিদেশী চিনির উপর প্রতি মণে ৩।১৫ টাকা স্থানে ১০৲ শুল্ক ধার্য করেন। বৃটীশ সাম্রাজ্যের বাহিরেব যেসব দেশ হইতে মাল আসে, তাহাদের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য হয়। মরিশাস বৃটীশ সাম্রাজ্যভুক্ত বলিয়া কিছু সুবিধা পাইল; আঘাত পড়িল গিয়া জাভার চিনির শিল্পে। মোট কথা, এই অভাবনীয় সুযোগ লাভ করিয়া ভারতের ধনিকরা চিনির কল করিতে সুরু করিলেন। এবিষয়ে যুক্তপ্রদেশ ও বিহার বাঙ্গলা হইতে আগাইয়া চলিল। বাঙলার বাহিরেই ১৯৩১ সালের পূর্বে ২৯টি কারখানা ছিল মাত্র। বাঙলায় মাত্র তিন চারিটি কল; দুঃখের বিষয়, ইহার মধ্যে বাঙালীর একটিও নহে। ভারতের চিনির কলে ৩০ লক্ষ মণ চিনি উৎপন্ন হয়; নূতন কারখানাগুলি হইতে চিনি বাহির হইলে আর ও ১৪।১৫ লক্ষ মণ চিনি হইবে, আশা করা যায়। সমস্ত ভারতের চিনির চাহিদা পূরণ করিতে হইলে আরও ২৫০টি কারখানার প্রয়োজন। ১৯৩৯এ ভারতের প্রয়োজনীয় চিনি প্রস্তুত হইতেছে। আমদানী চিনির এক তৃতীয়াংশ বাঙলা বন্দরে নামে।

১৯৩৪-৩৫ সালে ভারতে চিনির কারখানা ছিল ১৪২টি, তৎপূর্ব বৎসরে ছিল ১১৫টি। চিনি-শিল্প যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে সর্বপ্রধান; ভারতের মোট উৎপন্ন চিনির ৫০·৮% ও ৩১·৭% (=৮২·৫) ভাগ যথাক্রমে ঐ দুই প্রদেশে প্রস্তুত হয়। ইহার পরেই ভারতে দেশীয় রাজ্যের স্থান ৫·৪% ভাগ। ইহার পর বোম্বাই ও মাদ্রাস ৩·২৫% ও ৩·২% ভাগ যথাক্রমে। বর্মায় ২·৭% অংশ উৎপন্ন হয়। ইহার পর বাঙলাদেশ ১·৮%, সর্বনিম্নে পঞ্জাব ১·১৫%। উপরের এই তালিকা হইতে বুঝা যাইবে বাঙলার স্থান চিনির শিল্পে কি এবং এই ১·৮% ভাগের অধিকাংশই অবাঙালী ধনিকের হাতে। (দ্রঃ আর্থিক উন্নতি, ১০ম বর্ষ, ১৩৪২, পৃঃ ৭১-৭২)। ভারত সরকার চিনির কলের উপর ১৯৩৪-৩৫এ নূতন একটা কর (excise)—মোটা চিনির উপর হন্দরে দশ আনা, অন্য চিনির উপর ১।৴০ হন্দর প্রতি ধার্য করেন। সরকার বলেন যে, বিদেশী চিনি আমদানীর উপর শুল্ক হইতে যে আয় হইত তাহা কমতি হইয়াছে, সেই জন্য কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট এই একসাইজ কর ধার্য করিয়াছেন।

এইসব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারের ফলে বাঙলাদেশের আখের ক্ষেত কিভাবে কমিয়াছিল তাহা দেখাইতেছি :—

		একর	মোট
১৯০৪-০৫	বাঙলা, বিহার-উড়িষ্যা	৬,৩৩,০০০	
	আসাম ...	৪৪,০০০	
			৬,৭৭,০০০
১৯০৬-০৭	বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যা	৪,২৩,০০০	
	পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম	২,০০,০০০	
			৬,২৩,০০০
১৯২১-২২	বাঙলা ...	২,২০,৯০০	
	বিহার-উড়িষ্যা ...	৩,০৫,৯০০	
	আসাম ...	৪০,১০০	
			৫,৬৮,০০০
১৯৩০-৩১	বাঙলা ...	১,৯৮,৫০০	
	বিহার-উড়িষ্যা ...	২,৮৪,০০০	
	আসাম ...	৩২,০০০	
			৫,১৪,৫০০

পঁচিশ বৎসরের মধ্যে পূর্বভারতে বাঙলা, বিহার-উড়িষ্যা ও আসামের ইক্ষুক্ষেত ৬,৭৮,০০০ একর হইতে কমিয়া ৫,১৪,৫০০ একরে পরিণত হইয়াছিল ; ইহার ফলে যে কেবল একটা শিল্প ধ্বংস হইল, তাহা নহে, বিদেশী চিনির আমদানী বাড়িয়া চলিল ; বাঙলার বন্দরে বিদেশী চিনির কয়েক বৎসরের আমদানীর হিসাব নিম্নে দিতেছি :—

	দোলো চিনি	পরিষ্কার চিনি
	মণ	মণ
১৮৮১-৮২	...	৬৬,৪৩০
১৮৯১-৯২	১,৯০,৪৪৫	৬,২০,৫৭০
১৯০১-০২	২২,৭৫,৪৭৩	৭,১৪,৪২৯
১৯১০-১১	৩১,৩১,৬১০	৭২,৫৪,০৭৭
১৯২১-২২	২৪,৩৮,১৩১	৯৫,৩০,৬৯০
১৯৩০-৩১	...	১,১৫,০২,১০০

বিদেশ হইতে চিনির রপ্তানী বিংশ শতাব্দীতে কিভাবে বাড়িয়া চলিয়াছিল, তাহা দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। ১৮৯১এ যেখানে বাঙলা দেশ ৬৯ লক্ষ টাকার চিনি আমদানী করিয়াছিল, দশ বৎসর পর ১৯০১এ সেখানে হইয়াছিল ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। ১৯১২-১৩র নূতন বঙ্গ ৫ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকার বিদেশী চিনি আমদানী করিল; যুদ্ধ-পর্বের পাঁচ বৎসরে গড়ে ৬ কোটি ৬৭ লক্ষ; যুদ্ধের পর ১৯১৯-২০ হইতে ১৯২৮-২৯ এই দশ বৎসরে চিনি বাবদ গড়ে বৎসরে ৭ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা করিয়া বিদেশে গিয়াছিল। ১৯২৯-৩০এ ৫·৮২ কোটি টাকার চিনি আসে। ইহার পর ভারতীয় চিনির কারবার উন্নতি লাভ করিতে আরম্ভ করে, এবং বিদেশী আমদানী দ্রুত কমিতে লাগিল; ১৯৩০-৩১এ প্রায় ৪ কোটি টাকার, ১৯৩১-৩২এ ১ কোটি ৯১ লক্ষ টাকার চিনি আসিল। কিন্তু ইহাতে বাঙলাদেশ বা বাঙালী কতখানি লাভবান্ হইল, সে-কথা বাঙালী ভাবে নাই। এতকাল বিদেশ তাহার চিনি সরবরাহ করিত, এখন পরদেশী ধনিকরা সেই কাজ করিতে সুরু করিল।

এই শেষ বৎসরে ভারতের শর্করা শিল্পের ইতিহাসে নূতন পরিচ্ছেদ সুরু হইল। ভারত গভর্মেণ্ট ১৯৩১এর মার্চ মাসে বিদেশী রপ্তানী চিনির উপর প্রতি হন্দরে (১ মণ ১৬ সের) ৭৷০ টাকা এবং সেপ্টেম্বরে পুনরায় হন্দর প্রতি সারচার্জ রাজস্ব ২৫% হিসাবে ১৸৴০ করিয়া কর ধার্য করিলেন; এই শুল্ক দিয়া জাভার ওলন্দাজ শর্করা-শিল্পীদের পক্ষে আর ভারতে চিনি পাঠানো সম্ভব হইল না। এদিকে ১৯৩২এর জানুয়ারী হইতে সাত বৎসরের জন্য (১৯৩৮ পর্যন্ত) ৭৷০ আনা কর পাকা হইল। কিন্তু এই পর্ব শেষ হইয়াছে এবং তৎপূর্বেই ভারতীয় শর্করা শিল্পকে বিদেশী প্রতিযোগিতা হইতে মুক্তি দিবার জন্য যে ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে সর্বসাকুল্যে বিদেশী চিনিকে হন্দর প্রতি ৯৴০ আনা শুল্ক দিতে হয়।

ভারত গভর্মেণ্টের নিকট হইতে এই উৎসাহ পাইয়া ধনিকরা দ্রুত কল স্থাপনে ও চাষীরা ইক্ষুচাষে মন দিল; ভারতে বিদেশী চিনি যেখানে ১৯৩০-৩১এ প্রায় ১০ লক্ষ টন আসিত, পর বৎসরেই শতকরা ৪৫% কমিল; কমিতে কমিতে ১৯৩৩-৩৪এ ২·২৫ লক্ষ টন, ১৯৩৪-৩৫ এ ২·২১ লক্ষ টন হইল। আখের ক্ষেত বৃটিশ ভারতে ১৯৩০-৩১এ ছিল ২৬,৮৪,০০০ একর, সেখানে

১৯৩৫-৩৬এ হইয়াছে ৩৮,০৯,০০০।* পূর্বভারতেও বাড়িয়াছে; পূর্বের তালিকার সহিত তুলনা করুন :—

	১৯৩৫-৩৬
বঙ্গদেশ	৩,২৫,০০০ একর
বিহার-উড়িষ্যা	৪,৬৫,০০০ ,,
আসাম	৩৮,০০০ ,,
	৮,২৮,০০০ একর

পূর্বেই বলিয়াছি গবর্মেণ্টের এই রক্ষণ-শুল্কের প্রধান সুযোগ গ্রহণ করিল ধনিকরা। ১৯২৯-৩০এ ভারতে ২৭টি মাত্র চিনির কল ছিল; সকলপ্রকারে চিনি প্রস্তুত হইত মোট ৩,১০,০০০ টন। ইহার পর কিভাবে ভারতে কলের সংখ্যা ও উৎপন্ন চিনির পরিমাণ বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহার তালিকা নিম্নে দিলাম :—

	কল	মোট সকল প্রকার চিনি টন্
১৯২৯-৩০	২৭	৩,১০,৯১৮
১৯৩০-৩১	২৯	৩,৫১,৬৫০
১৯৩১-৩২	৩২	৪,৭৮,১১৯
১৯৩২-৩৩	৫৭	৬,৪৫,২৮৩
১৯৩৩-৩৪	১১২	৭,১৫,০৫৯
১৯৩৪-৩৫	১৩০	৭,৫৭,২১৮
১৯৩৫-৩৬	১৩৭	১০,৯১,৬০০
১৯৩৬-৩৭	১৫০	১১,৫০,৬০০

ভারতের বাৎসরিক চিনির প্রয়োজন প্রায় ১০ লক্ষ টন, সুতরাং বিদেশ হইতে শর্করা আমদানী করিবার আর প্রয়োজন নাই।

বিদেশ হইতে চিনি আমদানীর শুল্ক হইতে ভারত গবর্মেণ্টের মোটা একটা আয় ছিল; ১৯৩০-৩১এ চিনির আমদানী শুল্ক ছিল ১০ কোটি টাকার উপর; ১৯৩৫-৩৬ এ হয় ৩·২৩ কোটি টাকা। সুতরাং রাজস্বের দিক্ হইতে

* ১৮৯০-৯১ হইতে ১৮৯৭-৯৮ গড়ে প্রতি বৎসর ২৮,১৮,২৫০ একর; ১৮৯৮-৯৯ হইতে ১৯০৫-০৬ গড়ে ২৪,২৯,৭০০ একরে নামিয়াছিল।

গবর্মেণ্টের ক্ষতি হইয়াছে; তবে ইহার অনেকটা পূরণ হইয়াছে ১৫০টি কলের আয়কর হইতে; এতদ্ব্যতীত গবর্মেণ্ট ১৯৩৪এর এপ্রিল হইতে চিনি-কলের প্রস্তুত প্রতি হন্দর চিনিতে ১।/০ ও খাড় চিনির উপর ॥৵০ করিয়া শুল্ক (excise) ধার্য্য করিয়াছেন; ইহাতে ১৯৩৪-৩৫এ গবর্মেণ্টের ১,৫৮,৫২,০০০ টাকা লাভ হয় এবং পর বৎসরে প্রায় ২·২৫ কোটি টাকা ঐ খাতে আদায় হয়। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতে শর্করা শিল্পের যে উন্নতি হইয়াছে, তাহার কথা বিবৃত করিলাম; কিন্তু যে বাঙলাদেশ এককালে শর্করা শিল্পে অগ্রণী ছিল, সে এখন এই শিল্পে কোথায়, তাহার কথা আলোচনা করিতে গেলেই মুস্কিল হইবে। বর্ত্তমানে এদেশে মাড়োয়ারী ধনিকরা কয়েকটি চিনির কারখানা খুলিয়াছেন; ইহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে বেলডাঙ্গা ও দিনাজপুরের কারখানা। বাঙালীদের চেষ্টায় দুই একটি কল হইতেছে।

পরিশিষ্ট

চিনির আমদানী

বৎসর	বাংলাদেশের পরিমাণ	ঐ চিনির মূল্য (হাজার টাকা)	ভারতের মোট আমদানী চিনির মূল্য (হাজার টাকা)
১৮৯১		৬৯,০১	
১৯০১		১,৬০,০০	
১৯০৩-০৪		১,৮৩,০০	৬,৯০,২৭
১৯১৩-১৪	৮৫,১৩,০০০ (হন্দর)	৬,৫৭,৯৫ গড়ে	১৪,৯৫,৬৯
১৯১৪-১৫ হইতে ১৯১৮-১৯	যুদ্ধপর্ব	৬,৬৬,১০	১৪,৮৮,৩২
১৯১৯-২০ হইতে ১৯২৩-২৪ গড়ে	২,৭২,০০০ টন	৮,৪২,০৫	১৯,৯৪,৩৬
১৯২৪-২৫ হইতে ১৯২৮-২৯ গড়ে	৩,৬২,০০০ টন	৬,৮৪,১৬	১৭,২৪,৭৩

বৎসর	বাঙলাদেশের পরিমাণ	ঐ চিনির মূল্য (হাজার টাকা)	ভারতের মোট আমদানী চিনির মূল্য (হাজার টাকা)
১৯২৯-৩০	৪,৩০,০০০ টন	৫,৮২,৫০	১৫,৭৭,১৫
১৯৩০-৩১	৪,২৫,০০০ ,,	৩,৯৯,৯৮	১০,৯৬,৪৬
১৯৩১-৩২	২,০৩,০০০ ,,	১,৯১,৪১	৬,১৬,৫৩
১৯৩২-৩৩			৪,২২,৮৭
১৯৩৩-৩৪			২,৭০,৯৭
১৯৩৪-৩৫			২,১০,৮৫
১৯৩৫-৩৬			১,৯০,৭৩

তামাক

তামাক ভারতেব আদিম কৃষিজাত উদ্ভিদ্ নহে। ইহার আদি বাস আমেরিকা—এদেশে আন্দাজ ১৬০৫ খৃঃ অব্দে পর্তুগীজ কর্তৃক আনীত। তারপর নেশার জিনিষ বলিয়া ধীবে ধীরে সমস্ত দেশে ইহাব চাষ ও সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে ইহার বিচিত্র ব্যবহার প্রসার লাভ করিল। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৮২৯এ ভারতে তামাকচাষের উন্নতি বিষয়ে মনোযোগ দেন এবং তাহার ফলে পূর্বাঞ্চলে বাঙলায় ও দক্ষিণে মাদ্রাজে এই চাষ প্রসার লাভ করে; পরে বর্মায় ইহার চাষ প্রসারিত হয়।

ভারতের মধ্যে বাঙলাদেশই তামাকের চাষে প্রধান এবং ইহার মধ্যে রঙ্গপুর জেলা প্রধান। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙলায় তামাক-শিল্প গড়ে নাই; মাথা-তামাক বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত। কিন্তু কলিকাতার মাথা-তামাক ব্যবসায়ে বাঙালী খুব কম। সিগার ও সিগারেট ফ্যাক্টরী বাঙালীর নাই; মাদ্রাজে দিন্দিগুল নামক স্থানে অনেকগুলি সিগার কারখানা গড়িয়াছিল, কিন্তু সিগারের উপরকার বিদেশী তামাক পাতার উপর অতিরিক্ত শুল্ক চাপানোর ফলে অনেকগুলি কারখানা ফরাসী পণ্ডিচেরিতে উঠিয়া গিয়াছে। বাঙলাদেশে কোনো সিগার ফ্যাক্টরী না গড়িয়া উঠায় রংপুরের ভাল জাতের তামাক পাতা প্রায় সবই মাদ্রাজে চালান হইয়া যায়।

সমগ্র বৃটীশ ভারতে ১৯১১-১২ হইতে ১৯২০-২১ পর্যন্ত গড়ে ১০ লক্ষ একর জমিতে তামাক চাষ হইত; ১৯২১-২২এ ১০,৫০,৬৮৫ একর ছিল, ইহার মধ্যে বাঙলাদেশে ছিল ২,৯৮,১০০ একর অর্থাৎ সিকিভাগের বেশি। ১৯৩২-৩৩এ ভারতের কোন্ প্রদেশে কত একর করিয়া তামাক চাষ হইত তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :—

	একর
বাঙলাদেশ	২,৮১,০০০
মাদ্রাজ	২,৫৬,১১৪
বিহার-উড়িষ্যা	১,৬১,০০০
বোম্বাই	১,৩৬,৬৩০
বর্মা	৯২,৩২৪
যুক্তপ্রদেশ	৮৩,৪৫০
পঞ্জাব	৬৬,৩৫০
মধ্যপ্রদেশ	১৬,৮৭২
আসাম	১৩,৩৩২
সীমান্ত প্রদেশ	৮,১৬১
দিল্লী	৯৬২
আজমীর	২১
কুর্গ	৮
মোট	১১,১৭,১৯৪

বাঙলাদেশে ২০ বৎসর পূর্বে আরও অধিক ভূমিতে তামাকের চাষ হইত; যুদ্ধপর্বে (১৯১৭-১৮ ছাড়া) কোনো বৎসর ৩,১১,০০০ একরের কম জমিতে চাষ হয় নাই। কিন্তু ইহার পর জমির পরিমাণ খুব ওঠানামা করিয়াছে।

	বাঙলা	বৃটিশ ভারত
১৯১১-১২	৩,০৬,৩০০ একর	৯,৯৮,৯৪৩ একর
১৯২১-২২	২,৯৮,১০০ ,,	১০,৫০,৬৮৫ ,,

	বাঙলা	বৃটিশ ভারত
১৯৩২-৩৩	২,৮১,০০০ একর	১১,১৭,১৯৪ একর
১৯৩৪-৩৫	৩,০৭,৬০০ ,,	১২,৫৬,৮৫৫ ,,

মোট কথা ২৫ বৎসরে সমগ্র ভারতে ২'৫০ লক্ষ একর জমিতে চাষ বাড়িয়াছে, আর বাঙলায় ১৩০০ একর মাত্র; কিন্তু তাহার পূর্বে ত' কমিয়াই ছিল। অথচ বাঙলার বন্দরে তামাক নানাভাবে বিদেশ হইতে আমদানী হইতেছে—পাতা, পাইপের পাতা, সিগার, সিগারেট প্রভৃতি।

১৯২২-২৩ হইতে ১৯৩১-৩২ পর্যন্ত দশ বৎসরে তামাক পাতা বাঙলায় প্রতি বৎসর আমদানী হইয়াছিল ১৮'৭৫ লক্ষ পাউণ্ড বা ২২,৮০০ মণ,—ইহার মূল্য ছিল গড়ে ১৪'২৫ লক্ষ টাকা। ইহার অধিকাংশ যাইত মুঙ্গেরের ইম্‌পিরিয়াল টোবাকো কোম্পানীর কারখানায়। ১৯২১-২২ হইতে ১৯৩০-৩১ দশ বৎসরে গড়ে সিগার আসিয়াছিল ৮৬ হাজার টাকার, সিগারেট আসিয়াছিল ৫৮'৭৭ লক্ষ টাকার, পাইপের তামাক ৮'৫৬ লক্ষ টাকার ও অন্যান্য তামাকজাত সামগ্রী ১১,৫০০ টাকার। বিশ্বজোড়া আর্থিক দুর্গতি ও অসহযোগ আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত বাঙলার বন্দরে তামাকজাতীয় সকল প্রকার সামগ্রীর মূল্য আট বৎসরে গড়ে ছিল ৯০'৬০ লক্ষ টাকা। ১৯২৯-৩০এ ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত উঠে। ইহার পর আমদানী কমিতে থাকে; ১৯৩০-৩১ হইতে ১৯৩৪-৩৫ পর্যন্ত গড়ে ৩৭'৯৬ লক্ষ টাকা ছিল; ১৯৩৪-৩৫এ কমিয়া ২৩'২১ লক্ষ হইয়াছিল।

তামাকের চাষ বাড়ানো ও সিগার-সিগারেট প্রভৃতির কারখানা এদেশে প্রতিষ্ঠিত না করিতে পারিলে এত লক্ষ টাকা বিদেশে চালান বন্ধ হইবে না। তামাকের চাষে চাষীর লাভ বেশী, কিন্তু অধিকাংশ চাষী ইহার চাষ সম্বন্ধে অজ্ঞ; বীরভূমের ন্যায় শুষ্ক প্রদেশে তামাকের চাষ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ফলন খুব ভাল হয়। ধান, গম, তিসি, সরিষা একরপ্রতি যে পরিমাণ উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে যে দাম পাওয়া যায়, তাহা হইতে অধিক দাম পাওয়া যায় আখ, পাট ও তামাকে। ১৯২৯-৩০এ এক একর জমির তামাকের মূল্য ছিল ১৭১৲ টাকা, পর বৎসরে ১১৪৲।

বাঙলাদেশের পশ্চিম বঙ্গের দুই একটি জেলা ছাড়া প্রত্যেক জেলাতেই চাষীদের তামাক খাইবার মত কিছু কিছু তামাকের চাষ হয়; বড় রকমের চাষ হয় রঙপুর, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে। বর্ষার পর তামাক বীজ পোঁতা হয়; মাসদেড় পরে বীজক্ষেত থেকে চারা উঠাইয়া অন্যত্র রোয়া হয়। মাঘ-ফাল্গুনে পাতা কাটিবার মত হয়। রঙপুর সরকারী কৃষিবিভাগের চেষ্টায় ভালজাতের তামাক বোনা হইতেছে, এমন কি, আমেরিকার বিখ্যাত ভার্জিনিয়া তামাকও এদেশে ভাল উৎরাইয়াছে। যশোহর জেলার যমুনার ধারে হিংলী গ্রামের তামাককে 'হিংলী' বলে, সর্বত্রই ইহার আদর। ভাল মতিহারী (বিহারী)র মণ ৩০৲—৪০৲।

বিড়ি এদেশে অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড কুটীর শিল্প হইয়া উঠিয়াছে। তামাক পাতা কুটিয়া শুক্‌না অবস্থায় কেন্দ পাতার মধ্যে পাকাইয়া বিড়ি করা হয়। কেন্দপাতা আসে ছোটনাগপুর ও মধ্যপ্রদেশ হইতে। কলিকাতা ও ছোট ছোট শহরে বিড়ির দোকান ও ছোট ছোট কারখানা কত যে আছে, তাহার হিসাব দেওয়া কঠিন। বাঙলা হইতে ৬।৭ লাখ টাকার বিড়ি বর্মা, ষ্ট্রেট্‌স্ সেটলমেণ্ট প্রভৃতি ভারতীয় উপনিবেশে যায়।

বাঙলাদেশে বিদেশী তামাক ও তামাকজাত সামগ্রীর আমদানী।

বৎসর	বিবরণ		পরিমাণ
১৯০৯-১০ হইতে ১৯১৩-১৪	গড়ে প্রতি বৎসর যুদ্ধের পূর্বে	…	২৭,৪৯,২৯১৲
১৯১৪-১৫ হইতে ১৯১৮-১৯	গড়ে প্রতি বৎসর যুদ্ধপর্ব	…	৪৫,৪১,৭৫৬৲
১৯১৯-২০ হইতে ১৯২৩-২৪	যুদ্ধের পর গড়ে প্রতিবৎসর	…	৭২,৯৪,০০০৲
১৯২৪-২৫ হইতে ১৯২৮-২৯	গড়ে প্রতি বৎসর … [৪৪,৭৭,৩৬০ পাঃ]	…	৯০,৮৬,৪৬০৲
১৯২৯-৩০	সর্বোচ্চ আমদানী … [৪৪,৩৪,৩০০ পাঃ]		১,২০,৯৬,০০০৲
১৯৩০-৩১ হইতে ১৯৩৪-৩৫	মন্দাবাজারে গড়ে প্রতি বৎসর [২২,৫৮,৭০০ পাঃ]	…	৩৭,৯৬,৫২০৲

১৯১০ হইতে ১৯৩০ পর্যন্ত ২০ বৎসরের মধ্যে তামাকের আমদানীর অঙ্ক-গুলি হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, আমদানী বিশ বৎসরে ৪½ গুণ বা ৪৫০% বাড়িয়াছিল এবং অসহযোগ আন্দোলন ও পৃথিবীব্যাপী দুর্গতি স্বরু হইলে আমদানী হঠাৎ প্রায় ৩½ গুণ বা ৩৫০% এ নামিয়া আসিল; কিন্তু তামাক বা সিগারেট প্রভৃতি কমে ৫০%এর কম।

গাঁজাশণ

গাঁজা শণ জাতীয় একপ্রকার গাছের ফুল হইতে নির্গত স্রাব ও মঞ্জরী। ইহা মাদক দ্রব্য, লোকে নেশার জন্য তামাকের মত সাজাইয়া ধূমপান করে। ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই ইহার চাষ আছে—বর্মাই প্রধান, ইহার পর মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ইত্যাদি। বাঙলায় গাঁজা শণের চাষ সব থেকে কম। পূর্বে যশোহর জেলায় ইহার প্রধান চাষ হইত, এখন রাজশাহী জেলার নওগাঁ ছাড়া আর কোথায়ও চাষ হয় না, এবং ইহাও সরকারী আবগারী বিভাগের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। চাষীরা সমস্ত গাঁজা সরকারী অপিসে দিতে বাধ্য; তাহারা বাজার দর পায়। গবর্মেণ্ট গাঁজা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। দোকানদার সরকারী লাইসেন্স ক্রয় করিয়া গাঁজার-দোকান দিতে পারেন।

১৯১০-১১এ অখণ্ড বাঙলাদেশে ২২৯৮ গাঁজার দোকানে ৩৯৬৩ মণ গাঁজা বিক্রয় হয় এবং গবর্মেণ্ট লাইসেন্স ও গাঁজার দাম বাবদ ২৮,৮৩,৬০০ টাকা পান। ১৯২০-২১এ ১২৬৭টি দোকান ১৮৪০ মণ গাঁজা বিক্রয় হয় এবং সরকারী আয় ছিল ৩৮,১৬,৪৫৮৲। ১৯৩০-৩১এ ১২১১টি দোকানে ১০১৩ মণ গাঁজা বিক্রয় হয় ও আয় হয় ৩০,৯৪,৫৫৪৲।

নওগাঁ হইতেছে গাঁজা চাষের একমাত্র স্থান, ১৯২০-২১ এ ২৭০০ বিঘায় চাষ হয়—গাঁজা পাওয়া যায় ৬৮৪৭ মণ; গড়ে বিঘাপ্রতি ২/৷১৭ মণ গাঁজা পাওয়া গিয়াছিল। ১৯২৭-২৮এ ১৭৯৬ বিঘায় ৬০৭৩ মণ অর্থাৎ বিঘাপ্রতি ৩/৷৫ মণ গাঁজা উৎপন্ন হয়। ১৯৩৫-৩৬ এ গাঁজাক্ষেত ৭১৬ বিঘায় দাঁড়ায়, কিন্তু উৎপন্ন হয় ৩০০০ মণ।

আমাদের দেশে গাঁজাশণের এই একমাত্র ব্যবহার অর্থাৎ নেশার সামগ্রী উৎপন্ন করা। কিন্তু গাঁজাশণের আঁশ হইতে খুব ভাল দড়ি তৈরী হয় এবং যখন পাট বিলাতে ১৭ পাউণ্ড টন্ বিক্রয় হইয়াছে, তখন গাঁজাশণ ১৮ পাউণ্ড টন্ প্রতি দর পাইয়াছে। গাঁজাশণের জন্য পাটের ন্যায় প্রচুর জলের প্রয়োজন হয় না। বাঙলার সর্বত্র উহা হইতে পারে। এই শণ ইউরোপে বহু দেশে উৎপন্ন করা হয়; ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের Hemp বা শণ খুব বিখ্যাত।

তূলা

বাঙলার নিতান্ত নগণ্য চাষের মধ্যে পড়ে তূলার চাষ। বৃটিশ ভারতের যেখানে প্রায় দেড় কোটি একর জমিতে তূলার চাষ হয়, সে জায়গায় বাঙলার চাষ হইতেছে ৫৮,০০০ একর মাত্র। বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলায় সামান্য চাষ হয়, আসলে হয় চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশে। কিন্তু চিরদিন বাঙলার তূলার চাষের অবস্থা এমন শোচনীয় ছিল বলিয়া মনে হয় না; পূর্বকালে বাঙলার কাপড় প্রস্তুতের জন্য তূলা ও সূতা বিদেশ বা অন্য প্রদেশ হইতে আসিত না; একথা নিশ্চিত যে এখানকার তূলায় এখানেই সূতা কাটা হইত এবং সেই সূতা হইতে কাপড় বোনা হইত। শুধু তাহাই নহে বিদেশে সূক্ষ্ম কাপড় চালান যাইত। মসলিনের উপযুক্ত তূলা বাঙলায় হইত।

বর্ত্তমানে বাঙলাদেশে যে সামান্য তূলা উৎপন্ন হয়, তাহার আবার অতি সামান্য অংশ এদেশে ব্যবহৃত হয়; বিদেশীরা সে তূলা সস্তায় কিনিয়া লইয়া যায় এবং বোধহয় উন্নততর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বারা এই নিকৃষ্ট তূলাকে মূল্যবান্ সামগ্রীতে পরিণত করে। জাপান ইহার প্রধান খরিদ্দার।

বাঙলায় তূলার চাষ ১৯২১-২২এ ছিল ৪৮,৩০০ একরে; দশ বৎসর পরে ১৯৩০-৩১এ ৫৮,১০০ একর; খদ্দর আন্দোলনের সঙ্গে বোধহয় ১৯৩১-৩২এ বাড়ে; তখন হয় ৭৬,০০০ একর। কিন্তু ১৯৩২-৩৩এ পুনরায় দেখি ৫৮,৬০০ একর; ইহার পর আরও কমিয়াছিল। পূর্বেই বলিয়াছি চট্টগ্রাম পার্বত্য প্রদেশেই প্রধানত উৎপন্ন হয়।

তূলার চাষে বাঙলার অবস্থা কি, তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিবার জন্য আমরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের তূলার চাষের হিসাব দিতেছি :—(১৯৩১-৩২)

	একর	উৎপন্ন মণ	একর প্রতি
বোম্বাই	৫১,৩৭,০০০	৫২,০৬,০০০	১ মণ ৫॥০ সের
মধ্যপ্রদেশ	৪২,৬৯,০০০	৩৯,৫০,০০০	৩৭॥০ ,,
পঞ্জাব	২২,৫২,০০০	২৯,৫৬,০০০	১ মণ ১৩ ,,
মাদ্রাজ	১৭,২৮,০০০	১৭,২২,০০০	১ মণ ২ ,,
হায়দ্রাবাদ	১০,৫২,০০০	৬,৭২,০০	২৯ ,,
বড়োদা	৭,২২,০০০	৫,৯৫,০০০	৩৪ ,,
গবালিয়র	৫,৬২,০০০	৪,১২,০০০	৩০ ,,
রাজপুতানা	৪ ০৭,০০০	৩,৩১,০০০	৩৩॥০ ,,
বাঙলা	৭৬,০০০	১,০০,০০০	১ মণ ১৪ ,,

বাঙলায় ব্যাপকভাবে তুলা উৎপন্ন করা যায় কিনা সে পরীক্ষা হয় নাই; কতকগুলি জেলার নির্দিষ্ট অংশে ভাল জাতের তুলা বুনিয়া পরীক্ষা করা যাইতে পারে। বাঙলায় এখনো যে সামান্য তুলা উৎপন্ন হয় তাহার অধিকাংশই রপ্তানী হয়।

বাঙলার রপ্তানী

	টন্	মূল্য	ভারতের টন্
১৯২১-২২	৩২,১০৮	৩,৭০,০০০	৫৩,৯৬ লক্ষ
১৯২২-২৩	১৭,৭৮০	২,০৮,০০০	৭০,৯৭ ,,
১৯২৩-২৪	৬,৬৯১	৯৬,০০০	৯৮,৪৭ ,,
১৯২৪-২৫	৯,১৫৬	১,৪৩,০০০	৯১,২২ ,,
১৯২৫-২৬	৮,৩১৪	১,০০,০০০	৯৪,৯৯ ,,
১৯৩০-৩১	৬,১৫৯	৩৮,৯০,০০০	৪৬,৩২ ,,
১৯৩১-৩২	৬,১৬৩	৩৩,১২,০০০	২২,৪৪ ,,
১৯৩২-৩৩	৯,৩৮৫	৩০,৭৮,০০০	২০,৩৭ ,,
১৯৩৩-৩৪	১২,৮৮৯	৫২,১০,০০০	২৬,৫৯ ,,
১৯৩৪-৩৫	৭,৯০৩	৩৯,৮৪,০০০	৩৪,৪৯ ,,

বাঙলায় এইসব কৃষিজাত উদ্ভিজ্জ ব্যতীত আরও বহু প্রকার উদ্ভিদের চাষ এদেশে হয়; ইহার মধ্যে প্রধান হইতেছে পাট। পাট বাঙলার কেন, সারা দুনিয়ার একটি বিশেষত্ব; সেইজন্য আমরা পৃথক্‌ভাবে পাঠ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। ইহার পরই আসে 'চা'; তাহাও পৃথক্ পরিচ্ছেদে আলোচনা হইয়াছে।

কৃষি ও শিল্পের কথা মোটামুটিভাবে বলিয়া একটি কথা উপসংহারে আলোচনা করিতে চাই। কৃষির অর্থ হইতেছে যে, আমরা মাটি চষিয়া তাহার ভিতরের রাসায়নিক পদার্থকে উদ্ভিজ্জ দ্রব্যে পরিণত করিয়া গ্রহণ করি। জমির এই রাসায়নিক পদার্থ হইতেছে সার। বাঙলার চাষের জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে সার পড়ে না; জমিকে এক আধ বছর পতিত রাখিয়া বিশ্রাম দেওয়া হয় না; ফলে জমির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পাইতেছে।

জমির প্রধান সার হইতেছে গোবর পচা সার; কিন্তু দেশের দরিদ্র লোক গোবর শুকাইয়া জ্বালাইয়া ফেলে; গ্রামের সামান্য সারই মাঠে পৌঁছায়। কিন্তু উপায়ও নাই। রন্ধনাদি কাজের জন্য জ্বালানির সামগ্রী দরকার। বনভূমি নূতন করিয়া তৈয়ারী করিবার দিকে সরকার বা জমিদারের চেষ্টা নাই; বন সাফ হইয়া চাষের ক্ষেত হইতেছে, নূতন বনভূমি তৈয়ারী না হইলে লোকে সস্তায় ও সহজে জ্বালানি কাঠ পাইবে না। সরকার এ বিষয়ে দৃষ্টি না দিলে উপায় নাই। তা ছাড়া এদেশে গোরুর সংখ্যা কৃষির অনুপাতে কম; সেজন্য যথেষ্ট গোবর হয় না; অধিক গোরু রাখার প্রধান অসুবিধা গোচারণ ভূমির অভাব; সে সম্বন্ধে আমরা অন্যত্র আলোচনা করিব।

কিন্তু আরও সাংঘাতিক হইতেছে তৈল বীজের রপ্তানী। সে কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি; তৈল বীজ ও খৈল প্রচুর পরিমাণে প্রতি বৎসর বিদেশে রপ্তানী হয়; অর্থাৎ বাঙলার চাষের জমি প্রতি বৎসর অনুর্বর হইতেছে। হাড়-গুঁড়া একটা ভাল সার; তাহা এদেশে চা-বাগিচা ছাড়া আর কোথায়ও তেমন-ভাবে ব্যবহৃত হয় না। অধিকাংশ পটাশিয়াম সালফেট, যাহা কয়লা হইতে উপসামগ্রী রূপে পাওয়া যায়—তা চাষীদের কাছে আসিয়া সস্তায় পৌঁছায় না; মাছ পচার সারও খুব দামী সার; তাও অর্থাভাবে চাষী ব্যবহার করিতে পারে না।

১৮৯৩ সালে Dr. Voelcker, যাঁহাকে গবর্মেণ্ট ভারতীয় কৃষি সম্বন্ধে গবেষণার জন্য বিশেষভাবে আনিয়াছিলেন, তিনি 'ভারতের কৃষির উন্নতি'

নামক গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন 'যে দেশ শস্য ও বীজ উভয়ই বিদেশে রপ্তানী করে, তাহার জমির উর্বরতার শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। "On the one hand there is a large export of seeds, cotton and other products, besides an increasing one of wheat, all of which remove a considerable amount of soil-constituents." পৃঃ ৩৯-৪০ Wadia and Joshiর The Wealth of India পৃঃ ২২৯ দ্রষ্টব্য।

১৯১৯ সালে ভারতের সরকারী কৃষি বোর্ডও এবিষয়ে লেখেন ;

"The committee consider that the Board should place on record their opinion that the conservation of the natural manures such as oil seeds, oil cakes, bones, including horns, and fish manure of all kinds, for use in this country, is a matter of great importance. Oil seeds contain a large percentage of nitrogen, which is the most valuable of all manure constituents and is absolutely necessary to maintain the fertility of the soil." পূর্বগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত, পৃঃ ২৩২ দ্রষ্টব্য।

ভারতের কৃষির উন্নতির জন্য রয়েল কমিশন ১৯২৬এ বসে ; সেই কমিশনের সভাপতি ছিলেন লর্ড লিন্‌লিথগো—যিনি পরে ভারতের বড়লাট হইয়া আসিয়াছেন। কৃষি বিষয়ে বহু তথ্য ও তত্ত্ব তাঁহার কমিশন প্রতিবেদনে প্রকাশ করেন, তাহা 'ভারত পরিচয়ে' বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে।

গোপালন

বাঙলাদেশ কৃষিপ্রধান ; কৃষি নির্ভর করে চাষের বলদের উপর ; কৃষিজাত সামগ্রী হাটে বাজারে লইয়া যাওয়া হয় গোশকটে। দুগ্ধ বাঙালীর একটি প্রধান খাদ্য। কথায় বলে বাঙালীর শরীর দুধে ঘিয়ে, তেলে জলে, মাছ ভাতে পুষ্ট। আজ সব জিনিষেরই অভাব ঘটিয়াছে।

ভারতবর্ষের মধ্যে নানা জাতের ভাল গোরু আছে ; কিন্তু বাঙলার গোরু সব থেকে ওঁচা। গাইগোরু ও বিশেষভাবে ষাঁড় ভাল জাতের না হইলে বলদ গোরুও বলিষ্ঠ হইতে পারে না। কৃষিপ্রধান দেশের মধ্যে ডেনমার্ক জনবহুল ;

সেখানে প্রতি একশ জন লোকের ৭৫টি গোরু আছে; ভারতবর্ষে আছে ৬১টি। কিন্তু সংখ্যার দ্বারা ইহার তুলনা হয় না; কারণ বাঙলার বলদ দুর্বল ও গাভী অল্প দুধ দেয়। বাঙলায় যে বলদ আছে তাহা এখানকার চাষের পক্ষে যথেষ্ট নয়; ঐ সংখ্যার চেয়ে কম সংখ্যা বলিষ্ঠ পশু থাকিলে হয় ত' কাজ চলিত। কিন্তু তাহা হয় নাই, সেইজন্য পশুর সংখ্যা বেশী এবং তাহাদের খাইবার জন্য অধিক ব্যয় করিতে হয়; অধিক সংখ্যক গোরুর জন্য কৃষকের পরিশ্রমও করিতে হয় বেশী; প্রত্যেক হালের জন্য চাষী ও মজুরের দরকার। লোকের মজুরীও অত্যধিক এবং অনেক স্থলে দুষ্প্রাপ্য। ফলে যথাসময়ে বাঙলার অনেক মাঠে চাষ পড়ে না, বা ভাল করিয়া যথাসময়ে চাষ হয় না; তাহার একটি কারণ সকল চাষের হালের গোরু নাই, অথচ যে-গোরু আছে তাহা ১৬।১৭ বিঘাব বেশী জমি চষিয়া উঠিতে পারে না, এবং তাহাও অত্যন্ত খারাপভাবে হয়।

দুগ্ধের সমস্যা আরও তীব্র হইয়াছে। বিশেষভাবে বাঙলার মহানগরী কলিকাতা ও মফঃস্বলের শহরে দুধ কেবল মহার্ঘ্য নহে, দুধ অত্যন্ত ভেজাল। কলিকাতায় বহুদূর হইতে দুধ আসে এবং তাহা অত্যন্ত গ্রাম্যভাবে আনীত হয়। কলিকাতার দুধের দর চারি আনা সের, আর স্কটল্যাণ্ডে দুই আনা সের। য়ুরোপের তুলনায় আমাদের জীবনযাত্রা অনেক সস্তা, কিন্তু দুধের বেলায় আমরা সকলকে হার মানাইয়াছি; গত ষাট বৎসরে খাদ্যশস্যের দাম বাড়িয়াছে ৫ হইতে ৭ গুণ, কিন্তু শহরে দুধের দাম বাড়িয়াছে ১০ গুণ। বর্ত্তমানে বিদেশী জমাট দুধ বা দুধগুঁড়া প্রচুর পরিমাণে আসিতেছে। প্রতি বৎসর ৪০।৫০ লাখ টাকার দুধ বিদেশ হইতে ভারতে আসে। দুধের অভাবে দেশের ভাবী বংশধর অর্থাৎ শিশুগণ নির্জীব হইয়া মানুষ হইতেছে। দুগ্ধের জন্য গোরু পোষে পশ্চিমারা, বাঙালী গোয়ালার দুধ বিশ্বাস করিয়া খাওয়া যায় না বলিয়া বদনাম আছে।

বাঙালায় গোজাতির অবনতির কারণ বহু ও বিচিত্র। প্রথমত বহুকালের অবহেলায় বাঙলার অধিকাংশ জায়গার গোজাতি অত্যন্ত খর্বাকৃতি, অপুষ্ট, দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। বড় বড় মন্বন্তরে ভাল জাতি নাকি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ভাল ষাঁড় আরও দুর্লভ। গবর্মেণ্টের ফার্ম হইতে

ভাল জাতের ষাঁড় বিক্রয় ও বিলি করার ব্যবস্থা হইয়াছে, কিন্তু তাহা যথেষ্ট নহে। কোথায়ও কোথায় ইউনিয়ন বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটিতে ষাঁড় রাখা হইয়াছে, তবে তাহাও যথেষ্ট নহে। পূর্বে উৎকৃষ্ট ষাঁড় 'ধর্মের' নামে উৎসর্গ করা হইত। পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধোপলক্ষে বৃষোৎসর্গ ছিল হিন্দুর একটা ধর্ম। বর্তমানে সে অনুষ্ঠান উঠিয়া গিয়াছে; এখন একখানি 'বৃষকাঠ' নদীর ধারে পুঁতিয়া পিতৃপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও সমাজের প্রতি কর্তব্য সম্পন্ন হয়। তা ছাড়া কলিকাতা, মাদ্রাজ ও এলাহাবাদ হাইকোর্ট ধর্মের ষাঁড় সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ইহারা কাহারও সম্পত্তি নয়; সুতরাং ধর্মের ষাঁড়, পীরের ষাঁড় বধ করিলে বা বিক্রয় করিলে কেহ অপরাধী হয় না। এই সর্বনেশে রায় প্রকাশ হওয়াতে এদেশের সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। ধর্মের ষাঁড় মিউনিসিপ্যালিটির ময়লাফেলা গাড়ীতে জোতা হয়, কসাইরা নির্বিচারে ধরিয়া বধ করে; কেহই বোঝে না যে, কেবল গোজাতির সর্বনাশ সাধন হইতেছে, তাহা নহে; জাতির প্রধানতম পুষ্টিকর খাদ্য দুগ্ধ দুর্লভ হইতেছে। কারণ ভাল ষাঁড়ের অভাবে গাঁয়ের সাধারণ ষাঁড়ই দুর্বল গোজাতির পিতৃস্থান অধিকার করে। হিন্দুরা সাধারণ এঁড়ে বাছুরকে বলদ করে না; ফলে এই সব দুর্বল ষাঁড়গুলি বাঙলায় গোজাতির জনক।

বাঙলার গোজাতির উন্নতি করিতে হইলে বিলাত বা পশ্চিম হইতে বড় বড় ভাল ভাল জাতের ষাঁড় আনিলে চলিবে না; সে-পরীক্ষা অকৃতকার্য হইয়াছে। বাঙলার জন্য দরকার ছোট জাতের ভাল ষাঁড়; এবং সে-বিষয়ে সর্বোৎকৃষ্ট হইতেছে সিন্ধীগোরু। তবে বাঙলার অনেক জায়গায় বিহারী ও হিন্দুস্থানীরা গোশালা খোলায় তাহার আশেপাশে গোজাতির বিশেষ উন্নতি হইয়াছে।

বাঙলায় গোজাতির অধঃপতনের দ্বিতীয় কারণ গোচারণ ভূমির অভাব। পূর্বে জমিদাররা গোচারণ ভূমি ফেলিয়া রাখিতেন; এখন জনসংখ্যা বাড়িতেছে অথচ তাহাদের উপযুক্ত শিল্প বাণিজ্য না থাকায়, সকলেই কৃষির দিকে ঝুঁকিতেছে। জমিদার বা প্রজা কেহই গ্রামের পাশে জমির লোভটুকু ছাড়িতে পরিতেছে না। গোরুর পক্ষে কেবল যে গোচারণমাঠ চরিবার জন্য প্রয়োজন তাহা নহে, তাহার ব্যায়ামের জন্য গোচারণ মাঠ অত্যাবশ্যক।

পূর্ববঙ্গে গোজাতির দুর্দশা আরও বেশি, বিশেষভাবে বর্ষাকালে। সুতরাং গবর্মেণ্ট ও সমাজের দেখা উচিত যে, প্রত্যেক গ্রামে গোরুর উপযুক্ত গোচারণ মাঠ থাকে।

কিন্তু সমস্যার শেষ এখানেই নয়। আমাদের দেশে গোরুর খাদ্যশস্য উৎপন্ন করিবার জন্য কোনো চেষ্টা হয় না; খড় বা বিচালি একমাত্র খাদ্য; কিন্তু ইহার মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্যাংশ অতি অল্পই। তাছাড়া খড়ের দাম চড়িলে গরীবদের পক্ষে খড় কিনিয়া গোরুকে খাওয়ান অসম্ভব হয়। জলের অভাবে গোরু মারা যায়; বর্তমানে বাঙলাদেশের নানাস্থানে পুষ্করিণী খনন বা পঙ্কোদ্ধার প্রভৃতির দিকে লোকের দৃষ্টি না গিয়া নলকূপ খননে মন গিয়াছে। কিন্তু নলকূপ খননের দ্বারা গোরুর জল মিলিবে না। জলাশয় প্রতিষ্ঠা ও পঙ্কোদ্ধারের সহিতও গোজাতির উন্নতি নির্ভর করিতেছে। বাঙলার চাষীদের উচিত গোরুর খাদ্যের জন্য 'নেপিয়ার' প্রভৃতি ঘাস বোনা; এই ঘাস গোরুর পক্ষে পুষ্টিকর। মধ্যবিত্ত বাঙালী যদি গো-গৃহ বা dairy করিতে চান তবে কয়েক বিঘা জমিতে নেপিয়ার ঘাস রোপণ করিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন।

গোরুর প্রধান খাদ্য খৈল ও লবণ; উভয়ই বাঙলায় মহার্ঘ্য। খৈল ভেজালে পরিপূর্ণ। খৈল কেন সস্তায় পাওয়া যায় না, তাহা আমরা সরিষা অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি। ভেজাল খৈল খাইয়া গোজাতির কি পরিমাণ ক্ষতি হইতেছে, সে গবেষণা কেহ করেন নাই। মড়ক প্রভৃতি কারণের মধ্যে এইসব কারণ আছে কিনা তাহা বৈজ্ঞানিকেরা অনুসন্ধান করুন।

পশুর মৃত্যু হয় দুই কারণে; এক রোগে ও মড়কে; আর এক কশাইএর হাতে। এছাড়া দুর্ভিক্ষে ও বন্যায় বহু সহস্র গোরু-মহিষ মারা যায়। স্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য কেহ দায়ী নহে, কিন্তু প্রতিশোধ্য ব্যাধি হইতে গোমড়ক বা দুর্ভিক্ষজনিত গোক্ষয় নিবার্য; সুতরাং তাহা না করিতে পারিলে সমাজ ও রাষ্ট্র উভয়ই দায়ী।

পশু চিকিৎসার জন্য সরকারী একটি বিভাগ আছে; যুক্তপ্রদেশে প্রেসিডেন্সিতে মুক্তেশ্বর নামক স্থানে Imperial Institute of Veterinary Research আছে; সেখানে গোব্যাধির নানাপ্রকার ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে

ও ভ্যাক্সিন প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু চাষীদের জন্য অসময়ে সাহায্য খুব কমই মেলে; কারণ একটি জেলায় একজন কি দুইজন পশু-চিকিৎসক ডাক্তার থাকেন; তাঁহাদের পক্ষে জেলার সর্বত্র ঘুরিয়া মড়কের সময় ব্যবস্থা করা অসম্ভব; প্রত্যেক থানায় যেমন শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দারোগাদি থাকে, তেমনি পশু-চিকিৎসক থাকা দরকার। তাঁহারা কৃষি সম্বন্ধে তথ্যসমূহ চাষীদের কাছে জানাইবেন; তাঁহারা চাষীদের মধ্যে শিক্ষকের কাজ করিতে পারেন।

গোক্ষয়ের দ্বিতীয় কারণ গোবধ। গোহত্যা হয় মাংসের জন্য। অহিন্দু জাতিরা গোখাদক; কিন্তু সাধারণত বড় বড় শহরেই গোমাংস বিক্রয় হয়। গ্রামে বা ছোট সহরে মুসলমানরা বকর-ঈদ ছাড়া অন্য সময়ে গোমাংস প্রায় খায় না। বড় শহরের যেখানে বিলাতী সৈন্যের ছাউনী আছে, সেখানকার জন্য বহু গোবধ হয়। গোহত্যা বাবদ ভারতের মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের লাইসেন্স হইতে আয় পঞ্চাশ বৎসরে শতকরা ৭০% হারে বাড়িয়াছে; আর রপ্তানী ঐ সময়ের মধ্যে বিশগুণ অর্থাৎ শতকরা ২০০% বাড়িয়াছে। শুকনো মাংস রপ্তানীর জন্য যে গোরু বধ হয়, তাহার সংখ্যা ভারতে দশ লক্ষ।

দুধ দেওয়া শেষ হইয়া গেলে বহু সংখ্যক গোরু গ্রাম হইতে কশাইদের ফড়িয়ার হাতে পড়ে। কলিকাতার নিকটবর্তী ট্যাঙরায় বৎসরে প্রায় ৯০ হাজার এবং গোলডাঙ্গাতে প্রায় ১০ হাজার গাই গোরুই জবাই হয়। এই সংখ্যার মধ্যে ৩০০০০ গাইগোরুর বয়স সাত বৎসরের নীচে; অর্থাৎ দুধ দেওয়া শেষ হইবার পূর্বেই ইহারা নিহত হয়। অর্থনৈতিক দিক্ হইতে এই শ্রেণীর গাইগোরু বধ নিবারণ করা উচিত; কারণ এই গাইগুলি দুধ দিতে পারিত।

কলিকাতায় ছোট ছোট গোশালা অনেক আছে; গোয়ালারা দুই বিয়ানের পর গাই কেনে; প্রায়ই বাছুর বিক্রয় করিয়া 'ফুঁকা' দিয়া দুধ দুহিতে থাকে। আট মাস নিঃশেষে দুধ আদায় করিয়া গাই কশাইকে বিক্রয় করিয়া দেয়; কারণ ফুঁকা দিয়া দুধ দুহিলে গোরু দুই তিন বৎসর 'পাল' ধরে না। দুধ দিবে না অথচ বসিয়া খাইতে দিবে এত ধর্মবোধ পরম হিন্দু গোয়ালার নাই। সুতরাং গোবধের কার্যটা প্রত্যক্ষভাবে নিজেরা না করিয়া ধর্ম বাঁচাইয়া ফড়িয়ার হাত দিয়া গোরু বিক্রয় করিয়া দেয়।

বাঙলাদেশের নদীর ধারে ধারে অসংখ্য গোশালা স্থাপিত হইতে পারে। গোশালা হইতে যে কেবল দুধ সরবরাহ হইতে পারে তাহা নহে, পর্যাপ্ত দুধ হইলে মাখম, ঘৃত, পনীর প্রভৃতি প্রস্তুত করা যাইতে পারে। বাঙলাদেশে বহু লক্ষ টাকার ঘৃত প্রতি বৎসর বিক্রীত হয়; একথা সত্য যে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বাঙালী যে পরিমাণ ঘৃতপক্ক দ্রব্য আহার করিত, তাহার বহুগুণ সে বর্তমানে আহার করে; শহরে গ্রামে মেলায় হালুইকরের দোকান অনেক হইয়াছে; তা ছাড়া বিবাহ শ্রাদ্ধ উৎসবাদিতে ঘৃতপক্ক খাদ্য প্রচুর পরিমাণে খাওয়া হয়। বাঙলায় এত যে ঘৃতের প্রয়োজন, তাহার পনের আনা আসে বাঙলার বাহির হইতে। একথা কাহারও অবিদিত নাই যে, এই আমদানী ঘৃতের মধ্যে ভেজালের ভাগ খুবই বেশি। বাঙালী তাহার সরিষা ও সরিষার তেল আমদানী করে বাঙালার বাহির হইতে; তাহার নিত্যখাদ্য ঘৃত আমদানী করে বাঙলার বাহির হইতে; এবং ঘৃতের এই ব্যবসায় কাপড়ের ব্যবসার ন্যায় প্রায় সম্পূর্ণরূপে অবাঙালী ও বিশেষভাবে মাড়য়ারীদের হাতের মধ্যে এবং এই খাদ্যে ভেজাল মিশানো সম্বন্ধে তাহাদের দুর্ণামও আছে। কোন কোন ঘৃতে শতকরা ৭৫ ভাগ ভেজাল থাকে।

মাখম টিনের মধ্যে পুরিয়া বিক্রয় হয়; বাঙলাদেশের মধ্যে এমন কোনো উল্লেখযোগ্য গো-গৃহ (Dairy) নাই, যেখানে মাখম প্রস্তুত হয়। শিলং ও কালিংপঙে ডেয়ারী আছে। আমেদাবাদ ও বোম্বাইতে যেসব ডেয়ারী আছে সেখান হইতে মাখম বাঙলায় আসে, বাঙালীর উল্লেখযোগ্য ডেয়ারী আছে বলিয়া জানিনা। দার্জিলিঙের কেভেণ্টারের দুধ যত নিশ্চিন্ত মনে পান করা যায়, কলিকাতায় সেরকম কোনো সুপ্রসিদ্ধ গোয়ালার দুধ নির্ভয়ে গ্রহণ করা যায় না।—এ কলঙ্ক কবে যাইবে জানি না!

দুধের আর একটি উপসামগ্রী হইতেছে জমাট দুধ; বাঙলাদেশে প্রতি বৎসর কয়েক লাখ টাকার জমাটদুধ, গুঁড়াদুধ বিক্রয় হয়। দুধের কারবার অনেকগুলি হইলে, এই সব উপসামগ্রী করা একেবারে অসম্ভব হইবে না। ইংলণ্ড শিল্পে পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে; কিন্তু তাই বলিয়া সে কৃষি ও গোসেবায় উদাসীন নহে। ইংলণ্ডের অনেক জমিদারের গো-সেবা একটা বিশেষ সখ; এবং তাঁহাদের চেষ্টায় বৃটিশ গোজাতির আশ্চর্য

উন্নতি হইয়াছে। বৃটিশ গোগৃহের আয় ৩২ মিলিয়ন পাউণ্ডের উপর ছিল; গত মহাযুদ্ধের পর তাহারা কৃষি ও গোসেবায় বিশেষ মনোযোগী হইয়াছে।

আমরা এতক্ষণ গোরুর কথা বলিলাম; বাঙলাদেশের অনেক স্থানেই জল পাওয়া যায়। সুতরাং মহিষ পালন করাও যাইতে পারে। মহিষের দুধে মাখমের অংশ বেশি। সুতরাং ঘৃতাদির কারবার খুলিতে গেলে মহিষের পালন বিশেষ প্রয়োজনীয়। দক্ষিণ বাঙলায় যাহাতে মহিষ অধিক সংখ্যায় পালিত হইতে পারে, সেবিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

সমবায়ভাবে দুগ্ধের ব্যবসায় একমাত্র কলিকাতা মিল্ক সোসাইটি করিয়াছে। তাছাড়া গ্রামে কোনো ব্যবস্থা নাই। এই দিকে বাঙালী যুবকের দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য।

হাঁস ও মুরগীপালন

কৃষির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না থাকিলেও হাঁস ও মুরগীপালন চাষীরা ও গ্রামের গৃহস্থেরা করে। ডিম খাওয়ার রেওয়াজ গত এক পুরুষের মধ্যে কিভাবে বাড়িয়াছে, তাহার প্রমাণ সংখ্যাদ্বারা দেওয়া সম্ভব নহে; কিন্তু একথা সত্য যে, ডিম খাওয়া সম্বন্ধে লোকের যে সংস্কার ত্রিশ বৎসর পূর্বে ছিল, এখন তাহা শিথিল হইয়াছে। তাছাড়া বাঙলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেকের উপর মুসলমান; মুরগীর ডিম তাহাদের প্রধান খাদ্য; নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরাও মুরগী পোষে ও খায়; সাঁওতালদের মুরগী সম্বন্ধে কোনো সংস্কার নাই। সুতরাং একথা বলা যাইতে পারে, বাঙলাদেশে খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে মাছ যেমন অত্যাবশ্যক, মুরগীর প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা খুব যে কম তাহা নহে। প্রচুর পরিমাণে মুরগী শস্তায় পাইলে লোকের খাইতে আপত্তি কম। অথচ এত বড় একটা খাদ্য সামগ্রী সম্পূর্ণভাবে অবজ্ঞাত অবস্থায় গ্রামের মধ্যে পড়িয়া আছে। নিরক্ষর লোকের উপর সম্পূর্ণভাবে মুরগীর চাষ নির্ভর করিতেছে। বাঙলাদেশের চট্টগ্রামের মুরগী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুরগীর অন্যতম বলিয়া সুপরিচিত। কেন যে ইহার চাষ ও ব্যবসায় ব্যাপকভাবে হয় না, তাহাই আশ্চর্য মনে হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে ইহার চাষ করিতে পারিলে ইহাতে পয়সা আছে।

ডিমের ব্যবহার যে কেবল স্থানীয় নগর, শহর ও গ্রামে প্রচুর পরিমাণে করা যায় তাহা নহে, রপ্তানী-বাণিজ্যেও ইহার কারবার ভাল করিয়া চলিতে পারে। য়ুরোপের অনেক দেশই বাহির থেকে ডিম কেনে ইংলণ্ড প্রতি বৎসর ১৮ মিলিয়ন পাউণ্ডের (অর্থাৎ প্রায় ২৪ কোটি টাকার) ডিম কেনে; ইহার মধ্যে ভারত মহাসাগর পার হইয়া চীন হইতে যায় চারি কোটি টাকার! অবশ্য ডিমই যায় না, যায় বৈজ্ঞানিকভাবে প্রস্তুত ডিমের গুড়া।

বাঙলাদেশে মুসলমানদের মধ্যে এবিষয়ে ভালরূপ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা উচিত। কারণ মুরগীর ব্যবসায় করিতে তাহাদের আপত্তি নাই। চাটগাঁ, লেগহর্ণ, রোড-আইল্যাণ্ড প্রভৃতি জাতের মোরগ আনিয়া গ্রামে দিবার ব্যবস্থা ও দেশীয় মোরগগুলিকে সত্বর বিক্রয়ের জন্য বিদায় করিতে হইবে। মোট কথা, ভাল জাতের গোরু করিতে হইলে যেমন গ্রামের অজাকৃতি ষাঁড়গুলিকে সত্বর বিদায় দিয়া ভাল জাতের ষাঁড় আনিয়া দিতে হইবে, তেমনি মোরগ সম্বন্ধেও সেই একই কথা খাটে।

বাঙলাদেশে ডোবা, পুকুর, ঝিল, বিলের অভাব নাই; সুতরাং হাঁসের চাষও ব্যাপকভাবে হইতে পারে; এ দিকে হিন্দুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। হাঁস-পালন মুরগী-পালন হইতে সহজ; কারণ মুরগীর যেমন মাঝে মাঝে বসন্ত মড়ক হয়, তেমন কোন ব্যারাম হাঁসের হয় না। আলবুমেন্ বা শ্বেতসার নামক পদার্থ তৈয়ারীর জন্য হাঁসের ডিম প্রয়োজন হয়। বর্তমানে আলবুমান য়ুরোপীয় দেশ হইতে বাংলায় আসে। 'টার্কি' বা বনমোরগের চাষ সহজসাধ্য। সাহেবদের 'টার্কি রোষ্ট' ও 'ডাক্ রোষ্ট' প্রিয় খাদ্য।

শূকরের চাষ হিন্দুরাই করিতে পারে; মুসলমানদের পক্ষে উহা অস্পৃশ্য। কিন্তু হিন্দু ভদ্রলোক এই কাজে যায় না। বিলাতের জাহাজের জন্য যে ধরণের শূকরের দরকার, তা আমাদের দেশের ধাঙড়ে শূকর নয়। এইসব জাহাজের এবং সাহেবি হোটেলের চাহিদা অনুযায়ী ভাল জাতের শূয়র পোষার দরকার। শূয়রের মাংস (হ্যাম্ বেকন্ পর্ক) নানাভাবে প্রস্তুত হইয়া টিনে করিয়া এদেশে আসে। সে ব্যবসায়েও বাঙালী হাত দিতে পারে। তুলির জন্য শূকরের কুঁচি ব্যবহৃত হয়। চবিও কাজে লাগে।

মাছ

নদ-নদী-সরোবর-পুষ্করিণীবহুল বাঙালাদেশের লোকে যে 'মছলিখোর' হইবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। মানুষের খাদ্য হয় প্রকৃতির দান হইতে। বাঙালীর প্রধান খাদ্যের অন্যতম হইতেছে মাছ। বৈষ্ণব, উচ্চবর্ণের বিধবা, অবাঙালী ছাড়া বাঙলার প্রায় সমস্ত লোকই মাছ খায়। সুতরাং মাছ প্রায় চারকোটি লোকের নিত্যখাদ্য বলিলে ভুল হইবে না। মাছ সহজে হজম হয়; এবং ইহাতে প্রচুর পরিমাণে প্রটীন্ থাকে, যাহাতে মানুষের অস্থি ও মজ্জা বাড়ে।

বাঙালীর এত বড় খাদ্য সামগ্রীর উন্নতির জন্য কোন বৈজ্ঞানিক বিভাগ নাই। ১৯০৬ সালে স্যর কে. জি. গুপ্ত (I.C.S.)কে সরকার বাহাদুর মৎস্য চাষ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য নিয়োগ করেন। তিনি যথাসময়ে উঁহার প্রতিবেদন প্রকাশ করেন, কিন্তু তাহার পর সে-বিষয়ে কোনো 'উচ্চবাচ্য' আর হয় নাই। যুদ্ধের সময় যে ইন্ডাষ্ট্রিয়েল কমিশন বসে, তাহাতে ভারতের শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে সরকার অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন; তাহার মধ্যে একটি ছিল বাঙালাদেশের মাছের চাষের উন্নতি সম্বন্ধে। কিন্তু সরকার বাহাদুর যে কেবল এ বিষয় কিছু করিতে ভুলিয়া গেলেন তাহা নহে, বাঙলার ফিশারী বিভাগই উঠাইয়া দিলেন।

শ্রীযুত মিত্র মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে (Recovery Plan of Bengal, p. 293) বলিয়াছেন যে, বাঙলাদেশের ধান ও পাটের ক্ষেত হইতে গড়ে ৪১ কোটি টাকার মাল পাওয়া যাইতে পারে। আর এক ইংলণ্ড ও ওয়েলসের মাছ বিক্রয় হয় ২৫ কোটি টাকা, ফ্রান্সে হয় ১২ কোটি, জাপানে ৫২ কোটি, কানাডায় ১৬ কোটির উপর। এই কয়টি সংখ্যা হইতে বুঝা যাইতে পারে বাঙলার ন্যায় নদীবহুল সরোবরপূর্ণ দেশে কি-পরিমাণ ধন উৎপন্ন হইতে পারে। বাঙলার ২৭ লক্ষ লোক মৎস্যজীবী। বাঙলার দক্ষিণেই বঙ্গোপসাগর। সমুদ্রের মাছ ত এখন পর্যন্ত বাঙলাদেশে প্রায় অজ্ঞাত বলিলে হয়।

টাটকা মাছ বাঙালী কত লক্ষ টাকার খায়, তাহা বলা কঠিন। তবে কলিকাতায় যে তেরো লাখ লোক বাস করে তাহাদের জন্য ১০ হইতে ১২

হাজার টন মাছ বৎসরে আসে। কিন্তু মাথাপিছু ছটাক হিসাবেও মাছ দৈনিক ধরিলে, বৎসরে এক কলিকাতায় প্রয়োজন হয় ৪২,০০০ টন্! যদি ধরিয়া লই বাঙলার তিন কোটি লোকও মাছ খায়, তবে এদেশে দরকার হয় বছরে ১০ লাখ টন্ বা ২ কোটি ৭০ লক্ষ মণ মাছ; ইহার দাম যদি গড়ে ১০৲ মণ ধরি, তবে বছরে ২৭ কোটি টাকার মাছ বাঙালী খায়।

এ ছাড়া বাঙালী বাঙলার বাহির হইতে শুট্‌কি মাছ ও টিনের মাছ আমদানী করে; টীনের মাছের প্রধান খরিদ্দার অবশ্য সাহেবরা। ১৯২৫ সালে ৪,০০০ হাজার টাকার শুট্‌কি আসে, ১৯৩৮ সালে আসে ৭২ হাজার টাকার মাল। আর টিনের মাছ ১৯২৪ সালে যেখানে আসিত ১,৩৩,০০০ টাকা, ১৯২৮ সালে আসে ২,২৬,০০০ টাকার। এই সংখ্যাগুলির উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, বাঙালায় এই দুইটি শিল্প চেষ্টা করিলে গড়িতে পারে।

মিত্র মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, ১৫০ ফুট লম্বা চওড়ায় (অর্থাৎ সওয়া বিঘা দীর্ঘ প্রস্থে) কোনো পুষ্করিণী যদি পঙ্কবিহীন হয়, তবে সেখানে ৫০৲ টাকা ব্যয় করিলে দুই বৎসর পরে ১৯০৲ টাকার মাছ পাওয়া যায়। প্রতি বৎসর কিছু কিছু খরচ করিলে সচ্ছন্দে ১০০৲ হইতে ২০০৲ টাকা মুনাফা হয়। ইহা না হইবার কারণ পুষ্করিণীগুলি ডোবায় পরিণত হইয়াছে। উপরে পানা, নীচে অতিরিক্ত পাঁক, আসেপাশে জঙ্গল। তারপর মাছকে খাদ্য দিয়া পুষ্ট করিবার চেষ্টাও হয় না। এছাড়া মাছের পোনা অযথাভাবে নষ্ট হয়; সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

দক্ষিণ বঙ্গের নদীতে মাছ প্রচুর পাওয়া যায়; সেখান হইতে কলিকাতায় মাছ আসে। দক্ষিণ বঙ্গে এই মাছের ব্যবসার সঙ্গে বরফের কারবার জাগিয়াছে; কিন্তু লবণের দর খুব বেশি বলিয়া লোণা মাছ বা শুট্‌কি মাছের ব্যবসা এইসব স্থানে হইতে পারে না। মাছের ব্যবসার সহিত লবণের দর কমানোর সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হইয়াছে; রেফ্রিজেরেটিং মোটর-লরী বা মোটর-নৌকা করিয়া এইসব অঞ্চল হইতে টাটকা মাছ কলিকাতায় অল্প সময়ের মধ্যে আনা যাইতে পারে।

মাছের ব্যবসার সঙ্গে কয়েকটি শিল্প গড়িয়াছে। মাছের ভিতর যে 'পটকা' থাকে তাহা হইতে রাসায়নিক ক্রিয়াযোগে একপ্রকার শিরীষ হয়। অল্প

মূলধনে এই কুটীর শিল্প প্রবর্তন করা যায়। মাছের তেল কেরোসিন আসার আগে এদেশে পোড়াইবার জন্য ব্যবহৃত হইত; মাছের তেল নানাভাবে পরিশোধিত করিয়া সাবানে ব্যবহৃত হইতে পারে। মাছের সারও খুব দামী। আম, লিচু, লেবু প্রভৃতির চাষে মাছের সার প্রচুর পরিমাণে লাগে। ফল-বাগিচার উন্নতি হইলে মাছের সারের চাহিদা বাড়িবে। ফলের বাগানে বহু শত লোক জীবিকা আহরণ করিতে পারিবে, মাছের ব্যবসায়ে করিয়া অনেক হাজার লোক অর্থ উপার্জন করিবে।

মাদ্রাজে মৎস্য কৃষি খুবই উন্নতি লাভ করিয়াছে; নিকটে জাপানও এবিষয়ে অগ্রণী। এসব দেশ হইতে বিদ্যা আহরণ করিয়া আসিয়া মৎস্য-কৃষি আরম্ভ করা যাইতে পারে; গবর্মেণ্টের দৃষ্টি ও সমাজের চেষ্টা যুগপৎ এই শিল্পে আকৃষ্ট হইবার সময় আসিয়াছে।

ত্রয়ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বাংলার খনিজ সম্পদ

বাংলার প্রধান খনিজ সম্পদ্ হইতেছে কয়লা ; সমগ্র ভারতে ১৯৩০ সালে ২ কোটি ৩৮ লক্ষ টন্ কয়লা উৎপন্ন হয়, ইহার মধ্যে বৃটিশ ভারতে উৎপন্ন হয় ২ কোটি ২৭ লক্ষ টন্। বিহারের ঝরিয়া, গিরিধি প্রভৃতি কয়লার খনিতে ১½ কোটি টন্ ওঠে ; বর্ধমান জেলার রাণীগঞ্জ, আসানসোল প্রভৃতি স্থানের কয়লা খনি হইতে ৬৩ লক্ষ টন্ কয়লা উঠিয়াছিল। বিহারে বাংলা হইতে ২·৩ গুণ কয়লা হয়।*

	বৃটিশ ভারতবর্ষ	বিহার	বাঙলা
১৯২১	১,৮৩,৯৭,৬৭১ টন্	১,২৯,৯০,৪৮১ টন্	৪২,৫৯,৬৪২ টন্
মূল্য	১২,৩১,৫৭,৩৪৬ টাকা	৮,১০,৩২,৭৬৮ টাকা	৩,২৯,২২,৮৮০ টাকা
১৯২৬	২,০১,১৩,৪০৫ টন্	১,৩৯,৫৫,৭৭৭ টন্	৫১,৩৭,৬৮৮ টন্
মূল্য	৯,৭৩,০২,২৯৬ টাকা	৬,৪১,০৮,০০৭ টাকা	২,৬৮,৪১,৮২২ টাকা
১৯৩০	২,২৭,৬২,৩৯৪ টন্	১,৫০,৬৪,৪২৫ টন্	৬৩,১৬,৫২৮ টন্
মূল্য	৮,৮৫,৮৯,৭৯০ টাকা	৫,৫২,৩৩,৩৬০ টাকা	২,৪৯,৪৬,৯১০ টাকা
১৯৩৫	২,৩০,১৬,৬৯৫ টন্	১,২৭,৪৭,৩৪০ টন্	৬৬,৮২,৭৫২ টন্
মূল্য	৬,৫২,২০,৮৪০ টাকা	৩,৩৯,৬৬,৩৫৪ টাকা	১,৭২,৭৬,৪৬৩ টাকা

১৯৩২এ বাংলাদেশে ১৯৭টি খনি ছিল ও তৎপূর্ব বৎসরে খনিমণ্ডলে ২০৬টি খনি ছিল, বিহারে ছিল ২৭৩। বাংলাদেশে ১৯৩১এ ৫৮,১০,১৮৪ টন্ কয়লা উঠিয়াছিল ; ইহার মধ্যে বাঁকুড়ায় ৭২৩০ টন্, বীরভূমে ১০১৯ টন্ ও বর্ধমানে ৫৮,০১,৯৩৫ টন্ কয়লা উঠিয়াছিল। এই সব খনিতে গড়ে দৈনিক ৪৪,৬৪২ জন লোক কাজ করিত। বিহারে কাজ করিয়াছিল ৯৮,৮১৭।

শিল্পোন্নতি, রেলবিস্তার, ষ্টীমারের চলাফেরার উন্নতির জন্য কয়লার চাহিদা বাড়িয়াছে। ধনী ও মধ্যবিত্ত মানুষের আর্থিক অবস্থা ভাল হওয়ায় পাকাবাড়ী, কারখানা প্রভৃতির জন্য ইটের প্রয়োজন বাড়িয়াছে ও ইটের পাঁজা তৈয়ারীর

* Chief Inspector of Mines in India, 1931, p. 38-39.

জন্য কয়লা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। কোন্ বিষয়ে কতখানি কয়লা বাঙলাদেশে লাগে তাহা আমরা দেখাইব।

বাঙলাদেশের কয়লা প্রধানত যায় বর্মায়, সিংহলে, ষ্ট্রেট সেটেলমেণ্টে, হংকঙে ও ফিলিপাইনে। কলিকাতা কয়লা রপ্তানীর প্রধান বন্দর। বিদেশী কয়লার আমদানী কমিয়াছে।

কতকগুলি শিল্পে ষ্টীম উৎপন্ন করিবার জন্য কয়লার ব্যবহার প্রায় বন্ধ হইয়াছে; গত যুদ্ধের সময় হইতে বাঙলায় চালের কলের সূত্রপাত হয়; তখন কয়লা বয়লারে ব্যবহৃত হইত। গত কয়েক বৎসর হইতে এই সব বয়লারে তুষ ব্যবহৃত হইতেছে; ফলে সেখানে কয়লার চাহিদা কমিয়াছে। আখের কলেও পেষা-আখ জ্বালানি হয়; সেখানেও কয়লার চাহিদা নাই। বর্তমানে বহু শহরে ইলেকৃট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী হইতেছে; এ সব কলে পেট্রোলিয়ামের ক্রুড্ তেল ব্যবহৃত হয়।

কয়লা হইতে বহুবিধ উপসামগ্রী প্রস্তুত হয়; আলকাতরা হইতে সকল প্রকার আনিলিন্ রঙ প্রভৃতি বিবিধ সামগ্রী প্রস্তুত হইতে পারে; কিন্তু বাঙলা-দেশের কয়লার খনির সহিত এইসব রাসায়নিক শিল্পের কোনো চেষ্টা হয়। বাঙলাদেশে বড় বড় যে কয়টি খনি আছে, তাহার অধিকাংশের মালিক ইংরেজ কোম্পানী। বাঙলার কয়লার ব্যবসার ইতিহাস সংক্ষেপে এইরূপ। ১৮৪৪ সালে Bengal Coal Company রেজিষ্টারী হয়। ১৮৬৩ সালে ইক্যুটেবল কোল কোম্পানী গঠিত হয়। ইহার দশ বৎসর পরে রাণীগঞ্জ কোল্ এসোসিয়েশন কাজে নামে। ১৮৭৫ সালে বরাকর কোল কোম্পানী হয়। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর এ ছাড়া আর কোনো কোম্পানী বাঙলা-বিহারে কয়লার কাজ করিতে আসে নাই। ১৯০৪ সালের পর হঠাৎ কয়লার বাজার চড়িল; দেখিতে দেখিতে বহু কোল কোম্পানী গঠিত হইল; এবং সে সময়ে যে কেহ টাকা খাটাইবার কথা ভাবিয়াছিল, সেই কয়লার 'শেয়ার' ক্রয় করিয়াছিল। কিন্তু সমস্ত ফট্‌কা শেয়ারের দশা যা হয়, কয়লারও তাই হইল। তারপর যুদ্ধের পর লোকে পুরতান কথা ভুলিয়া আবার কয়লার দিকে ঝোঁকে।

যুদ্ধের পর ১৯২১ সালে ব্যবসায়-বাণিজ্য বেশ মাথা খাড়া করিয়া উঠিতে আরম্ভ করে। কয়লার দর চড়ে; গবর্মেণ্ট স্বয়ং বিস্তর কয়লার ক্ষেত ক্রয়

করিয়া কাজ সুরু করিল ; কারণ সরকারী রেলের ইঞ্জিনের খোরাক জোগাইবার জন্য প্রচুর ব্যয় গবর্মেণ্টকেই করিতে হয়। গবর্মেণ্ট এমনভাবে কয়লার বাজার নামায় যে, বাজার উন্টা দিকে চলিতে সুরু করিল ; দর নরম হইতে সুরু করিল। কতকগুলি কয়লার মালিক এসোসিয়েশন গঠন করিয়া কয়লার দর নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা করিল ; কিন্তু যাহারা এসোসিয়েশনের বাহিরে থাকিল তাহারা শস্তায় কয়লা কিনিয়া গবর্মেণ্টের কয়লা সরবরাহ করিল। এসোসিয়েশন ভাঙিয়া গেল, এবং তখন হইতে দর কাটাকাটি পূর্ণ মাত্রায় চলিল।

ভারতবর্ষে কয়লা কতখানি করিয়া তোলা হইতেছে, তাহার একটা তালিকা দিলাম :—

	হাজার টন্		হাজার টন্
১৮৮০	১০,১৯	১৯২০	১,৭৯,৬২
১৮৯০	২১,৬৮	১৯৩০	২,৩৮,০৩
১৯০০	৬১,১৮	১৯৩১	২,১৭,১৬
১৯১০	১,২০,৪৭	১৯৩২	২,০১,৫৩

গ্রেটবৃটেন ছাড়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের আর কোনো দেশ এত কয়লা উত্তোলন করে না। ১৯৩২ এর তালিকা প্রদত্ত হইল।

		টন্
বৃটেন	...	২০,৮৭,৩৩,০০০
ভারত	...	২,০১,৫৩,০০০
কানাডা	...	১,০৪,৬৭,০০০
অষ্ট্রেলিয়া	...	৮৯,৯৮,০০০
নিউজীল্যাণ্ড	...	১৭,৩৭,০০০
দক্ষিণ আফ্রিকা	...	৯৭,৬৪,০০০

এখন দেখা যাক ভারতের কোনখানে কতখানি কয়লা উঠে, এবং কি দর পাওয়া যায় :—

১৯৩২	টন্	
বঙ্গদেশ	৫৭,৮২,৬০৩	৩।০
বিহার-উড়িষ্যা	১১৮,৪৭,২১৬	৩৶০
আসাম	২,১০,০৩৫	১০৸৵০
পঞ্জাব	৭২,৮৫৭	৫।০
বেলুচিস্থান	১৮,৯২৮	৭৸৵০
মধ্যপ্রদেশ	১১,৬৩,০৯৬	৩৸৵০
হায়দ্রাবাদ	৭,৮১,১২১	৩৸৶০
রাজপুতানা	৩০,০৪৩	৪৵০
মধ্যভারত	২,৪০,৪৮৮	৪৶০
মোট	২,০১,৫৩,৩৮৭	৩৸৵০ গড়ে

কোন্ দেশে কত টন্ কয়লা মাথাপিছু ব্যয়িত হয় দেখা যাক্—

ভারতবর্ষ	·০৬	বৃটেন	৩·০২
কানাডা	৩·৩২	অষ্ট্রেলিয়া	১·১৯
নিউজীল্যাণ্ড	১·৫	দঃ আফ্রিকা	১·০৪

১৯৩২ সালে ভারতবর্ষে মোট ব্যবহৃত কয়লাব কত অংশ কিভাবে ব্যবহাব হয় তাহার একটা হিসাব দিলাম :—

রেলপথসমূহে	৩২·৭	পোর্টট্রাষ্টের কাজে	৫·৭
সরকারী জাহাজে	০·২	নদীসমূহের ষ্টীমারে	৩·০
পণ্যবাহী জাহাজে	৫·৫	ইট ও টালির কারখানায়	৩·৪
কাপড়ের কলে	৬·৯	চা-বাগানে	১·০
চট-কলে	৩·৩	কাগজের কলে	০.৭
লৌহ, পিতলাদির কারখানায়	৩০·৩	খনিসমূহে	১০·২
		বিবিধ শিল্পকার্যে	১২·১

বাঙলার বন্দর হইতে প্রতিবৎসর কয়লা রপ্তানী হয়; ভারতবর্ষের নানা বন্দব হইতে এছাড়াও বাহিরে যায় :—

	টন্		টন্
১৯২৯	২৬,১৭,৬০৭	১৯৩১	২১,৯২,০২৯
১৯৩০	২০,৫০,৫২৫	১৯৩২	১৮,৭৫,৬৪৪

এ ছাড়া জাহাজের ব্যবহারের জন্য লক্ষ টন্ কয়লা রপ্তানী হয়। ১৯০৮, ১৯১০ সালে ১০ লক্ষ টন্ পর্যন্ত রপ্তানী হয় এই জাহাজের জন্যই। ১৯২৭ সালে নয় লক্ষ টনের উপর ছিল; কিন্তু তার পর থেকেই কমিতে কমিতে ১৯৩২ সালে ৬,২৮,২৩১ টন্ মাত্র রপ্তানী হইয়াছিল।

ভারতের পশ্চিম দেশে নানা স্থানে কয়লা চালান হয়; কিন্তু ইহার চাহিদা হ্রাস পাইয়াছে; কারণ বোম্বাই অঞ্চলে আফ্রিকার কয়লা শস্তায় পাওয়া যায়। ১৯২৩ সালে সওয়া ছয়লাখ টন্ ছিল। ১৯৩২ সালে মাত্র ৪০,৯৭৮ টন্ হয়।

বাঙালার ষ্টীম কয়লার দাম কি ছিল, তাহার একটা তালিকা দিলাম।

		টন্ প্রতি			প্রতি টনের মূল্য
১৯০২	...	৩।৶৬	১৯১৮	...	৫।৩
১৯০৩	...	৩।৶০	১৯১৯	...	৬॥/০
১৯০৪	...	৩॥৹	১৯২০	...	৮৸১০
১৯০৫	...	৩॥০	১৯২১	...	১৮৵৮
১৯০৬	...	৪॥৵০	১৯২২	...	১৪॥৵৭
১৯০৭	...	৬।০	১৯২৩	...	১২।৭
১৯০৮	...	৬৸০	১৯২৪	...	১০॥/০
১৯০৯	...	৪।০	১৯২৫	...	৭॥/০
১৯১০	...	৪॥/৭	১৯২৬	..	৬।/১০
১৯১১	...	৩৸৹	১৯২৭	...	৫৸০
১৯১২	...	৬৶৭	১৯২৮	...	৫।৶৯
১৯১৩	...	৬॥০	১৯২৯	...	৬৲
১৯১৪	...	৭।/০	১৯৩০	...	৫৸৭
১৯১৫	...	৫।/৮	১৯৩১	...	৫।৵৩
১৯১৬	...	৫/৪	১৯৩২	...	৪॥৵২
১৯১৭	...	৬৲			

বাঙলার কাঁচা কয়লার দর নিখিল ভারতের কয়লার দরের সঙ্গে বাড়িয়াছে ও কমিয়াছে। বাঙলার কয়লার দর কোন্ বৎসরে কি ছিল, তাহা নিম্নে দিলাম :—

বৎসর	টন্ বা ২৭ মণের দাম টাকা	বৎসর	টন্ বা ২৭ মণের দাম টাকা
১৯২১-২২	৭·৭	১৯২৭-২৮	৪·৫
১৯২২-২৩	৯·৬	১৯২৮-২৯	৩·৯
১৯২৩-২৪	৯·১	১৯২৯-৩০	৩·৯
১৯২৪-২৫	৮·৬	১৯৩০-৩১	৩·৯
১৯২৫-২৬	৬·৭	১৯৩৪-৩৫	২৷৵৮
১৯২৬-২৭	৫·২	১৯৩৫-৩৬	২৷/৪

১৯৩০-৩১ সালে বাঙলায় ৬৩ লক্ষ টন্ কয়লা উঠিয়াছিল ; ইহার দর ছিল ২৷৹ কোটি টাকার কম ; কিন্তু ১৯২৫-২৬ সালের দর যদি থাকিত তাহা হইলে আড়াই কোটি টাকার জায়গায় দাম হইত সওয়া চার কোটি টাকা।

ইংরেজিতে যাহাকে বলে metallurgy বা ধাতুশিল্প, তাহা বাঙলাদেশে নাই ; এখন আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় কাঁসা, পিতল, তামা বিদেশ হইতে আসে। কিন্তু বাঙলাদেশের পাশেই সিংহভূম জেলা ছিল তামার জন্য বিখ্যাত। এখনো সেখানে বিরাট কারখানায় কাজ হইতেছে ; অবশ্য সে কারখানার মালিক য়ুরোপীয়রা। Metllurgyর দিকে বাঙালী বণিক্‌দের দৃষ্টি দেওয়ার সময় হইয়াছে।

লবণ*

মানুষের জল হাওয়া যেমন কোনোকালে ট্যাক্সের বিষয় ছিল না, সমুদ্রের জল ও লবণও তেমন খাজনার বিষয় ছিল না। মুসলমান যুগে যে সামান্য কিছু আদায় হইত, তাহা ধরিবার মতো নয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে

* M. P. Gandhi, Monograph on Common Salt, 1930, P. 674.

ব্যবসায় নামিবার পর হইতে লবণের উপর শুল্কের কথা তাহাদের মনে হয়। ইতিহাস পাঠকমাত্রই অবগত আছেন ইংরেজের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করিবার পূর্বেই বাঙলাদেশে অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুতরাং দেওয়ানী প্রাপ্তির পূর্বেই তাহাদের গোমস্তা ও কর্মচারীরা বাঙলার ভিতরে ভিতরে ঢুকিয়া আভ্যন্তরীণ ব্যবসায় প্রায় সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করিয়াছিল।

দেওয়ানী প্রাপ্তির পর ক্লাইভ লবণ বিক্রয়ের জন্য একটি প্রাইবেট কোম্পানী গঠন করেন; কিন্তু বিলাতের পরিচালকবর্গ ইহা অনুমোদন করেন না; ১৭৬৮ সালে ঐ প্রাইবেট কোম্পানী উঠিয়া যায়। ঐ বৎসরেই কোম্পানী লবণের এক্‌সাইজ্‌ বা আবগারী ব্যবস্থা করেন এবং কোনো লবণ ব্যবসায়ীকে পঞ্চাশ হাজার মণের বেশি প্রস্তুত করিতে পারিবে না—এই সর্তে আবদ্ধ করেন। সমুদ্র-উপকূলের কয়েকটি স্থান লবণের জন্য বিখ্যাত ছিল; সুতরাং কোম্পানীর তাহা দুই একস্থানে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভবপর হইয়াছিল। কিন্তু ইহা হইতে লবণের আয় বাড়িল না। বরং দেখা যায় ১৭৬৬ হইতে ১৭৭২এর মধ্যে আয় কমিয়া গেল। এমন সময় হেষ্টিংস হইলেন বাঙলার গবর্ণর; তাঁহার মত প্রতিভাশালী শাসনকর্তা এদেশে কমই আসিয়াছেন। তিনিই ১৭৭৩ সালে লবণকে সরকারী সম্পত্তি বলিয়া ঘোষণা করিলেন। পাঁচ বৎসরের মেয়াদে ঠিকাদারদের সহিত লবণ সরববাহের বন্দবস্ত হয়; কিন্তু ইহাতেও আশানুরূপ রাজস্ব বৃদ্ধি হইল না। ১৭৮০ সালে পুনরায় নূতন পদ্ধতি তিনি প্রবর্তন করিলেন—তাহাকে বলা হয় এজেন্সি প্রথা; এবং ইহাই বহুকাল পর্যন্ত চলে। সমস্ত প্রদেশের জন্য একজন কন্‌ট্রোলার নিযুক্ত হন; তাঁহার অধীন 'নিমৃকি' এজেণ্টরা কাজ দেখিতেন। লবণ প্রস্তুত যাহারা করিত তাহাদের বলিত 'মালাঙ্গি'। ইহারা এজেণ্টের তাঁবে কাজ করিত, ধার্য দামে লবণ এজেণ্টকে বিক্রয় করিত। ইহাতে মালাঙ্গিদের যতই সর্বনাশ হউক না কেন, রাজস্বের দিক্ হইতে খুবই সুবিধা হইল; ১৭৮০ সালে যেখানে লবণের আয় কমিয়া ৮৪২৭ পাউণ্ড হইয়াছিল, সেখানে ১৭৮৬-৮৭ সালে ৪৫৭,৬৮৭ পর্যন্ত হইল। কোম্পানীর লবণের এই ব্যবসায়কে একচেটিয়া করিয়া লওয়াতে দেশী লবণ-ব্যবসায়ী ও মালাঙ্গিদের খুব ক্ষতি

হয়; এ ছাড়া লবণের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় লবণের ব্যবসায় দেশ মধ্যে হ্রাস পায়। ১৭৯৩ সালে যেখানে লোকে গড়ে মাথাপিছু ১১·৯ পাউণ্ড লবণ ব্যবহার করিত, সেখানে ১৮৪৩ সালে ৯ পাউণ্ড মাত্র ব্যবহার করে। অথচ ফরাসী চন্দননগরের ১৮১৫ সালের রিপোর্টে জানা যায় যে, লোকে ২২-২৩ পাউণ্ড লবণ গড়ে বৎসরে ব্যবহার করিত।

কোম্পানী বাঙলার লবণের একচেটিয়া ব্যবসায় বজায় রাখিবার জন্য শস্তা মাদ্রাজী ও সিংহলী লবণ এদেশে আসিতে দিত না। বাঙলাদেশ মাদ্রাজকে ধান বিক্রয় করিত, কিন্তু তাহার বদলে সে লবণ কিনিয়া আনিতে পারিত না। ইহা একচেটিয়া ব্যবসায়ের অত্যাচার। এমন কি, ১৮১৭ পর্যন্ত বিলাতী লবণও এদেশে আসিতে পারিত না; একশ' মণ লবণের জন্য ৩০০৲ টাকা শুল্ক আদায় করা হইত। এছাড়া কোথায় কোনো লোক একটু লোনা জল ফুটাইলে কঠোর শাস্তিবিধান করা হইত। কোনো জমিদার তাহার এলাকায় কেহ গোপনে লবণ তৈয়ারী করিতেছে, এ খবর যদি সরকারে না দিতেন, তবে তাঁহার ৫০০০৲ টাকা জরিমানা হইত। এবিষয়ে পরে পরে অনেক রেগুলেশন পাশ হয়।

ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে কোম্পানীর একচেটিয়ার বিরুদ্ধে জনমত ক্রমশই তীব্র হইয়া উঠিতেছিল। ইংলণ্ডের শিল্পীদের ব্যবসাবাণিজ্য দ্রুত উন্নতি লাভ করিতেছিল, অথচ ভারতে তাহাদের অবাধ বাণিজ্যের বাধা সৃষ্টি করিতেছিল কোম্পানী। কোম্পানীর বাণিজ্যের আয়ুকাল শেষ হইতে না হইতে ইংলণ্ড হইতে এদেশে লবণ রপ্তানীর জন্য জোর আন্দোলন সুরু হইল। অবশেষে ১৮৩৪ সালের পর কোম্পানী আর কোনো প্রকার ব্যবসায় নিযুক্ত থাকিবে না স্থির হইল; এবং এই সময় হইতে বিলাতী লবণ বাঙলায় আসিতে আরম্ভ করিল। ইংলণ্ডে চেশায়ার সল্ট কোম্পানী তখন প্রবল। এছাড়া জাহাজ কোম্পানীরাও কাজ চাহিতেছিল। তাহারাও বিলাত হইতে লবণ আনিয়া, ভারতবর্ষ হইতে অন্য মাল লইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত। এইসব নানা যোগা-যোগের ফলে বিলাতী লবণের আমদানী বাড়িতে লাগিল। ১৮৩৫ সালে বাঙলায় ২৮৪,৮৫৮ মণ বিলাতী লবণ আসিয়াছিল, ১৮৫১-৫২ সালে আসে ২,৯২৬,৮৬৬ মণ

এদিকে গবর্মেণ্টের একচেটিয়া বাণিজ্য বন্ধ হইয়া গেলে তাহারা এক্‌সাইজ বা শুল্ক প্রথায় দেশী লবণ তৈয়ারী আরও ত্রিশ বৎসর চালান। কিন্তু অবশেষে ১৮৬৪-৬৫ সালে সরকার ঠিক করিলেন, লবণের কারবার হইতে একেবারে ছুটি লইবেন। ফলে হতভাগ্য মালাঙ্গিরা ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে মরিল। ১৮৭২ সালের পর বাঙলাদেশে লবণের কারবার প্রায় লুপ্ত হইল; ১৮৯৮ সালের পর চিহ্ন পর্যন্ত লোপ পায়। বাঙলার একটা প্রকাণ্ড কারবার নষ্ট হইল ও বাঙালী বিদেশী লবণ কিনিতে বাধ্য হইল। বাঙলার সমুদ্র উপকূলে অতি প্রাচীনকাল হইতে লবণ-শিল্প গড়িয়া উঠে; সমগ্র উত্তর বঙ্গের অধিকাংশই বাঙলার লবণ ব্যবহার করিত; বাঙলার সমুদ্রতীরে ও তমলুক, হিজলি কাঁথি, সুন্দরবন, ভোলা (বাখরগঞ্জ), চট্টগ্রাম ও উড়িষ্যার তীরে লবণ তৈয়ারীর যে ব্যবস্থা ছিল, এবং যে ব্যবসায়ে বহু লোক প্রতিপালিত হইত, তাহার অবসান হইল।

আজকাল বাঙলার বন্দরে প্রতিবৎসর দেড় কোটি মণ লবণ আসে; ইহার মধ্যে ৫০ লক্ষ মণ আসে এডেন হইতে। সাধারণত এডেন, লোহিত সাগরতীরবর্তী বন্দর, মিশর, স্পেন, লিভারপুল, হামবুর্গ, রুমানিয়া হইতে বিদেশী লবণ আসে। এছাড়া ভারতীয় লবণ আসে কাথিয়াবাড় হইতে। ভারতের প্রায় সকল উপকূলেই লবণ প্রস্তুত হয়—কেবল হয় না বাঙলার সমুদ্র উপকূলে। গবর্মেণ্টের-লবণ-অনুসন্ধান কমিটি অনেক অনুসন্ধান করিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলেন যে, বাঙলায় এমন কি, মেদিনীপুরেও লবণ প্রস্তুত লাভজনক হইবে না। (অধুনা কয়েকটি কোম্পানী কাজ সুরু করিয়াছে)।

কাথিয়াবাড় এখন বাঙলায় সবথেকে বড় লবণ-বিক্রেতা। ১৯২৭-২৮ সালে ১'৩১ লক্ষ টাকার লবণ আসে। আর ১৯৩২-৩৩ সালে আসে ৩০'৪৩ লক্ষ টাকার। ইংলণ্ড ক্রমশই বাঙলাদেশে লবণের ব্যবসায় পিছাইতেছে। ১৯২১-২২ সালে ১৯'৩৯ লক্ষ টাকার লবণ বাঙলায় বিক্রয় করে; দশ বৎসর পরে মাত্র ৩'৪২ লক্ষ টাকার লবণ আসে।

ভারতবর্ষের কোথায় লবণ প্রস্তুত হইতেছে, তাহার তালিকা দেখিলে পাঠক বুঝিবেন, বাঙালীর এই শিল্পে স্থান কোথায়। তালিকা ১৯৩৫ সালের—

	টন্	মূল্য
এডেন	৩,৩৯,৬৬৭	১৯,৮১,২৯৯৲
বঙ্গদেশ	১৭	১,০৭৯৲
বোম্বাই-সিন্ধু	৬৩৩,৭০০	৩১,০২,৬৫৬৲
বর্মা	৪০,০৮৬	৫,৩১,০০৯৲
গবালিয়র	৯৫	৪,৭২৫৲
মাদ্রাজ	৪৬০,২৫৭	২২,৮৯,৭৯০৲
উত্তর ভারত	৪৭৪,৩৫১	৩৭,৭৮,৫৭৯৲
মোট	১,৯৪৮,১৭৩	১,১৬,৮৯,১৩৭৲

বাঙলাদেশে অধুনা কয়েকটি লবণ কারখানা স্থাপিত হইয়াছে ; তবে অন্যান্য প্রদেশের সহিত তুলনা করিয়া দেখাইবার অবস্থা এখনো হয় নাই। ভারতে উৎপন্ন এই ১৯'৪৮ লক্ষ টন্ লবণ ছাড়া বিদেশ হইতে ১৯৩৫ সালে ৩,৯৩,৯৭২ টন্ (মূল্য ৫৭,৬৪,২৬২৲) লবণ বিদেশ হইতে আমদানী হয়।

বাঙলাদেশে কতখানি লবণ প্রতিবৎসর ব্যবহৃত হয়, তাহার তালিকা ১৯২১ সাল পর্যন্ত পাওয়া যায় ; সেই সংখ্যাটির সাহায্যে আমরা মাথা-পিছু ব্যবহৃত লবণের পরিমাণ জানিতে পারি।

বাঙলায় ব্যবহৃত লবণ

	লক্ষ মণ		লক্ষ মণ
১৯১২-১৩	৭৬'৪২	১৯২০-২১	৮৪'৪৬
১৯১৬-১৭	৭০'৭৬	১৯২১-২২	৮৪'৪৬
১৯১৮-১৯	৭৬'৫১	১৯২৪-২৫	৭৭'২০
১৯১৯-২০	৭৮'১২	১৯২৫-২৬	৭৬'১০

মাথাপিছু বৎসরে লবণের পরিমাণ কতখানি তাহা আমরা এইখানে দেখাইতেছি :—

	সের		সের
১৮৮০-১	৫ $\frac{১}{১৬}$	১৯০০-০১	৫ $\frac{৩}{৪}$
১৮৯০-১	৫ $\frac{১}{২}$	১৯০৩-০৪	৫ $\frac{১}{৮}$

	সের		সের
১৯১২-১৩	৬·৭	১৯২১-২২	৭·৬
১৯১৪-১৫	৫·৮	১৯২৪-২৫	৫·২ (আন্দাজ)
		১৯৩০-৩১	৭·৫ (আন্দাজ)

১৯২১-২২ সালে অন্যান্য প্রদেশে কতখানি করিয়া লবণ জনপ্রতি ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা দেখা যাক্ :—

	পাউণ্ড		পাউণ্ড
পঞ্জাব	১০·২৬	মধ্যপ্রদেশ	১১·৫৬
সিন্ধু	১০·৪১	বোম্বাই	১৩·৯৪
রাজপুতানা	১০·৫৯	বঙ্গদেশ	১৫·২৪
বিহার-উড়িষ্যা	১০·৯৭	বর্মা	১৮·৫৪
সংযুক্ত প্রদেশ	১০·৯৮	মাদ্রাজ	১৮·৮৮

এখানে দেখা যাইতেছে, যে জাতি ভাত খায়, তাহাদের লবণের প্রয়োজন বেশী হয়। বিদেশে মাথাপিছু লবণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশী দেখা যায়। ইংলণ্ড ৪০ পাউণ্ড, পর্তুগাল ৩৫, ইতালি ২০, ফ্রান্স ১৮, রুশ ১৮ পাউণ্ড লবণ মাথাপিছু ব্যবহার করিত। বেলজিয়াম ১৬½, অষ্ট্রিয়া ১৬, প্রুশিয়া ১৪, স্পেন ১২, বৃটিশ ভারত ১২ পাউণ্ড, সব কাছাকাছি ; কিন্তু এই পরিমাণ অত্যন্ত স্বল্প। কুলীদের জন্য নিযুক্ত সরকারী ডাক্তারের মতে অকর্মণ্য অবস্থাতেও ২২½ পাউণ্ড (১১¼ সের) লবণ প্রয়োজন। এই হিসাবে বাঙলার তথা ভারতের মাথাপিছু লবণের ব্যবহার খুবই কম স্বীকার করিতে হইবে।*

ভারতবর্ষে যে পরিমাণ বিদেশী লবণ আমদানী হয়, তাহার চৌদ্দআনি বাঙলায় আসে। বোম্বাই, মাদ্রাজেও আমদানী হয়, কিন্তু তাহা অতি সামান্য ; সেখানকার উপকূলে লবণ প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা গবর্মেণ্টের আছে। বাঙলায় সেরূপ নাই। গবর্মেণ্ট হইতে প্রতিবৎসর বাঙলাদেশ সম্বন্ধে যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়, তাহাতে কলিকাতার বন্দরে আমদানী মালের বিস্তৃত তথ্য থাকে ; কিন্তু সমুদ্র পথে অনেকখানি লবণ চট্টগ্রামেও আসে, আমরা বাঙলার মোট হিসাব দিতেছি :—

* M. P. Gandhi, Monograph on Common Salt, 1930, p. 178.

১৮৮০-১৮৯০ গড়ে প্রতিবৎসর		৯৫ লক্ষ মণ	লক্ষ টাকা
১৮৯০-১৯০০ ,, ,,		১ কোটি মণ	,,
১৮৯০	...	...	২০·৭৩ ,,
১৯০১-১৯০২	...	১৩৫ লক্ষ মণ	৩৯·৮২ ,,
১৯০৩-০৪	...	...	২৯·৮২ ,,
১৯১১-১২	...	৬৪·৮১ লক্ষ মণ	(বর্তমান বাঙলায়)
১৯১২-১৩	...	৬২·০৯ ,,	,,

	বাঙলায় আমদানী লবণ (হাজার টন)	(লক্ষ টাকা) বিদেশ হইতে আমদানী	বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি হইতে	মোট টাকা
১৯২২-২৩	৪৪৯	১১৯·৯৫	২২·৫৬	১৪২·৫১
১৯২৩-২৪	৩৮১	৮০·৪৬	৮·৭৩	৮৯·১৯
১৯২৪-২৫	৫১৪	১০৫·৪৬	২২·২২	১২৭·৬৮
১৯২৫-২৬	৪৩৬	৭০·৩২	৭·৪৮	৭৭·৮০
১৯২৬-২৭	৪৩৬	৮৯·৪১	১৩·৩৪	১০২·৭৫
১৯২৭-২৮	৪৬৭	১২৬·৬৪	১৯·২৫	১৪৫·৮৯
১৯২৮-২৯	৪৯৩	১০৮·২৫	১৫·৮২	১২৪·০৭
১৯২৯-৩০	৫৫৩	৯৫·১৬	২৯·৬০	১২৪·৭৬
১৯৩০-৩১	৬০২	৮২·০৫	২৩ ২৮	১০৫·৩৩
১৯৩১-৩২	৪৭২	৫৭·০৮	৫১·৫৮	১০৮·৬৬
১৯৩২-৩৩	৫২৮	৫৪·৯২	৬৬·৬১	১২১·২৩

ধান হইতে চাল করা যে ধরণের শিল্প, সেই ধরণের শিল্প হইতেছে সরিষা তেলের কল, ময়দার কল, সুরকি কল, ইট ও টালির কারখানা। এই সব কারখানাকে ঠিক শিল্পের মধ্যে ফেলা অনুচিত।

এছাড়া রাসায়নিক শিল্প, ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প, বৈদ্যুতিক শিল্প বাঙলায় গড়িয়া উঠিয়াছে এবং উঠিতেছে। বেঙ্গল কেমিক্যাল, বেঙ্গল ইম্যুনিটি, ডাঃ কার্তিক বসুর কারখানা, কলিকাতা কেমিক্যাল ওয়ার্কস প্রভৃতির ঔষধ; বেঙ্গল কেমিক্যাল, বসাক, শর্মা-ব্যানার্জি কোংর প্রসাধন সামগ্রী; কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস, ন্যাশনাল সোপ (Nasco), বঙ্গলক্ষ্মী প্রভৃতি বহু কোম্পানীর সাবান; ওয়াটার প্রুফ ও অয়েল ক্লথ, এনামেল, গাটাপার্চা, সেল্যুলয়েড, এনামেল, বিজলিবাতি, বেল্টিং, লেখার কালী, জুতার কালী ও ব্রক্সো, ঝিনুকের বোতাম, ফাউন্টেন পেন, কলমের কারখানা প্রভৃতি বাঙালীর আর্থিক উন্নতির উদাহরণমাত্র।

পাট শিল্প

পাট, নাল্‌তে, ধনচে, শণ, গাঁজা, কোঁয়া, নারিকেলের ছোবড়া, কার্পাস তুলা—এই কয়প্রকার উদ্ভিজ্জ আঁশাল পদার্থ বাঙলায় পাওয়া যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাঙলাদেশে ধান, আখ, নীল, তুলা, তুঁত ছিল বাঙলার প্রধান কৃষি শস্য। বহু বৎসর নীল ছিল প্রধান ব্যবসায় শস্য। ব্যবসায় শস্য বা Commercial Crop তাহাকে বলিতেছি, যাহা কেবলমাত্র বিক্রয়ের জন্যই উৎপন্ন করা হয়, অন্যের চাহিদার উপর যাহার বিক্রয় নির্ভর করে; নীল ছিল সেই জাতের কৃষি শস্য। ক্রমে পরিপূরক জারমেন রঙ আবিষ্কৃত হওয়ায় নীলের চাষ কমিতে কমিতে বাঙলাদেশ হইতে লোপ পাইল। কাপড়ের ব্যবসায় ধ্বংস হওয়াতে তুলার চাষও খুব কমিয়া গিয়াছে। চিনির কারবার ধ্বংস হওয়ায় আখের চাষ হ্রাস পাইল। রেশমের ব্যবসায় বন্ধ হওয়ায় তুঁতের চাষ লুপ্ত হইল। এমন সময় বিদেশ হইতে চাহিদা হইল পাটের; তখন বাঙালী চাষী সেই চাহিদা পূরণে মন দিল। মোট কথা, গত একশত বৎসর বাঙালী বাহিরের চাহিদা পূরণ করিবার জন্য চাষ করিতেছে কিন্তু তাহার মূল্যাদি নিয়ন্ত্রিত হইতেছে বাহির হইতে।

বাঙলাদেশের চাষের জমিতে কি পরিমাণ কোন্ শস্য উৎপন্ন হয়, তাহার অনুপাত নিম্নে দেওয়া গেল।

১৯৩০-৩১ সালে

মোটামুটি হিসাব

ধান	৭২·৫ = ২,০৫,৮২,০০০	একর
অন্যান্য ডাল প্রভৃতি	৫·৩ = ১৫,০৭,৫০০	,,
পাট	১০·৭ = ৩০,২৮,০০০	,,
তরিতরকারি	২·৬ = ৭,৪৮,০০০	,,
আখ, তামাক ইত্যাদি	২·৬ = ৭,৫০,০০০	,,
তিল, সরিষা ইত্যাদি	৬·৩ = ১০,৮৬,২০০	,,
	১০০	

সমগ্র বাঙলার চষা জমির শতকরা দশ ভাগ জমিতে পাট হয়। যুদ্ধের পূর্বে ১৯০৪ হইতে ১৯১৩ পর্যন্ত এই দশকে গড়ে প্রতি বৎসর কি পরিমাণ কোন্ ফসল সমগ্র ভারতে হইয়াছিল এবং কি দাম পাওয়া গিয়াছিল দেখা যাক্।*

শস্য	আয়তন (একর, হাজার)	উৎপন্ন শস্য	একর প্রতি উৎপন্ন মণ	মণ প্রতি পাইকারী দাম	একর প্রতি উৎপন্ন শস্যের দাম
চাল	৫,৬৯,৮৯৫	২,৪০,২৫,০০০ টন্	১১·৫	৪·৭৫ টাকা	৫৪·৬২ টাকা
গম	২৮,১৪৫	৪৭,৫২,৩৫০ টন্	৮·৪	৩·৭৩ ,,	৩১·৩৩ ,,
তুলা	২০,৯৭৯	৩৮,৩৬,৯৬৬ বস্তা	০·৮৮	২৮·৩০ ,,	২৫·০৪ ,,
পাট	৩১,১৪,৪২০	৮২,৯৮,৫৯০ বস্তা	১২·৯	৯·৬০ ,,	১২৮·৭৯ ,,

বেশ দেখা যাইতেছে, পাটের চাষই সর্বাপেক্ষা বেশি লাভজনক ছিল; সুতরাং চাষীর লাভ ও লোভ যে যুগপৎ বাড়াইয়া তুলিয়াছিল সে কথা বলা বাহুল্য।

সমগ্র ভারতের সহিত তুলনা করিয়া বিষয়টা তত স্পষ্ট নাও হইতে পারে, তাই বাঙলাদেশের অন্যান্য শস্যের সহিত তুলনা করিয়া পাটের অবস্থা দেখা যাক্।

* Beng. Jute Enquiry Com. Report, Vol. 1, p. 70.

বাঙলাদেশে একরপ্রতি উৎপন্ন শস্যের দাম*

		১৯২৯-৩০ টাকা	১৯৩০-৩১ টাকা
চাল	...	৬৬·২	৪৯·৪
গম	...	৪১·৯	২৫·৯
তুলা	...	৪২·	২৭·০
তিসি	...	৩১·৭	২৩·৪
তামাক	...	১৭১·৫	১১৪·৬
পাট	...	১২৬·৫	৫৩·৬
সরিষা	...	৪৩·০	২৫·৮
আখ	...	২৪০·০	১৮২·৩

একর প্রতি আখ ও তামাকের পরেই পাটের দাম পাওয়া যায়। কিন্তু এই দাম বাহিরের চাহিদার উপর নির্ভর করে; সে কথা পরে আলোচনা করিব। এখন দেখা যাক্ কিভাবে পাটের চাষ কত জমিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে ও কি পরিমাণ পাট উৎপন্ন হইয়া আসিতেছে :—†

	সমগ্র ভারতে হাজার একর	বাঙলাদেশে হাজার একর	মোট ভারতে উৎপন্ন হাজার বস্তা	মোট বাঙলায় উৎপন্ন হাজার বস্তা
১৮৭২-৭৩	১,০০০			৮৫০
১৯০১-০২	২,৩৩৯		৭,০০০	...
১৯০৩-০৪	২,২৭৫		৭,২৪১	...
১৯০৪-১৩ গড়	৩,১১৪		৮,২৯৮	...
১৯২২	১,৮০০	১,৫২৮	৫,৪০৪	৪,৭৪৬
১৯২৩	২,৭৮৮	২,৪১০	৮,৪০১	৭,৪৬৩
১৯২৪	২,৭৭০	২,৩৫৮	৮,০৬২	৭,১৬৬
১৯২৫	৩,১১৫	২,৬৮৫	৮,৯৪০	৭,৯৫১

* Beng. Jute Enq. Com. Report, p. 71.

† Beng. Jute Enq. Com. Report, p. 70.

	সমগ্র ভারতে হাজার একর	বাঙলাদেশে হাজার একর	মোট ভারতে উৎপন্ন হাজার বস্তা	মোট বাঙলায় উৎপন্ন হাজার বস্তা
১৯২৬	৩,৮৪৭	৩,৩২১	১২,১৩২	১০,৬৫২
১৯২৭	৩,৩৭৪	২,৯৩৩	১০,১৮৮	৯,০০৪
১৯২৮	৩,১৪৪	২,৬৭০	৯,৯০৬	৮,৫১৯
১৯২৯	৩,৪১৫	২,৯৮৯	১০,৩৩৫	৯,১৯০
১৯৩০	৩,৪৯২	৩,০৩১	১১,২০৫	৯,৮৮৬
১৯৩১	১,৮৫৮	১,৫৯৮	৫,৫৩৫	৪,৯৮৬
১৯৩২	...	১,৫০৫	৭,০৭২	৩,৫০০
১৯৩৩	...	...	৭,৯৮৭	...
১৯৩৪	...	...	৮,৫০০	...

সমগ্র বাঙলা প্রদেশে কোথায় কতখানি জমিতে পাটের চাষ হয়, তাহা বলিয়াছি। পাটের চাষ পশ্চিম বঙ্গে নিতান্ত সামান্য। কোন্ জেলায় কতখানি আবাদ হয়, তাহা আমরা নিম্নে দিলাম।

		১৯৩২-৩৩ (হাজার একর)	১৯৩৩-৩৪ (হাজার একর)
২৪ পরগণা	...	৪৬·৪	৬১
নদীয়া	...	২৭·৬	৩৬
মুর্শিদাবাদ	...	১৪·৬	২১
যশোহর	...	৪৮·৭	৭০
খুলনা	...	২২·৬	৩১
বর্ধমান	...	২·১	৩
বীরভূম	...	×	×
বাঁকুড়া	...	×	×
মেদিনীপুর	...	৫·৫	৫
হুগলী	...	১৯·১	৩৪
হাওড়া	...	৪·১	৪
রাজশাহী	...	৬৩·	৯১

		১৯৩২-৩৩ (হাজার একর)	১৯৩৩-৩৪ (হাজার একর)
দিনাজপুর	...	৫০·	৫৯
জলপাইগুড়ি	...	২·৩	২
রঙ্গপুর	...	২১৮·	২৫২
বগুড়া	...	৭০·	৮৫
পাটনা	...	৫৫·	৮০
মালদহ	...	১৯·৪	৩০
ঢাকা	...	২০৪·৮	২৬৫
মৈমনসিংহ	...	৪৭৪·৫	৫৬৬
ফরিদপুর	...	১৪৭·৫	১৫০
বাখরগঞ্জ	...	২৩·৯	·৩২
চট্টগ্রাম	...	৩	·৩
ত্রিপুরা	...	১৭৯·	১৮৩
নোয়াখালি	...	৩৫·৪	৫০
কুচবিহার	...	২৩·১	২৫
ত্রিপুরা রাজ্য	...	১·২	১·৪
মোট		১৮,৪৫,৭০০	২১,৬৮,৭০০
বিহার-উড়িষ্যা		১,৭০,০০০	১,৯০,০০০
আসাম		১,২৭,৪০০	১,২০,৪০০
		২১,৪৩,১০০০	২৪,৭৯,৮০০

গড়ে বাঙলাদেশে ২০ হইতে ২৫ লক্ষ একর জমিতে পাটের চাষ হয়; ইহার মধ্যে ১৯০৭-০৮ সালে সব চেয়ে বেশি জমিতে চাষ হয়—৩৮·৮ লক্ষ একর; সব থেকে কম হয় ১৯২১-২২ সালে ১৫·২ লক্ষ একর। উৎপন্ন পাটের শতকরা ৮৫ ভাগ বাঙলায়, ৯ ভাগ বিহার ও নেপালে এবং ৬ ভাগ আসামে হয়। মাদ্রাজে সামান্য কিছু পাট হয়।

বাঙলার জেলাগুলির মধ্যে মৈমনসিংহ জেলায় সবথেকে বেশি জমিতে পাট বোনা হয়। ১৯৩৩-৩৪ সালে তথাকার মোট ২৪,৯১,০০০ একর জমির মধ্যে ৫,৬৬,০০০ একর জমিতে পাট চাষ হয়। ইহার পরই ঢাকা, রঙপুর, ত্রিপুরা, ফরিদপুর ইত্যাদি। বিহারের ১,৯২,০০০ একরের মধ্যে পূর্ণিয়া জেলাতেই ১,৬২,০০০ একর জমিতে পাট হয়। উড়িষ্যার কটকে মাত্র ১৭,০০০ একরে চাষ হয়। আসামের গোয়ালপাড়া, নওগাঁ, কামরূপ, দরঙ ও সিলেটে পাট উৎপন্ন হয়।

	একর—চাষ		উৎপন্ন—গাঁইট	
	১৯৩৫	১৯৩৬	১৯৩৫	১৯৩৬
বাঙলা	১৯,১৭,৫০০	২১,৮০,৮০০	৬৫,৩৮,০০০	৭৭,৭৪,০০০
বিহার	১,২৮,৪০০	২,১১,০০০	৩,৪৪,৩০০	৫,২০,০০০
উড়িষ্যা	১৭,২০০	১৩,৫০০	৪৪,৭০০	২৮,৮০০
আসাম	১,১৭,৮০০	১,৭০,৪০০	৩,১২,৬০০	৪,১২,৫০০
	২১,৮০,৯০০	২৫,৪৫,০০০	৭২,৩৯,৬০০	৮৭,৩৫,৮০০

৮৭,৩৫,৮০০ গাঁইট পাটের ওজন ৪,৩৬,৭৯,০০০ মণ বা ১৬,১৭,৭৪১ টন্। ১৯৩৫-৩৬এ ভারতের সমস্ত বন্দর হইতে ১৫,২৩,০০০ টন্ পাট ও পাটজাত সামগ্রী রপ্তানী হয়; ইহার মূল্য ছিল ৩৭ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে কাঁচা পাট ছিল ৭,৭১,৩০০ টন্—মূল্য ১৫,৭১ কোটি টাকা।

বাঙলার এই পাটের চাষ পৃথিবীর পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যকীয়। পৃথিবীর যাবতীয় শস্য, লবণ, চিনি, সিমেণ্ট, খৈল প্রভৃতি সামগ্রী একস্থান হইতে অন্য স্থানে লইবার জন্য প্রচুর পরিমাণে থলিয়ার প্রয়োজন; বহুবিধ জিনিষ প্যাক করিতে চটের দরকার; গানি, ক্যানভাস, সুতলি, দড়ি প্রভৃতি শতবিধ বস্তু পাট হইতে হয়। যুদ্ধের সময় বালি ভরিবার জন্য প্রচুর ব্যাগের প্রয়োজন হয়। এছাড়া লিনোলিয়াম শিল্পের প্রধান উপাদান পাটকুচা; পশমের সঙ্গে মিশাইয়াও উহাকে নানা কাজে লাগানো হয়। এই বিচিত্র চাহিদার ফলে গত ষাট বৎসরে ১০ লাখ একর পাটের জমি হইতে ৩৮ লক্ষ একর পর্যন্ততে উঠিয়াছিল। কেন ও কিভাবে এই উন্নতি হইয়াছে ও বাঙলাদেশে নানা আর্থিক সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে, তাহারই এখন আলোচনা করা যাক।

বাঙলাদেশের চট, থলিয়া, সুতা, দড়ি প্রভৃতি নানাবিধ সামগ্রী কাপালী নামে একজাতির লোক ঘরে তৈয়ারী করিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার

দিকে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত উদ্ভিদবিদ্যাবিশারদ রক্সবার্গ সাহেব পাটের প্রতি ইংলণ্ডের ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করেন। ১৮২৮ সালে সর্বপ্রথম কিছু পাট ডাণ্ডি (Dundee)তে চালান দেওয়া হয়। এই সময়ে চট, থলিয়া, দড়ি তৈয়ারী হইত শণ বা মসিনার আঁশ হইতে। এই সময়ে ডাচদের অধিকৃত জাভা প্রভৃতি দ্বীপ হইতে কফি চালানের জন্য থলিয়ার চাহিদা হইল। সে সব চট বাঙলাদেশ হইতে রপ্তানী হইত। ১৮৫০ সালে ঘরে-বোনা চট ৯০ লক্ষ খানি, গানি ও থলিয়া ২৮ লক্ষ খানি রপ্তানী হয়। ইহার মূল্য ছিল যথাক্রমে ২১ লক্ষ টাকা ও ১৯ লক্ষ টাকা।

ইতিমধ্যে ডাণ্ডির এক স্কচ্ কারবারী পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিল যে, কলের তাঁতে পাটের চট বোনা যায়। ১৮৩৭ সালে সেখানে প্রথম কল স্থাপিত হয়। এ যাবৎ সকল কলেই রুশিয়ার শণ ও গাঁজার আঁশ ব্যবহৃত হইত। প্রথম প্রথম শণের তাঁতেই পাট বোনা হইত; কিন্তু অসুবিধা হইতে লাগিল। ইঞ্জিনীয়ারগণ নূতন ধরণের তাঁত তৈয়ারী করিলেন। এমন সময়ে রুশিয়ার সহিত ইংরেজ প্রভৃতি কয়েকটি জাতির যুদ্ধ বাঁধিল; ইতিহাসে ইহা ক্রিমিয়ান যুদ্ধ নামে পরিচিত (১৮৫৪-৫৫)। এই যুদ্ধের ফলে রুশিয়ার শণ ইংলণ্ডে রপ্তানী বন্ধ হইল; তখন হইতে বাঙলায় পাটের চাহিদা সুরু। ক্রিমিয়ান্ যুদ্ধের পূর্বে যে পরিমাণ পাট বিলাতে যাইত, তাহা দুই বৎসরে দ্বিগুণ হইয়া গেল। শুধু যে পাটের রপ্তানী বাড়িল তাহা নহে, বাঙলাদেশেই পাটের কল খোলা হইল। ১৮৫৫ সালে প্রথম চটের কারখানা শ্রীরামপুরের নিকট রিশড়ায় স্থাপিত হয়; ষ্টীমে তখন তাঁত চলিত না; তাঁতিরা কারখানায় কাজ করিত। ১৮৫৯ সালে প্রথম ষ্টীমে-চালানো তাঁত দিয়া কল স্থাপিত হইল। সেই হইতে পাটের কল একটির পর একটি হইতেছে। সুতরাং পাটের কলের ইতিহাস হইতেছে আশি বৎসরের ইতিহাস। বাঙালাদেশে যখন বিদেশী ধনিকরা ও বণিক্‌রা পাটকল নির্মাণে মন দিল, তখন ভারতের পশ্চিমে বোম্বাই শহরে পারসি বণিক্‌রা ভারতের মূলধনে কাপড়ের কল স্থাপনে লাগিয়াছেন। সেদিন বাঙালী ধনিকরা পাট কলের ভবিষ্যত দেখিতে পান নাই।

বর্তমানে ভারতবর্ষে (১৯৩০-৩১) পাটের কল ১০০টি; এ ছাড়া স্কটল্যাণ্ডে জারমেনীতে, ফ্রান্সে, ইতালিতে, জাপানে, মার্কিনরাজ্যে ও অন্যান্য দেশেও

বহুশত পাটের কল আছে। ভারতবর্ষে ১০৬ কলে মোট ৬১,৮৩৪ তাঁতে (বাঙলাদেশের ৯৪টি কলে ৬০,৬৬১) কাজ হয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ৪৫,৫৫৫টি তাঁত আছে। পৃথিবীর মোট তাঁত ১,০৭,৩৮৯টি; এই তাঁতের খোরাক যায় প্রধানতঃ বাঙলাদেশ হইতে। কোন্ দেশে কত তাঁত, কত বস্তা পাট তাহাতে লাগে সেই তালিকাটি নিম্নে দিলাম :—

১৯২৬-২৭ সনের তালিকা

দেশ	তাঁত	মিলে কত বস্তা লাগে
বঙ্গদেশ	৬০,৯১৪	
অন্য স্থানে	১,৪৯০	
ভারতবর্ষ	৬২,৪০৪	৫৬ লক্ষ বস্তা
গ্রেট বৃটেন	৮,৫০০	১০ লক্ষ বস্তা
য়ুরোপের অন্য দেশ		
জারমেণী	৯,৬০০*	২৪ লক্ষ বস্তা (জারমেণী হইতে সুইডেন)
ইতালী	৫,০০০	
বেলজিয়াম	৩,০০০	
ফ্রান্স	৭,০০০	
চেকোস্লোভাকিয়া	২,০০০	
পোল্যাণ্ড	১,৬০০	
রুশিয়া	১,০০০	
অষ্ট্রিয়া	১,১০০	
সুইডেন	১,০০০	
আমেরিকা	২,৭৫০	৭ লক্ষ বস্তা (আমেরিকা হইতে অন্যান্য)
চীন-জাপান	১,২০০	
অন্যান্য	১৮০৫	
	৪৫,৫৫৫	
মোট	১,০৭৯,৫৯	
ভারতবর্ষে খুচরা পাট বিক্রয় হয়		৫ লক্ষ বস্তা
		১০২ লক্ষ বস্তা

*১৮৬১ সালে প্রথম কল স্থাপিত হয়।

প্রত্যেক বস্তার ওজন ৫ মণ; তাহা হইলে ৫ কোটি মন পাট এদেশে উৎপন্ন হয়।

একবার পাট যখন পৃথিবীর ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিল, তখন ইহার দামের ওঠানামা, ইহার চাষের কম্‌তি-বাড়তি পৃথিবীর চাহিদার উপর নির্ভরশীল হইল। চাষীরা গ্রামের মাঠে চাষ করে বটে, কিন্তু ইহার বাজার নিয়ন্ত্রণ করে পৃথিবীর চাহিদা, যার সঙ্গে ইহাদের কোন যোগ জানত নাই। বিগত য়ুরোপীয় যুদ্ধ পর্যন্ত পাটের চাষ আশাতীতভাবে বাড়িয়া চলিয়াছিল। হঠাৎ যুদ্ধ বাঁধায় রপ্তানী কমিয়া যায়। পাটের দর ১৮৫১ সালে ছিল ১৪৷৷০ বস্তা অর্থাৎ ৫ মণের দাম। ১৯০৬ সালে ৫৭৷৷০ পর্যন্ত উঠে; তারপর আবার কমিতে কমিতে ১৯০৯ সালে ৩২৷৷০ হয়। আবার বাড়িতে থাকে; ১৯১২ সালে ৫৪।০, ১৯১৩ সালে ৭১৲, যুদ্ধের পূর্বে ১৯১৪ সালে ৮৬৷৷০ হয়। ষাট বৎসর আগে যে দর ছিল, তার প্রায় ছয়গুণ! বলা বাহুল্য, বাঙলার চাষীরা এই দর পাইয়া খুবই খুশী ছিল এবং আশা করিয়াছিল এমন দিন চিরকালই থাকিবে। যুদ্ধের সময় দাম খুবই কমিয়া যায়, ৩৫৲ পর্যন্ত নামিয়া যায়; আবার যুদ্ধান্তে হঠাৎ দপ করিয়া দর জাগিয়া উঠিয়া (১৯১৯ সালে) ৯৫৲ হইল। ইহার পর আবার কমিতে থাকে; ১৯২৬ সালে চরম দর উঠে। কিন্তু ইহার পর হইতে কমিতে সুরু হয়; কিভাবে এই কমি-বেশী হইতেছে, তাহা তালিকায় আমরা দিলাম। কমিয়া কমিয়া শেষকালে ২৷৷০ মণ অর্থাৎ ১২৷৷০ টাকা বস্তা পর্যন্ত হয় বা ৮০ বৎসর পূর্বে যে দর ছিল, তাহা হইতেও বস্তাপিছু ২৲ টাকা কম। (Beng. Jute Com. Rep. P. 84)। অন্যান্য ফশলের তুলনায় ইহা কিভাবে কমিয়াছে তাহা সংলগ্ন পত্রী হইতে বুঝা যাইবে। এমনভাবে দর কমিবার কারণ কি তাহা আমরা পরে আলোচনা করিব।

বৎসর	পাট	পাটের সামগ্রী	তুলা	তুলার সামগ্রী	শব্জী	ডাইল	চা	তৈল	সমস্ত সামগ্রী
১৯১৪	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
১৯২৮	১০০	১৫০	১৬৭	১৫৯	১৩৩	১৫৭	১৫৪	১৪২	১৪৫
১৯২৯	৯৫	১২২	১৪৬	১৬০	১২৫	১৫২	১৪০	১৯৫	১৫১
১৯৩০	৬৩	৮৮	৯১	১৩৯	১০০	১১৯	১১৪	১২৭	১১৬

বৎসর	পাট	পাটের সামগ্রী	তুলা	তুলার সামগ্রী	শস্য	ডাইল	চা	তৈল	সমস্ত সামগ্রী
১৯৩১	৪৯	৭৬	৮৩	১২৩	৭৮	৮৯	৮৬	৮২	৯৬
১৯৩২	৪৫	৭৫	৯২	১১৯	৬৮	৯২	৬১	৭৫	৯১

পাট হইতে চাষীর আয় প্রতি বৎসর কি পরিমাণ হইয়াছিল, তাহাই নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

১৯০৫—১৯৩০*

বৎসর	কত হাজার বস্তা (৫ মণে বস্তা) কলিকাতা ও চট্টগ্রাম হইতে রপ্তানী হইয়াছে	মফঃস্বলে মণ প্রতি দর	চাষীদের আন্দাজ আয় টাকা	
			হাজার	
১৯০৫	৭,৬৪১	৭৲	২,৩৮,৭৮১	
১৯০৬	৮,২৯১	৯॥০	৩,৫২,৩৬৮	
১৯০৭	৮,৩৫১	৭॥০	২,৬৬,১৮৮	
১৯০৮	৮,২৭৯	৫h০	২,০৬৯,৭৫	
১৯০৯	৮,৪১১	৫॥০	১,৮৩,৯৯৯	
১৯১০	৭,৪৫৪	৫h০	১৮,৬৩,৩৫০	
১৯১১	৯,০৯৭	৭।০	২,৯৫,৬৫২	
১৯১২	৯,৬৯৪	৮॥০	৩,৭৫,৬৪২	
১৯১৩	৯,২৪৩	১২৲	৫,১৯,৯১৯	যুদ্ধের পূর্বে
১৯১৪	৮,৩১১	৫h০	২,০৭,৭৭৫	
১৯১৫	৮,৩৫১	৭।০	২,৭১,৪০৮	যুদ্ধ পর্ব
১৯১৬	৮,২১১	৯৲	৩,৩৮,৭০৪	যুদ্ধ পর্ব
১৯১৭	৮,৫১১	৬৲	২,২৩,৪১৪	যুদ্ধ পর্ব
১৯১৮	৭,৫৯৮	৮॥০	২,৯৪,৪২২	যুদ্ধ পর্ব

বৎসর	কত হাজার বস্তা (৫ মণে বস্তা) কলিকাতা ও চট্টগ্রাম হইতে রপ্তানী হইয়াছে	মফঃস্বলে মণ প্রতি দর		চাষীদের আন্দাজ আয় টাকা
	হাজার			হাজার
১৯১৯	৮,৯৫৩	১০৷৷০		৪,৩৬,৪৫৯
১৯২০	৭,৫৯২	৭৸০		২,৬৫,৭২০
১৯২১	৭,২১২	৮৵০		২,৬৫,৯৪৩
১৯২২	৬,০০০	১০।০		২,৮৫,০০০
১৯২৩	৯,২০০	৭৷৷০		৩,১০,৫০০
১৯২৪	৮,৯৩৭	১৩৲		৫,৪৭,৩৯১
১৯২৫	৯,১৭০	১৯৲		৮,৩৬,৭৬২ চরম দর
১৯২৬	১২,১৯৯	৯৸০		৫,৪৮,৯৬৫
১৯২৭	১১,৩৯৮	৯৸০		৫,১২,৯১৫
১৯২৮	১০৭,৯৮	১০৵০		৫,০২,৭৩৭
১৯২৯	১০,২১৬	৯৷৷০		৪,৪৬,৯৫০
১৯৩০	৯,৬৫৩	৫৸০		২,৪১,৩২৫
১৯৩১		৩৷৷০	[৮৷৷০]*	
১৯৩২		৩।০	[৭৷৷৵০]	
১৯৩৩			[৬৲]	
১৯৩৪			[৬/০]	
১৯৩৫			[৭/০]	
১৯৩৬			[৬৵০]	[কলিকাতার দর]

* Census of Bengal, 1931, p. 15.

১৮৫৫ সালে প্রথম পাটের কল রিশড়ায় খোলা হয়। কিন্তু ১৮৭২এর পূর্বে সরকার বাহাদুরের দৃষ্টি এদিকে পড়ে নাই। তারপর ১৯০১ সালের পর হইতে পাটের চাষের উন্নতির জন্য য়ুরোপীয় বণিক্‌দের সমবেত চেষ্টার ফলে ১৯০৪ সালে গবর্মেণ্ট একজন বিশেষজ্ঞকে পাট তদারক করিবার জন্য নিযুক্ত করেন। কৃষিবিভাগ পাটের উন্নতির জন্য কৃষককে সময়ে সময়ে উপদেশ দিয়া থাকেন। সরকারী কৃষি বিভাগের একটি প্রধান কাজ হইতেছে আগামী বর্ষে কতখানি পাট হইবে, তাহার একটা পূর্বাভাস প্রতিবৎসরে প্রকাশ করা। পৃথিবীর বাজারে পাটের চাহিদা কতখানি হইবে এবং কতখানি উৎপন্ন করিলে বাজারে মাল বেশী আসিয়া দর কমাইয়া দিবে না, সেইভাবে আভাস পূর্ব হইতে কৃষককে দিবার ব্যবস্থা নাই। এক বৎসরে পাটের চাহিদা দেখিয়া ফিরে বৎসরে চাষী বেশি পাট বোনে; কিন্তু সে বৎসরে হয় ত' চাহিদা নাই; কারণ ভারতের কলে ও বিদেশীর কলের গুদামে কাঁচামাল বিস্তর মজুত থাকে। অথচ চাষীকে মাল বিক্রয় করিতেই হইবে; চাহিদা নাই—মাল আছে, সুতরাং দর কম হইবেই। এইভাবের বাজারের উঠ্‌তি পড়্‌তির সঙ্গে মাঠের চাষার কোনো সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই। চাষী পাট লইয়া নিকটের বাজারে বা হাটে যায়; পূর্বে ব্যাপারীরা কিনিয়া লইত বা ফড়িয়ারা কিনিয়া আনিয়া পাট কোম্পানীর আড়তে বিক্রয় করিত। এখন কোম্পানী নিজেই লোক রাখিয়া মাল খরিদ করে; মাঝে যাহারা লাভ করিত, তাহাদের অন্ন গিয়াছে। কিন্তু এখনো অনেকখানি পাটের ব্যবসায় দেশীয়দের হাতে আছে; তবে ইহার অনেকটাই মাড়োয়ারী আড়তদারের হাতে। মোটকথা, মাঝখানের পাইকারের হাতে থাকিয়াও চাষার লাভ হয় না, কলওয়ালার গোমস্তাদের হাতে গিয়াও লাভ হয় না। আসল লাভ হয় কলের। বাঙলার কোনো কোনো কলে যুদ্ধের সময়ে শতকরা ৩৭৫৲ পর্যন্ত মুনাফা দেওয়া হইয়াছিল। পাটকলের কারখানা, ম্যানেজারের বাড়ীঘর সব দেখিলে স্পষ্টই বোঝা যায় শ্রমিকের অর্থ ধনিককে কি বিলাসে রাখিতেছে। পাটের চাহিদা ও চাষ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য পূর্ববঙ্গে পাটসমবায় সমিতি হইয়াছিল; কিন্তু নানা কারণে তাহা টিঁকিতে পারে নাই। চাষীর সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিবার প্রতিষ্ঠান নাই। কিন্তু পাটকলওয়ালাদের খুব শক্তিশালী সঙ্ঘ আছে;

তাহাদের কথা বা অনুরোধ ঠেলিতে পারে, এমন শক্তি খুব অল্পেরই আছে।

আমরা নিম্নে পাটের কলের উন্নতির একটা হিসাব দিলাম। ১৮৮০-১৮৮৪ সালের সমস্ত সংখ্যাগুলিকে আমরা ১০০ ধরিয়া লইয়াছি; সেই সংখ্যা হইতে কিভাবে কোন্ বিষয়টি উন্নতি করিয়াছে, তাহা জানা যাইবে।*

প্রতিবৎসর গড়ে	মিলের সংখ্যা	মূলধন (লক্ষ টাকা)	হাজার		
			শ্রমিক	তাঁত	টাকু
১৮৮০-৮৪	২১(১০০)	২৭০·৭(১০০)	৩৮·৮(১০০)	৫·৫ (১০০)	৮৮ (১০০)
১৮৮৫-৮৯	২৪(১১৪)	৩৪১·৬(১২৬)	৫২·৭(১৩৬)	৭ (১২৭)	১৩৮·৪(১৫৭)
১৮৯০-৯৪	২৬(১২৪)	৪০২·৬(১৪৯)	৬৪·৩(১৬৬)	৮·৩ (১৫১)	১৭২·৬(১৯৬)
১৮৯৫-৯৯	৩১(১৪৮)	৫২২·১(১৯৩)	৮৬·৭(২২৩)	১১·৭ (২১৩)	২৪৪·৪(২৭৮)
১৮৯৯-১৯০৪	৩৬(১৭১)	৬৮০ (২৫১)	১১৪·২(২৯৪)	১৬·২ (২৯৫)	৩৪৪·৬(৩৮০)
১৯০৫-০৯	৪৬(২১৯)	৯৬০ (৩৫৫)	১৬৫ (৪২৫)	২৪·৮(৪৫১)	৫১০·৮(৫৮০)
১৯১০-১৪	৬০(২৮৬)	১২০৯ (৪৪৩)	২০৮·৪(৫৩৭)	৩৩·৫(৬০৯)	৬৯১·৮(৭৮৬)
যুদ্ধপর্ব					
১৯১৫-১৯	৭৩(৩৪৮)	১৪০৩·৬(৫১৯)	২৫৯·৩(৬৬৮)	৩৯·৭(৭২২)	৮২১·২(৯৩৩)
১৯১৯-২০	৭৬(৩৬২)	১৫৬৩·৫(৫৭৯)	২৮০·৪(৭২৩)	৪১·০(৭৪৫)	৮৫৬·৯(৯৭৩)
১৯২০-২১	৭৭(৩৬৭)	১৯২৩·৫(৭১২)	২৮৮·৪(৭৫৮)	৪১·৬(৭৪৫)	৮৬৯·৯
১৯২১-২২	৮১(৩৮৬)	২১২২·৪(৭৮৪)	২৮৮·৪(৭৪৩)	৪৩ (৭৮২)	৯০৮·৩(১০৩২)
১৯২২-২৩	৮৬(৪০৯)	২৩২৪·৭(৮৫৯)	৩২১·২(৮২৮)	৪৭·৫(৮৬৩)	১০০৩(১১৪০)
১৯২৩-২৪	৮৯(৪২৪)	২৩৮৫ (৮৮১)	৩৩০ (৮৫১)	৪৯ (৮৯১)	১০৪৩(১১৮৫)
১৯২৪-২৫	৯০(৪২৪)	২২১৩ (৮১৮)	৩৪১ (৮৮১)	৫০·৩(৯১৪)	১০৬৭(১২১৩)
১৯২৫-২৬	৯০(৪২৯)	২১৩৪ (৭৮৮)	৩৩১ (৮৫৪)	৫০·৫(৯১৮)	১০৬৩(১২০৯)
১৯২৬-২৭	৯৩(৪৪৩)	২১১৯ (৭৮৩)	৩৩৩ (৮৬০)	৫১ (৯২৭)	১০৮৩(১২৩১)
১৯২৭-২৮	৯৩(৪৪৩)	২১১৯ (৭৮৩)	৩৩৫ (৮৬৫)	৫২·২(৯৪৯)	১১০৫(১২৫৬)
১৯২৮-২৯	৯৫(৪৫২)	২১২৬ (৭৮৫)	৩৪৩ (৮৮৬)	৫২·৪(৯৫৩)	১১০৮(১২৫৯)
১৯২৯-৩০	৯৮(৪৬৬)	২১৮৬ (৮০৭)	৩৪৩ (৮৮৬)	৫৩·৯(৯৮০)	১১৪০(১২৯৬)
১৯৩০-৩১	১০০(৪৭৬)	২৩৬০(৮৭২)	৩০৭(৭৯৩)	৬১·৮(১১২৩)	১২২৪(১৩৯২)
১৯৩১-৩২	১০৩(৪৯০)	২৩৬০(৮৭২)	২৭৬(৭১৩)	৬১·৪(১১১৬)	১২২০(১৩৮৬)
১৯৩২-৩৩	৯৯(৪৭১)	২৩৭০(৮৭৬)	২৬৩(৬৭৮)	৬০·৫(১১০০)	১২০২(১৩৬৬)
১৯৩৩-৩৪	৯৯(৪৭১)	২৩৭০(৮৭৬)	২৫৭(৬৬২)	৫৯·৫(১০৮১)	১১৯৪(১৩৫৭)

* ১৯৩০ জানুয়ারীর সংখ্যা।

পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ২১টি কলের জায়গায় ৯৮টি কল হইয়াছে, অর্থাৎ ৪॥০ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। মূলধন বৃদ্ধি পাইয়া ৮·৭৫ গুণ, শ্রমিক সংখ্যা বাড়িয়াছিল প্রায় ৮·৮ গুণ, তাঁতের সংখ্যা প্রায় ৯·৮ গুণ, টাকু বাড়িয়াছে ১২·৯ গুণ। কিন্তু শ্রমিকদের বেতন সে হারে বাড়ে নাই, তাহাদের স্বাচ্ছন্দ্য সে হারে উন্নতি লাভ করে নাই।

উৎপন্ন মালের পরিমাণ ও মূল্য এই সময়ের মধ্যে বাড়িয়াছে আরও বেশি। ১৮৮০-৮৪ সালে গড়ে বার্ষিক ৫॥০ কোটি গানি থলিয়া ও ৪৪ লক্ষ গজ চট বোনা হয়; ইহার মূল্য ছিল ১২॥০ কোটি। যুদ্ধের সময় ১২ গুণ থলিয়া, ২৬২ গুণ চট বোনা হয়, ইহার মূল্য '৮৪ সাল হইতে ৩২ গুণ বেশি! ১৯২৫-২৬ সালে উৎপন্ন সামগ্রীর মূল্য চরমে উঠে—৫৭ কোটি ৫২ লক্ষ টাকার মাল তৈয়ারী হয়। ইহার পর মাঝে এক বৎসরে ৫৬ কোটি হইয়া পুনরায় কমিতে থাকে। ১৯৩০-৩১ সালে ৩১·৪৮ কোটি টাকার মাল তৈয়ারী হয়। চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যে ২৫ কোটি টাকার মাল কম উৎপন্ন হইলে দেশের লোকের কতখানি দুর্গতি হইতে পারে, তাহা আজ এদেশে চাক্ষুষ দেখা যাইতেছে। কিন্তু তাহার পর ইহা আরও কমিয়া এবং ১৯৩৪-৩৫এ ২১·২৪ কোটি টাকার মাল প্রস্তুত হয়।

মোট উৎপন্ন পাট কিভাবে বিক্রয় হয়, সংক্ষেপে তাহা দেখাইতেছি।

(৪০০ পাউণ্ড বা ৫ মণের লক্ষ বস্তা)

	১৯১৩-১৪	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯	১৯২৯-৩০	১৯৩০-৩১	১৯৩১-৩২
উৎপন্ন	৮৯	১২১	১০২	৯৯	১০৩	১১২	৫৫
রপ্তানী	৪৩	৪৫	৪৯	৪৯	৪[illegible]	৩৪	৩১
কলে ব্যবহৃত	৪৫	৫৫	৫৮	৬০	৬৪	৪৬	৪৩

ভারতের বাহিরে প্রায় সকল সভ্যদেশই পাট ও পাটজাত সামগ্রী ক্রয় করে; ইহাদের মধ্যে পাটের চাহিদা গ্রেটবৃটেনেই সমধিক। কিন্তু একটা জিনিষ ক্রমশই দেখা যাইতেছে যে, ইংরেজ ধনিকরা বিলাতের পাটকলে পুঁজি না ঢালিয়া বাঙলাদেশে সেই পুঁজি দিয়া কল খোলা বেশি লাভজনক বলিয়া

দেখিতেছেন। অপর দিকে অন্যান্য জাতি নিজদেশে পাট কলের প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত করিবার দিকে বেশি ঝোঁক দিতেছে।

বৃটেন বৃটীশ ভারত হইতে প্রচুর পরিমাণে কাঁচা পাট আমদানী করে। ১৯২৪ সালে ১,৭৯,০০০ টন্, ১৯২৭ সালে ২,৪৪,০০০ টন্, ১৯২৮ সালে ১,৯৮,০০০ টন্ (মূল্য যথাক্রমে ৫৪,২২,০০০ পাউণ্ড, ৭৩,৬৮,০০০, ৬১,২১,০০০ পাউণ্ড) বিলাতে বিক্রয় হয়। এ ছাড়া বৃটেন বৃটীশ ভারত হইতে যে চট কাপড় আমদানী করে, তাহার মূল্য ঐ বৎসরগুলিতে যথাক্রমে ৮,৪৫ হাজার, ৭,০৬ হাজার, ৪,৪৭ হাজার পাউণ্ড; থলিয়া ব্যাগ যাহা আমদানী করে তাহার মূল্য আলোচ্য বর্ষগুলিতে যথাক্রমে ১৮,৮৯ হাজার, ১৬,৫০ হাজার, ১৬,৭০ হাজার পাউণ্ড।

মোট কথা, এক গ্রেটবৃটেন ভারতবর্ষ হইতে ৮২,৩৮,০০০ পাউণ্ড মূল্যের মাল ক্রয় করিয়াছিল।

	১৯২৪	১৯২৭	১৯২৮
	(হাজার পাউণ্ড মূল্য)		
কাঁচা পাট	৫,৪২২	৭,৩৬৮	৬,১২১
চট	৮৪৫	৭০৬	৪৪৭
থলিয়া	১,৮৮৯	১,৬৫০	১,৬৭০
মোট	৮,১৫৬	৯,৭২৪	৮২,৩৮

এছাড়া অন্যান্য দেশ হইতে বৃটেন তৈরী মাল কেনে; সমস্ত আমদানী পাট ও পাটজাত সামগ্রীর মূল্য ১৯২৪, ১৯২৭ ও ১৯২৮ সনে যথাক্রমে ৯৪,৪০,০০০ পাঃ, ১,০৯,৯৭,০০০ পাঃ, ৯৪,৬৫,০০০ পাউণ্ড ছিল।

পাট রপ্তানীতেও ইংলণ্ড প্রধান। ১৯২৮ সালে ইংলণ্ড হইতে ৭১,৭৭,০০০ পাউণ্ডের মাল ও পাট বিদেশে চালান দেয়; ইহার মধ্যে পুনঃ রপ্তানীও আছে। মোট কথা, এক পাটের আমদানী-রপ্তানী কারবারে ইংরেজ ব্যাঙ্কগুলি ১,৬৬,৪৩,০০০ পাউণ্ড বা প্রায় ২২ কোটি টাকা চালাচালি করে। রপ্তানীর পর যাহা থাকে, তাহা বৃটেনের মধ্যে বিক্রয় হয়। সে যে কত টাকা তাহা জানা যায় না।*

* See The United Kingdom, U. S. A., Department of Commerce, p. 356-358.

বাঙলাদেশ হইতে কোন্ দেশ কতখানি পাট ও পাটজাত সামগ্রী গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার একটা তালিকা দিলাম :—

কাঁচাপাট

(হাজার টাকা)

	১৯২১-২২	১৯২৫-২৬	১৯৩০-৩১
বৃটেন	২৮,৭৩২	১,০৫,৬৯৬	২২,৩৫৭
মার্কিণ	১৮,৬৩৫	৩৮,৬৯৮	১০,৪৪৮
জার্ম্মেণী	৪২,০৭৯	৮১,৬০৩	৩৫,০৪৬
ফ্রান্স	১১,৭০৪	৫২,৯৯৫	১৮,৪৬৫
বেলজিয়াম	৬,০৫১	১৮,৫৮৮	৯,৯৩৩
ইতালি	৮,৪২৮	২৯,৩৩১	৯,২২৯
স্পেন	৭,১৯০	১৮,৭৩৪	৬,৯২৫
ব্রেজিল	৫,০৩৫	৯,৪৬৭	৩,৭৮০
জাপান	২,০০৮	৬,১১৫	১,১৬৮
রুশিয়া	×	৬২৩	৪০১
অন্যান্য	৪,৮৪১	১৭,৬০৭	১১,১১৫
মোট	১,৪০,৪৯২	৩,৭৯,৪৫৭	১,২৮,৮৪৭

গানি চট

(হাজার টাকা)

	১৯২১-২২	১৯২৫-২৬	১৯৩০-৩১
মার্কিণ	১,১০,২৪৯	২,১৩,২৯২	১,০৬,৫৬৭
আর্জ্জেণ্টাইন	২২,২১৯	৪৯,২০৯	৩১,৫৬৪
বৃটেন	১০,০০৪	১৪,১৩৯	৫,৯৩৫
কানাডা	৭,৩৮৯	১৩,৯০৫	৯,০৭৩
অষ্ট্রেলিয়া নিউজিল্যাণ্ড	৪,১৬৯	১০,১৯৭	৩,৮০২

	১৯২১-২২	১৯২৫-২৬	১৯৩০-৩১
ফ্রান্স	১৫	৪৪	×
উরুগয়ে	৪৭৮	২,৭৯৯	২,১৭৭
চীন	৫৯৩	২,২৪২	৫৩০
জার্ম্মেণী	১১৭	৪২৫	২৮৯
অন্যান্য	৪,০৬৫	১১,৭৫৭	৮,৭৬৪
মোট গানি	১,৫৯,২৯৮	৩,১৮,০০৯	১,৬৮,৭০১
গানি ব্যাগ (নানা দেশে)	১,৩৯,১৭৩	২,৬৭,২১৪	১,৪৬,১৭৯
সূতাদড়ি প্রভৃতি	১,৪৮৬	৩,১৭৫	৪,০৬৫
মোট পাটজাত সামগ্রীর মূল্য	২,৯৯,৯৫৭	৫,৮৮,৩৯৮	৩,১৮,৯৪৫

বিলাতে যখন পাটের ও পাটের জিনিষের এই দর, তখন এদেশে কাঁচা পাট ও পাটের জিনিষের কি দর দেখা যাক্। আমরা এই জিনিষটাকে ১৯১৪ সালের Index বা মানসংখ্যার সহিত পরবর্ত্তী বৎসরগুলির দরের তুলনা করিব। ঐ বৎসরে পাট ও পাটের জিনিষের যে দর ছিল, তাহার তুলনায় দেখা যায়, গত কয় বৎসর পাটের দর যেভাবে নামিয়াছে, পাটের তৈয়ারী জিনিষের দর সেভাবে নামে নাই। অর্থাৎ চাষী পাটের দর যে ভাবে পাইয়াছে, ধনিক তাহার তৈয়ারী মাল ইহার তুলনায় অনেক চড়া দামে বিক্রয় করিয়াছে। নিম্নের তালিকা হইতে পাঠক দেখিবেন, যুদ্ধের সময় যখন পাটের মূল্য অসম্ভব কমিয়াছিল, তখন পাটের জিনিষের মূল্য আরও অসম্ভবরূপে বাড়িয়াছিল। ১৯১৪ সালের ও ১৯২৮ সালের কাঁচা পাটের দর সমান, অথচ পাটের জিনিষের দাম দেড়গুণ।

	(মান-সংখ্যা)			(মান-সংখ্যা)	
	কাঁচা পাট	পাটের জিনিষ		কাঁচা পাট	পাটের জিনিষ
১৯১৪	১০০	১০০	১৯২৩	৯০	১৩৮
১৯১৫	৬৮	১০৯	১৯২৪	১০২	১৫৯
১৯১৬	৮০	১২৯	১৯২৫	১৫৪	১৭৭
১৯১৭	৬৫	১৩৮	১৯২৬	১২০	১৪৭
১৯১৮	৭৫	২১৯	১৯২৭	৯৩	১৪৬
১৯১৯	১১৫	১৭৫	১৯২৮	১০০	১৫১
১৯২০	১০৪	১৪৯	১৯২৯	৯৫	১২২
১৯২১	৮৩	১০৫	১৯৩০	৬৩	৮৮
১৯২২	১১০	১৪৪			

উপরিউক্ত তালিকা হইতে বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, পাটের দর যে ভাবে কমিতেছে, পাটের জিনিষের দর কমা ত দূরের কথা, বরং বাড়িয়াছেই। আন্তর্জাতিক অর্থসঙ্কট হেতু পাট ও পাটের জিনিষের দাম কমিয়াছে সত্য; সমস্ত জিনিষের কেনা-বেচা কমিয়াছে; থলিয়া, ব্যাগ, চটের চাহিদা হ্রাস পাইয়াছে। সেজন্য পাটের চাহিদাও হ্রাস পাইয়াছিল; কিন্তু এই নিখিল অর্থসঙ্কটই পাটের দর কমার একমাত্র কারণ বলা যায় না; তাহা হইলে পাটজাত মালেরও সেই অনুপাতে দাম কমা উচিত ছিল।

পাটের চাষীরা সঙ্ঘবদ্ধ নহে ও পাটের ব্যবসায়ী ও পাটের কলওয়ালারা সঙ্ঘবদ্ধ, সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ধনিক চট কলওয়ালারা তাহাদের মিলে যে পরিমাণ পাট একবৎসরে লাগে, তাহা অপেক্ষা অধিক মাল ক্রয় করিয়া রাখে। সুতরাং আগামী বৎসরে বাজারে পাট উঠিলে মিলওয়ালাদের পাট কিনিবার আগ্রহ থাকে না। কিন্তু পাট বিক্রয় করিবার প্রয়োজন চাষীদের ষোল আনা; কারণ সেই পাট বিক্রয় করিয়া চাষীকে জমির খাজনা মহাজনের টাকা, সংসারের খরচ চালাইতে হইবে। কাঁচাপাটের ওজনও বেশী থাকে। সুতরাং চাষী অধিকাংশ পাটই, ব্যবসায়ী ও কলওয়ালারা যে দর দেয়, সেই দরে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। বাঙলার অধিকাংশ কলের ম্যানেজিং এজেণ্ট

সাহেব; মাত্র ছয়টি দেশীয়দের; ইহার মধ্যে একটি মাত্র বাঙালীর। এইসব কলের অংশীদার অধিকাংশই ভারতীয় হইলেও তাঁহাদের উহা নিয়ন্ত্রণ করিবার শক্তি নাই। পাট রপ্তানীর ব্যবসায়ও বারআনি সাহেবদের হাতে; গুটি পাঁচ দেশীয় কোম্পানী রপ্তানীর কাজে আছে, ইহার মধ্যে বাঙালী দুই একটি মাত্র। কলওয়ালা ও ব্যবসায়ীরা পূর্ব হইতে সকলেই প্রচুর পাট সুবিধা দরে কিনিয়া গুদামে মজুত রাখে। পর বৎসরে কমদামে পাট পাওয়া না গেলে তাহারা মজুত মালের দ্বারা প্রায় এক বৎসর কাজ চালাইতে পারে। সুতরাং রপ্তানীকারী কোম্পানী ও পাট কলওয়ালার উপর চাষীর পাটের দর নির্ভর করে।

চটকলসমূহে কি পরিমাণ পাট মজুত থাকে, তাহার একটা হিসাব দেওয়া গেল :—

	১৯৩০-৩১ (লক্ষ গাঁট)	১৯৩১-৩২ (লক্ষ গাঁট)	১৯৩২-৩৩ (লক্ষ গাঁট)
পূর্বের মজুত পাট	৩৪	৫১	৪১
বৎসরে ক্রীত	৬৪·৭৫	৩৪·৭৫	৫০·৫
মোট	৯৮·৭৫	৮৫·৭৫	৯১·৫
এক বৎসরে কত গাঁট মিলে খরচ হয়	৪৭	৪৪·৭২	৪৭·৭৫
বৎসরের শেষে মজুত থাকে	৪৪·৫	৪১	৫১ লক্ষ গাঁট

ভারতের বাহিরে ও পাটের ব্যবসায়ীদের হাতে ১৯৩২-৩৩ সালে ১৫ লক্ষ গাঁট পাট ছিল এবং তা দিয়া পাঁচ মাস কলের কাজ চলে। ভারতের কলওয়ালাদের হাতে যে পাট মজুত ছিল, তাহা দ্বারা দশ এগার মাস কলের খোরাক চলিয়া যায়; সুতরাং তাহারা ধীরে সুস্থে গাঁট কিনিতে পারে। বাঙলার এই মজুত পাটের মূল্য ২০ কোটি টাকা। কলওয়ালারা এই টাকা একবৎসর অলসভাবে ফেলিয়া রাখিতে পারে, এতটাকার জোর তাহাদের আছে; কিন্তু দরিদ্র চাষীর পক্ষে পাট বিক্রয় না করিয়া কয়েকমাস বসিয়া থাকিবার জোর নাই। (রবীন্দ্রনাথ রায়, পাট চাষীর দুরবস্থা, ক্লাইভষ্ট্রীট ১৩৪০, ভাদ্র ও আশ্বিন, পৃঃ ২১৪-২১৮)

বিদেশে পাটের চাহিদা ক্রমশই কি আকার ধারণ করিতেছে, তাহা বাঙালীর জানা দরকার। বর্তমানে সকল দেশেরই চেষ্টা নিজদেশে সকল প্রকার সামগ্রী প্রস্তত করা এবং বিদেশে উদ্বৃত সামগ্রী চালান দেওয়া। এই ভাবে নিজদেশে সব কাজে হাত লাগাইবার চেষ্টার ফলে বাঙলার পাটের পরিবর্তে অন্য কোনো আঁশান বস্তু আবিষ্কৃত হয় কিনা, সে বিষয়ে প্রায় প্রত্যেক দেশ চেষ্টা সুরু করিয়াছে। যদি তাহারা কৃতকার্য হয়, তাহা হইলে বাঙলার পাটের গুমর আর থাকিবে না; এক কালে কার্পাসজাত মাল, রেশম, সোরা চিনি, নীল বাঙলার বিশেষত্ব ছিল; সমস্তই য়ুরোপে নব নব আবিষ্কারের ফলে এদেশ হইতে প্রায় লোপ পাইয়াছে। নীলের চাষ বাঙলায় এখন নাই; চীন আফিম ত্যাগ করায় বাঙলার আফিমের চাষ উঠিয়া গিয়াছে। রেশম প্রায় লুপ্ত; সোরার প্রয়োজন হয় না। পাটের পরিবর্তে কিছু আবিষ্কৃত হইলে বাঙলায় নূতন সমস্যা আসিবে। নিউজিল্যাণ্ডে মসিনার আঁশের পরীক্ষা চলিতেছে; রুশিয়ায় কেন্দির (Kendyr) নামে এক প্রকার উদ্ভিদ্ হইতে আঁশ বাহির হইয়াছে। এরূপ সকল দেশই চেষ্টা করিতেছে; (Bengal Jute Enq. Com. Report, Appendix দ্রষ্টব্য; প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১, পৃঃ ২৮১-২৮৩) জাপানীরা ব্রেজিলে পাটের চাষ সুরু করিয়াছে।

পৃথিবীব্যাপী ব্যবসা মন্দার দরুণ ভারতের পাটশিল্প নিতান্ত অসুবিধাগ্রস্ত হইয়াছিল। ভারতের বাহিরে পাটের ও পাটজাত সামগ্রীর চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় এই সমস্যা দূর করিবার জন্য পাট কল সমিতি (Jute Association, স্থাপিত ১৮৮৬) স্থির করেন যে, কিছুকাল কলের কাজ মন্দায় চালাইতে হইবে; শ্রমিকদের কাজের ঘণ্টা কমাইয়া, সপ্তাহে দুইদিন কাজ বন্ধ করিয়া, শতকরা ১৫ ভাগ তাঁতে তালাচাবি দিয়া—সমিতি উৎপন্ন মালের পরিমাণ কমাইয়া বাজারে কম মাল সরবরাহ করিবে ও ফলে দর কিছু চড়াইতে পারিবে স্থির করেন। কিন্তু সমিতির বাহিরেও কতকগুলি কল ছিল, যাহারা যদৃচ্ছাক্রমে কাজ করিত। ১৯৩৩এর জুন পর্যন্ত এই সব সর্ত বলবতী ছিল। তা ছাড়া য়ুরোপ ও আমেরিকান পাট কলওয়ালারা এ সব সর্তের মধ্যে যায় নাই।

১৯২৬ সাল হইতে পাটের দর কমিতে থাকে; চাষীদের দুর্দশাও সুরু

হইল। কিন্তু ইহাতে পাটশিল্পীদের তেমন ক্ষতি হয় নাই। কলিকাতার বাজারে পাটের দর ৪৲ মণ, কিন্তু একশ' গজ চটের দাম ১০৲; ইহা তৈরী করিতে বিশ সের পাট লাগে। পাটের কলে লাভ অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে। রেল বা ষ্টীমারে ভাড়া কমে নাই; সে ক্ষেত্রেও গবর্মেণ্ট বা কোম্পানীর কোনো লোকসান হয় নাই। খাজনা কমে নাই; জমিদারের রাজস্ব ঠিক আছে। পাট রপ্তানী শুল্ক ও ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের কর গাঁট পিছু ৫।।৵০ পূর্ববৎ রহিয়াছে। মোটকথা, চাষী ছাড়া লোকসান আর কাহারও তেমনভাবে হইতেছেনা।

খবরের কাগজে লেখালেখি, সভাসমিতির আন্দোলনে, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কয়েকজন সদস্যের চেষ্টায় ১৯৩২ সালে গবর্মেণ্ট পাট-তদন্ত-কমিটি বসান। ১৯৩৪ সালের গোড়ায় এই কমিটির প্রতিবেদন বা রিপোর্ট বাহির হইয়াছিল।

য়ুরোপীয় ও সরকারী সদস্যগণ যে রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহার সহিত দেশীয় সদস্যদের মত মেলে নাই; আরও মতভেদ আছে। এই সব কারণে গবর্মেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, বর্তমানে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট সমগ্রভাবে বিবেচনা করা সম্ভব নহে।

দেশীয় সদস্যগণের মোট বক্তব্য হইতেছে এই যে, পাটশিল্পী ও ব্যবসায়িগণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিতেছে বলিয়া তাঁহারা বাজার নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন না; পাট চাষীগণ দরিদ্র, অশিক্ষিত সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ করিতে পারে না বলিয়া উপযুক্ত দর পায় না, প্রয়োজনাতিরিক্ত পাট উৎপাদন করে; কোন আর্থিক সুবিধা তাহাদের নাই। অথচ পাট বাঙলার সর্বপ্রধান আর্থিক সম্বল; পাটের দর বাড়িলে সমগ্র বাঙলার আর্থিক সম্পদ্ বাড়িয়া যাইবে। পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ করা সরকারের কর্তব্য। (দ্রঃ হিতবাদী, ১৩৪০ ফাল্গুন, নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক লিখিত। ক্লাইভষ্ট্রীট ১৩৪০ ফাল্গুন, পৃঃ ৬২৫-৬২৯) [অধুনা পাটনিয়ন্ত্রণ সুরু হইয়াছে]।

পাটের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাটের ক্ষেত বাড়ে, চাহিদা হ্রাস পাইলে চাষ কমে। আমরা পূর্বে বলিয়াছি, পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে গবর্মেণ্ট প্রথমে খুব গরজ দেখান নাই। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ না করিলেও নয়। সরকারী কৃষি বিভাগ 'কক্যা বোম্বাই' নামে এক প্রকার ভাল জাতের পাট আবিষ্কার করিয়া

উহা চালাইবার জন্য উপদেশ করেন। তাঁহারা বলেন,—অল্প জমিতে অধিক পাট হইবে; ইহা নিয়ন্ত্রণের আর এক রূপ মাত্র। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে চাষীদের তাহাতে লাভ নাই; কারণ প্রত্যেক চাষীই কিছু কিছু পাট দিয়া কিছু টাকা চায়। অল্প জায়গায় বেশী পাট উৎপন্ন হইলে অবশিষ্ট চাষীদের সমস্যা কঠিনতর হইবে। সেইজন্য গবর্মেণ্ট একটা প্ল্যান খাড়া করিয়া চাষীদের পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ করিয়া, অন্যান্য লাভজনক ফসলের চাষ সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন। চাল, দাইল, আনাজ, আখ, ফল প্রভৃতি বুনিয়া তাহারা যাহাতে আয় বাড়াইতে পারে, সে বিষয়ে রীতিমত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কৃষি বিভাগ ও সরকারী অন্যান্য কর্মচারীর এই শিক্ষাদান কার্যই প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত।

চা

সকল প্রকার নেশার মধ্যে যা বাঙলাদেশে খুব প্রসার লাভ করিয়াছে সে হইতেছে চা। পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্বে চা-পান এদেশে একপ্রকার অজ্ঞাতই ছিল। ১৮২৬ সালে ইংরেজরা বর্মার রাজার নিকট হইতে সন্দির সর্তানুসারে আসাম পাইলেন। ১৮৩৭ সালে সেখানে চা-বাগিচা খুলিবার জন্য প্রথম চা-কোম্পানী গঠিত হইল। ১৮৫৯ সাল হইতে চা-শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং একশ' বৎসর এখনো হয় নাই।

বাঙলাদেশের মধ্যে দার্জিলিঙ, জলপাইগুড়ি, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রদেশে চা-উৎপন্ন হয়। ১৯২১ সালে বাঙলাদেশে ৩২৬টি চা-বাগিচা ছিল। ১৯৩১ সালে ৩৯৩টি। ১৯৩১ সালে ২০৭,৬৩৩ একর জমিতে চা-বাগিচা ছিল। ৯ কোটি পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয়। দশ বৎসর পূর্বে ছিল ৬ কোটি পাউণ্ড। ৯·৩০ লক্ষ শ্রমিকের জীবিকা ইহা হইতে হইতেছে।

বাঙলাদেশে চা-বাগিচা অনেক থাকিলেও চা-এর প্রধান কেন্দ্র হইতেছে আসাম; আসাম পৃথক্ প্রদেশ হইলেও, চা রপ্তানীর জন্য, চা-বাগিচার কুলির জন্য, নানা বিষয়ের জন্য বাঙলার উপর নির্ভরশীল; সুরমা উপত্যকা অখণ্ড বাঙলার অন্তর্গত; সেখানেও ১৪৫ হাজার একর জমিতে চা হয়। সুতরাং

আসামের বলিয়া চা-শিল্পকে আমরা বাঙলা হইতে বাদ দিতে পারিব না। নিম্নের তালিকায় চা-এর হিসাব দিলাম ঃ—

প্রদেশ	আয়তন হাজার একর	উৎপন্ন হাজার পাউণ্ড	শ্রমিক	১৯৩১ বাগানের সংখ্যা
আসাম				৫৩৮ বড়গুলি
সুরমা	১৪৫	৭৩,৭৮৪	১৫৬,৪৮৯	১৫৮
আসাম	২৮৫	১৮৫,১৫৭	৪০০,৯৯৫	৩৮০
	৪৩০	২৫৮,৯৪১	৫৫৭,৪৮৪	
বঙ্গদেশ				২৮৮
দার্জিলিঙ	৬১	২৩,০০৯	৬৫,৫২২	
জলপাইগুড়ি	১২৮	৮৫,৪২৭	১২৫,৬৩২	
চট্টগ্রাম	৬	১,৫১৭	৫,৭৪৫	
	১৯৫	১০৯,৯৫৩	১৯৬,৮৯৯	
মাদ্রাজ	৬৭	২৭,৬৩০	৭০,৮৫২	
কুর্গ	...	১৬৯	৬২০	
পঞ্জাব	১০	১,৯৩০	১০,৯৯৫	
যুক্তপ্রদেশ	৬	১,৪৮৯	৩,৮৭১	
বিহার	৪	৮৫৩	২,৯০২	
বৃটিশ ভারত	৭১২	৪০০,৯৬৫	৮৪৩,৬২৩	
দেশীয় রাজ্য	৭৭	৩২,০৩৩	৮৬,৮৪৯	
	৭৮৯	৪৩২,৯৯৮	৯৩০,৪০২	

১৯৩৫এ সমগ্র ভারতে ৮,২১,০০০ একর জমিতে চা চাষ হয়। ৪০,০০,৯৫,০০০ পাউণ্ড চা হয়। ৯,০৫,৫৫৫ জন শ্রমিক কাজ করে।

পৃথিবীতে মানুষ যত চা খায়, তার শতকরা ৪০ ভাগ ভারতবর্ষ হইতে যায়। পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ চা উৎপন্নকারী দেশ ভারতবর্ষ; দেখা যাক্ কোথায় কি পরিমাণ চা হয় ও রপ্তানী হয়।

	১৯৩০ সাল কুাইণ্টল	১৯৩৩
ভারতবর্ষ	১,৭৭৪,০০০	১৭,৪০,০০০
সিংহল	১,১০৩,০০০	৯,৮২,০০০
ওলন্দাজ, দ্বীপালী, যাভা, সুমাত্রা	৭২০,০০০	৭,৫৩,০০০
জাপান	৩৮৬,০০০	৪,৩৫,০০০
ফরমোসা	১০৪,০০০	৯৩,০০০
আসাম	২৪,০০০	৬৯,০০০
সোভিয়েট	৪,০০০	৮,০০০
এশিয়া মোট	৪১,৩০,০০০	...
নাইসাল্যাণ্ড ও আফ্রিকা	১২	১৪,০০০
চীন হইতে রপ্তানী	৪২০,০০০	৪২০,০০০

ভারতবর্ষে যে চা হয়, তার শতকরা ৮০ ভাগ আসাম ও বাঙলায় হয়। সুরমা উপত্যকাকে বাঙালীর বাঙলা ধরিলে খাস বাঙলা ও সুরমার চা ক্ষেত হয় ৩৪০ হাজার একর, আসামের থাকে ২৮৫ হাজার একর। চায়ের উৎপন্ন অখণ্ড বাঙলায় হয় ১,৮৩,৭৩৭ হাজার পাউণ্ড ও আসামের হয় ১,৮৫,১৫৭ হাজার পাউণ্ড। আসামে নিযুক্ত কুলির সংখ্যা ৪ লক্ষ অখণ্ড বাঙলায় কুলির সংখ্যা ৩·৫৩ লক্ষ। অর্থাৎ সমগ্র ভারতে উৎপন্নের ৩৮ ভাগ অখণ্ড বাঙলায় ও ৪২ ভাগ আসামে উৎপন্ন হয়। আরও বড় করিয়া দেখা যাক্। পৃথিবীর সমগ্র চা-এর চাহিদার প্রায় ১৯ ভাগ অখণ্ড বাঙলা, ২১ ভাগ আসাম যোগান দেয়।

ভারতবর্ষ হইতে যত টাকার মাল বিদেশে রপ্তানী হয়, তার শতকরা ৮।১০ ভাগ হইতেছে চা। রপ্তানী চাএর শতকরা ৮৩।৮৪ ভাগ বৃটিশ দ্বীপ

গ্রহণ করে। ভারতবর্ষে যে পরিমাণ চা-উৎপন্ন হয়, তার সামান্যই এদেশে ব্যবহৃত হয়। সেজন্য বর্ত্তমানে বিশেষ প্রোপাগাণ্ডা বা প্রচার কার্য চলিতেছে।

চা-এর রপ্তানী

	লক্ষ পাউণ্ড	মূল্য লক্ষ টাকা	মোট রপ্তানী শতকরা
১৯২৪-২৫	...	৩,৩৩৯	...
১৯২৫-২৬	...	২,৭১২	...
১৯২৬-২৭	৩,৪৯০	২,৯০৪	৯%
১৯২৭-২৮	৩,৬২০	৩,২৪৮	১০%
১৯২৮-২৯	৩,৬০০	২,৬৬০	৮%
১৯২৯-৩০	৩,৭৭০	২,৬০১	৮%
১৯৩০-৩১	৩,৫৬১	২,৩৫৬	..
১৯৩১-৩২	৩,৪১০	১,৯৪৪	...
১৯৩২-৩৩	৩,৭৮৮	১,৭১৫	...
১৯৩৩-৩৪	৩,১৭৮	১,৯৮৪	..
১৯৩৪-৩৫	৩,২৪৮	২,০১৩	...
১৯৩৫-৩৬	৩.৩৩০	১,৯৮,২৩৩ হাজার	১২.৩৫%

১৯২৭-২৮ সালে চা এর দাম খুব বেশী পাওয়া গিয়াছিল; তারপরেই পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্য-দুর্গতি সুরু হয়। ১৯০১-০২ হইতে ১৯১০-১১ সাল পর্যন্ত চা-এর দর গড়ে পাউণ্ড প্রতি ছিল ছয় আনা। তাহাকে মূল করিয়া কি ভাবে এই দর বাড়িয়াছে দেখা যাক্।

	দাম পাউণ্ড প্রতি			মূল
১৯০১-০২ হইতে	টাকা	আনা	পাই	(Index)
১৯১০-১১	০	৬	০	১০০
১৯২৭-২৮	০	১৪	১০	২৪৭
১৯২৮-২৯	০	১১	৪	১৮৯
১৯২৯-৩০	০	৯	১১	১৬৫

ভারতের চা-এর বাজারের মন্দার কারণ ওলন্দাজরা জাভা ও সুমাত্রায় প্রচুর পরিমাণে চা উৎপন্ন করিয়া য়ুরোপে চালান দিতেছে। চা-এর বাজারে ভারতের ইংরেজ পুঁজিওয়ালাদের সঙ্গে ডাচ্‌দের অকস্মাৎ এই প্রতিযোগিতা ইংরেজ সহ্য করিতে পারে নাই। ডাচ্ ভারতের চিনির বাজারে একাধিপত্য করিতেছিল। সেখানে সে মরিশাস্‌কে মাথা তুলিতে দিতেছিল না, আবার চা-এর বাজারেও প্রতিযোগিতা সুরু করিল। ভারতে চিনির বাজার হইতে ডাচ্‌কে তাড়াইবার জন্য চিনির উপর শুল্ক বসানো হইল। ভারতীয় চা ব্যবহারের জন্য বিলাতে খুব প্রচার চলিতেছে।

অটোয়া কনফারেন্সের নীতি অনুসারে বৃটীশ দ্বীপালীতে ভারতীয় চা-এর শুল্ক কমিয়াছে ; ইহার ফলে জাভার চা খানিকটা আটকানো গিয়াছে।

সাধারণ লোকের ধারণা চা-বাগিচার কুলিরা অনেক টাকা বেতন পায় ; ১৯৩১-৩২ সালে তাহাদের মজুরী আসামে খুব কমিয়া গিয়াছিল ; পুরুষ, স্ত্রী ও শিশু যথাক্রমে ১২৷৫, ৯৷৭, ৬৸৶৮ মাসিক পাইত ; পূর্বে পাইত ১৭৲, ১০৸৭, ৭৷৭। সুরমা উপত্যকায় পুরুষদের মজুরী ৯৷৶২ হইতে ৭৸৵১, মেয়েদের ৭৷৵৫ হইতে ৬৴১, ছেলেদের ৫৶৬ হইতে ৪৷৴১ পাইতে দাঁড়ায়।

চা-বাগিচার উন্নতির জন্য পুনরায় বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। ১৯৩১ সালে শ্রমিকদের অবস্থা তদন্ত করিবার জন্য এক রাজকীয় কমিশন এদেশে আসেন ও তাঁহারা আসামে পুনরায় স্বাধীন শ্রমিকদের আসিবার জন্য ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন। এখন যাহারা আসামে যায় তাহাদিগকে indentured কুলি বলা হয় না, তাহাদিগকে assisted emigrant বলা হয়। তিন বৎসরের জন্য কড়ার করিয়া তারা চা-বাগিচায় ঢুকিতেছে। ইহার পর তাহারা স্বাধীনভাবে অন্যত্র কাজ করিতে পারিবে। শ্রমিকের স্বাস্থ্য প্রভৃতির জন্য কমিশন অনেক সুপারিশ করিয়াছেন।

আসাম, বাঙলা ও সুরমা চা-বাগিচাওয়ালারা সাহেব, আসামী ও বাঙালী ; মাড়োয়ারীও আছে। তবে সাহেবদের বাগান ও শক্তিই অধিক। রপ্তানী চা-এর উপর একটি শুল্ক ১৯২১ এ ধার্য করা হয় ; ইহা হইতে ভারত সরকারের ৪০।৪৫ লক্ষ টাকা আয় হইত ; কিন্তু ইতিমধ্যে য়ুরোপেও বিশেষভাবে ইংলণ্ডেই ডাচ্-ভারতের চা ভারতীয় চা-এর সহিত প্রতিযোগিতা করিতে আরম্ভ করিলে

তখন ভারতের চা-এর দাম কমাইবার জন্য রপ্তানী শুল্ক রদ করা হইল। ১৯২৭-২৮ হইতে এই রপ্তানী শুল্ক বন্ধ হইল।

বয়ন-শিল্প

সমগ্র ভারতবর্ষে ১৯৩১ সালে ৩৩৪টি কাপড়ের কল ছিল; ইহার মধ্যে ২৮০টি বৃটীশ ভারতে, অবশিষ্ট ৫৪টি দেশীয় রাজ্যে। কোন্ প্রদেশে কয়টি কাপড়ের কল ছিল তাহার তালিকা দিলাম :—

বৃটীশ ভারত		দেশীয় রাজ্য	
বোম্বাই	১৯২	বড়োদা	১৯
মাদ্রাজ	২০	ইন্দোর	৬
যুক্তপ্রদেশ	২৪	মহীশূর	৫
বঙ্গদেশ	১৬	হায়দ্রাবাদ	৫
পাঞ্জাব	৫	গবালিয়র	৫
মধ্যপ্রদেশ-বেরার	১১	পশ্চিম ভারতীয় রাজ্য	৫
বিহার-উড়িষ্যা	১	বোম্বাই-এর রাজ্য	৫
দিল্লী	৪	ফরাশীরাজ্য	৩
বর্মা	১	কিষণগড়	১
		কোচিন	১
	২৮০		৫৪
		পণ্ডিচেরী	৩

১৯৩৬এ ৩৭৯টি কল হইয়াছিল।

১৯৩১এ সমগ্র ভারতে ৩৪৩টি কাপড়ের কলে ১,৮৬,০০০ তাঁত, ৯৫ লক্ষ চরকা চলিতেছিল; কম-সে-কম ৪ লক্ষ লোক মিলে নানাভাবে নিযুক্ত এবং মূলধনও খাটিতেছে ৬৫।৭০ কোটি টাকা। বাঙলায় ১৬টি কল—সেগুলিতে ছয় হাজারের বেশি তাঁত চলে না। সমগ্র ভারতের তুলনায় কাপড়ের বাজারে বাঙলার স্থান অতি নগণ্য। বাঙলায় প্রগতি ২৫ বৎসরের মাত্র; স্বদেশী

আন্দোলনের পূর্বে বাঙালীর নিজের একটিও কল ছিল না। বাঙলার বস্ত্র-সমস্যা আলোচনার পূর্বে আমরা ভারতবর্ষের কাপড়ের কলের ইতিহাস ও সমস্যার কথা আলোচনা করিব, কারণ সমগ্র দেশের সহিত বাঙলার সমস্যা জড়িত।

সর্ব প্রথম কাপড়ের কল স্থাপিত হয় হুগলী নদীর তীরে ১৮৩০ সালে— বাউরিয়া কটন মিলস্। ইহা ইংরেজদের দ্বারা স্থাপিত এবং এখন এটি অন্যভাবে আছে। বহুকাল পরে ১৮৫১ সালে জনৈক ইংরেজ বণিক্ বরোচ-এ ও ১৮৫৪ সালে বোম্বাইতে কল স্থাপন করেন। ১৮৬৫ সালে দাবার নামে এক পার্শী প্রথম দেশী মালিকানায় কল স্থাপন করেন। সেই হইতে ধীরে ধীরে বোম্বাই অঞ্চলে কাপড়ের কল একটির পর একটি স্থাপিত হইতে থাকে। এইখানে বলা উচিত যে, ভারতের কাপড়ের কলের প্রগতির সহিত বাণিজ্য-শুল্কের একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ দেখা যায়। ১৮৬৬ সালে ১৩টি কল, ১৮৭৭ সালে ৫১টি কল স্থাপিত হয়। এই সময়ের বড়লাট লর্ড লীটন; তিনি অনেক মালের উপর শুল্ক উঠাইয়া দেন; তখন প্রধান আমদানী মাল ছিল কাপড়; আমদানী শুল্কে প্রায় দেড় লক্ষ পাউণ্ড আদায় হইত; সেটি মকুব হইল; ভারতের রাজস্ব কমিল; সঙ্গে সঙ্গে বিলাতী কাপড় বিনা শুল্কে আসিতে লাগিল। ফলে, এই শিশু শিল্পকে অবাধ বাণিজ্য নীতির সহিত সংগ্রাম করিতে হইল। আশ্চর্যের বিষয় এই, বহু প্রতিকূলতার মধ্যে বস্ত্রশিল্প টিকিয়া গেল।

১৮৯৪ সালে বিদেশী কাপড় ও সূতার উপর শতকরা ৫% শুল্ক ধার্য হইল; সঙ্গে সঙ্গে দেশী কলে ২০নং সূতার উপর ৫% Excise শুল্ক ধরা হইল। এই বাণিজ্য-শুল্ক কিছু পরিমাণে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পকে মাথা তুলিয়া রাখিতে সহায়তা করিল; কিন্তু তাহা বেশি দিন স্থায়ী হইল না। ম্যানচেষ্টারের কলওয়ালাদের চাপে ও অবাধ বাণিজ্য নীতির অজুহাতে বিলাতী কাপড়ের উপর ৫% যে শুল্ক ছিল, তাহা কমাইয়া ৩½% করা হইল এবং বিলাতী সূতা একেবারে বিনাশুল্কে আনিবার অনুমতি পাইল। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় মিলের সকল প্রকার কাপড়ের মূল্যের উপর ৩½% কর ধার্য হইল। ১৮৯৬ সালে এই ভারতীয় কটন-শুল্ক-এক্ট্ পাশ হয়।

বিশ বৎসর এই কর ছিল ; ১৯১৬ সালে উহা রদ হয়। এই কয় বৎসরের মধ্যে কাপড়ের কলের ইতিহাসে অনেক পরিবর্তন হয়। ভারতের মোটা সূতার কাপড়ের খরিদ্দার ছিল বেশির ভাগ ভারতের বাহিরে লোক, যেমন মালয়, চীন প্রভৃতি। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ভারতে দেড়শ'র উপর কল ছিল ; পূর্বোক্ত সব দেশে জাপান আসিয়া প্রতিযোগিতা স্থরু করিল এবং ভারতীয় কাপড়কে সেসব দেশ হইতে প্রায় বিতাড়িত করিল ; কাপড়ের কলের ভীষণ দুর্দিন দেখা দিল। একে ভারতের ভিতরে বিদেশী কাপড়ের সহিত প্রতিযোগিতা, নিজেদের উৎপন্ন বস্ত্রের জন্য বিশেষ কর প্রদান, তাহার উপর বাহিরে জাপানীদের প্রতিযোগিতা। এই দুঃসময়ে বাঙলাদেশে 'স্বদেশী আন্দোলন' দেখা দিল ; এই আন্দোলন বোম্বাই-এর কাপড়ের কলকে এক হিসাবে বাঁচাইয়া দিল।

১৯১৭ সালে ভারতীয় রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য ভারত গবর্মেণ্ট বিদেশী কাপড়ের উপর ৭½% শুল্ক ধার্য করেন ও ভারতীয় কাপড়ের কলের উপর ৩½% excise কর সাব্যস্ত করেন। ১৯২২ সালে বিদেশী সূতা, যাহা ১৮৯৬ হইতে বিনা শুল্কে আমদানী হইয়া আসিয়াছিল, তাহার উপর ৫% শুল্ক ধরা হইল। যাহাই হৌক ১৯১৬ হইতে ১৯২২ সাল পর্যন্ত দেশী কাপড়-কলের স্বর্ণযুগ বলা যাইতে পারে। বিলাতী কাপড় তখন দেশে কমই আসিতেছিল ; জাহাজের অভাব। ইন্‌শিওরেন্সের খরচার জন্য খুব চড়া দামে বিলাতী কাপড় বিকাইত। দেশী মিলওয়ালারাও কেহ কেহ ৭৫% শতকরা লাভ করিয়াছিল বলিয়া শোনা যায়। তাহারা কোটি কোটি টাকা লাভ করে ও মূলধনের টাকা উঠাইয়া লয়। ১৯১৪ সালে সমগ্র ভারতে ২৩৯টি কল ছিল। ১৯৩০ সালে ৩৪৮টি হয় ; অর্থাৎ ষোল বৎসরে ১০৯টি কল বাড়ে। অবশ্য পরে কয়েকটি কলের কাজ বন্ধ হইয়া যায়।

১৯২২ সাল হইতে ভারতীয় কাপড়ের বাজারে নূতন সমস্যা দেখা দিল। প্রথম বাহিরের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে জাপান আসিল। কয়েক বৎসর পূর্বে জাপান, বোম্বাই-কাপড়কে মালয় দ্বীপালী হইতে তাড়াইয়াছিল। এইবার ভারতবর্ষে সে প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দিল। এই হইল পূর্বদিক হইতে আক্রমণ। পশ্চিমের মিলওয়ালাদের প্রতিযোগিতা পূর্ব হইতেইত ছিল। আর একটি

উপদ্রব জুটিল; সেটা হইতেছে পশ্চিমের কলযুগের শ্রমিক দানবের সহিত ধনিক কুবেরের বিরোধ। ১৯২২ সাল হইতে বোম্বাই-এর কাপড়ের কলে 'ধর্মঘট' বা strike দেখা দিল। বাহিরের প্রতিযোগিতা ও ভিতরের ধর্মঘটে গত কয়েক বৎসর ভারতের কাপড়ের ব্যবসায়কে অত্যন্ত দাবাইয়া রাখিয়াছে। সুতরাং বোম্বাই-এর বস্ত্রশিল্পকে বাহির হইতে পূর্ব ও পশ্চিমের দুই দ্বীপ হইতে আক্রমণ ও ভিতর হইতে শ্রমিকদের আক্রমণে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছিল।

ক্রমে ভারতীয় কাপড়ের কলের এমন অবস্থা হইল যে, ভারত গবর্মেণ্ট ১৯২৬ সালে 'ট্যারিফ বোর্ড' গঠন করিতে বাধ্য হইলেন; এই কমিশন ভারতের ভিতরের ও বাহিরের বাণিজ্য-অবস্থা সবিশেষ আলোচনা করিয়া বলেন যে, তিন বৎসরের জন্য আমদানী শুল্ক ১১% হইতে ১৫% করিতে হইবে, ও সূক্ষ্ম বস্ত্রের শিল্পের জন্য সরকারী সহায়তার প্রয়োজন। গবর্মেণ্ট এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই; তবে কাপড়ের কলের উপর যে excise কর ছিল, তাহা উঠাইয়া দিলেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে টাকার বিনিময় ১ শিঃ ৬ পেন্স কায়েমি করিয়া দেওয়াতে বিদেশী সূতার যে সুবিধা হইল, তাহার মূল্য প্রায় শতকরা ১২½%র সমতুল্য; ইহাকে একপ্রকারে সরকারী সহায়তা বা bounty বলা যায়। ১৯২৬ সাল হইতে জাপান ভারতের বাজারকে এমনভাবে আক্রমণ করিয়াছে যে, কোনো মতেই তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া না পারিতেছে লাঙ্কাশিয়ার কলওয়ালা, না পারিতেছে বোম্বাইওয়ালা। নিম্নে বয়ন শিল্পে জাপানের প্রগতি পরিস্ফুট করিবার জন্য একটি তালিকা দিলাম :—

	১৯১৩-১৪		১৯২৫-২৬		১৯২৬-২৭		১৯২৭-২৮		১৯২৮-২৯		১৯২৯-৩০	
	বিলাত	জাপান	বিলাত	জাপান	বিলাত	জাপান	বিলাত	জাপান	বিলাত	জাপান	বিলাত	জাপান
কোরা কাপড়	৯৮·৯	·৫	৭৯·২	২০·১	৭৮·৭	২০·৭	৭৪·৭	২৭·৫	৩৯·৪	২৮·৮	৪৬·২	৪২·৫
ধোয়া কাপড়	৯৮·৫	—	৯৬·	১·০	৯৬·৪	·৫	৯৪·৭	১·০	৯৪·৮	১·০	৯২·১	২·৯
রঙীন কাপড়	৯২·৬	·২	৭৯·১	১৯·০	৭১·১	১৫.২	৬৯·৮	২০·৩	৬৯·২	২১·৭	৫৬·৬	৬১·৯

এই তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে, ভারতেব বাজারে জাপানী কাপড় কি ভয়ঙ্কর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আসিয়াছে।

জাপানী বস্ত্র-বাণিজ্য যখন ধীরে ধীরে ভারতীয় বস্ত্রকে চীন, মালয় প্রভৃতি দেশ হইতে বিতাড়িত করিতেছিল, তখন বৃটীশ গবর্মেণ্ট ভারতীয় বহির্বাণিজ্য রক্ষার জন্য কোনো প্রকার চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু আমদানী বাণিজ্যে যখন জাপানী প্রতিযোগিতা ম্যাঞ্চেষ্টারের প্রতিপত্তি খর্ব করিতে আরম্ভ করিল, তখনই ভারত সরকার তথা বৃটীশ সরকার আমদানী শুল্ক সম্বন্ধে একটা বিধি-ব্যবস্থা না করিয়া পারিলেন না। ১৯৩০-৩১ সালের বাজেটে সূতী পণ্যের উপর শুল্ক ১১% হইতে ১৫% করা হইল। অটোয়া-চুক্তি অনুসারে অ-বৃটীশ পণ্যের উপর আরও ৫% করিয়া বেশি ধরা হইল। ১৯৩১ সালের অতিরিক্ত বাজেটের সময় বিদেশী সূতী পণ্যের উপর ২৪% অতিরিক্ত কর ধার্য করা হয়। এই সময়ে ভারতের সর্বত্র কংগ্রেসের বয়কট আন্দোলন তীব্রভাবে চলিতেছিল; বোম্বাই, আহমদাবাদ ও কলিকাতার মিলওয়ালারা এই বয়কট আন্দোলনেব সাফল্যের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই আন্দোলনের ফলে বিলাতী বস্ত্রের বিশেষভাবেই এদেশে আমদানী হ্রাস পায়; কিন্তু ভারতীয় মিলওয়ালাবা 'জাতীয়তা'-বোধ উদ্বুদ্ধ করিয়া 'বয়কট'কে সাফল্যমণ্ডিত করিলেন বটে, কিন্তু জাপানী কার্যকুশলতার কাছে তাঁহাদিগকে হার মানিতে হইল। জাপান বোম্বাই-এর তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিল।

জাপানের এই সাফল্যের অনেক কারণ; প্রথমত জাপান স্বাধীন দেশ, সকল বিষয়ে রাষ্ট্রীয় সহায়তা তাহারা লাভ করে। অর্থনীতি কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করিলে তাহারা স্বল্পমূল্যে বিদেশ হইতে কাঁচামাল কিনিতে পারিবে ও সস্তায় তৈরী মাল ছাড়িতে পারিবে, সেই বিদ্যাটি তাহারা যেমনভাবে আয়ত্ত করিয়াছে, এমন কেহ পারে নাই। তাহারা নব-প্রবর্তিত অর্থনীতি প্রবর্তনের ফলে অতি সস্তায় ভারতীয় তুলা ক্রয় করিয়াছিল এবং ১৯৩০ সালে ৫০% শুল্ক দিয়াও ভারতের বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছিল। অবশেষে ভারত সরকার কোনো কোনো সামগ্রীর উপর ৭৫% শুল্ক ধার্য করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতেও জাপানী মাল সস্তায় বাজারে বিকাইতেছে।

একথা গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত—জাপান ভারতবর্ষ ও আমেরিকা প্রভৃতি

স্থান হইতে তুলা ক্রয় করিয়া, জাহাজে করিয়া লইয়া গিয়া, মিলে কাপড় বানাইয়া, পুনরায় জাহাজে করিয়া আনিয়া ৫০%, ৭৫% হারে শুল্ক দিয়া ভারতীয় মিল হইতে সস্তায় কাপড় বিকাইতেছে কি করিয়া? ভারতীয় মিলওয়ালারা কেবলমাত্র প্রবর্ধমান সরকারী শুল্ক ব্যবস্থা ও ভারতীয়দের স্বদেশ-প্রীতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া ফাঁপিয়া উঠিতেছেন: নির্দিষ্ট অর্থনীতি, বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা, মিতশ্রমিক যন্ত্রপাতি সহ অনুসন্ধান কাপড়ের কলের মালিকগণ কর্তব্য বলিয়া মনে করেন না। এ ছাড়া মিঃ সাকাকুবা নামে জনৈক বোম্বাই-প্রবাসী জাপানী কলওয়ালা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও প্রণিধানযোগ্য; ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের এই দুর্গতির কারণ সম্বন্ধে তিনি বলেন,—

(১) ভারতে বাড়তি-উৎপন্নের (over-production) জন্য মজুদি কাপড়ের পরিমাণ-বৃদ্ধি ও ১৯৩২ সনে আমদানী কাপড়ের পরিমাণ-বৃদ্ধি।

(২) বোম্বাই মিলগুলির উৎপাদন-খরচের আধিক্য ও সেই অনুপাতে জাপানী ও বৃটিশ মিলের উৎপাদন-খরচের অল্পতা।

(৩) বোম্বাই মিলগুলির পরস্পরের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা। ভারতের যাহা প্রয়োজন, তাহার চেয়ে ১৯৩২ সালে শতকরা ১০% ভাগ বস্ত্র বাড়তি ছিল।

জাপান ভারতের বাজারে এমনি প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, অবশেষে বোম্বাই মিল ও ল্যাঙ্কাশায়ারের মিলের স্বার্থের জন্য ভারত গবর্মেণ্ট জাপানীদের সহিত একটা আপোষ করিতে বাধ্য হইলেন। ল্যাঙ্কাশায়ার, জাপান ও বোম্বাই-কলের প্রতিনিধি লইয়া এক কন্ফারেন্স হয়। বহু মাসের শলা-পরামর্শের পর একটা কাজচলাগোছ মীমাংসা হইয়াছে।

সন্ধির সর্তানুসারে জাপান প্রতি বৎসর ভারত হইতে অন্যূন ১৫ লক্ষ গাঁটরী তুলা ক্রয় করিবে ও শতকরা ৫০৲ শুল্কে ভারতে ৪০ কোটি গজ বস্ত্র আমদানী করিতে পারিবে। ১৯৩৩ সালে ভারতে ৪৬ লক্ষ বস্তা তুলা জন্মিয়াছিল; তন্মধ্যে জাপান ১৫ লক্ষ বস্তা, ভারতীয় কলগুলি ২২ লক্ষ বস্তা ব্যবহার করে। অবশিষ্ট ৮ লক্ষ গাঁট য়ুরোপে বিক্রয় হয়।

ভারতে প্রতি বৎসর ১২৬ কোটি গজ বস্ত্র আমদানীর প্রয়োজন। জাপান

৪০ কোটি গজ আমদানী করিলে অবশিষ্ট ৮৬ কোটি গজ ইংলণ্ড সরবরাহ করিবে। ভারতীয় মিলে ৩০০ কোটি গজ উৎপন্ন হয়।

ভারতবর্ষের সমুদয় কলের টাকুর শতকরা ৪৭%টি বোম্বাইতে, ২২% আহমদাবাদে, ১০% কাণপুরে অবস্থিত। ১৯৩০ সালে ৩৪৩টি কল ছিল, তার মধ্যে বোম্বাই প্রদেশে ১৩৮, বোম্বাই দ্বীপে ৮১, রাজপুতানায় ৫, বেরারে ৪, মধ্যপ্রদেশে ৮, হায়দ্রাবাদে ৫, মধ্য ভারতে ১৫, বাঙলায় ১৭, পঞ্জাবে ৯, যুক্তপ্রদেশে ২৪, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ২৮, মৈশূরে ৫, পণ্ডিচেরীতে ৬, বর্মায় ১টি।

ভারতবর্ষে যে পরিমাণ তুলা উৎপন্ন হয়, তা ভারতীয় কলে লাগে না। ১৯৩০-৩১ সালে ৪৮,২০,০০০ বস্তা ও ১৯৩১-৩২ সালে ৪০,৬৪,০০০ বস্তা তুলা উৎপন্ন হয়; কিন্তু ভারতীয় কলে মাত্র যথাক্রমে ২২,৬৯,৩৫৯ বস্তা ও ২৩,৪৫,০৭৮ বস্তা তুলা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বাহির হইতে তুলা আমদানী করিতে হয়।

কোন্ প্রদেশে কতখানি করিয়া তুলা কলে লাগিয়াছে, তাহার তালিকা দেখা যাক্ ঃ—

	(৪০০ পাউণ্ডের বস্তা)	
	১৯৩০-৩১	১৯৩১-৩২
বোম্বাই প্রেসিডেন্সী	১১,৭৩,৮৫৯	১১,৩১,৩২৭
বোম্বাই	৬,৬৪,৫৪৬	৬,১০,২৮৮
আহমাদাবাদ	৩,২১,৫০৩	৩,২২,২৫৭
মাদ্রাজ	২,১৪,৭৫৯	২,৬০,৭০৭
যুক্তপ্রদেশ	২,৩৫,৬২৩	২,৫৬,৮২০
মধ্যপ্রদেশ-বেরার	১,১৮,৪৯২	১,১৫,০১৮
বঙ্গদেশ	৯১,৯৯৩	১,০২,৩৯০
পঞ্জাব-দিল্লী	৭৩,৭৩৬	৮৯,৬৮১
দেশীয় রাজ্য	৩,৩৩,৯৯৬	৩,৫৮,৭৯৩
	৩১,২৮,৩০৭	৩২,০০,০০০

দেখা যাইতেছে, বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশেই তুলার খরচ কম হইয়াছে; ইহার কারণ ধর্মঘট ও নানা শ্রমিক গণ্ডগোলে এখানকার মিলগুলি খুব কামাই গিয়াছে।

ভারতীয় মিলে সূতা ও কাপড় দুইই হয়। অনেক মিলে কেবল সূতাই করে; দেশী তাঁতিরা সেই সূতা ক্রয় করে; ছোট ছোট মিলও সূতা কেনে। বৃটীশ ভারতের মিলে ১৯২১-২২ সালে ৬৫,৩০ লক্ষ পাউণ্ড সূতা প্রস্তুত হয়, ১৯৩০-৩১ সালে ৭৫,৩৬ লক্ষ পাউণ্ড। ইহার মধ্যে বাঙলার মিলগুলিতে মাত্র ৩,৭৭ লক্ষ পাউণ্ড সূতা প্রস্তুত হয়। বৃটীশ ভারতের মিলগুলির উৎপন্ন কোনো বৎসরে বাড়িতেছে, কোনো বৎসরে কমিতেছে; কিন্তু দেশীয় রাজ্যের মিলগুলির উৎপন্ন ধীরভাবে বৎসরের পর বৎসর বাড়িয়া চলিয়াছে। ধোয়া ও রঙীন কাপড়ে বাঙলার প্রগতি নিন্দনীয় নহে।

(বাঙলায় উৎপন্ন)

	সূতা (লক্ষ পাউণ্ড ওজন)	ধুতি-চাদর (লক্ষ পাউণ্ড)
১৯২১-২২	৩,৩৬	৪৬
১৯২৬-২৭	৩,১৬	৭৫
১৯৩০-৩১	৩,৭৭	১,৬৭
(সমগ্র বৃটীশ ভারতে)		
১৯৩০-৩১	৭৫,৩৬	৫০,৭৮

ভারতীয় কটন মিলে কত টাকার মাল তৈয়ারী হইয়াছে, তাহা জানিলে বাঙলার করণীয় এখনো কি আছে, তাহা বুঝা যাইতে পারে:—

	বাঙলাদেশ (হাজার)	বোম্বাই (হাজার)	সমগ্র ভারত (কোটি টাকা)	Excise কর বাঙলার (হাজার টাকা)	Excise কর ভারতের (হাজার টাকা)
১৯১৯-২০	৯২,৪৮	৪,৮১,০৫৩	৫৭·৮	৩৩২	১৫,৫১৪
১৯২১-২২	৭৩,১৭	৫,১০,১২০	৬০·৭	২৬৫	২১,৯১৬
১৯২৩-২৪	৬৭,৭৬	৪,২৫,০৮১	৫২·৯	২২২	১৫,৬৫১
১৯২৬-২৬	১,০৬,৭১	৩,৬০,৪৬১	৪৭·২	২৮৮	১৪,৬৬০

সমগ্র ভারতের ৪৭ কোটির মধ্যে মাত্র ১ কোটি টাকার মত কাপড়

বাঙলাদেশ বুনিত। Excise কর সামান্যই দেয়। ১৯২৫-২৬ সাল হইতে এই কর উঠিয়া যায়।

ভারতবর্ষের মিলে যে কাপড় প্রস্তুত হয়, তাহা কিয়ৎপরিমাণে রপ্তানী হয়। অবশিষ্ট দেশেই ব্যবহৃত হয়। রপ্তানী মালের পরিমাণ ও মূল্য প্রতি বৎসরই হ্রাস পাইতেছে:

	সূতা (হাজার টাকা)	কাপড় (হাজার টাকা)		সূতা (হাজার টাকা)	কাপড় (হাজার টাকা)
১৯২১-২২	৭৭,১৪৬	৭৯,৩৬১	১৯২৬-২৭	৩০,৮৫৪	৭৬,৬৩২
১৯২২-২৩	৫৪,৭৭৬	৭৫,৮৪৬	১৯২৭-২৮	১৯,৭৯১	৬৭,৯৩২
১৯২৩-২৪	৩৬,৬২২	৭২,৯২৭	১৯২৮-২৯	১৯,৫৬৭	৯৮,৩৮৯
১৯২৪-৪৫	৩৭,০১১	৭৫,৭৩৬	১৯২৯-৩০	১৯,০২৪	৫২,৮৪৩
১৯২৫-২৬	২৯,৩৩৭	৬৭,১৪৮	১৯৩০-৩১	১৫,৭৬৮	৩৬,৩৮৬

বলাই বাহুল্য, ১৯২৬ সাল হইতে জাপান ভীষণভাবে ভারতকে পূর্বসাগর হইতে তাড়াইবার জন্য ব্যবস্থা করে; ১৯২১-২২ সালে হঙকঙে ভারতীয় কাপড় ও সূতা যাইত প্রায় চার কোটি টাকার (৩,৯৮,৪৬,০০০ টাকার), ১৯৩০-৩১ সালে মাত্র ৪,২১,০০০ টাকার যায়। এইভাবে প্রত্যেক দেশ হইতে ভারতবর্ষের কাপড় জাপান কর্তৃক বিতাড়িত হইতেছে; অবশেষে জাপান ভারতবর্ষ হইতেও ভারতবাসীর কাপড়কে তাড়াইয়া তাহার তৈয়ারী কাপড় বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতেছে। বৃটীশ সরকারের শতবিধ আইন, শুল্ক-আইন তাহাদের এই গতিকে রোধ করিতে পারিতেছে না।

শতাব্দীর কিছু পূর্বে ভারতবর্ষের প্রয়োজনীয় বস্ত্র ভারতবাসীর দ্বারাই তৈয়ারী হইত; বিদেশী বস্ত্রের বা দেশীয় ধনিকদের দ্বারা চালিত মিলের কাপড়ের প্রয়োজন ছিল না। তবে এ কথা নিশ্চিত যে, তখন মানুষ এ পরিমাণ কাপড় ব্যবহার করিতে পারিত না; নিতান্ত প্রয়োজনীয় মোটা কাপড় ছাড়া কোনো প্রকার সূক্ষ্ম বা সুন্দর কাপড় সাধারণ লোক পরিবার আশা করিত না। বর্তমানে অনেক বেশি কাপড় প্রত্যেক লোকে ব্যবহার করে। তবে ইহার অনেকখানির জন্য ভারতকে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ভারতবর্ষে ২২৯ কোটি গজ কাপড় ব্যবহৃত হইত। ইহার মধ্যে বিদেশী আমদানী কাপড় ১৯৪ কোটি গজ, ভারতীয় মিলে প্রস্তুত

হইয়াছিল মাত্র ৩৫ কোটি গজ; মাথাপিছু ৭·৮ গজ করিয়া কাপড় পড়িয়াছিল। ১৯১৩-১৪ সালে সমগ্রের জন্য ৪২০ কোটি গজ কাপড় অর্থাৎ ১৩·২৯ গজ করিয়া কাপড় মাথাপিছু পড়ে; ইহার মধ্যে আমদানী ৩১৩ কোটি গজ, ভারতের মিলে প্রস্তুত ১০৭ কোটি গজ। ইহার পর যুদ্ধ বাঁধে। তখনই যথার্থভাবে বোঝা গেল ভারতবর্ষ সত্যই পরাধীন। ভারতীয় মিলের তৈয়ারী কাপড়ের পরিমাণ মাত্র ১২৯ কোটি গজ; আমদানী কাপড়ের পরিমাণ কমিতে কমিতে ১৯১৯-২০ সালে ১০০ কোটি গজে দাঁড়াইল, অর্থাৎ দুইশ' কোটি গজের অভাব! ফলে কাপড় দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য হয়। ইহার পর হইতে ধীরে ধীরে আমদানী কাপড় ও ভারতে প্রস্তুত কাপড়ের পরিমাণ বাড়িতে থাকে। ১৯১৩-১৪ সনে মাথাপিছু যে ১৩·২৯ গজ কাপড় ব্যবহৃত হয়, তাহার মধ্যে ৯·৯০ গজ ছিল আমদানী, ৩·৩৯ গজ ছিল দেশী মিলের। ১৯২৯-৩০ সালে মাথাপিছু ১২·০৪ গজ ব্যবহৃত কাপড়ের মধ্যে ৫·৪৬ গজ ছিল আমদানী, আর ৬·৫৮ গজ দেশী মিলের প্রস্তুত। এখন অবস্থা আরও ভাল।

যুদ্ধের পূর্বে এই আমদানী কাপড়ের ৯৮% ভাগ ছিল বৃটীশ দ্বীপপুঞ্জের মাল। গত বিশ বৎসরে অনেক পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। জাপান এখন বড় রকম স্থান অধিকার করিয়াছে।

১৯১৩-১৪ সালে বৃটীশ কাপড় আমদানী হয় ৩১,০৪০ লক্ষ গজ, ১৯২৯-৩০ সালে নামিয়া ১২,৪৮০ লক্ষ গজ হয়, ১৯৩০-৩১ সালে মোট আমদানী ১৯,১৯০ লক্ষ গজের মধ্যে বিলাত হইতে আমদানী হয় ৫,২৬০ লক্ষ গজ।

কিভাবে এই বয়নশিল্পের আমদানী পরিবর্তিত হইতেছে দেখা যাক্—

(লক্ষ গজ)

	১৯১৩-১৪	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯	১৯২৯-৩০	১৯৩০-৩১	১৯৩১-৩২
বৃটীশ	৩১,০৪০	১৪,৬৭০	১৫,৪৩০	১৪,৫৬০	১২,৪৮০	৫,২৩০	৩,৮৩০
জাপান	৯০	২,৪৪০	৩,২৩০	৩,৫৭০	৫,৬২০	৩,২১০	৩,৪০০
মাকিণ	১০০	১৬০	২৮০	৩০০	৩৩০	৯০	১৯০
ইতালি	২৩০	১৭০	২৬০	৩৮০	২৫০	১০০	১১০
ওলন্দাজ	২৫০	২০০	২০০	২০০	২২০	১৩০	৭০

এই সঙ্গে দেখা যায় ভারতীয় কাপড়ের কলে কি পরিমাণ কাপড় উৎপন্ন হইয়াছে :—

(লক্ষ গজ)

যুদ্ধের পূর্বে	যুদ্ধের সময়	যুদ্ধের পর	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮
৮,৫৪০	১২,১৯০	১২,১৯০	১৫,৭৭০	১৬,৭৫০

১৯২৮-২৯	১৯২৯-৩০	১৯৩০-৩১	১৯৩১-৩২
১৪,১০০	১৮,১৫০	২০,০৩০	২৩,১১০

ভারতে উৎপন্ন ও বিদেশ হইতে আমদানী এই উভয় প্রকারের বস্ত্রের একটা হিসাব আমরা এইবার করিব :—

(লক্ষ গজ)

	মিলের উৎপন্ন	আমদানী	দেশী বস্ত্রের রপ্তানী	বিদেশী বস্ত্রের রপ্তানী	বাদসাদ দিয়া মোট ব্যবহৃত
১৯২৫-২৬	১৯,৫৪০	১৫,৬৫০	১,৬৫০	৬৫০	৩২,১৮০
১৯২৬-২৭	২২,৫৯০	১৭,৮৮০	১,৯৮০	২৯০	৩৮,২০০
১৯২৭-২৮	২৩,৫৭০	১৯,৭৩০	১,৬৯০	৩৪০	৪১,২৮০
১৯২৮-২৯	১৮,৯৩০	১৯,৩৭০	১,৪৯০	২৪০	৩৬,৫৭০
১০২৯-৩০	২৪,১৯০	১৯,১৯০	১,৩৩০	২২০	৪১,৮৩০
১৯৩০-৩১	২৫,৬১০	৮,৯০০	৯৮০	১৭০	৩৩,৩৬০
১৯৩১-৩২	২৯,৯৯০	৭,৭৬০	১,০৪০	১৫৭	৩৬,৪৫২

গত চল্লিশ বৎসরে ভারতে মিলের প্রগতি :—

		টাকা (হাজার)	তাঁত	শ্রমিক	তূলা হন্দর	বেল্ (হাজার)
১৮৮২	৬৭	১,৬২০	১৪,১৭২	৪৮,৪৬৭	১,৩৯১	৩৯৭
১৮৯২	১৩৯	৩,৪০২	২৫,৪৪৩	১,১৮,০০০	৪,০৮৩	১,১৬৫
১৯০২	১৯২	৫,০০৬	৪২,৫৮৪	১,৮১,০০০	৬,১৭৭	১,৭৬৫
১৯১২	২৬৪	৬,৪৬৩	৮৮,৯৫১	২,৪৩,০০০	৭,১৭৫	২,০৫০
১৯২২	২৯৮	৭,৩৩১	১,৩৪,৬২০	৩,৪৩,০০০	৭,৭১২	২,২০৩

		টাকা (হাজার)	তাঁত	শ্রমিক	তুলা হন্দর	বেল্ (হাজার)
১৯৩০	৩৪৮	৯,১২৪	১,৭৯,২৫০	৩,৮৪,০০০	৯,০০৮	২,৫৭৩
১৯৩১	৩৩৯	৯,৩১১	১,৮২,৪২৯	৩,৯৫,০০০	৯,২১৬	২,৬৩৩
১৯৩২	৩৩৯	৯,৫০৬	১,৮৬,৩৪১	৪,০৩,০০০	১০,৯৯০	২,৯১১
১৯৩৩	৩৪৪	৯,৫৭১	১,৮৯,০৪০	৪,০০,০০০	৯,৯৩০	২,৮৩৭
১৯৩৪	৩৫২	৯,৬১৩	১,৯৪,৯৮৮	৩,৮৪,৯৩৮	৯,৪৬৩	২,৭০৩
১৯৩৫	৩৬৫	৯,৬৮৫	১,৯৮,৮৬৭	৪,১৪,৮৮৪	১০,৯৩১	৩,১২৩
১৯৩৬	৩৭৯	৯,৮৫৬	২,০০,০৬২	৪,১৭,৮০৩	১১,০৯৮	৩,১৭১

৩১ আগষ্ট ১৯৩৩ সালে ভারতবর্ষে মোট কাপড়ের কল

(হাজার)

	মিল	টাকু	তাঁত	শ্রমিক	তুলা হন্দর	তুলা ৩॥০ হন্দরের বস্তা
বোম্বাই দ্বীপ	৭৮	৩৩,০০,৬৮৮	৭৩,২৬৯	১,১৯,২৬৯	২,৭৯২	৭৯৭
আহমদাবাদ	৮২	১৯,৭৮,৩১৪	৪৭,২২৪	৭৭,৭৪৩	১,৬৭২	৪৭৭
বোম্বাই প্রেসিডেন্সি (অন্যান্য)	৬০	১১,৮৯,৭৯২	২২,০৯৮	৫৪,৭৩১	১,২২৬	৩৫০
মোট	২২০	৬৪,৬৮,৭৯৪	১,৪২,৫৯১	২,৫২,৪১৭	৫,৬৯০	১,৬২৫
মাদ্রাজ	২৮	৮,৬৩,৯৪০	৫,৫৫৩	৩৫,১০৪	১,০৮৯	৩১১
যুক্তপ্রদেশ	২২	৬,৬৪,৪৭৬	৮,৯০৬	২৭,৪৭৬	৯৬৭	২৭৯
বঙ্গদেশ	১৯	৩,৩৩,৩৬৮	৫,৯৭৬	১৫,৮৭২	৩৯২	১১২
মধ্যভারত	১৪	৩,১৩,৫৭২	৮,৩৩৯	১৭,৮৮৩	৫১২	১৪৬
পঞ্জাব	১০	১,৫৭,৫৪৬	৩,৭৫৮	৬,৯০৯	২৮০	৮০

	মিল	টাকু	তাঁত	শ্রমিক	তুলা (হাজার)	
					হন্দর	৩।॰ হন্দরের বস্তা
মধ্য প্রদেশ	৮	৩,০৬,০০০	৫,৭২৩	১৮,৪৩২	৩৭৬	১০৭
রাজপুতানা	৫	৬৮,২৩২	১,৪৬৬	৩,৪৬৭	১০০	২৮
হায়দ্রাবাদ	৫	১,০৩,৯০৪	১,৫৯৯	৪,৪৩৫	১২১	৩৪
মহীশূর	৫	১,৪২,১৭২	২,০৪০	৭,৯০১	১৮৭	৫৩
বেরার	৪	৬৪,৭২০	১,৩৪৯	৪,৩১০	৮৯	২৫
পণ্ডিচেরী	৩	৭২,৯৪৪	১,৭৪০	৪,৯৬২	৮৩	২৪
বর্মা	১	১২,০০০	×	৮৩৭	২৯	৮·৪
	৩৪৪	৯৫,৭১,৬৬৮	১,৮৯,০৪০	৪,০০,০০৫	৯,৯৩০	২৮,৩৭

See The Millowners Association Chart, Bombay, 31 Aug. 1933.

ইহা ছাড়া ৩১টি নূতন মিল তৈয়ারী হইতেছে। বাঙলায় ১৯টীর মধ্যে ৩টি কাজ করিতেছে না। আরও ১৯টি তৈয়ারী হইতেছে। ১৯৩৪ জুন মাসে একটি রেজিষ্টারী হইয়াছে।

বাঙলাদেশে মাত্র ১৭টি কাপড়ের কল আছে, আরও কয়েকটি নূতন গঠিত হইতেছে; পূর্বেই বলিয়াছি বোম্বাই-এর তুলনায় বাঙলার স্থান নগণ্য। কিন্তু বাঙলায় বয়নশিল্পের ইতিহাস সমগ্র ভারতীয় শুল্কের ইতিহাসের সহিত যুক্ত; সেইটি বুঝিবার জন্য বস্ত্রশিল্পের সমগ্র ইতিহাস ও সমস্যাগুলি পূর্বে বলিলাম। বাঙলার বস্ত্রশিল্প কিভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, সেকথা বহুস্থানে বহু লোকে নানাভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। সেই প্রাচীন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত এম্. পি. গান্ধী বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইলে, বাঙালী সর্বপ্রথম

কাপড়ের কল স্থাপনে উদ্যোগী হইল; ১৯০৬ সালে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল্‌স্ শ্রীরামপুরে স্থাপিত হইল। যুদ্ধের পূর্বে কুষ্টিয়া 'মোহিনী মিল্‌স্' স্থাপিত হয়; এক দুইটি ছাড়া বাঙালীর নিজের কল বলিতে তখন আর কিছু ছিল না। বঙ্গলক্ষ্মী স্থাপনের পূর্বে বাঙালাদেশে কাপড়ের কলের কিরূপ প্রগতি হইয়াছিল, তাহা নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

	কল	তাঁত	টাকু	শ্রমিক (দৈনিক)
১৮৮০-৮১	৬	১২৬	১৬৭ হাজার	৪,১৬৬
১৮৯০-৯১	৮	×	১৯৭ ,,	৮,৭৯০
১৮৯৬-৯৭	৯	২০০	৩৪৯ ,,	১০,৯০০
১৯০০-০১	১০	২০৯	৪১১ ,,	৮,০৩০
১৯০৩-০৪	১০	২১৩	৪৫১ ,,	১০,২৩০

১৯০৫ সালে বাঙলাদেশে স্বদেশী আন্দোলন উপস্থিত হইল; তাহারই ফলে বাঙালীর প্রথম কল 'বঙ্গলক্ষ্মী' ১৯০৬ সালে আরম্ভ হয়।

বয়নশিল্পের প্রতি বাঙলার এই অবহেলা সে গত কয় বৎসরে অনেকখানি শুধরাইয়া লইয়াছে।

গত দশ বৎসরে বাঙলার উৎপাদিকা শক্তি অনেক বাড়িয়াছে একথা সত্য। কিন্তু সমগ্র ভারত বা বৃটীশ ভারতের বা বোম্বাই-এর তুলনায় উৎপাদন নিতান্ত অল্প।

নিখিল ভারতে প্রগতি হইয়াছে শতকরা ৭৪%; বোম্বাইতে হইয়াছে ৬৫%; বাঙলা ৩৫%। এই হিসাবে বাঙলার প্রগতি যথেষ্টই হইয়াছে এবং এখনো ১৮।১৯টী কল খুলিবার ব্যবস্থা বাঙালী করিতেছে; সুতরাং এই প্রগতির হার যে আরও বাড়িবে সে বিষয়ে ভরসা করা যায়। (Statistical Abstract, 10th Issue, 1930-31, p 757).

বাঙলাদেশের যে চল্লিশটি কলের নাম পাওয়া যায় সবগুলিতে কাজ হইতেছে না; কয়েকটি আদৌ স্থাপিত হয় নাই। এই সকল মিলে মাত্র ৭·৯ কোটি গজ কাপড় উৎপন্ন হয়। কোন্ প্রদেশে কতখানি সুতা ও কাপড় হয় তুলনামূলকভাবে দেখাইতেছি :—

১৯৩১-৩২

(লক্ষ গজ)

	সুতা	কোরা ধোয়া কাপড়	রঙীন কাপড়
বোম্বাই দ্বীপ	৩২,২০	৯৩,৩০	২৮,৪০
আহমদাবাদ	১৫,২০	৫৭,৩০	২৬,৯০
বোম্বাই প্রেসিডেন্সী	৫৪,৯০	১৬৪,৩০	৫৪,৫০
মাদ্রাজ	৮,৮০	৩,৩০	৩,৬০
বঙ্গদেশ	৩,৮০	৭,৫০	৪০
যুক্তপ্রদেশ	৯,০০	১৩,৮০	৬০
আজমীড়	৭০	২,০০	৮
পঞ্জাব	৫২	৭৩	৩
দিল্লী	২,৪৫	৬,১০	১,০০
মধ্যপ্রদেশ	৪,৪১	৬,৪০	১,৮০
বর্মা	৩৩	—	—
দেশীয়রাজ্য	১১,৮০	২৬,৮০	৫,৯০
মোট সুতা	৯৯,৬০	ধুতি ২৩১,১০	রঙীন ৬৭,৯০

রঙীন ছিট ও কাপড়ে বাঙলাদেশ পঞ্জাব ও আজমীড় ছাড়া সমস্ত প্রদেশ থেকে নীচে, কোরা ও ধোয়া কাপড় মাত্র ৭,৫০ লক্ষ গজ উৎপন্ন করে। যদি ধরা যায় বাঙলাদেশের সমস্ত কলে দশ কোটি গজও কাপড় হয়, তবে পাঁচ কোটি লোকের ভাগ্যে বাঙলার কাপড় পড়ে গড়ে মাথাপিছু ২ গজ; আর একজনের মাথাপিছু লাগে ১২।১৩ গজ। সুতরাং বাঙালীর যা কাপড় মাথাপিছু লাগে তার ২ গজ বাঙলার মিলে তৈরী, অবশিষ্ট ১০ গজ কাপড় বিদেশী ও বাঙলার বাহিরের উৎপন্ন।

বাঙলার এতগুলি কলের মধ্যে বাঙালীর নিজস্ব মাত্র আটটি। বাঙালীর মিলে উৎপন্ন কাপড় বাঙালীর মাথাপিছু প্রয়োজনীয় কাপড়ের বোধ হয় ৬।৭ ইঞ্চি সরবরাহ করে। যেখানে ৫ কোটি লোকের জন্য ৬০ কোটি গজ কাপড় দরকার, সেখানে ২০টি কলে উৎপন্ন হয় মাত্র ৭.৯ কোটি

গজ। সুতরাং এখনো কম সে কম ছোট মাঝারি বড় রকমের আরও ১২০টি কল স্থাপন করা যাইতে পারে।

বাঙলার যে-সব মিলে কাজ হইতেছে

সেপ্টেম্বর ১৯৩৩

	মুলধন (হাজার টাকা)	টাকু	তাঁত	তুলা ৭৮৪ পাউণ্ডে বস্তা	শ্রমিক	সেপ্টে ১৯৩৮ -আগষ্ট ১৯৩৯
বঙ্গেশ্বরী	৪১৪	১০,০০০	৩০০	১,১৫৩	৪৫৮	২৯২
বঙ্গলক্ষ্মী	৭১১	৩৫,৯৯২	৯৩২	৩,৬২৫	১,৭৮০	৩০৬
ভারত অভ্যুদয়	৩,০০২	৪৭,৫০৮	৭০২	১৯৩৬ হইতে বন্ধ আছে		
বাউরিয়া	১,৮০০	৪১,৯৯২	৮৩৫	৮,৩৩৪	২,১৫৭	৩০৩
ঢাকেশ্বরী ১	৩,৩০১	২৯,৩০৮	৭৮০	৪,৭৬৪	১,৬৬৩	২৯৯
ঐ ২		১৯,৮০০	৪৯৮	৫৭৩	৭৭১	৩০৬
ডানবার নং ১, ,, ২, ,, ৩, ,, ৪	১,৯০০	৪২,৯৪৪	৫২৪	৮,৯৭৩	২,২২৫	৩০৩
কেশোরাম	৩,৫০০	৫৯,৩৪০	১,৮৭২	১৩,৭৩২	৩,৭৫১	৩০৭
ইষ্টইণ্ডিয়া	১২০	—	১০৮	—	২৩০	২৬৫
লক্ষ্মীনারায়ণ	১,০৯০	৫,৬১৮	২২২	৭৩৬	৫৫২	২৭৬
মহালক্ষ্মী	৫৭৫	৫,০২০	১৫০	১৮৫	৬৫৭	৩০২
মোহিনী	১,৪০০	১৯,২৮৮	৫৫৫	৩,৯৬৪	১,১৬০	২৮০
রামপুরিয়া		১৫,৫৯২	৭৯০	৪,৪০৮	১,১৩৪	৩০৫
শ্রীরাধাকৃষ্ণ নং ১ —		১৮,৭৩২	৫৬৭	৮,৪৭৭	১,২৮৮	৩১১
,, নং ২ —					৯৯৫	১৭৬
ভিক্টোরিয়া		১২,৩০৪				

সুতা

বাঙলার উৎপন্ন সুতা

(হাজার পাউণ্ড ওজন)

দেশ	১৯৩০-৩১	১৯৩১-৩২	১৯৩২-৩৩
সমগ্র ভারত	৮,৬৭,২৭৮	৯,৬৬,৩৭৩	১০,১৬,৪১৮
বোম্বাই প্রেসিডেন্সী	৪,৭৫,৯৪৪	৫,৪৯,০৩৮	৫,৫৮,৫৯৪
মাদ্রাজ	৭৬,৯২৬	৮৭,৭২৮	১,০৪,৯০৯
যুক্তপ্রদেশ	৮৫,০৪৯	৮৯,৭৩১	৯৩,১২৬
মধ্যপ্রদেশ-বেরার	৪৫,১০২	৪৪,১৪২	৪৫,৩৮৫
বঙ্গদেশ	৩৭,৭৬২	৩৭,৬২০	৪০,৮২১
দিল্লী	১৯,৫৮০	২৪,৪৭১	২৬,৭৯১
আজমীড	৬,০০২	৬,৯৬২	৭,৭৯৬
পঞ্জাব	৪,০৩১	৫,১৭১	৫,০৬৩
বর্মা	৩,২৬৪	৩,২৫৮	৩,২৮০
অন্যান্য	১,১৩,৬১৩	১,১৮,২৪৭	১,৩০,৬৪৯

(Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, 1933 March.

কাগজের কল

প্রাচীনকালে আমাদের দেশে লোকে তালপাতায় লিখিত; কোনো কোনো স্থানে ভূর্জপত্র ব্যবহৃত হইত। মুসলমানদের আগমনের পর হইতে এদেশে কাগজের প্রচলন হয়। 'কাগজ' আদিতে চীনদেশে আবিষ্কৃত হয়; আরবরা অষ্টম শতাব্দীতে মধ্য-এশিয়া জয় করে; সেইখানে তাহারা চীনাদের কাগজ করার পদ্ধতি শিক্ষা করে। য়ুরোপীয়রাও আরবদের নিকট হইতে 'কাগজ' করিবার পদ্ধতি শিক্ষা করে; তৎপূর্বে তাহারা পার্চমেণ্ট বা ভেড়ার চামড়ায় লিখিত। মধ্য-এশিয়াতেও চামড়ায় লেখার রেওয়াজ ছিল; 'পুস্ত' মানে চামড়া; পুস্ত হইতে পুস্তক হইয়াছে।

মুসলমানদের ভারত বিজয়ের পর এই নূতন শিক্ষা ভারতের সর্বত্র জাগিয়াছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীতে য়ুরোপীয় পদ্ধতি অনুযায়ী কাগজ প্রস্তুত করিবার কল স্থাপিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত কাগজ তৈয়ারীর শিল্পে বহু সহস্র লোক নিযুক্ত ছিল; তখন ইহা পল্লী-শিল্প ছিল। এখন এই শিল্প দেশে প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মুদ্রাযন্ত্রের সহিত কাগজ-শিল্পের সম্বন্ধ অতি নিকট বলিয়া দেশে ছাপাখানার বিস্তারের সহিত কাগজ-শিল্পের প্রসার হয়।

খ্রীষ্টান মিশনারীরা যেমন এদেশে মুদ্রাযন্ত্র বিস্তারের জন্য দায়ী, কাগজের কল স্থাপনের জন্য তাঁহাদের দায়িত্ব কম নহে। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে দিনেমার পাদ্রীরা মাদ্রাজের নিকট (১৭১৬ খ্রীঃ অঃ) প্রথম একটি কাগজের কল স্থাপন করেন; বলা বাহুল্য, সে যুগে য়ুরোপেও এই শিল্প যথেষ্ট বৈজ্ঞানিকভাবে করা হইত না। যাহা হউক, প্রায় একশত বৎসর পরে আর একটি দিনেমার খ্রীষ্টান মিশনারীদের চেষ্টায় বাঙলাদেশের শ্রীরামপুরে (১৮১১ খ্রীঃ অঃ) মিশন, ছাপাখানা ও কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এ সব কারখানা বর্তমানের তুলনায় খেলনার মতো। শ্রীরামপুরের এই কল উঠিয়া গেলেও লোকে 'শ্রীরামপুরী কাগজ'কে ভুলিতে পারে নাই।

১৮৭০ সালে বাঙলাদেশে 'বালি পেপার মিল' নামে একটি সাহেব কোম্পানী মাত্র একটি কল লইয়া কাগজের কল আরম্ভ করেন। ১৮৭৯ অব্দে উত্তর ভারতবর্ষে লক্ষ্ণৌ শহরে কুপার কোম্পানী কাগজের একটি বৃহৎ কল খোলেন। ১৮৮২ সালে 'টিটাগড় পেপার মিলস্' প্রতিষ্ঠিত হয়; পর বৎসর পুনা নগরীতে একটি কাগজের কল খোলা হয়; ১৮৯০ অব্দে বেঙ্গল পেপার মিল্স্ নামে একটি বৃহৎ কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়; ইহার পরেও ভারতের নানাস্থানে ছোটখাটো কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ১৯০৫ সালে টিটাগড়ের কোম্পানী বালির কাগজ কল কিনিয়া লয় ও টিটাগড়ে বৃহৎভাবে কারখানা খোলে; বালিতে কোনো কাগজের কল নাই; কিন্তু 'বালির কাগজ' এখনো আমরা বলি।

জ্ঞান-বিস্তারের সহিত কাগজের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়; পৃথিবীর কোন্ দেশে মাথা-পিছু কতখানি করিয়া কাগজ ব্যবহৃত হয়, তাহার একটি তালিকা নিম্নে আমরা দিতেছি; এই তালিকা হইতে বুঝা যাইবে, এদেশে শিক্ষার অবস্থা কি

শোচনীয় এবং শিক্ষা বিস্তার লাভ করিলে এই কাগজ-শিল্পেরও ভবিষ্যত কত উজ্জ্বল হইবে। নিম্নের তালিকাটি ১৯২৫ সালের হিসাব :—

	পাউণ্ড		পাউণ্ড
মার্কিন রাজ্য	১৫২	আর্জেণ্টাইন	৩১
গ্রেটবৃটেন	৮১	চিলি	২৬
জার্ম্মেনী	৪৮	জাপান	১৮
ফ্রান্স	৪০	ব্রেজিল	১৩
বেলজিয়াম	৫০	মিশর	৫
অষ্ট্রেলিয়া	৪৪	ভারতবর্ষ	১
			পাউণ্ডের কম

গত দশ বৎসরে ভারতে কাগজের ব্যবহার বাড়িলেও তাহা সভ্য পৃথিবীর ব্যবহৃত কাগজের অনুপাত হইতে যে অনেক নীচে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

বাঙলাদেশের যে কাগজ প্রয়োজনে লাগে তাহার মূল্য অনুমান করা কঠিন; তবে বাঙলার বন্দরে যে পরিমাণ কাগজ বিদেশ হইতে আসে ও বাঙলার চারিটি কলে যে পরিমাণ কাগজ প্রস্তুত হয়, তাহার মূল্য ধরিলে দেখা যায় যে, ১৯৩২-৩৩ সালে কলিকাতার বন্দরে আমদানী কাগজের মূল্য ছিল ৬৯ লক্ষ টাকার উপর ও বাঙলাদেশে উৎপন্ন কাগজের মূল্য ছিল ১ কোটি ২০ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকার অর্থাৎ বাঙলায় যে পরিমাণ কাগজ লাগে তাহার এক তৃতীয়াংশ বিদেশ হইতে আসে। এই কাগজ নানা শ্রেণীর; তার মধ্যে প্যাকিং কাগজ আসিয়াছিল ৯৫ হাজার হন্দরের, মূল্য ছিল ১৪·৫৮ লক্ষ টাকা, খবর ছাপার কাগজ ১,২০ হাজার হন্দর, মূল্য প্রায় ১·০৩ লক্ষ টাকা; খবর ছাপার কাগজ ছাড়া অন্যান্য ধরণের কাগজ আসে ৬৮ হাজার হন্দরের, মূল্য প্রায় সাড়ে ১০ লক্ষ টাকা; মোট সকল প্রকার বিদেশী কাগজ আসিয়াছিল ৬৯ লক্ষ টাকার; সমগ্র ভারতে আসে ২·৪৯ কোটি টাকার।

ভারতবর্ষে যত কাগজ উৎপন্ন হয়, তার শতকরা ৮০% ভাগ বাঙলাদেশে উৎপন্ন হয়। কিন্তু দেখা যাইতেছে, সমগ্র ভারতের আমদানী কাগজের মূল্য প্রায় আড়াই কোটি টাকার, সেই জায়গায় ভারতে প্রস্তুত হয় শওয়া

কোটি টাকার মাল; সুতরাং এখনো শওয়া কোটি টাকার মাল ভারতে প্রস্তুত করা যায়।

ভারতের কলগুলি অনেক পরিমাণে সাধারণ কাগজের প্রয়োজন পূরণ করিলেও সংবাদপত্রের কাগজের সরবরাহ করিতে পারে না। সংবাদপত্রের কাগজ তৈয়ারী হয় শীতমণ্ডলের একজাতের গাছের 'মণ্ড' হইতে। বাঙলার উত্তরে হিমালয় অঞ্চলে সে জাতের গাছ আছে; কিন্তু তাহা সমতলে আনিয়া তাহাকে পিশিয়া 'মণ্ড' (pulp) বানানো ও তাহা হইতে কাগজ প্রস্তুত করা ব্যয়সাধ্য হয়। কিন্তু এই কাগজ আপাতত বাদ দিলে ভারতের মধ্যে কাগজ প্রস্তুতের উপযুক্ত যেসব কাঁচামাল আছে, তাহা অফুরন্ত, বিচিত্র, শস্তা ও মজবুত বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়াছেন। সাবুই ও অন্যান্য ঘাস বাঙলার আসে পাশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ ও বিহার-উড়িষ্যায় বৎসরে পঞ্চাশ হাজার টন সাবুই ঘাস কাগজের জন্য পাওয়া যায়। বাঁশও প্রচুর পাওয়া যায়; হিমালয়ে ও বিশেষভাবে ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে অপর্যাপ্ত আছে; ভারতের অন্যত্র যে বাঁশঝাড় আছে, তাহা হইতে প্রায় ২০ লক্ষ টন বাঁশ পাওয়া যায়; এই বাঁশ হইতে প্রায় ১,২৬,৫০০ টন কাগজ তৈয়ারী হয়; এই কাগজ বর্তমানে বাঙলার প্রয়োজন পূর্ণ করিবে। বাঁশ হইতে টিটাগড় মিলে অতি উৎকৃষ্ট কাগজ হইতেছে; বাঁশের সুবিধা এই যে, উহা পর্যাপ্তভাবে পাওয়া যায় এবং তিন বৎসরের মধ্যে নূতন বাঁশ ব্যবহারোপযোগী হয়; সেই জায়গায় কানাডার গাছগুলি pulpএর উপযুক্ত হইতে ষাট বৎসর লাগে; সে সব দেশের বড় বড় গাছগুলি যেভাবে নিঃশেষিত হইতেছে, তাহাতে মণ্ডের সমস্যা অচিরে না হইলেও একদিন হইবে; কিন্তু বাঁশের চাষে সে সম্ভাবনা কম, কারণ বাঁশ অল্প সময়ের মধ্যে মণ্ডের উপযুক্ত হয়।

সাবুই ও বাঁশ ছাড়া খাগড়া, নল, বাটা প্রভৃতি শর জাতীয় উদ্ভিদ্ এদেশে পাওয়া যায়; ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে এই সব শর অফুরন্তভাবে পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং বাঙলার পক্ষে কাগজের কলের উন্নতি করা খুবই সম্ভব। ভারতের কাগজের কলের জন্য যে, কেবল ভারতীয় উপাদান ব্যবহৃত হয়, তাহা নহে, বিদেশ হইতে 'মণ্ড' (pulp) আমদানী করিতে হয়।

১৯২২-২৩ হইতে ১৯৩১-৩২ পর্যন্ত দশ বৎসরে গড়ে ৩৩ লক্ষ ২৬ হাজার টাকার করিয়া মণ্ড আমদানী হইয়াছিল। এই আমদানীর চৌদ্দ আনি বাঙলা-দেশে আসে।

ভারতবর্ষে প্রায় ৩।৪ কোটি টাকার কাগজ প্রতি বৎসরে ব্যবহৃত হয়। ইহার মধ্যে ১৯৩১ সালে ভারতে উৎপন্ন হয় ৩৯ লক্ষ টাকার মাল, ও বিদেশ হইতে আসে ২,৮৬ লক্ষ টাকার মাল। ১৯২৯-৩০ সালে ৩ কোটি ৭২ লক্ষ টাকার কাগজ ভারতে আসে, ইহার মধ্যে বাঙলাদেশে আসে ১,২১ লক্ষ টাকার।

বাঙলাদেশে ও ভারতের অন্যত্র যে সব কাগজের কল আছে, তাহাদের সম্বন্ধে তথ্য সংলগ্ন পত্রে প্রদত্ত হইয়াছে।

বৃটিশ ভারতে কাগজের কল

	কলের সংখ্যা	মূলধন লক্ষ টাকা	শ্রমিক	কাগজ টন্	মূল্য লক্ষ টাকা
১৯১২	৮	৫০	৪,১৪৷	২৬,৯০০	৭৭
১৯২১	৭	৫৩	৫,৫৪৬	২৮,২৭৫	২২৮
১৯৩১	১০	১৬৪	৭,০৫৮	৩৯,৭০৬	১৭৪
		বাঙলার হিসাব			
১৯২১	৩	৪০	৪,২১৭	২৩,৬০৩	১৯৭
১৯৩১	৪	৭৭	৪,৮১৭	৩৪,৪৫১	১৫১

১৯৩০ সালে পৃথিবীর নানাদেশে ২১,৬০০,০০০ মেটরিক টন্ কাগজ ও পেষ্ট বোর্ড প্রস্তুত হয়। ইহার মধ্যে উত্তর আমেরিকার হয় ১১,৯৫০,০০০ টন্, য়ুরোপে হয় ৮,২৮০,০০০ টন্। দেশ-হিসাবে কানাডা ২,৬৫৫,০০০ টন্, জার্মেনী ২,৩৭৬,০০০ টন, বৃটেন ১,৬৩০,০০০ টন্ উৎপন্ন করে। জাপান ৮০৩,০০০ টন্ করে, ভারত সেই জায়গায় করে ৪০,০০০ টন্ মাত্র। (Statistical Year Book, 1931-32, p. 127) ১৬—১৭ মিলিয়ন টন্ কাগজের মণ্ড (Pulp) প্রতি বৎসর পৃথিবীতে প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষ এত সামান্য প্রস্তুত করে যে, তাহার উল্লেখ পর্যন্ত ষ্ট্যাটিষ্টিকের বইতে থাকে না।

বাংলাদেশে ও ভারতে আমদানী কাগজ ও মণ্ডাদি

	বঙ্গদেশে		ভারতে আমদানী	
	কাগজ	মণ্ড	কাগজ	মণ্ড
	হাজার টাকা	টন্	হাজার টাকা	টন্
১৯৩৫-৩৬	...	...	২৯,৯০০	২,০৪৮
১৯৩৪-৩৫	...	...	২৭,২৮২	২,৬২৮
১৯৩৩-৩৪	...	...	২৬,৩১৯	২,৭১০
১৯৩২-৩৩	৮,০৮৩	১,৯৭৬	২৮,৬০০	২,২০৯
১৯৩১-৩২	৬,৯৬৯	৩,২৭১	২৫,০২৪	৩,৫৯৯
১৯৩০-৩১	৮,৭১৯	৪,০০০	২৮,৬৭৪	৪,২০৭
১৯২৯-৩০	১২,১১৯	৪,২৮৬	৩৭,২৩১	৪,৪৯৫
১৯২৮-২৯	১০,৫৪০	৩,৯৫৪	৩২,৯৯৫	৪,১৫১
১৯২৭-২৮	৮,৯৯৯	৩,৯০০	৩০,০৬২	৪,০২৮
১৯২৬-২৭	৯,০৬১	৩,৩৫৯	৩১,৮২০	৩,৪৯৯
১৯২৫-২৬	৮,০৭৯	২,৫১৮	২৮,১·৫	২,৫৮৫
১৯২৪-২৫	৮,০০৩	২,১৮৬	৩০,৩৪৭	২,২০৯
১৯২৩-২৪	৭,৩৬৩	১,৯৮৯	২৭,১০৮	২,০৪৬
১৯২২-২৩	৬,৬৯৪	২,৩১০	২৭,৮৬৬	২,৪৪৫
১৯২১-২২	৬,৫৯২	৪,২৮২	২৩,৪১১	৪,৩৬৫
১৯১৯-২০	৭,০৪৩	...	৬,৩০১	...

দিয়াশলাই

সভ্যতার অগ্রসরের সঙ্গে সঙ্গে দিয়াশলাই-এর ব্যবহার সকল দেশেই বাড়িয়াছে। উহা যে সন্ধ্যাদীপ ও উনান জ্বালাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়, তা নয়; অপরিমিত সিগার, সিগারেট, পাইপ, বিড়ি ব্যবহারজনিত দিয়াশলাই-এর ব্যবহার অত্যন্ত বাড়িয়া চলিয়াছে।

বিগত যুদ্ধের পূর্বে সুইডেন ও জাপান প্রধানত ভারতে দিয়াশলাই পাঠাইত; সুইডেন ৩০ ভাগ, জাপান ৫০ ভাগ। ১৯২১-২২ সালে ২,০৩,৮০,০০০

টাকার দিয়াশলাই বিদেশ হইতে আসে। সেই বৎসর ভারত গবর্মেণ্ট ইহার উপর গ্রোসপ্রতি ১৸৹ হারে শুল্ক ধার্য করেন। ইহার ফলে গবর্মেণ্টের আয়ও বাড়িল, আর দেশী দিয়াশলাইয়ের কারখানা স্থাপিত হইতে লাগিল; মৃতকল্প কারখানাগুলি জাগিয়া উঠিল। সেই হইতে ভারতে বিদেশী দিয়াশলাইয়ের আমদানী কমিতেছে। ১৯২৯-৩০ সালে মাত্র ১০,৮৯,০০০ টাকার মাল আসিয়াছিল।

সুইডেন ও জাপানের দিয়াশলাই বিষয়ে কতকগুলি সুবিধা ছিল; প্রধানত সাইবীরিয়ায়, রুশিয়ায় দিয়াশলাই-এর বাক্স ও কাটি বানাইবার উপযুক্ত গাছ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সুইডেনের এক বিখ্যাত ফন্দীবাজ ব্যবসায়ী (Kreuger) এক কোম্পানী গঠন করিয়া পৃথিবীতে দিয়াশলাইয়ের একচেটিয়াত্ব করিবার সংকল্প করেন। ইহাদের অধীনে ভারতে কারখানা স্থাপিত হইল; WIM Co. (West India Match Company) দিয়াশলাই সুইডিশ কোম্পানীর মাল; বোম্বাই, কলিকাতার নিকটে আলমবাজার, ধুবড়ী, মাদ্রাজ, লাহোর প্রভৃতি স্থানে কারখানা স্থাপন করিয়াছে। ইহারা আসামে, আন্দামানে শত শত একর বনভূমি ক্রয় করিয়া শিমুল প্রভৃতি গাছের চাষ করিতেছে। আসামের কাঠ ব্যবহার করিবার জন্যই ধুবড়ীতে তাহারা কারখানা করিয়াছে। জাপানীরা সুইডিশদের মতো অতবড় কারখানা খুলিতে না পারিলেও তাহারা কলিকাতার নিকটবর্তী মেটিয়াবুরুজে কারখানা খুলিয়াছে; মানিকতলার 'ইসভী' দিয়াশলাইয়ের কারখানার প্রধান অংশীদার হইতেছে জাপানীরা। বাঙলার দেশী কারখানার কলকব্জা সবই প্রায় জাপান থেকে আনা।

বোম্বাইতে বড় বড় দশটি কারখানা আছে; ইহাতে ৫০ লক্ষ গ্রোসের উপর দিয়াশলাই হয়। বাঙলাদেশেও ২৫।৩০ লাখ গ্রোস উৎপন্ন হয়; কিন্তু ইহার মধ্যে বাঙালীর খাটি কারখানা খুব কম।

(দ্রষ্টব্য—ব্যবসা-বাণিজ্য, ১৩৪০ মাঘ সংখ্যা; ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ১৩৪০ ফাল্গুন, পৃঃ ৬২২-৬২৫)

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে আদর্শবাদী ব্যবসায়ীরা বাঙলায় দিয়াশলাইয়ের কারখানা স্থাপনের চেষ্টা করিয়া বহু লোকশান দিয়াছেন। বিদেশী

দিয়াশলাইয়ের উপর শুল্ক স্থাপিত হইলে লোকে মনে করিয়াছিল যে, এই শিল্প কুটীর শিল্পরূপে দেশে প্রসারলাভ করিবে।

বাঙলার শিল্প-কারখানা

বাঙলাদেশে তথা ভারতের সর্বত্র গত একশত বৎসরের মধ্যে মূলধনের সাহায্যে বহু শিল্প কারবারী-আকারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; এইসব শিল্প-প্রতিষ্ঠান বা ফ্যাক্টরীতে শ্রমিক তাহার শ্রমের বিনিময়ে বেতন বা মজুরী লইয়া কার্য করে; পুঁজিপতির লাভ-লোকসানের সহিত শ্রমিকের সম্বন্ধ নাই। গত একশত বৎসরের মধ্যে বহু নূতন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে; বিজ্ঞানের উন্নতি, মানুষের প্রয়োজনবোধ প্রভৃতি নানা কারণে বৃহৎ কারখানায় প্রচুর সামগ্রী শস্তায় প্রস্তুত করিবার প্রচেষ্টা দেখা দিয়াছে। সামগ্রী প্রস্তুত ছাড়াও বহু লোকের প্রয়োজন হয়, এমন শিল্প বা ব্যবসায় আছে, যেমন চলাচল বা যানবাহনাদির ব্যবস্থা। রেলওয়ে, জাহাজ, পোষ্ট, টেলিগ্রাম প্রভৃতির জন্য যে লোকের প্রয়োজন, তাহাকেও ইহার মধ্যে ধরা যায়। যাহাই হৌক, বাঙলা তথা ভারতে বহু রকমের শিল্প জাগিয়াছে। ভারতের কয়েকটি প্রদেশে বিশেষ কতকগুলি শিল্প উন্নতিলাভ করিয়াছে; প্রাকৃতিক কারণেই ইহা সম্ভব কিনা, তাহা গবেষণার বিষয়। প্রধান শিল্পকেন্দ্রগুলির প্রদেশসমূহে কি অবস্থা, তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি। বোম্বাইতে ১৯২১-২২ সালে ৮৭২টি; ১৯৩০-৩১ সালে ৯৫৯টি যৌথ কারবার ছিল; মাদ্রাজে যথাক্রমে ৫৭৯ ও ৮০০, যুক্তপ্রদেশে ২৪১ ও ২২৪। পঞ্জাবে ১১২ ও ২৮৫, বর্মায় ২২৫ ও ২৮৮। বিহার-উড়িষ্যায় ৬২ ও ৯৭, আসামে ১১৪ ও ১৬৬। বাঙলাদেশে যৌথ কারবারের সংখ্যা সব প্রদেশ হইতে অধিক; ১৯১২ সালে সংখ্যা ছিল ৮৪৭, ১৯২১-২২ সালে ২৩৯৪, ১৯৩০-৩১ সালে ৩৫৬২টি। বাঙলায় এই সংখ্যাধিক্যের হেতু কলিকাতা রাজধানী না থাকিলেও রাজধানীর সকল গৌরব এখনো এখানে বর্তায়; বাণিজ্য, শিল্প, ব্যবসায় সকলেরই কেন্দ্র কলিকাতা; সেইজন্য অধিকাংশ বড় বড় কোম্পানী কলিকাতাতে রেজেষ্টারী করা। যেমন চা-এর কোম্পানী; অধিকাংশ চা কোম্পানী ত' আসামে; অথচ ৪০০ চা কোম্পানী রেজিষ্টার্ড বাঙলায়, ৬০টি মাত্র আসামে।

বাঙালাদেশে সব থেকে বৃদ্ধি পাইয়াছে যৌথ ঋণদান সমিতি বা লোন-অফিস; ১৯২১-২২ সালে ২৮৫টি ছিল। ১৯৩০-৩১ সালে সেখানে হইয়াছিল ১০৬৯। ইন্‌সুরেন্স ৪৫ স্থানে ৫৩; নৌতারণ ১৮ স্থানে ১৬ অর্থাৎ দুটি কোম্পানী কমিয়াছে; রেলওয়ে ও ট্রাম কোম্পানী ২৭ স্থানে ২৫; অন্যান্য চলাফেরা চালাইবার কোম্পানী ৮৭ স্থানে ১০৭; ব্যবসায়, শিল্প কারবার ৯০৫ স্থানে ১২৫৬; চা কোম্পানী ৩৫৬ স্থানে ৪০০; অন্যান্য বাগিচা কোম্পানী ৩৩ স্থানে ৪৯; কয়লার খনি ২৬৩ হইতে ১৯৬; সোনার খনির কোম্পানী ২টি ছিল, এখন একটিও নাই। অন্যান্য খনি ৪০ হইতে ৩৭; কাপড়ের কল ৩২ হইতে ৪৬; পাটকল ৫৯ হইতে ৬৬; রেশম, পশম প্রভৃতি অন্যান্য মিল ৮ হইতে ৫; তুলা বীজ ছাড়ানো প্রেসিং কোম্পানী ৪ হইতে ৩; পাট প্রেস ১৭ স্থানে ২৫; ময়দার কল ১৪ হইতে ৭; জমিদারী বিল্ডিং প্রভৃতি কোম্পানী ৪৮ হইতে ৮৩; চিনির কারবার ২১ হইতে ১০; অন্যান্য ১৩০ হইতে ১৯৯।

পরিশিষ্ট

বাঙলার কারখানার সংখ্যা

গবর্মেণ্ট ও লোকাল ফাণ্ডের ফ্যাক্টরী

	১৯২৫	১৯৩২	কলিকাতা ২৪ পরগণা ও হাওড়া হুগলী* ১১+২৬+৭	শ্রমিক ১৯২৫	শ্রমিক ১৯৩২
ফ্যাক্টরী	৫৭	৬৫	—৪৪	৪১,৯২০	৩৩,৪৪৯
চা-বাগিচা	২২০	২৮৮		১৪,৩১৫	
কটন পিনিং ও প্রেস	১২	১৬		১,৯০৩	১,৬০৯
জুট প্রেস্	১০৩	৯৩		৩১,৭২৫	২৯,০১৭

* বাংলার কতগুলি কল কলিকাতা ও তাহার ৫০ মাইলের মধ্যে, তাহা দেখাইবার জন্য কলমটি দেওয়া হইল।

	১৯২৫	১৯৩২	১৯৩২	শ্রমিক ১৯২৫	১৯৩২
			কলিকাতা, ২৪ পরগণা ও হাওড়া		
কটন মিলস্	১৪	১৭	৪+৬৬+৩১	১৩,৩৭৭	১৯,১৪৯
হোসিয়ারী	৪	১৫	+২০ হুগলী	৪৩২	৬৬৪
পাট কল	৮৩	৯৪	১২৮টির মধ্যে	৩,৩৮,২৯৭	২,৫৪,৩১৪
রেশম কল	১	২	১২১টি এইখানে	১১২	২৭৭
				৩,৫২,২১৮	২,৭৪,৪০৪
ইঞ্জিনিয়ারিং—					
গাড়ী ও মোটর মেরামত	২৪	২২	১০+১২	২,৬১০	১,৭১৩
ইলেকট্রিক ইঞ্জিনীয়ারিং	৫	৮		৬৩৩	৬৭৪
,, উৎপাদন	৬	৮		১,৬১৪	২,২৮৬
সাধারণ ইঞ্জিনীয়ারিং	১২৩	১৪৪		১৮,৬১০	১৫,৪৯৭
কেরোসিন টিনিং প্যাকিং	৮	১১		৫,৩৮৭	৩,৩৬০
ধাতু ষ্ট্যাম্পিং	২	৩		৯৬৯	৭৮৪
রেলওয়ে কারখানা	৭	১৩		১৪,৩৩৯	১১,০৪১
জাহাজ তৈয়ারী	১৩	৯		১৬,০৮৩	৭,৯১৫
ষ্টীলট্রাঙ্কের তালা	০	০		——	——
ট্রামওয়ে কারখানা	২	২		১,১১৯	১,০৯৮
বিবিধ	২	৫		১৩০	৪৭৪
মোট	১৯২	২২৫		৬১,৪৯৪	৪৪,৮৪২
খনিজ ও ধাতব	৮	১১	১+১+৩	৬,৪৬১	৪,৮৮১

খাদ্যের কারখানা

				শ্রমিক	
	১৯২৫	১৯৩২	১৯৩২	১৯২৫	১৯৩২
			কলিকাতা ২৪ পরগণা হাওড়া		
রুটি, বিস্কুট	৪	৮	৩+৫	৪৯৭	৭১৪
মগুপ্রস্তুত	৩	২		৪১৫	৩১৮
ময়দার কল	৮	১১	৩+৪+৩	১,২৪৯	১,২৫৪
টিনে ও বোতলে পুরা খাদ্য	৩	৩	+৩+	৯৩	৪১
বরফ, সোডা	১৩	১২	৫+৩+৩	৮৭৩	৯৩৯
ধান কল	১৯১	৩৩০	+১২৯+	৮,৬৭৪	১২,৮৪৮
চিনির কল	১	১		১০০	৯০
তামাক	২	৩		৪২৪	৩৬০
বিবিধ	১	৩		৫০	৬৩৬
		৩৭৬	১৭১		

কেমিক্যাল রঙ

অস্থি ও সার	৭	৭	+৫+১	১,০৫৬	৮৬২
কেমিক্যাল	৮	৭	+৪	১,৮৯৭	২,৪০৯
গ্যাস	৪	৫	+২+২	৮৪৫	৭৬৮
লাক্ষা	১	৩	+৩+	৭২৫	৪৩৭
দিয়াশলাই	১১	১৪	+১৩	৩,১৮৬	৫,০৯২
তেলের কল	৬৪	৫৩	২১+১৩+৭	২,৭৬২	২,৫২৩
রঙের কারখানা	৬	৮	+৫+৩	১,১৭৯	১,১৯১
সাবান	৪	১০	১+৮	২১৬	৩৮৬
বিবিধ	৪	৪	.	২৪৩	১৯১
	১০৯	১১১			

	১৯২৫	১৯৩২	১৯৩২ কলিকাতা ২৪ পরগণা হাওড়া	শ্রমিক ১৯২৫	শ্রমিক ১৯৩২
কাগজের কল	৩	৩	×	৩,৭৪৪	৪,২২২
কাগজের কাই	১	১	×	৩৮৯	৫৮২
মুদ্রাযন্ত্র, বই বাঁধানো	৫৬	৮৬	৭৪+৫+১	৫,২৯৪	৫,৮৫০
বিবিধ	×	৪	৩+১	×	৩২৯
ইট ও টালি	৩	২		৪০৭	১৭৩
ছুতারের কারখানা	৯	১৫	২+৮+৪	১,৩৮৩	৮১১
সিমেণ্ট, চুণ, পটারী	৬	৯	+৩+৩	১,৪২৮	১,১২০
কাঁচ	৩	৫	×	৪২৬	১,১৯১
কাটার কারখানা	৩	৫	+৪	১৪০	২০৯
পাথর কাটা	৫	৫	+৪	৪২৫	২৫৬
বিবিধ	৩	৩		৫৭	৮৫
				৪,২৬৬	৩,৮৪৫
চামড়া ও জুতার কারখানা	১	২	+২	১০০	১১৯
ট্যানারী	৮	৪	+৪	৭২১	৩২২
ক্যানভাস	২	১	+১	২০+৩৫	৩০
গ্রামোফোন বোর্ড	১	১	+১	৪৩৯	৬৯০
ধোপী কারখানা	২	৪	+৪	৬৭	৩২৬
বোতাম ও চিরুণী	১	২	+২	৭০	৭১
দড়ির কারখানা	৪	৫		১,০৮৩	৯১১
রবারের জিনিষ	১	১	+১	৬	৪০৬
বিবিধ	৭	১৪	৩+৮+১	৫৮৮	১,৩২৩
কারখানা	১,১৪৮	১,৪৮৭		৫,৫১,৩৪২	৪,৫৪,০০৭

কোন্ প্রদেশে কত শ্রমিক দৈনিক খাটে

	১৯২১	১৯২৫	১৯৩২	১৯৩৫
বঙ্গদেশ	৫,১৬,১৪৩	৫,৫১,৩৪২	৪,৫৪,০০৭	৫,১৩,১৯৯
বোম্বাই	৩,৭১,৭৩১		৩,৭০,৭০৪	৪,২০,৭১৬
মাদ্রাজ	১,২৩,৬৭১		১,৪২,৫৪৯	১,৬২,৭৪৫
বর্মা	৯০,৯৫৩		৯৮,৭০১	৯০,৩২৭
সংযুক্তপ্রদেশ	৯২,১২২		৯২,১৬১	১,৩৯,২৬০
বিহার-উড়িষ্যা	৮৩,৮৯১		৬৬,৩৬৫	৮৬,৩২৭
মধ্যপ্রদেশ	৬৮,৩৯৫		৬৮,৮৫৬	৫৯,৮৯৬
পঞ্জাব	৪৬,৮৭৫		৪৯,৫৪৯	৫৮,১৯১
আসাম	৬,২৯১		৪৫,৪২০	৪৭,৫৫৭
উঃপঃ সীমান্ত প্রদেশ	৮৭৯		১,২৫১	১,২৩১
বেলুচিস্থান	৩,০৩১		১,১৮১	২,২৭৮
আজমীড়	১৪,৫০৫		১৪,৯০২	২৩,৪৮১
দিল্লী	৮,৫৪৫		৯,৮১১	১৩,২২৯
কুর্গ বাঙ্গলোর	১,৫০২		২,৬২৫	২,৫৮৪
	১৪,২৮,৫৩৬		১৫,২৮,৩০২	১৬,১০,৯২১

বাংলায় ফ্যাক্টরীর সংখ্যা (চা-বাগিচা সমেত)

		ফ্যাক্টরী-সংখ্যা	শ্রমিক-সংখ্যা
১৯৩২	...	১,৪৮৭	৪,৫৪,০০৭
১৯৩১	...	১,৪৭১	৪,৮০,৪৩৯
১৯৩০	...	১,৪৪৪	৫,৬৩,৮৭৭
১৯২৯	...	১,৩৯৩	৫,৮৯,৮৬০
১৯২৮	...	১,৩৪৮	৫,৭১,০৭৯
১৯২৭	...	১,২৯৭	৬,৫৯,৭৫৯
১৯২৬	...	১,২৩৪	৫,৫০,৯২৩

		ফ্যাক্টরী-সংখ্যা	শ্রমিক-সংখ্যা
১৯২৫	...	১,১৪৮	৫,৫১,৩৪২
১৯২৪	...	১,০৬৫	৫,৪৩,১২৩
১৯২৩	...	১,০০৮	৫,২৩,৬৩৫
১৯২২	...	৯৭৫	৫,১৭,০৮০

		ভারতের মধ্যে বাঙলার জয়েণ্ট ষ্টক সোসাইটি	ভারতের বাহিরে রেজিষ্টার্ড জয়েণ্ট ষ্টক সোসাইটি
১৯৩০-৩১	...	৩৫৬২	৪৭৮
১৯২৯-৩০	...	৩,৪৩২	৪৭২
১৯২৮-২৯	...	৩,১৩৩	৪৫৩
১৯২৭-২৮	...	২,৮৬৮	৪৩৪
১৯২৬-২৭	...	২,৬৫১	৪৪২
১৯২৫-২৬	...	২,৪৫১	৪০৯
১৯২৪-২৫	...	২,৩২৭	৩৯৩
১৯২৩-২৪	...	২,৩১৮	৩৭৬
১৯২২-২৩	...	২,৩৩৪	৩৫৭
১৯২১-২২	...	২,৩৯৪	৩৫২
১৯২০-২১	...	২,১৪৮	৩৪১
১৯১৯-২০	...	১,৭৪২	৩২২
১৯১৮-১৯	...	১,২৬৪	৩৪৭
যুদ্ধপর্ব			
১৯১৭-১৮	...	১,১৭৬	৩৩১
১৯১৬-১৭	...	১,০৭৫	৩৩৩
১৯১৫-১৬	...	১,০২৩	৩২০
১৯১৪-১৫	...	৯৭০	১৭৭
১৯১৩-১৪	...	৯৭৩	২০৩
১৯১২-১৩	...	৮৪৭	৪৭

পঞ্চত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

বাংলার কুটীর শিল্প

একশত বৎসর পূর্বে বাংলা তথা ভারতে একটিও কল বা mill ছিল না—একথা বলা যাইতে পারে; তৎপূর্বে বাংলার বস্ত্র, খাদ্য, যান-বাহন ঔষধ-পথ্য, বাসন-পত্র, অস্ত্র-শস্ত্র প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বাঙালীর কুটীরে কুটীরে প্রস্তুত হইত। একথা সত্য যে, তখন লোকের পয়সা ছিল কম, প্রয়োজন ছিল অল্প এবং হয়ত শারীরিক আরাম বা স্বাচ্ছন্দ্য আজকার থেকে অনেক কম মিলিত। বর্তমানে বাঙলার কুটীরশিল্প প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে; শিল্প ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম ধ্বংস পাইয়াছে ও তাহার স্থানে যন্ত্রশিল্প কারবারী-আকারে গড়িয়া উঠিতেছে এবং তাহার সঙ্গে নূতন নগর ও শহর সৃষ্টি হইতেছে। বর্তমান বাঙলার শিল্পকেন্দ্রগুলি একশত বৎসর পূর্বের মানচিত্রে প্রায় অজ্ঞাত ছিল।

বর্তমানে বাঙলাদেশ নিজের কাপড় নিজে বুনিতে পারে না। গুটি কুড়ি কাপড়ের মিলে বাঙালীর প্রয়োজনীয় কাপড় সরবরাহ হয় না,—সেকথা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। বোম্বাই প্রদেশের মিলের, বিলাতী ও জাপানী মিলের কাপড় না আসিলে বাঙালীর প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ হয় না। দেশী তাঁতিরা এখনো কাপড় বোনে। শতাব্দী পূর্বে বাঙালী শুধু কাপড় বুনিত না, সুতাও কাটিত। এখন মিলে দ্রুত কলের সাহায্যে প্রচুর পরিমাণে কাপড় বোনা হইতেছে, তাহার লাভও বিস্তর; সেই লাভ কয়েকজন অংশীদার কিছু ও মোটা অংশ ম্যানেজিং এজেণ্টগণ পাইতেছেন; কোনো কোনো ক্ষেত্রে মিলগুলি ধনী মাড়োয়ারীর নিজস্ব সম্পত্তি, তাহার লাভের ষোল আনাই তাঁহার নিজস্ব। পূর্বে এই লাভের টাকাটা একজন বা একদলের হাতে গিয়া পড়িত না, তাহা তাঁতি, সুতাকাটনী ও তুলার চাষীদের মধ্যে ভাগ হইয়া যাইত, অবশ্য মহাজনও অনেকখানি পাইত। মোট কথা, শিল্প-জগতে নানা কর্মীর মধ্যে লভ্যাংশ বণ্টিত হইত ও এইভাবে সমাজে আর্থিক সমতা কিয়ৎ পরিমাণে রক্ষিত হইত।

বাঙালাদেশ কেবল যে নিজ প্রয়োজনীয় বস্ত্র উৎপন্ন করিত তাহা নহে, দামী কাপড় বিদেশে রপ্তানী করিত। ঢাকা ছিল একসময়ে বাঙলার রাজধানী; তখন হইতে এ জায়গা সূক্ষ্ম বস্ত্রশিল্পের একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে; পর্তুগীজ দিনেমার, ফরাসী, ইংরেজ বণিকগণ এইসব বস্ত্র য়ুরোপে লইয়া যাইতেন; সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসীরা ছিল বাঙলার মস্‌লিনের বড় রকম গ্রাহক। চতুর্দশ লুই (১৬৪৩-১৭১৩)-এর সভা ছিল বিক্রমাদিত্যের সভার ন্যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতেও এ ব্যবসায় ভালই চলে; কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের পর দ্রুত এই ব্যবসায় হ্রাস পাইতে থাকে। ১৭৮৭ সালে ঢাকার মস্‌লিন ইংলণ্ডে তিন লক্ষ পাউণ্ডের আমদানী হয়।

এ দেশ বিলাস সামগ্রীর জন্য বিদেশের মুখাপেক্ষী হইত না। ১৮১৭ সনে ডাঃ রবার্টসন তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছিলেন "অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও বিলাস সামগ্রীর জন্য ভারতবর্ষ যতটা স্বাবলম্বী, পৃথিবীর অন্য কোন দেশই ততটা স্বাবলম্বী নহে। ভারতবর্ষ হইতে পৃথিবীর সমস্ত দেশে কৃষিজাত ও শিল্প-জাত দ্রব্যাদির রপ্তানী হইত এবং তাহার বিনিময়ে প্রচুর পরিমাণে মূল্যবান্ ধাতু ভারতে প্রেরিত হইত। নদী যেমন সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হয়, সমগ্র পৃথিবীর মূল্যবান্ ধাতু তদ্রূপ ভারতে প্রেরিত ও তথায় সঞ্চিত হইত—তথা হইতে আর প্রত্যাবর্তন করিত না।"

লেকি ইংলণ্ডের ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে,—ইংলণ্ডের বাজারে বৃটিশ কারখানায় তৈয়ারী রেশমী, পশমী ও সুতী বস্ত্র ভারত হইতে আমদানী বস্ত্রের সহিত প্রতিযোগিতায় সমর্থ না হওয়ায় ১৭০০ ও ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে দুই এক প্রকার ভারতীয় বস্ত্র ব্যতিরেকে অন্য সমস্ত ভারতজাত বস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া পার্লামেণ্টে আইন রচিত হয়। ঐতিহাসিক উইলসন ১৮১৩ সনে লিখিয়াছেন যে,—"ভারতীয় বস্ত্রের বিক্রয় বন্ধ করার জন্য ইংলণ্ডে শতকরা ৭০ হইতে ৮০ টাকা হারে আমদানী শুল্ক প্রবর্তিত হইয়াছিল। ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পকে ধ্বংস করিয়া ম্যাঞ্চেষ্ট্যার ও পেইলির বস্ত্র-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল। তদুপরি ভারতের বাজারে বিনা-শুল্কে ইংলণ্ডজাত দ্রব্যাদি প্রেরণ করা হইতেছিল। British goods were forced upon her without paying any duty and the foreign manufacturer

employed the arm of political injustice to keep down and ultimately strangle competitor with whom he could not have contended on equal terms অর্থাৎ প্রকাশ্য প্রতিযোগিতায় ভারতীয় পণ্যকে হঠাইয়া দেওয়া বিদেশীয় ব্যবসায়ীর পক্ষে সম্ভব হইত না; রাজনীতিক ক্ষমতার অবৈধ সুযোগ গ্রহণ করত তাহারা ভারতীয় শিল্প ধ্বংস করিয়াছিল।"

১৮১২ হইতে ১৮২৫ সন পর্যন্ত ইংলণ্ডে ভারতীয় বস্ত্রাদির উপর শতকরা ৩৭৲ হইতে ৭৫৲ হারে শুল্ক আদায় করা হইত। তৎপরে বিবিধ প্রকার বস্ত্রের উপর শতকরা ১০৲ হইতে ৩০৲ হারে শুল্ক আদায় করা হইত। কিন্তু ভারতের বাজারে ইংলণ্ড-জাত সমস্ত শিল্পই বিনাশুল্কে প্রবেশ লাভ করিত। অত্যধিক শুল্ক স্থাপনের ফলে বিদেশে ভারতীয় বস্ত্রের বিক্রয় একদিকে বন্ধ হইয়া যায়, অন্যদিকে স্বদেশে বিলাতী বস্ত্র বিনাশুল্কে প্রবেশ লাভ করায় স্বদেশীয় বস্ত্রের বিক্রয় ক্রমশঃ হ্রাস পায়। ভারতীয় বস্ত্র-শিল্প ইহার ফলে কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, নিম্ন তালিকায় তাহা দেখা যাইবে—

ভারতে বস্ত্র আমদানী ও ভারত হইতে বস্ত্র রপ্তানী

বৎসর	ভারত হইতে রপ্তানী সিক্কা টাকা	ভারতে আমদানী সিক্কা টাকা
১৮১৩-১৪	৫২,৯১,৪৫৮	৯২,০৭০
১৮১৪-১৫	৮৪,৯০,৭৬০	৪৫,০০০
১৮১৫-১৬	১,৩১,৫১,৪২৭	২,৬৩,৮০০
১৮৩০-৩১	৮,৫৭,২৮০	৯১,২৪,৮৬৭
১৮৩১-৩২	৮,৪৯,৮৮৭	৮৮,৪৯,৫৬৪
১৮৩২-৩৩	৮,২২,৮৯১	৬৬,৫২,৫১৪

ভারতে বিনাশুল্কে বিলাতী বস্ত্র আমদানী হওয়ায় ভারতীয় বস্ত্র-শিল্প কি ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, ১৮৩৪ সনে স্যার চার্লস ট্রেভেলিয়ান তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—বাঙালা দেশজাত বস্ত্রের বিক্রয়ে বিদেশ হইতে প্রায় এক কোটি টাকা ও স্বদেশে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা—একুনে

এক কোটি আশী লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে। এক্ষণে সামান্য পরিমাণে যে বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হয়, তাহা বিলাতী সুতায় তৈয়ারী।" বাঙলার দরিদ্র তন্তুবায়গণের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিয়া স্যার চার্লস লিখিয়াছিলেন,—"বার্ষিক এই ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা যাহারা পাইত, তাহারা এক্ষণে কি করিবে? যে সমস্ত শিল্পে ভারতবাসী উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, সেই সমস্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠায় আমরা তাহাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিলে তাহাদের একটা উপায় হইতে পারে।" কিন্তু বৃটিশ বণিক্‌গণ হতভাগ্য ভারতবাসীকে সে স্বাধীনতা প্রদান করেন নাই। হিতবাদী, ২৬ পৌষ, ১৩৪১

বাংলার কুটীর-শিল্প ধ্বংসের প্রধানতম কারণগুলি আমরা বিশ্লেষণ করিয়া নিম্নে দিতেছি :—

(১) ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত বাংলার মস্‌লিন ও রেশমের চাহিদা ফ্রান্সে বেশী ছিল। বিপ্লবের পর এই চাহিদা হ্রাস পাইল। ইংলণ্ডেও ইহার খরিদ্দার ছিল; তবে সেখানে নিতান্ত কম।

(২) এই সময়ে ইংলণ্ডে অর্থনীতি বিজ্ঞানের সবিশেষ আলোচনা সুরু হয়। ইংলণ্ড তখন সংরক্ষণনীতির দিকে ঝুঁকিতেছে। বাংলার কাপড় ছিটের উপর মোটা শুল্ক চাপাইয়া দেওয়ার প্রচেষ্টার ফলে আমদানী ধীরে ধীরে রদ হয়। এই কাপড় পাঠানোতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বার্থ ছিল; কারণ, তাহারা এই তৈয়ারী মাল বিক্রয় করিয়া লাভ করিত। ইহা দ্বারা ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের ক্ষতি হইতেছিল।

(৩) সর্বাপেক্ষা বড় কারণ হইতেছে ইংলণ্ডের যন্ত্রশিল্পের আবিষ্কার। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ হইতে ইংলণ্ডে ষ্টীম এঞ্জিন, কলের তাঁত, কলের চরকা প্রভৃতি অনেক রকম যন্ত্রের আবিষ্কার হওয়ায় ইংলণ্ডের ও তৎসঙ্গে বাংলার কুটীর-শিল্প ধ্বংস হইল। ইংলণ্ড কুটীর-শিল্প ও কৃষি ত্যাগ করিয়া কলীয় শিল্প গ্রহণ করিল; বাংলাদেশে শিল্প ধ্বংস হইলে বাঙালী শিল্পীরা কৃষির আশ্রয় গ্রহণ করিল। সেই হইতে বাংলা কৃষিপ্রধান দেশ।

(৪) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলাদেশ জয় করিলে বাংলা হইতে কোটি কোটি টাকা ইংলণ্ডে যায়; সেই টাকা ইংলণ্ডের শিল্পকে পুষ্ট করিল।

(৫) ষ্টীম চালিত জাহাজের প্রবর্ত্তন হইলে পালের প্রয়োজন থাকিল না ; বাংলাদেশ হইতে বহুকাল এই পালের কাপড় সরবরাহ হইত ; উহা বন্ধ হইল।

(৬) ইংরেজ বাণিজ্য-সঙ্ঘও বিধিবদ্ধভাবে কাজ করিত।*

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলায় 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলন ব্যপদেশে স্বদেশী আন্দোলন সুরু হয়। তখন হইতে বাঙালীর দৃষ্টি গেল দেশী কাপড়চোপড়ের প্রতি ; অবশ্য বাংলার ধনীরা বাঙালী-তাঁতির সূক্ষ্ম কাপড় পরিধান করিয়া, এবং দরিদ্রেরা বাঙালী-জোলা ও তাঁতির মোটা কাপড় কিয়ৎপরিমাণে ব্যবহার করিয়া তাহাদের কোন রকমে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। প্রাচীনকালে বাংলার কাটুনিরা সুতা কাটিয়া দিত ; ক্রমশঃ তাহা লোপ পায় ও তাহার স্থানে বিলাতী সুতা এই সব তাঁতে ব্যবহৃত হইতে থাকে।

সূক্ষ্ম বস্ত্র ও খুব মোটা কাপড় এবং গামছার কথা ছাড়িয়া দিলে দেখা যায়, সাধারণ লোকে বিলাতী ছাড়া ব্যবহার করিত না ; ফলে, গ্রামে গ্রামে তাঁতিরা নিজ নিজ ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া নানা কর্মের সন্ধানে গ্রাম ত্যাগ করে, অথবা কৃষিকার্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় ; বহু লোক অর্থাভাবে শীর্ণ অবস্থায় ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে না পারিয়া দেহত্যাগ করিল। এখন অধিকাংশ গ্রামে হিন্দু তাঁতিদের ঘরে জনসংখ্যা এত কম যে, তাহাদের কুটীর-শিল্পের কাজে ঘরে সহায়তা পায় না ; একাই নালিকাটা, রঙা করা প্রভৃতি কাজ করে। এত অসুবিধা সত্ত্বেও বাঙলার দরিদ্র লোকে গ্রামের জোলা ও তাঁতির মোটা কাপড় গামছা, দোসুতী চাদর ব্যবহার করিয়া তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, কিন্তু এভাবে আর বেশী দিন চলিবে না।

স্বদেশী আন্দোলন সুরু হইবার পর হইতে বাঙালী ও অবাঙালী ধনিকরা বাংলাদেশে কল করিবার দিকে দৃষ্টি দিলেন ; তাঁতিদের উন্নতির দিকে তেমন দৃষ্টি যায় নাই, তাঁহারা সরকারী ষ্ট্যাটিষ্টিকের বইয়ের তালিকায় দেখিতেন, এত কোটি গজ কাপড় বিদেশ হইতে পূর্বে আসিত, এখন এত কোটি গজ এদেশে তৈয়ারী হয়! বয়কটের কৃতকার্যতায় তাঁহারা খুশী হইতেন। কিন্তু এই কাপড়ের মূল্যের কতখানি তাঁতিদের হাতে গ্রামে পৌছায় সে-বিষয়ে দৃষ্টি বহুকাল পড়ে নাই। এতৎ সত্ত্বেও দেখা যায়, স্বদেশী আন্দোলনের

* M. P. Gandhi, *Competition with Foreign Cloth.*

পর হইতে বাংলার তাঁতিরা কিয়ৎ পরিমাণে সঞ্জীবিত হইয়াছিল। প্রত্যেক জেলায় তাঁতিদের উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

বাঙলার প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই দুইচারিখানি করিয়া তাঁত ছিল। এখনো অনেক গ্রামে তাঁতি ও জোলা আছে। শান্তিপুর, চন্দ্রনগর, চৌমোহানি, নোয়াখালী, টাঙ্গাইল, সোনামুখী, বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া), কুষ্টিয়া প্রভৃতি স্থান এখনো নানারূপ ধুতি, সাড়ী, ছিট, চাদরের জন্য বিখ্যাত। গ্রামে গ্রামে যেসব কাপড় চাদর বোনা হয়, তাহা কয়েকটি প্রসিদ্ধ হাটে সপ্তাহে সপ্তাহে বিক্রয়ের জন্য আনীত হয়। পশ্চিম বঙ্গে হাওড়ার হাট বিখ্যাত।

বাংলার বস্ত্রশিল্পের উন্নতির জন্য প্রথম চেষ্টা করেন মিঃ ই. বি. হ্যাভেল; ইনিই ভারতের মৃত চিত্রকলাকে পুনর্জীবিত করেন। ১৯০১ সালে তিনি এই বিষয়ে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাহারই তিন বৎসর পরে স্বদেশী আন্দোলন বাংলায় উপস্থিত হয়। হ্যাভেল সাহেব বলেন যে, সেই সময়ে বাঙলাদেশে (বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা) প্রায় চারি লক্ষ তাঁতি তাঁত চালাইয়া কোনো প্রকারে জীবিকা অর্জন করিতেছিল; তাহাদের তাঁত অতি পুরাতন ধরণের, তথাচ সেই তাঁতের সাহায্যে তাহারা বিলাতী কলওয়ালাদের ও বোম্বাই কলওয়ালাদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিয়া ছিল। অনেকের অভিযোগ যে, এদেশের নিরক্ষর লোকে বৈজ্ঞানিক কোনো তত্ত্ব বা নূতন যন্ত্র সহজে গ্রহণ করে না। এ অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য নহে; কারণ শ্রীরামপুরের যে তাঁত চলে, তাহা গত শতাব্দীতে এক সাহেব প্রবর্তন করেন। এখন শ্রীরামপুরী-তাঁত নানাস্থানে ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু ইহার পরেও তাঁতের খুব উন্নতি হইয়াছে এবং তাহার প্রচারের চেষ্টা হইলে দেশের তাঁতিদের যে আর্থিক দুর্গতি দূর করিতে পারা যায়, সে-বিষয়ে সন্দেহের কারণ নাই। নক্সা পাড় বুনিবার জ্যাকার্ড মেসিন্ শান্তিপুর ও ঢাকার কারিগররা ব্যবহার করিতেছে।

বাংলার সাধারণ তাঁতি যে কাপড় বোনে তাহা মিলের কাপড়ের চেয়ে চড়া দামে বিক্রয় হয়। ইহার অনেক কারণ। প্রধান কারণ অধিকাংশ তাঁতই অত্যন্ত সেকেলে। তারপর সূতা গুটানো, নলিকাটা, টানা করিতে,

কাশিমবাজার হইতে যায় ১৪ লক্ষ টাকার রেশম। ১৭৭৬ অব্দে বাঙলার রেশমের প্রতিদ্বন্দ্বী হয় ইতালি ও চীন। আলিবর্দী খাঁর রাজত্বকালে মুর্শিদাবাদের শুল্ককেন্দ্রে ৮৭½ লক্ষ টাকার রেশম বিক্রয় হয়। এ ছাড়া কোম্পানীর রেশম বিনাশুল্কে গিয়াছিল।

১৭৭৯ অব্দে কর্ণেল রেনেল লিখিয়াছিলেন যে, ইউরোপে কাশিমবাজারের রেশম প্রায় বৎসরে তিন হইতে চারি লক্ষ পাউণ্ড ক্রয় করে।

১৮০২ অব্দে লর্ড ভ্যালেন্‌টিয়া বাংলার রেশম ফ্যাক্টরীর বিস্তৃত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কাশিমবাজার ছিল প্রধান কেন্দ্র; তাছাড়া মালদহ, বৌলিয়া, কুমারখালি, রাধানগর ও রঙ্গপুরেও রেশমের কুঠী ছিল। কাশিমবাজারের ফ্যাক্টরীতে প্রায় তিন হাজার লোক খাটিত। তিনি সর্বত্র তুঁতগাছের চাষ ও গুটির চাষ করিতে লোকদিগকে দেখেন। লোকরা প্রায় সারা বৎসরই কাজ পাইয়া থাকে। গ্রামের মেয়েরা ও শিশুরা গুটিপোকা চাষ করে; ইহা অস্বাস্থ্যকর কার্য নহে; কারণ লর্ড ভ্যালেন্‌টিয়া বিশেষভাবে বলিয়াছেন যে, অধিকাংশ লোকই বেশ সুস্থ। অনেক জায়গাতেই ইতালীর উন্নত পদ্ধতি লোকে অনুসরণ করিত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে, ভারতীয় রেশমী বস্ত্রের চাহিদা ছিল; অর্থাৎ এদেশের একদল লোক রেশমের গুটির ও তুঁতের চাষ করিত এবং সূতা কাটিত; আর তাঁতিরা এইসব সূতা হইতে বস্ত্র বুনিত। রেশমের বস্ত্রে চাহিদা ছিল বলিয়া বহু সহস্র তাঁতি এইভাবে জীবিকা উপার্জন করিত; ফ্যাক্টরীতেও তাঁতিরা কাজ পাইত। কিন্তু গত শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলা হইতে রেশমী বস্ত্রের চাহিদা হ্রাস ও ক্রমে লোপ পাইল; কারণ ইংলণ্ডে সূক্ষ্মবস্ত্র প্রস্তুত করিবার মত ভাল তাঁত নির্মিত হইলে সে-দেশে রেশমী বস্ত্রের চাহিদা থাকিল না, চাহিদা হইল রেশমের। ফলে রেশমী বস্ত্র প্রস্তুতকারী তাঁতিদের ব্যবসায় নষ্ট হইল। ইংলণ্ডের চাহিদা পূরণের জন্য অধিক লোক রেশম সূতা প্রস্তুতে ব্যাপৃত হইল। ১৮৩০-৩৫ অব্দ হইতে রেশম শিল্পের অবনতির সুরু হয়। ষাট বৎসর পূর্বে মুর্শিদাবাদে ১৬,৮০,০০০ টাকার রেশম উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহার মধ্যে রেশম উৎপাদকরা পাইয়াছিল ১০,৮০,০০০৲ টাকা, তাঁতি পাইয়াছিল ১,৮০,০০০ টাকা। তখনো ঐ জেলায় ১৩৭ খানি গ্রামে প্রায়

১৯০০ তাঁত চলিত। এই সব রেশমের খাদ্য তুঁতের পাতা; সেই তুঁতের চাষ হইত ৫০,০০০ বিঘায়; তাহাতেও বহু লোক নিযুক্ত থাকিত।

১৮৬৭-৬৮ অব্দে বাংলাদেশ হইতে দেড়কোটি টাকার রেশম রপ্তানী হয়, এ ছাড়া ছিল রেশমী কাপড়। সবশুদ্ধ প্রায় ২ কোটি টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছিল; আর ১৯৩১-৩২ সালে রপ্তানী দাঁড়াইয়াছে ৬১ হাজার টাকায় মাত্র! সেই বৎসর বাঙলায় বিদেশী রেশম ও রেশমজাত সামগ্রী আসিয়াছিল ২১ লক্ষ টাকার।

রেশম-চাষীর ও রেশম-শিল্পীর সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাইতেছে।*

	রেশম চাষী	কাটুনী ও তাঁতি
১৮৯১	৮৫,০০০	×
১৯০১	৭৮,৪৪৬	৫০,৩৯৩
১৯১১	৪২,৬৫৯	৪৮,৭৮৩
১৯২১	১৪,৪৯১	১৩,৫৮৭
১৯৩১	১.৫৬৬	৫,৬৪২

১৮৯১ অব্দে রেশম চাষীব সংখ্যা ছিল ৮৫ হাজার; এখন সেখানে দেড়-হাজার মাত্র! ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিব বিদেশ হইতে রেশম ও কৃত্রিম রেশম বা রেয়ন আমদানী, এবং সর্বোপরি লোকের রুচির পরিবর্তন এই অধোগতির জন্য দায়ী।

এ ছাড়াও বাংলার রেশমের অধোগতির কয়েকটি কারণ আছে; প্রথমতঃ একই রকমের সুতা প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা রেশমচাষীদের মধ্যে নাই; ফলে তাঁতিরা নানা 'কাউণ্টের' সুতা টানায় পোড়েনে ব্যবহার করে। দ্বিতীয়তঃ, বীরভূম প্রভৃতি রেশম-প্রধান স্থানের তাঁতিদের মধ্যে রঙের জ্ঞান খুবই কম। তৃতীয়তঃ, প্রাচীন ঠক্‌ঠকি তাঁত ছাড়া অন্য ধরণের তাঁত বাংলায় খুব কমই দেখা যায়। চতুর্থতঃ, তাঁতিরা সম্পূর্ণরূপে মহাজন বিশেষভাবে মাড়োয়ারী মহাজনদের হাতের মধ্যে। দাদন লইয়া তাহারা কাজ করে ও বাজার হইতে অনেক সস্তায় তাহারা মাল ছাড়িতে বাধ্য হয়। এছাড়া শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অভাব ত' আছেই।

* বাংলার রেশমশিল্পের অবনতি ও তাহার প্রতিকার—উদয়ন, ১৩৪১, মাঘ। পৃঃ ১২৯৮।

কিন্তু প্রাদেশিক সরকার এই সব বিষয়ে দৃষ্টি দিলে তাঁতিদের অবস্থা ও শিল্পের উন্নতি কতখানি হইতে পারে, তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বিহার গবর্মেণ্টে দেখাইয়াছেন। ১৯২২ সালে ভাগলপুর সিল্ক ইনষ্টিটিউট্ গঠিত হয়; সে বৎসরে ৮ লাখ টাকার মাল বিক্রয় হয়; ১৯২৯ সালে ২৫ লাখ। উড়িষ্যায় প্রায় ১০ হাজার লোক এণ্ডি গুটির চাষে নিযুক্ত আছে। বিহারের তাঁতিরা তসর গুটির সূতা ও তুলার সূতা মিশাইয়া বাফ্‌তার চাদর প্রস্তুত করে; বাংলার পাট-চাষীরাই ইহার বড় খরিদ্দার। বাফ্‌তার ও তসরের চাদর ১৮৯০ সালে এক লাখ টাকার বিক্রয় হইত, ১৯০০ সালে দুই লক্ষ টাকার, ১৯২২ সালে ৮ লক্ষ ও ১৯২৯ সালে ২৫ লক্ষ টাকার মাল বিক্রয় হয়। বাঁকুড়া ও বীরভূমে এই ধরণের চাদর সহজেই প্রস্তুত করানো যায়। বিহার সরকারের চেষ্টায় বিলাতী তাঁত দশ বৎসরে দুই হাজার প্রবর্তিত হইয়াছে। সুতরাং বাঙলা গবর্মেণ্টের ইচ্ছা ও চেষ্টা এবং দেশের লোকের শুভবুদ্ধি হইলে এই শিল্প পুনরায় প্রাণলাভ করিতে পারে এবং বহু লক্ষ লোকের জীবিকার ব্যবস্থা পুনরায় হইতে পারে। বাংলাদেশের জলবায়ু রেশম চাষের বিশেষ উপযোগী; এমন কি, জাপান প্রভৃতি অতিশীতের দেশের চেয়েও এদেশ রেশম চাষের পক্ষে অধিক অনুকূল।

বাংলাদেশে অনেক জাতের রেশম পাওয়া যায়; তসর গুটি, এণ্ডি গুটি, মুগা গুটি; ইহার মধ্যে এণ্ডি আসামেই প্রধান। এণ্ডির পলু বা পোকা ভেরাণ্ডার পাতা খায়; ভেরাণ্ডার গাছ সর্বত্রই হয়; সুতরাং বাংলাদেশে আরও বেশী করিয়া এণ্ডির চাষ করা অসাধ্য নহে। সুতরাং গ্রামে রেশম চাষের ব্যবস্থা করিতে পারিলে, জাপান যেমন রেশমের একটা বড় কেন্দ্র হইয়াছে, তেমনি এখানেও হওয়া সম্ভব। রেশমের সূতার দর ১৮৲ হইতে ৪৫৲ সের।

বাংলাদেশে রেশমের রঙীন সাড়ী পরিবার ফ্যাসান খুব বাড়িতেছে; এক্ষেত্রে বাংলায় এই শিল্পের আরও উন্নতি হইতে পারে। বর্তমানে মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী, মালদহ, বীরভূম, বাঁকুড়া রেশমের সূতা ও কাপড়ের জন্য বিখ্যাত। বীরভূমের কেটের কাপড়ের চাহিদা আছে।

বাংলার রেশমের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হইতেছে জাপান ও চীনের সস্তা রেশম; এ ছাড়া ফরাসী ও ইতালির রেশম ও রেশম বস্ত্র ত আছেই।

অধুনা কৃত্রিম রেশম বা রেয়ন (Rayon) নামে এক প্রকার পদার্থের প্রস্তুত কাপড় প্রচুর পরিমাণে বিদেশ হইতে আসিতেছে। এই পদার্থ রেশম বা সূতাই নহে; ইহা কাঠের কাই বা নানাজাতীয় সেল্যুলস্ হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়া করিয়া বাহির করা হয়।

বিদেশ হইতে কি পরিমাণ রেশম ও রেয়ন্ এদেশে আমদানী হইতেছে, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

	রেশম ও রেশমী কাপড় টাকা	কৃত্রিম রেশমাদি টাকা
১৯২২-২৩	১২,৬৫,৭৬৮	৩,১৬,০০০
১৯২৬-২৭	১৯,৭২,৮৮৬	৬৯,৯০,০০০
১৯৩২-৩৩	২৫,০৪,০০০	৩৯,৫০,০০০

১৯৩২-৩৩এ ভারতে ২ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকার রেশম ও ৩ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকার কৃত্রিম রেশম বা রেয়ন আমদানী হয়।

কৃত্রিম রেশম, রেশম ও মিশ্রিত রেশম এই তিন শ্রেণীর কাপড় ও ছিট্ জাপান হইতেই বেশি আসিতেছে। ১৯৩২-৩৩ সালে বাংলাদেশে প্রায় লক্ষ গজ খাঁটি রেশম (মূল্য ৮·১০ লক্ষ টাকা), মিশ্রিত রেশম ২৬·৭৫ লক্ষ গজ (মূল্য ৬·৩১ লক্ষ টাকা) ও ১,৪৫·৫২ লক্ষ গজ কৃত্রিম রেশম (মূল্য ৩৫·৬৪ লক্ষ টাকা) বিদেশ হইতে আমদানী হয়। জাপান কয়েক বৎসরের মধ্যে তিন গুণ মাল আমদানী করিয়াছে। বাংলার রেশম শিল্প এমন কি, সূক্ষ্ম বস্ত্রশিল্প পর্যন্ত গভীরভাবে এই কৃত্রিম রেশমের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে।

জাপানে রেশমের অনেকখানি কাজ কুটীর শিল্পের মধ্যে আবদ্ধ; এসত্ত্বেও তাহারা পৃথিবীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম হইয়াছে। বাংলার রেশম শিল্প যদি যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যায়, তবে বাংলাও এই খাতে প্রতি বৎসর ২০।২৫ লক্ষ টাকা দেশে রাখিতে পারে। (দ্রঃ Recovery Plan of Bengal)

প্রাণীজ শিল্প

লাক্ষা

কৃষি ও কৃষিজ শিল্পের কথা আমরা বলিয়াছি। এইবার প্রাণীজ শিল্পের কথা আলোচনা করিব।

লাক্ষা, মোম, রেশম, পশম, চামড়া প্রাণীজ শিল্পের অন্তর্গত। তুঁত, কুল প্রভৃতি কয়েক রকমের গাছে এক প্রকার কীটাণু-স্রাব হইতে লাক্ষার জন্ম। বাঁকুড়া, বীরভূম, সিংহভূম, মানভূম অঞ্চলে লাক্ষা প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হয়; মুর্শিদাবাদ ও মালদহেও পাওয়া যায়। সাধারণত আমরা গালার খেলনা, চুড়ি দেখিতে পাই। তা ছাড়া ছুতারের কাজে 'পালিসে', কুমারের 'বর্ণ' দিতে, শেকরার 'পাইনে' গালা লাগে। বিদেশে ইহার চাহিদা ইলেক্‌ট্রিকের insulating-এর জন্য, লিথোগ্রাফীর কালি ও গ্রামোফোনের রেকর্ড করিতে।

কলিকাতায় লাক্ষা সাফ্ করিবার দুইটি কারখানা আছে। অধুনা কলিকাতায় 'রেকর্ড' তৈয়ারী হইতেছে বলিয়া সেখানে লাক্ষার চাহিদা হইতেছে। ইংলণ্ড, মার্কিণ দেশ লাক্ষার প্রধান খরিদ্দার; জারমেনী, জাপান, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড ইহার পরেই। জাপান ছাড়া সকলেই অধুনা ইহার আমদানী কমাইয়াছে; কেবল জাপানে চাহিদা বাড়িয়াছে। বৎসরে ৪।৫ লক্ষ হন্দর লাক্ষা বিদেশে রপ্তানী হয়।

প্রস্তুত-ভেদে লাক্ষার বিভিন্ন নাম আছে—যেমন টিকলি বা বোতাম গালা, চাঁচ গালা, বাতি গালা, বীজ গালা ইত্যাদি। পূর্বে গালার রঙও প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হইত; আনিলিন রঙ সে শিল্পের ধ্বংস করিয়াছে। ১৯১৮-১৯ সাল পর্যন্ত বৎসরে ২।৩ কোটি টাকার গালা রপ্তানী হইত। কিন্তু ১৯১৯-২০ হইতে হঠাৎ গালার দাম অপ্রত্যাশিতভাবে বাড়িয়া গেল। সেই সময় হইতে ১৯২৯ পর্যন্ত ইহার চাহিদা খুবই দেখা যায়; তারপর হইতেই চাহিদা মন্দা। ১৯২৯ সালে যেখানে প্রায় ৮½ কোটি টাকার মাল বিদেশে যায়, চার বৎসর পরে ১৯৩৩ সালে মাত্র ১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হয়। কেন যে চাহিদা বাড়িয়াছিল, কেনই বা হঠাৎ ইহার রপ্তানী

কমিল, তাহা কেহ সন্ধান করে নাই। এই রপ্তানী কম্‌তি হওয়ায় প্রধান ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাংলা ও বিহারের লাক্ষা-চাষী। কারণ ভারতবর্ষ হইতে যে পরিমাণ লাক্ষা বিদেশে রপ্তানী হয়, তার চৌদ্দ আনা যায় বাংলা থেকে।

	১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯
সমগ্র ভারতের	(লক্ষ টাকা)	(লক্ষ টাকা)	(লক্ষ টাকা)	(লক্ষ টাকা)	(লক্ষ টাকা)
রপ্তানী	৭,৫৫	৬,৯০	৫,৪৭	৬,৯৮	৮,৬৪
বাংলার অংশ	৭,৫৩	৬,৮৭	৫,৪২	৬,৯১	৮,৪৭

মালের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে লাক্ষা-চাষীরা ইহার 'চাষে' মন দেয়। কিন্তু ১৯২৯ সাল হইতে চাহিদা কমিতে থাকিল ও চাষীরা অসহায়ভাবে পুনবায় ধান-জোয়ার বুনিতে সুরু করিল।*

লাক্ষার রপ্তানী

	হন্দর	মূল্য	
১৮৬৮-৬৯	৪৩,৭৪০	১১,৭৫,৭৩৯৲	দব ৹৩৲ হন্দব
১৮৭৮-৭৯	৬৪,৪৯৮	২২,২৪,৮৪৩৲	
১৮৮৮-৮৯	৮১,৩৯০	৩১,৯৪,১২৫৲	
১৮৯৮-৯৯	১৪৬,৩৯৫	৭০,০৭,৭৪১৲	
১৯০৮-০৯		২,৭৬,৫৩,০০০৲	

১৯০৮-১৯১৮ পর্যন্ত গড়ে বার্ষিক ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ছিল।

১৯১৭-১৮	৩,১৯,৯০৮	৩,৭৪,৫৪,০০০	
১৯১৮-১৯	২,৩১,৫০০	২,৮৪,৬০,০০০৲	
১৯২০-২১	৩,০৮,৭০০	৭,৫৭,৭৪,০০০৲	দব গড়ে ১৫৫৲
১৯২২-২৩	৪,৭৫,২২৭	১০,২৫,৩৮,০০০৲	দর গড়ে ২১৫৲
১৯২৮-২৯	৭,২১,৮০৩	৮,৪৭,৩৬,০০০৲	দর গড়ে ১১৭৲
১৯২৯-৩০	৬,৪৮,৯১০	৬,৮৮,২৪,০০০৲	দর গড়ে ১০৬৲
১৯৩০-৩১	৫,৪২,৬১৯	৩,১০,৫০,০০০৲	দর গড়ে ৫৭৲
১৯৩১-৩২	৪,৫৬,৫৭২	১,৮২,৬৮,০০০৲	দর গড়ে ৪০৲

* সুরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, লাক্ষা ব্যবসায়ে বাঙ্গালী (বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের ৮ই অক্টোবর ১৯৩৩ তারিখের অধিবেশনে পঠিত। ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কার্ত্তিক ১৩৪০, পৃঃ ২৮৫—২৯৫।)

	হন্দর	মূল্য	
১৯৩২-৩৩	৪,১৫,৫৮৮	১,২৩,৮১,০০০৲	দর গড়ে ২৯৲
১৯৩৩-৩৪		২,৪৬,৪৪,০০০৲	
১৯৩৪-৩৫		৩,২৯,৯৬,০০০৲	
১৯৩৫-৩৬		১,৩৪,৫৭,০০০৲	

বাসন-পত্র

বাঙালীর ঘরে বাসন-পত্র একটা ঐশ্বর্য—সুসময়ের গৌরব, অসময়ের সহায়। ধনী, দরিদ্র, সকলের ঘরেই কাঁসা, পিতল, তামার বাসন-পত্র পাওয়া যায়। বর্তমানে ফ্যাশান ও সুবিধার জন্য লোকে অ্যালুমিনিয়ামের, এনামেলের ও চীনামাটির বা কাঁচের জিনিষ কেনে। কিন্তু গৃহস্থের সম্পদের দিক্ হইতে এই সামগ্রীর মূল্য সামান্যই ; কারণ পুরাতন হইলে, ভাঙ্গিয়া গেলে ইহাদের মূল্য নাই বলিলেই চলে। তবে এখন ভাঙ্গা পুরাণো অ্যালুমিনিয়াম অতি সামান্য দরে বিক্রয় হয়। জাপান সকল প্রকার লোহা-লক্কড় কেনে ; তবে ভাঙ্গা কাঁচ, চীনামাটির ব্যবহার নাই বলিলেই চলে। কিন্তু বাঙালীর ঘরের কাঁসার জিনিষ দুই পুরুষ ব্যবহার করিয়াও অর্ধেক দাম পাওয়া যায় ; তামার ও তাই ; পিতলেরও সিকি দাম মেলে।

এককালে বাংলাদেশেই কাঁসারীরা কাঁসা, পিতল, তামা ঢালাই ও তৈয়ারী করিত। এখন সে শিল্প ধ্বংস পাইয়াছে ; তামা, পিতলের চাদর বিদেশ হইতে আসে, কাঁসা ঢালাই হয় এবং এখনো গ্রামে গ্রামে সহস্র সহস্র লোক এই শিল্প অনুসরণ করিয়া বা ইহার ব্যবসা করিয়া জীবিকা উপার্জন করিতেছে। কিন্তু বর্তমানে অ্যালুমিনিয়ম ও এনামেলের কাছে এই শিল্প টিকিতে পারিতেছে না। সস্তায় কাঁসার জিনিষ দিতে পারা দরকার ; সেজন্য আরও অধিক রাসায়নিক জ্ঞানের প্রয়োজন ; সহজ ব্যবহার্য যন্ত্রাদির চলন প্রয়োজন। গভর্মেণ্টের শিল্প বিভাগ এই বিষয়ে গবেষণা করিয়া একপ্রকার নূতন কাঁসা আবিষ্কার করিয়াছেন ; ইহা গুণে বাংলার প্রাচীন কাঁসার ন্যায় সুন্দর, অথচ ইহা হাল্‌কা ও সস্তা। এই শিল্পের উন্নতি সাধনের জন্য নূতন নূতন 'মিতশ্রমিক' যন্ত্রাদির প্রচলন হওয়ার

প্রয়োজন, নতুবা য়ুরোপের বৃহৎ যন্ত্রশালার প্রতিযোগিতা হইতে ইহাদের আত্মরক্ষা করা কঠিন।

বাংলার অনেক জেলাতেই পিতল-কাঁসার শিল্প এখনো আছে। বর্ধমান জেলার দাঁইহাট, বেগুণকোলা, পূর্বস্থলী, চুপি, জাবুই, সহেড়া বাজার, দিগ্‌নগর, বোনপাশ বিশেষ খ্যাত। বীরভূম জেলাব নলহাটি, দুবরাজপুর, কেন্দুলির নিকট টিকলবিটা কাঁসার কাজের জন্য সুপরিচিত। শেষোক্ত গ্রামে ৫০।৫৫ ঘর কাঁসারী কাজ করে। বাঁকুড়া জেলায় পাত্রশায়রে প্রায় ২০০ কাঁসারী কাজ করে; বিষ্ণুপুরে দুইশত পরিবার গড়ে তিন জন করিয়া লোক বাহাল করিয়া কাঁসার কাজে লিপ্ত আছে। বিষ্ণুপুরের কাজের নামডাক খুব। মেদিনীপুরেরও অনেক জায়গায় এই শিল্প আছে; কিন্তু উহা অসম্পূর্ণভাবে মহাজনদের হাতে। কোনো কোনো কারবারে ৭০।৮০ জন লোক পর্যন্ত নিযুক্ত আছে। কিছু লাভের ভাগ পায় মহাজন, কারিগর কেবল খাটিয়া সারা হয়; কোনো কোনো সময়ে সে মালের বাজার-দর কি, তাহা পর্যন্ত জানিতে পারে না। হুগলি জেলার ষোলঘরা, বাঁশবেড়ে, বালি, দেওয়ানগঞ্জ এই শিল্পের কেন্দ্র। ষোলঘরাতে ৩৭ ঘর কাঁসারী কেবল ঘুঙুর তৈয়ারী করে। আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত দেওয়ানগঞ্জে ৩০০ ঘর লোক এই কাজে লিপ্ত আছে; সেখানে বাগ্দী, দুলেরাও এই কাঁসার কাজ করে। হাওড়া জেলায় কয়েকটি স্থান এই শিল্পের জন্য পরিচিত। কলিকাতার কাঁসারীপাড়াই ছিল একটা বড় রকম কেন্দ্র,—এখনো ছোট ছোট কারখানায় অনেক লোক খাটে। তাছাড়া পিতল-কাঁসার ব্যবসায় হিসাবে কলিকাতা শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। নদীয়া জেলার অনেকগুলি গ্রামে কাঁসারীরা কাজ করে; কিন্তু মতিয়াবি ও নবদ্বীপেই বৎসরে ২৫,০০০ মণ বাসন-পত্র তৈয়ারী হয়।

বাংলার শ্রেষ্ঠ কাঁসার জায়গা হইতেছে মুর্শিদাবাদের খাগড়া। খাগড়ার বাসন বাঙালীর বিশেষ প্রিয়। সেখানে বহু শত লোক এই কাজে লিপ্ত আছে। ঢাকা জেলায় ব্রাহ্মণগাঁও, ধানকুড়িয়া, লোহজঙ্গ, ফিরিঙ্গি বাজার ষোলঘর, ধামরাই প্রভৃতি স্থান, মৈমনসিংহ জেলার অন্তর্গত ইসলামপুর, কাকমারি, মগরা বিখ্যাত। মৈমনসিংহ থেকে ৫০ হাজার হইতে একলাখ

টাকার বাসন প্রতি বৎসর রপ্তানী হয়। ফরিদপুরের পালঙ ও রাজবাড়ীতে পিতল ও কাঁসা দুইই হয়। চট্টগ্রামে মজবুত লোহার ট্রাঙ্ক হয়। রাজসাহী জেলার কয়েক জায়গাই বিখ্যাত। মালদহ জেলার নবাবগঞ্জে প্রায় তিন শ' পরিবার এই শিল্পে নিযুক্ত আছে।

বাংলার এই শিল্পও ধ্বংসোন্মুখ। ইহার প্রধান কারণ অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতির সহিত প্রতিযোগিতা, কারিগরদের শিক্ষার অভাব; বিশেষভাবে রাসায়নিক বিদ্যার অভাব এই শিল্পের অধঃপতনের প্রধানতম কারণ। এদ্ব্যতীত বাসনপত্র ছাড়া আর কোনো প্রকার সামগ্রী প্রস্তুত করিবার জন্য তেমন চেষ্টা হয় নাই। পিতলের কব্জা, চাবি, তালা, বোল্ট বা ছিট্‌কী, দরজার নব্ (knob) প্রভৃতি জিনিষ বিদেশ হইতে বহু টাকার আসে। কলিকাতার কোনো কোনো কারখানায় ইহা তৈয়ারী হইতেছে; তবে তাহা বিদেশী মাল হইতে নিকৃষ্ট। এতদ্‌সত্ত্বেও ইহার চাহিদা আছে।

পিতল, কাঁসা ছাড়া জার্মান 'সিলভারে'র মালও তৈয়ারী হইতেছে। এই সব ধাতুর পাত বিদেশ হইতে আসে। ধাতু-রসায়ন (Metallurgy) একটি বড় রকম শিল্প; কিন্তু ইহা কুটীর শিল্প হইতে পারে না; ইহার জন্য সুবৃহৎ কারখানার প্রয়োজন। পূর্বেই বলিয়াছি পূর্বে ভারতবর্ষেই পিতল, কাঁসা, তামা গালাই হইত। পিতলের ও তামার মূর্তি বাংলাদেশে ও নেপালে প্রস্তুত হইত। ধনী বাঙালীর মন শিল্পের দিকে ফিরিলে পিতল ও তামার মূর্তি প্রতিমূর্তি প্রভৃতি পুনরায় নির্মিত হইবে।

বিদেশ হইতে অ্যালুমিনিয়ামের চাদর, পাত, সামগ্রী আসে; তাহার মূল্য ৩৩ লক্ষ টাকার উপর (১৯২৬-২৭ সালে); এবং পিতল ও কাঁসার চাদর, রড প্রভৃতি আসে ৬৩ লাখের উপর। মোট বাংলার বাসন-পত্রের জন্য বৎসরে এক কোটি টাকার অ্যালুমিনিয়াম, পিতল ও কাঁসা আমরা বিদেশ থেকে কিনি। এ ছাড়া তামা কিনি ৩৭ লক্ষ, কোনো কোনো বৎসরে ৫৮ লক্ষ টাকার পর্যন্ত। জার্মান সিলভারের চাহিদাও বাড়িতেছে।

এইসব ধাতু হইতে কারিগররা সামগ্রী প্রস্তুত করে। ক্ষুদ্রপ্রাণ কারিগরদের পক্ষে আর সেসব ধাতুশিল্পকে পুনর্জীবিত করা অসম্ভব; কারণ আজকাল রাসায়নিক শিল্প ও ইঞ্জিনীয়ারিং এত জটিল জ্ঞানসাপেক্ষ হইয়াছে যে, তাহা

বৃহৎ কারবারী আকারে না করিলে চলিবে না; তা ছাড়া বহু বিশেষজ্ঞের সহায়তাও প্রয়োজন।

কুটীর-শিল্পের মধ্যে সোনারূপার গহনার শিল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রায় প্রত্যেক গ্রামে ও শহরে দুই চার ঘর স্বর্ণকার আছে। গ্রামের মেয়েদের সোনার বা রূপার গহনা তাহারা প্রস্তুত করে। হিন্দু, মুসলমান, ধনী, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র সকলের গহনার প্রয়োজন—যেমন প্রয়োজন অন্নবস্ত্রের। সেইজন্য বলিতে পারি, এই শিল্প বস্ত্র-শিল্পের ন্যায় বহুব্যাপ্ত। প্রাচীন পাথরের মূর্তিতে দেখা যায়, কত রকমের গহনা দেবদেবী, নরনারীর অঙ্গের শোভাবর্ধন করিতেছে। বালা, চুড়ি, কঙ্কন, অনন্ত, চুর, তাবিজ, জশম, হার, নলক, নথ, দুল, কান, চাঁপকলি, সাতনরি, চন্দ্রহার, সূর্যহার, নাকচাবি, বেশড়, মাকড়ী, আঙটি, পা-চুট্‌কী, গোট, মল, বাঁক, আটবেঁকি, তোড়া, গুজরি, ঝাঁঝর, সিঁথি, হাঁশুলি, পৈঁচা প্রভৃতি বহুবিধ গহনা বাঙালীর মেয়েরা পরিত। এখন ইহার অনেকগুলির চলন নাই, এমনকি, বাঙালীর মেয়েরা অধিকাংশের নাম ও ব্যবহার পর্যন্ত জানেন না। বাঙলার গ্রামের কারিগর এইসব তৈয়ারী করিত। এখন কলিকাতায় বহু হালফ্যাশানের 'জুয়েলারি' দোকান হইয়াছে, এগুলি সবই পুঁজিওয়ালাদের ব্যাপার, কারিগররা শ্রমিকমাত্র, অনেক সময়ে ঠিকায় কাজ করে। কিন্তু এখন নিম্নশ্রেণীর লোকের জন্য বিশেষত হিন্দুস্থানীদের জন্য জার্মান সিলভারের গহনা বিদেশ হইতে আসে। গহনা ছাড়া সোনা-রূপার তার বা সূতা প্রস্তুতের শিল্পেও এককালে ঢাকা, মুর্শিদাবাদ যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল। সোনার তার দিয়া নানাপ্রকার গহনা হইত এবং ভারতবর্ষের নানা স্থানে রপ্তানীও হইত। এই সোনার সূতায় ঢাকার বিখ্যাত শাড়ীর পাড় হইত, সোনার বুটিদার কাপড়, সোনার কল্কা সবই এই সূতা দিয়ে হইত; এখন সেই সোনারূপার সূতা আসে বিদেশ হইতে। স্যর জর্জ বার্ডউড সাহেবের যে একটি উক্তি সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা আমরা নিম্নে উঠাইয়া দিলাম :—

"Indian native gentlemen and ladies should make it a point of culture never to wear any clothing or ornaments but of native manufacture and strictly native design." (*Recovery*, p. 381)

কামারের কাজ

বাংলাদেশ পলিমাটির দেশ; বাংলায় লোহার ও কয়লার যেসব খনি আছে, সেগুলি বীরভূম, বাঁকুড়া ও বর্ধমানের পশ্চিমদিকে অবস্থিত। লোহার খনি ছিল বীরভূমে ও বাঁকুড়ায়। বোধহয় এই দুই জেলার উৎপন্ন লোহায় সমগ্র বাংলার প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত হইত। ১৮৭২ সালেও বীরভূম জেলায় ৭২টি লোহার 'শাল' বা উনুন ছিল। সেখানে এখনো সেইসব 'শালে'র চিহ্ন আছে; এখন সেই জেলায় লোহা তৈয়ারী হয় না। পশ্চিম-বঙ্গের এই লোহা হইতে এককালে বাংলার অস্ত্রশস্ত্র, কারিগরদের হাতিয়ার, চাষীর হাল, কোদাল, গৃহস্থের নিত্য ব্যবহার্য লোহার সামগ্রী প্রস্তুত হইত।

বাংলায় যে এককালে অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ারী হইত, তাহার প্রমাণ অসংখ্য। মুর্শিদাবাদের 'বাচাগুলি তোপ', 'জাহান কোশ' দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। অতবড় কামান কিভাবে তৈয়ারী হইয়াছিল তাহা এখন কল্পনা করাও কঠিন। 'জাহান কোশ' প্রথমে ঢাকায় তৈয়ারী হয়; ইহার নির্মাতা বাঙালী 'জনার্দন কর্মকার (১৬৩৭ খৃঃ অঃ)। বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের 'দলমাদান' কামান হিন্দুদের রাজত্বকালে নির্মিত হইয়াছিল।

মুসলমান সুবাদার, নবাব ও স্বাধীন রাজা জমিদাররা সকলেই বাংলা-দেশেই অস্ত্রশস্ত্র করাইতেন। বর্ধমানের উত্তরে বোনপাশের নিকট কামারপাড়া ছিল প্রধান কেন্দ্র। এই কামারপাড়ায় 'গাদা বন্দুক' তৈয়ারী হইত। মুঙ্গেরের 'গাদা বন্দুক' বহুকাল পর্যন্ত বিখ্যাত ছিল। এছাড়াও পারস্য, আরব, পাঞ্জাব হইতেও ভাল ভাল অস্ত্রশস্ত্র আমদানী হইত।

বাঙালী শাক্ত সম্প্রদায়ের জীব বলির বিরুদ্ধে নহে; ফলে, অনেকের ঘরেই খড়্গ থাকিত; মহিষ বলির খড়্গ খুবই বড় হইত। কামারপাড়ার তরবারিও বিখ্যাত ছিল। তারপর ইংরেজদের আগমনের ও রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্প নষ্ট হইতে লাগিল। অস্ত্রশস্ত্র বিদেশ হইতে আসিল। কামারের শিল্প নষ্ট হইল। সুতরাং তাহাকে অন্য শিল্পের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। যাহারা ছুরি কাঁচি প্রভৃতি করিত তাহাদের সেই দশা হইল; যাহারা কোদাল খুর্পী প্রভৃতি বানাইত, তাহাদের কাজও

গেল ঢালাই লোহার বিলাতী মাল আমদানীর সঙ্গে। এখন টাটার কারখানায় হইতেছে।

আমরা নিত্য লোহার কি কি জিনিষ ব্যবহার করি এবং ইহার কতখানি বিদেশ হইতে আসে তাহা দেখা যাক্।

প্রথম দফায় ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর প্রভৃতি ধরা যাক্। এককালে সবই এদেশের বাঙালী কামারেই করিত। এখন চৌদ্দ আনা আসে বিদেশ থেকে। বাংলার প্রয়োজনও বাড়িয়াছে অনেক; ছুরিই কত রকমের—কলমকাটা ছুরি, রুটি কাটা ছুরি, কসাইএর ছুরি, দপ্তরীর ছুরি, ডাক্তারী ছুরি, গাছকাটা ছুরি ইত্যাদি। কাঁচিও অনেক রকমের; জাঁতি বাঙালীর নিত্য প্রয়োজনীয়। দাড়ি কামানো ক্ষুর যে এদেশে হইত, এখন তাহা কেহ সহজে বিশ্বাস করিতে পারিবে না। এখন 'রেজর্' বা জিলেট্ ব্লেড্ সেই স্থান পূরণ করিতেছে। কামার ও জাত-নাপিতের পেশা প্রায় যাইবার দাখিল হইয়াছে।

কৃষির জন্য ব্যবহৃত কোদাল, ফাওড়া, গ্রামে কমই তৈয়ারী হয়, অধিকাংশই বিদেশী ঢালাই লোহায় প্রস্তুত। ছুতারের সকল প্রকার হাতিয়ার; কামার ও মুচির যন্ত্রপাতি সবই বিদেশ হইতে আসে। এইসব ছোটপাটো সামগ্রী গ্রামের কুটীরে প্রস্তুত করা অসম্ভব নহে। এ ছাড়া লোহার তালা চাবিও তৈয়ারী হইতে পারে।

বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেক গ্রামে ও শহরে দুই চারি ঘর করিয়া কামার আছে। গ্রামের এই কামার চাষীদের ফাল, গোরুর গাড়ীর চাকার হাল প্রভৃতি লাগায়; সময় পাইলে শিকল, চাটু, খুন্তি, বেড়ি, শাবল বানায়। সামান্য একটা 'হাফর, একটা নেয়াই, হাতুড়ি, সাড়াশী প্রভৃতি দুই পাঁচটা যন্ত্র লইয়া ইহারা কাজ করে।

বর্ধমানের বোনপাশ, বাঁকুড়ার সাহসপুর, সাধারণ কাটারি, শাঁখের করাত প্রভৃতির জন্য এবং বাখরগঞ্জের উজিরপুর ও অন্যান্য নানা স্থান ভাল ভাল লোহার ইস্পাতের জিনিষ তৈয়ারীর জন্য বিখ্যাত।

বাংলার বন্দরে ছুরি কাঁচির আমদানী

১৯২২-২৩	...	৫,৭২,০০০৲
১৯২৬-২৭	...	১৫,২৩,০০০৲

হার্ডওয়ার বা লোহালক্কড় ১৯২৬-২৭

কৃষির কোদাল প্রভৃতি	...	১০,৭২,০০০
বাল্তি, গালভানাইজ্ টীন	...	৫,০০০
তালা, কব্জা, বোল্ট ইত্যাদি	...	৯,৯৮,০০০
গৃহস্থালী সামগ্রী	...	৩,৮৮,০০০
এনামেল	...	১২,৭৯,০০০
গ্যাস্ ম্যাণ্টেল	...	৯২,০০০
ছোট যন্ত্রপাতি	...	২৪,০৫,০০০
বালতি, লণ্ঠন	...	৩৪,০০,০০০
কাঁচের বাতি	...	৪,০০০
আলোর অংশ	...	১,৫৯,০০০
লোহার সিন্দুকাদি	...	৫১,০০০
ষ্টোভ	...	২,৬০,০০০
অন্যান্য	...	৬৮,৪৪,০০০
	মোট	১,৬৯,৬৩,০০০

Sea-borne Trade of British India 61st year, Vol. II, p. 43.

আঁশাল সামগ্রী

পাট, শন, কোঁয়া ও নারিকেলের ছোবড়া হইতে সুতুলি, দড়ি, দড়া, কাছি তৈয়ারী হয়। জল-তোলা, গরু-বাঁধা, গাড়ীর বোঝা-বাঁধা, নৌকার গুণ-টানা প্রভৃতি শতবিধ কাজের জন্য দড়িদড়া ও কাছির প্রয়োজন নিত্য। বাংলাদেশে উপরি উক্ত সকল প্রকার আঁশাল সামগ্রীগুলি পাওয়া যায়। গ্রামের চাষারা অনেক জায়গায় শন বা পাট হইতে দড়ি পাকাইয়া লয়। গ্রামের উদ্বৃত্ত মাল

বাজারে বিক্রয় হয়। তবে মজবুত দড়ি সবই বিদেশ হইতে আসে; বিশেষভাবে 'ম্যানিলা' শনের দড়ি আসে ফিলিপাইন দ্বীপ হইতে। নারিকেলের প্রচুর দড়ি প্রতি বৎসর দক্ষিণ ভারত হইতে আসে। ত্রিবাঙ্কুর ও কোচীনে নারিকেলের ছোবড়া হইতে দড়ি, জাহাজের কাছি, পাপোষ, ম্যাটিং প্রভৃতি তৈয়ারী হয়। এইসব মাল ভারতের সর্বত্র, এমনকি, বিদেশেও চালান যায়। য়ুরোপের কয়েকটি দেশে দক্ষিণ ভারতের নারিকেলের দড়ি চালান যায়, ও সেখানকার কারখানায় তাহাদের প্রয়োজন ও রুচি অনুযায়ী মাল প্রস্তুত করে; ভারতবর্ষ হইতে তৈয়ারী মাল ক্রয় করিতে সকলেই নারাজ। ওটোয়া কন্‌ফারেন্সের সিদ্ধান্ত অনুসারে বৃটিশ সাম্রাজ্যে নারিকেল ছোবড়ার মাল বিক্রয়ের বিশেষ সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহার একটি কারণ এখন যেসব ছোবড়ার কারখানা আছে সেগুলি বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড ও জার্মেনীতে; সুতরাং বৃটিশ সাম্রাজ্যেব মধ্যে ইহার কল প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য শুল্কের বিশেষ সুবিধা দান করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

বাংলাদেশের দক্ষিণের সকল জেলাতেই বহু লক্ষ নারিকেল গাছ আছে। এদেশের নারিকেলের ছোবড়ার কোনো সদ্‌ব্যবহার হয় না; একমাত্র ব্যবহার গদি প্রস্তুতেব জন্য। ছোবড়া নরম করিবার জন্য যে লোনা জলের দরকার তাহাও বাংলায় অভাব নাই।

নারিকেলের খোল হইতে হুকা হয়; খোল হইতে বোতামও হয়। হুকা প্রস্তুতের শিল্প বাংলার এখনো গৃহশিল্প আছে। তবে বিড়ি ও সিগারেটের কল বাড়াতে হুকার ব্যবহার কমিয়াছে। সুতরাং বোতাম তৈয়ারীর কাজে অধিক লোক লাগিতে পারে; জাপান হইতে এদেশে ৫।৭ লাখ টাকার বোতাম আসে। জার্মেনী হইতে আসে ৩।৪ লাখ টাকার।

বোতাম যে কেবল নারিকেলের খোলা হইতে হয় তাহা নহে। বিদেশ হইতে যে সব বোতাম আসে, তাহা নানা উপাদানের; যেমন হাতীর দাঁতের, ধাতু নির্মিত (অ্যালুমিনিয়াম, পিতল, তামা ইত্যাদি), ঝিনুক, শিঙ, হাড়, কোরোজো (দক্ষিণ আমেরিকার একপ্রকার গাছ) ও গালালাইট্ (দুধের কেজিন্ হইতে প্রস্তুত) নামে এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ।

বাংলাদেশে ঝিনুকের বোতাম সামান্য তৈয়ারী হয়। যশোহর, নোয়াখালি

ও ত্রিপুরা জেলার কোনো কোনো গ্রামে এই শিল্প ছিল বা অর্ধ-মৃতাবস্থায় আছে। বর্তমানে ঢাকা জেলার কয়েকটি গ্রামে এখন এই শিল্প চলিতেছে। তবে বাংলার চাহিদা পুরণ হয় না বলিয়া বৎসরে ৮।১০ লক্ষ টাকার বোতাম জাপান ও জার্মেনী হইতে আসে।

কলিকাতায় বোতামের আমদানী

১৯২২-২৩	...	৭,৪৩,৮৩৩৲
১৯২৬-২৭	...	৯,৬৫,০৬২৲

পেণ্ট করিবার বুরুশ, মাথার বুরুশ, জুতার বুরুশ, দাঁতের বুরুশ প্রভৃতি এই ধরণের সামগ্রী অল্প ব্যয়ে কুটীরশিল্প করা যায়। প্রতি বৎসর তিন লাখ টাকার উপর এই জাতের জিনিষ বাংলাদেশে আসে।

কুটীর শিল্পের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে খেলনা শিল্প। বাংলার মাটির পুতুল, তালপাতার খেলনা, শোলার খেলনা এক কালে বাঙালীর ছেলে-মেয়ের মনের মধ্যে রঙীন কল্পনা সৃষ্টি করিত। এখন সে দিন প্রায় চলিয়া গিয়াছে। ভারতের আধুনিক আর্থিক দুর্গতি সুরু হইবার পূর্বে এক বৎসরে প্রায় ৫৩ লক্ষ টাকার বিদেশী খেলনা এদেশে আসিয়াছিল এবং ২॥০ লক্ষ টাকার সামগ্রী বিদেশে রপ্তানী হয়।

বাংলার মাটীর খেলনা ও পুতুল খুবই বিখ্যাত ছিল, বিশেষ করিয়া কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত ঘূর্ণী গ্রামের কুমারদের খেলনার আদর সর্বত্র ছিল। এ ছাড়া বীরভূম জেলার ইলামবাজারের গালার খেলনারও চাহিদা ছিল; সেখানে এক কালে দুইশত ঘর কারিগর ছিল, এখন দুই চারি ঘর কোন রকমে টিকিয়া আছে। বিশ্বভারতী এই শিল্পকে পুনর্জীবিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। বর্মার পাগান গ্রামে ইহা এখনো গৃহশিল্পরূপে বহু শত পরিবারের জীবিকা দান করিতেছে। এবং চেষ্টা করিলে এখানেও তদ্রূপ করা যাইতে পারে।

মাটীর পুতুল ও খেলনা গ্রামের কুমার ও অন্যান্য দরিদ্র জাতির মেয়েরা তৈয়ারী করে; ইহার মধ্যে বৈচিত্র্য কম এবং যেসব শিশু রেল-মোটর গাড়ীর যুগে জন্মিতেছে এগুলি তাহাদের আনন্দ দান করিতে পারে না। এককালে কাঠের রঙীন ঘোড়া, হাতী প্রভৃতি খেলনার রেওয়াজ ছিল,

এখন সেসবের আদর নাই। বড়ই আশ্চর্যের ও আপশোষের বিষয় যে, বাঙালী প্রতি বৎসরে বহু লক্ষ টাকার মাটির অতি কদাকার খেলনা জাপান হইতে কিনিতেছে। সে খেলনাগুলি নয় জাপানী শিল্পের নিদর্শন নয় ভারতীয় শিল্পের; সেগুলি অত্যন্ত বীভৎস আর্ট, মেলায় ও বাজারে বিক্রীত হইতেছে।

য়ুরোপে বিশেষভাবে জার্মেনীতে খেলনা তৈয়ারী একটা প্রকাণ্ড শিল্পে দাঁড়াইয়াছিল। স্প্রিঙে পরিচালিত রেল-ইঞ্জিনই প্রথমে ছিল; এখন সেই স্প্রিঙ দিয়া সহস্র প্রকারের খেলনা হইয়াছে। জার্মেনীর দেখাদেখি জাপান এই শিল্পে লাগিয়াছে এবং জার্মেনীকে খেলনার বাজার হইতে তাড়াইয়াছে। গত মহাযুদ্ধের পূর্বে জাপান ৩,১৬ হাজার টাকার খেলনা পাঠাইয়াছিল; ১৯৩০-৩১ সালে ১৩,১০ হাজার টাকার; ১৯৩২-৩৩ সালে যখন বাজার খুব মন্দা, তখন বাংলাদেশ ২২,৮৬ হাজার টাকার জাপানী খেলনা কেনে। সেই বৎসরে জার্মেনী হইতে আসে ৩,৩৪ হাজার টাকার মাল। অর্থাৎ ২৬ লক্ষ টাকার খেলনা বিদেশ হইতে আমরা কিনিয়াছিলাম।

বাংলায় টিনের খেলনা নাই বলিলেই চলে; মেলায় টিনের গাড়ী, ইঞ্জিন প্রভৃতি দেখা যায়, তবে তাহা এমন কদাকার যে, বর্তমানে সেসব অচল। অথচ এ শিল্প গ্রামে গ্রামে করা কঠিন নহে। কতকগুলি ছাঁচ তৈয়ারী করিয়া গ্রামে গ্রামে কাটিবার জন্য দেওয়া যায়; সেইগুলি সহরের কেন্দ্রে আনিয়া ছোট কারখানায় সমবেত করা যাইতে পারে। এইভাবে নানা কেন্দ্রে নানা রকমের টিনের খেলনা করিলে ভাল হয় এবং রঙ করিবার জন্য হয় কোনো বড় সহরে বা কলিকাতায় আনিয়া ব্যবস্থা করিতে হয়। ইহার দ্বারা গ্রামের বহু সহস্র নারী ও শিশু উপরি সময়ে কাজ পাইতে পারে। এ বিষয়ে সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। সরকারী শিল্পবিভাগ এই শিল্পগঠনকারীদিগকে সাহায্য করিবার জন্য বিস্তৃতভাবে হিসাবপত্র করিয়া রাখিয়াছেন। (Recovery, p. 369)

ঠিক 'খেলনা' বলিতে যা বুঝায়, তা হাতীদাঁতের তৈয়ারী খেলনা পুতুল নয়। বাংলাদেশে মুর্শিদাবাদ, রঙ্গপুর ও ত্রিপুরা হইতেছে এই শিল্পের কেন্দ্র; তবে মুর্শিদাবাদের শিল্পীদের সমতুল্য কেহই ছিল না। শতাধিক বৎসর পূর্বে হিন্দু কারিগরদের খুবই নামডাক ছিল। এখন সেই শিল্প

বাংলায় ধ্বংসোন্মুখ। বাংলা হইতেই এই শিল্প দিল্লীতে যায়, কিন্তু বাংলার কারিগরদের সহিত তাহাদের তুলনা হয় না। বাংলার ধনী যাঁহারা হাতীর দাঁতের সামগ্রী ক্রয় করিতে সমর্থ, তাঁহারাও এখন জাপান ও চীন হইতে এই উপাদানের শিল্প সামগ্রী ক্রয় করিয়া গৃহে সঞ্চয় করিতেছেন। পূর্বে গবর্মেণ্ট মুর্শিদাবাদের শিল্পীদের সামগ্রী ক্রয় করিয়া বড় বড় প্রদর্শনীর জন্য প্রেরণ করিতেন; মুর্শিদাবাদের নবাব, কাশিমবাজারের মহারাজ ও ত্রিপুরার মহারাজের প্রাসাদে হাতীদাঁতের বহুবিধ সামগ্রী আছে। কলিকাতা যাদুঘরের নমুনাগুলি দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

খেলনার আবার নানা স্তর আছে; যেমন ফুটবল ক্রিকেট, টেনিস, ব্যাডমিণ্টন প্রভৃতি বিদেশী খেলার অনেক সরঞ্জাম বিদেশ হইতে আসে। তাসও বিদেশ হইতে আসে। এসব সামগ্রী দেশে তৈয়ারী করা কঠিন নয়; তার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে শিয়ালকোটের খেলার সামগ্রী প্রস্তুতের শিল্প হইতে। বিদেশ হইতে খেলনা ১২ লক্ষ টাকার, তাস ৫ লক্ষ ২০ হাজার, অন্যান্য ৪ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকার মাল আসিয়াছিল। ১৯২৬-২৭ সালে খেলনা হইতে প্রায় ২০ লক্ষ টাকার মাল কলিকাতার বন্দরে আসে; এগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে বাংলাদেশে স্বল্প মূলধনে ইহার অনেকগুলি কারবার খোলা যায়।

চামড়ার শিল্প

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ; বাংলার শতকরা ৭০।৭৫ জন কৃষিজীবী। সুতরাং এতবড় দেশে গো মহিষাদির সংখ্যা স্বভাবতই অধিক হইবে। অনুমান করা হয় পৃথিবীতে প্রতি বৎসর মৃত ও নিহত গরুর চামড়া পাওয়া যায় ৮ কোটী ৯০ লক্ষ। ইহার মধ্যে ভারতে পাওয়া যায় প্রায় আড়াই কোটী। মহিষের চামড়া পৃথিবীতে ৫০ লক্ষর উপর; ভারতে হয় সাড়ে ৩৬ লক্ষ! মহিষের চামড়া এত বেশী আর কোথায়ও পাওয়া যায় না। ছাগলের চামড়া ২ কোটি ২০ লক্ষ হয় এক ভারতেই। আমেরিকা, জার্মেনী, বৃটেনের কোথাও ছাগল-চামড়া নাই; ভেড়ার চামড়া ১৫ মিলিয়ন পাওয়া যায় মার্কিন রাজ্যে, তারপরেই হয় ভারতে—১১ মিলিয়ন।

ইহা হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন ভারতের এই কাঁচামালের মূল্য কত। ভারতবর্ষে যতগুলি বন্দর দিয়া চামড়া রপ্তানী হয়, তার মধ্যে কলিকাতা হইতে যত টাকার রপ্তানী হয়, এমন আর কোন বন্দর হইতে হয় না।

পৃথিবীময় চামড়ার জিনিষের চাহিদা বাড়িয়াছে; একদিকে মানুষের মাংসাহারও যেমন অপরিমিতভাবে বাড়িয়াছে, তেমনি বাড়িয়াছে নিহত প্রাণীর চামড়ার সামগ্রীর চাহিদা; অথবা বলিতে পারি—চামড়া অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষ সেগুলিকে শিল্প-সামগ্রীতে পরিণত করিয়া লোকসমাজে চাহিদা সৃষ্টি করাইতেছে। যুদ্ধ বিভাগের সৈন্যদের জন্য নানা উপকরণ নির্মাণে চর্মের প্রয়োজন হয়; পুলিশ বিভাগেও তথৈবচ; এছাড়া—মানুষের জুতার ব্যবহার, ব্যাগের ব্যবহার পূর্ব হইতে অনেক বাড়িয়াছে।

চামড়া পাওয়া যায় দুই রকমে; গ্রামে যেসব পশু স্বাভাবিকভাবে বা ব্যাধিতে মরে, দ্বিতীয় যেসব পশু আহারের জন্য নিহত হয়; এইসব মৃত ও নিহত পশু হইতেছে ছাগল, ভেড়া, গরু, মহিষ। যেখানে আহারের জন্য পশু নিহত হয়, সেখানে চামড়াটাকে আমরা উপসামগ্রী (Byproduct) বলিতে পারি।

চামড়া সংগ্রহ হয় নানা ভাবে; প্রথমতঃ বড় বড় শহর বা নগরে যেখানে গোখানা বা হত্যাশালা আছে, সেখানে গোখানার মালিকের নিকট হইতে চামড়া পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ গ্রামের ভাগাড় বা মরা গরু ফেলিবার জায়গা অনেক সময়ে গ্রামের মুচিরা জমিদারদের কাছ হইতে জমা করিয়া রাখে; সেখানকার মরা পশুর চামড়া ইহারা সংগ্রহ করে। তৃতীয়ত: পূজা পার্বন, বকর ঈদে ও শহরে শহরে নিত্য আহারের জন্য যে সব পশু হত্যা হয়, তাহাদের চামড়া।

বাংলাদেশে চামড়া যদিও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, কিন্তু এদেশে চামড়ার দাম বেশি পাওয়া যায় না। ইহার প্রধান কারণ এদেশের গরু অন্য প্রদেশ হইতে অত্যন্ত শীর্ণ, খাদ্যাভাবে অপুষ্ট, আকারে ক্ষুদ্র; ফলে চামড়ার অনেক দোষ হয়। প্রধানতঃ অপুষ্ট গরুর চামড়া মজবুত ও মসৃণ হয় না। এতব্যতীত চামড়ার উপর নানা রকমের দাগ থাকে, যেমন গুটির দাগ,

আঁটুলির ফুটা, গোদাগা, পাঁচন গুঁতার দাগ, কাঁটার আঁচড়; তা ছাড়া মরা গরু ভাগাড়ে ফেলিলে শকুনিতে চামড়া ছিড়িয়া ফেলে; আনাড়ী মুচিতে অত্যন্ত খারাপ করিয়া ছাল ছাড়ায়। এইসব কারণ দূর করার মানেই গোজাতির যত্ন, অর্থাৎ তাহার প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা, ভাল জাতের গরু আনিয়া বাংলার গরুর উন্নতি সাধন, গরুর বসন্ত যাহাতে না হয় সেজন্য সময় মত টীকা দেওয়া, আঁটুলিতে ফুটা না করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা, অর্থাৎ নিয়মিত স্নানাদি ও গাত্র মার্জনের ব্যবস্থা করা; গোদাগ দাপনায় দিলে সমস্ত চামড়ার অর্ধেক দাম কমিয়া যায়; চিহ্ন যদি দিতেই হয়, তবে কানে দেওয়া যাইতে পারে; তা ছাড়া গোদাগ যে বসন্তের প্রতিষেধক নহে, তাহা চাষার জানা প্রয়োজন। তীক্ষ্ণ পাঁচন দিয়া বলদ গরুকে মারা একেবারে আইন করিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া দরকার। এ ছাড়া ভাগাড়ে গরু ফেলিবার পূর্বে গ্রামের মুচিকে খবর দিলে সে পূর্ব হইতেই সাবধান হইতে পারে।

আমরা আলোচনার সুবিধার জন্য কয়েকটি সংজ্ঞা ব্যবহার করিব; 'ছাল' বলিতে ছাগল ও ভেড়ার চামড়া, 'চামড়া' বলিতে গরুর ও মহিষের ছালকে বুঝাইবে। 'কাঁচা চামড়ার' অর্থ চামার যে চামড়া শুকাইয়া বিক্রয়ের জন্য বেপারীকে দেয়। 'দেশীয় চামড়ার' বা যে চামড়া সামান্য উপাদানাদির সাহায্যে পরিষ্কৃত হয় তাহাকে দেশী চামড়া বলিব (bark tanned); 'কাঁচা চামড়া', ও 'দেশী চামড়া' বিলাত হইতে নানা রকমের নামে এদেশে ফিরিয়া আসে। ইহার সাধারণ নাম 'বিলাতী চামড়া'। এখন ট্যানারিতে 'বিলাতী চামড়া'ও হইতেছে। ইহাকে ক্রোম ট্যানিং বলে।

মৃত জন্তুর দেহ হইতে ছাল ছাড়াইয়া তাহাকে চামড়ায় (Leather) পরিণত করিবার পূর্বে গ্রাম্য মুচিরা সাধারণতঃ রৌদ্রে দিয়া শুকাইয়া লয়; কোথায়ও বা লবণ দিয়া তাহাকে পরিষ্কার করে। এসব বিষয়ে খুটিনাটি অনেক কাজ আছে, যাহা আমাদের প্রত্যক্ষ আলোচনার বহির্ভূত বিষয়। মোট কথা বর্তমান গ্রাম্য পদ্ধতি অত্যন্ত অনিষ্টকর; তবে বিগত যুদ্ধের পূর্বে যখন চামড়া ব্যবসায় জার্মানদের একপ্রকার একচেটিয়া ছিল, তখন ইহারা কিভাবে সহজে কাঁচা চামড়া পরিষ্কার করা যায়, সে-বিষয়ে হাতে-কলমে দেখাইয়া দিত।

গ্রামের মাঝে 'দেশী চামড়া' বানাইবার যে ব্যবস্থা আছে, তাহাকে বলে 'বার্ক ট্যানিং'। প্রধানতঃ এই পদ্ধতি অনুসারে চামড়াগুলির মাংস ও লোম সাফ করিয়া নানা গাছের ছালের জলে সেগুলিকে ভিজাইয়া রাখা হয়। বাব্‌লার ছাল, গড়ান গাছের ছাল, হরিতকী, সোনালির ছাল প্রভৃতি বাংলার নিজস্ব গাছ-গাছড়ার ত্বক্ বা ফল দিয়া 'চামড়া' তৈয়ারী হয়। বাব্‌লা গাছ বাংলাদেশে প্রচুর হয়; গড়ান গাছও সুন্দরবনে পর্যাপ্ত। গড়ানের ত্বকে শতকরা ২৭ হইতে ৩৩ ভাগ 'ট্যানিন্' বা কষায়িন্ নামে রাসায়নিক পদার্থ থাকে। হরিতকী কষায় রসের পক্ষে উপযুক্ত হইলেও উহা বাংলায় প্রচুর পাওয়া যায় না। ইহার মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ ট্যানিন বস্তু আছে; রাসায়নিক শাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান যথেষ্ট না থাকায় হরিতকী কষায় রসে ভাল চামড়া তাহারা প্রস্তুত করিতে পারে না; নিতান্ত মোটা জাতের চামড়া তৈয়ারী হয়।

বর্তমান যুগে য়ুরোপে ও আমেরিকায় গাছের কাঁচা ছালের কষায়ের পরিবর্তে কষায়নির্যাস ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু বাংলাদেশে খড়্গপুর ও রাণীগঞ্জে মাত্র দুইটি কারখানায় হরিতকীর নির্যাস নিষ্কাষিত হয়। কলিকাতা হইতে প্রতি বৎসর বহুলক্ষ টন্ হরিতকী য়ুরোপের দেশে দেশে চালান যায়।

বাংলাদেশে এখানে-সেখানে ও বিশেষভাবে কলিকাতার উপকণ্ঠে ট্যানিং কাজ হয়,—জুতার সুকতলা, ঘোড়ার জিন, লাগাম, বেল্ট্ বা কোমরবন্ধ তৈয়ারী হয়। বেল্‌টিং-এর জন্য মহিষের মোটা চামড়ার দরকার। এই ধরণের বেল্টিং প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে আসে প্রায় দশলক্ষ টাকার। বেল্টিং তৈয়ারী কাজে বাঙালীর দৃষ্টি দেওয়া দরকার। দেশী চামড়ায় তৈয়ারী সুটকেসের চাহিদা জনসমাজে খুব বাড়িয়াছে। পাতলা ছালের চাহিদাও যথেষ্ট; বাছুর, ছাগল, ভেড়ার চামড়া বই-বাঁধানো, মনিব্যাগ তৈয়ারী প্রভৃতি শতবিধ কাজে লাগে। এই পাতলা চামড়ার উপর কারুকার্য করিয়া মহিলারা নানা শিল্প সামগ্রী প্রস্তুত করিতেছে। ফুটবলের চামড়া এই দেশীয় উপাদানে প্রস্তুত চামড়া হইতেই হয়। এ ছাড়া আধা-ট্যানকরা চামড়া ভারতের নানা বন্দর হইতে প্রায় আট কোটি টাকার রপ্তানী হয়।

চামড়া ট্যান করিতে কেবল মাত্র যে উদ্ভিজ্জ রাসায়নিক লাগে তাহা নহে;

চূণ, সালফ্যুরিক এসিড, হাইড্রোক্লোরিক এসিড, পটাস, সোহাগা, আমোনিয়া প্রভৃতি বহুবিধ রাসায়নিক যৌগিক পদার্থের প্রয়োজন হয়। বাংলায় এসব পদার্থ সামান্যই হয়; অধিকাংশই বিদেশ হইতে আসে।

চামড়ার উপর যে হরেক রকমের রঙ দেওয়া হয়, তা প্রায় সবই জারমেনীর রঙ,—কয়লা বা আলকাতরা হইতে প্রস্তুত। সে-শিল্প বাংলায় হয় নাই। এ ছাড়া ট্যানিং-এর সময় নানাবিধ তেলের প্রয়োজন—চর্বি, মাছের তেল, তিমির তেল ইত্যাদি; পাওয়া যায় না কড্ মাছের তেল, যাহা, শ্যাময় (Chamois) চামড়া তৈয়ারী করিতে লাগে। শ্যাময়ের চামড়া মোটর গাড়ী সাফ করিবার জন্য প্রয়োজন হয়। কতকগুলি ট্যানারিতে শ্যাময় তৈয়ারী হইতেছে।

ভাল 'বিলাতী চামড়া'কে বলে 'ক্রোম লেদার'। বাংলাদেশের গরুর চামড়ায় খুব ভাল 'ক্রোম' হয়; ভারতবর্ষে মাত্র ৫।৬ টি কারখানায় এই জাতীয় চামড়া হয়, বাংলাদেশে মাত্র ন্যাশনাল ট্যানারীতে হয়। সুতরাং এ দিকে আরও দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন হইয়াছে। এছাড়া গ্লেজ্‌কীড, গ্লেজ শীপ্‌স্কীন বা ভেড়ার পালিশ করা চামড়া, ক্রোম সোল, শ্যাময় চামড়া প্রভৃতি নানাবিধ চামড়া এই ক্রোমের অন্তর্গত।

চামড়া ট্যানিং-এর অন্তর্গত হইতেছে ট্যাক্সিডার্মি বিদ্যা; শিকারীরা যেসব প্রাণী শিকার করে, যেমন বাঘ, ভালুক, শেয়াল, সাপ,—তাহাদের চামড়ার উপরিভাগ ঠিক রাখিয়া ট্যান করাকে ট্যাক্সিডার্মি বলে। ম্যুজিয়মের জন্য জীবজন্তু তৈয়ারী এই বিদ্যার অন্তর্গত।

এতক্ষণ আমরা চামড়া তৈয়ারীর শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম। কিন্তু চামড়া তৈয়ারী হইয়া গেলে, যেসব সামগ্রী প্রস্তুত হয়, তাহাতে পৃথক্ পৃথক্ শিল্প ও ব্যবসায় গড়িয়া উঠিয়াছে। চামড়া প্রস্তুত করিয়া এক দল লোক খালাস; সেই চামড়া হইতে নানা শিল্পী নানারূপ সামগ্রী বানায়। ইহার মধ্যে প্রধান হইতেছে জুতা-শিল্প। ১৯৩১-৩২ সালে ভারতবর্ষ বাহির হইতে প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকার জুতা আমদানী করিয়াছিল, ১৯৩২-৩৩ সালে পৌনে ৯১ লক্ষ টাকার। বাংলাদেশে বড় জুতার কারখানা নাই—যেমন আগ্রা ও কানপুরে আছে। কানপুরের নর্থ-ওয়েষ্টর্ণ-ট্যানারী বিদেশী মালিকের

টাকায় চলিতেছে। কয়েক বৎসর হইল য়ুরোপের বিখ্যাত 'জুতা-রাজ' অষ্ট্রিয়া দেশের বাটা (Bata) বাংলাদেশে জুতার কারখানা খুলিয়াছে। আজকাল জুতা তৈয়ারীর জন্য বহু ধরণের কল ব্যবহৃত হয় এবং তাহা মোটা পুঁজিপতি ছাড়া কেহই করিতে পারে না।

জুতার প্রয়োজন যে কেবল সাধারণের তাহা নহে; গবর্মেণ্ট সৈন্য ও পুলিশ বিভাগের জন্য প্রচুর জুতা ক্রয় করেন। এছাড়া সৈন্যের অন্যান্য সরঞ্জামও চামড়া দিয়া হয়; অশ্বারোহীর অশ্বের জন্য চামড়ার অনেক সাজ পোষাক লাগে। জুতা ছাড়া অধুনা চামড়ার স্যুটকেস্ লোকে খুবই ব্যবহার করিতেছে; তবে ইহা এখনো কুটীর শিল্প আছে।

বাংলাদেশে যে চামড়া বা ছাল প্রতি বৎসর পাওয়া যায়, তাহার সামান্য অংশই এদেশে থাকে, অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়। বিগত যুদ্ধের পূর্বে এই ব্যবসায় প্রায় একচেটিয়া ছিল জার্মান ও অষ্ট্রিয়ানদের। ইহাদের এজেণ্ট ও পাইকারগণ দেশময় ঘুরিয়া, গোখানার সহিত বন্দবস্ত করিয়া, ছোট বড় স্থানে লোক নিযুক্ত করিয়া চামড়া রপ্তানী ব্যবসায়টা প্রায় একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিল। চামড়ার ভাল মন্দ নানারকম আছে; ইংরেজদের দেশে খুব ভাল চামড়া ছাড়া রপ্তানী হইত না। কিন্তু জার্মানরা সে বিষয়ে খুব উদার ছিল; ভাল, মাঝারি, নিকৃষ্ট, নিকৃষ্টতম সবই নিজ দেশে চালান দিত। জারমেনী নিজের ব্যবহার্য মাল রাখিয়া অবশিষ্ট সবই বিদেশে বিক্রয় করিত। ইংরেজরা এই কার্য তেমনভাবে গ্রহণ করে নাই; চামড়ার কাজে বোধহয় নোঙরামি আছে বলিয়া তাহাদের মর্যাদায় লাগিত। হিন্দু মুচিরা চামড়া সাফ ও তৈয়ার করে বটে, কিন্তু এই ব্যবসায়ে কোনো হিন্দু নামে না। আশ্চর্যের বিষয় এক কালে ইংলণ্ড ছিল চামড়ার বড় খরিদ্দার; ১৮৯০ সাল পর্যন্ত প্রায় ৩৫ লক্ষ চামড়া ইংলণ্ড ক্রয় করিত; ১৯১৩ সালে দেখি ১৭,৫৩০ খানিমাত্র সে ক্রয় করিয়াছিল; অথচ এই সময়ে চামড়ার প্রধান ক্রেতা হইয়া উঠে জার্মানরা। শেষকালে এমন হইয়াছিল যে, কলিকাতার সঙ্ঘবদ্ধ সাতটি জার্মান কোম্পানী ছাড়া সাধারণের চামড়ার ব্যবসায় চালানো দায় হইয়াছিল। ভারতীয় বন্দর হইতে হামবুর্গ ও ব্রিমেন পর্যন্ত সোজাসুজি কাঁচা চামড়া চালান দিলে জার্মান জাহাজে

ভাড়া খুব কম লাগিত। যুদ্ধের সময়ে জার্মানদের সহিত ব্যবসায় বাণিজ্য বন্ধ হইয়া যায়। ১৯১৮-১৯ সালে দেখি ইংলণ্ড ভারতীয় চামড়ার শতকরা ৫৭% ভাগ পুনরায় ক্রয় করিতেছে; কিন্তু যেমন জার্মানরা ১৯২০-২১ সালে বাণিজ্য সুরু করিল, তখনই দেখি চামড়ার বাণিজ্য জার্মানী ২০% ভাগ, ১৯২২-২৩ সালে ৪৪% ভাগ দখল করিয়াছে। (Cotton, Handbook p. 215).

বাংলার বন্দর হইতে যেসব মালপত্র বিদেশে রপ্তানী হয়, তার মধ্যে পাটের জিনিষ হইতেছে প্রায় শতকরা ৪২ ভাগ, চা ১৮ ভাগ, কাঁচা পাট ১৯ ভাগ; তার পরেই কাঁচা ছাল ও চামড়া শতকরা ৩।৪ ভাগ। এই কাঁচা ছাল গত কয় বৎসর হইতে কিভাবে বাংলাদেশ হইতে বিদেশে রপ্তানী হইতেছে, তাহার তালিকা আমরা নিম্নে দিলাম; এই কাঁচা চামড়া বাঙালী যদি ট্যান্ করিতে পারিত তবেত' সে অধিক দাম পাইত। এবং যদি ট্যান্ করিয়া তারপর নানাবিধ সামগ্রী তৈয়ার করিতে পারিত, তবে লাভের অংশ আরও থাকিত। কিন্তু আমরা কেবল কাঁচা চামড়াই বিক্রয় করিয়া আসিতেছি :—

	টাকা	সমগ্র রপ্তানীর
১৯০৯-১০ হইতে ১৯১৩-১৪ পর্যন্ত	৭,৫৯,৫৪,০০০	
১৯১৪-১৫ হইতে ১৯১৮-১৯ পর্যন্ত	৫,১৩,৫৭,০০০	
১৯১৯-২০	১৩,৫৭,১৩,০০০	
১৯২০-২১	২,৭৬,৯৭,০০০	
১৯২১-২২	৩,৪২,০৫,০০০	৪.৪৫%
১৯২২-২৩	৩,৪৫,২০,০০০	৩.০৭%
১৯২৩-২৪	৪,৮১,৫০,০০০	৩.৯১%
১৯২৪-২৫	৪,৮২,৩০,০০০	৩.৪২%
১৯২৫-২৬	৪,৮৫,০৪,০০০	৩.৩৪%
১৯২৬-২৭	৪,৮৪,০০,০০০	৩.৮৩

	টাকা	সমগ্র রপ্তানীর
১৯২৭-২৮	৫,৭৮,৯০,০০০	৪·২০%
১৯২৮-২৯	৫,৭১,০২,০০০	৪·১৭%
১৯২৯-৩০	৪,৮২,২৫,০০০	৩·৮১%
১৯৩০-৩১	৩,৩২,৫৮,০০০	৪·১২%
১৯৩১-৩২	২,৩৩,৩১,০০০	৪·০৫%
১৯৩২-৩৩	১,৮৬,৬৫,০০০	৩·৬০%

কাঁচা চামড়ার রপ্তানীতে বাংলা প্রথম; কিন্তু তৈয়ারী চামড়া যা বিদেশে রপ্তানী হয়, তাহাতে বাংলা সর্ব নিম্নে। ১৯২৬-২৭ সালে বাজার ভালই ছিল; সেই বৎসরের হিসাবটা দেওয়া যাক্। সে-বৎসরে ভারতবর্ষের নানা বন্দর হইতে মোট ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার তৈয়ারী চামড়া বা লেদার রপ্তানী হয়; ইহার মধ্যে কোন্ দেশ হইতে কতখানি গিয়াছিল, তাহা নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে;

মাদ্রাজ	হইতে	৬,৪৪,৪২,০০০	টাকা
বোম্বাই	,,	৮২,৩২,০০০	,,
বর্মা	,,	১০,০২,০০০	,,
সিন্ধুপ্রদেশ	,,	৯,৩০,০০০	,,
বঙ্গদেশ	,,	৩,৯৪,০০০	,,

এই বিষয়ে বাংলার অবস্থা যে কি শোচনীয়, তাহা পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন।

বাঙলার লেদার রপ্তানী

১৯২৩-২৪ ...	৯,০১,৯৮০	১৯২৮-২৯ ...	৭,৮৩,০০০
১৯২৪-২৫ ...	৯,৩৬,০০০	১৯২৯-৩০ ...	৮,৩৭,০০০
১৯২৫-২৬ ...	৭,৯৬,০০০	১৯৩০-৩১ ...	৫,৮০,০০০
১৯২৬-২৭ ...	৩,৯৪,০০০	১৯৩১-৩২ ...	৭,৬৯,০০০
১৯২৭-২৮ ...	৫,৭৭,০০০	১৯৩২-৩৩ ...	১২,৩৯,০০০

১৯২৯-৩০ সালে ভারতের কাঁচা চামড়া রপ্তানী হয় ৪ কোটি টাকার উপর। ইহার মধ্যে জার্মেনী একাই কেনে ১ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকার মাল।

কাঁচা ছালের বড় খরিদ্দার আমেরিকা; ৫ কোটি ৪১ লক্ষ টাকার ছালের ৪ কোটি ৩ লক্ষটাকা সে কেনে। তৈয়ারী ট্যান-করা ছাল বা চামড়ার সেরা খরিদ্দার ইংলণ্ড। ৯ কোটি টাকার মালের মধ্যে সে ৮ কোটি টাকার উপর ক্রয় করে।

বাংলাদেশ হইতে কাঁচা চামড়া রপ্তানী হয়; অথচ বাংলায় চামড়া ট্যান্ করিবার উপাদানের অভাব নাই, সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ভারতবর্ষ হইতে শওয়া কোটি টাকার নানাবিধ কষায়ীন ছাল ও ফল বিদেশে রপ্তানী হয়; তারমধ্যে বাংলার অংশ সেরা; ১৯২৭-২৮ সালে ৮০ লক্ষ টাকার মাল বাংলা হইতে রপ্তানী হয়। ১৯৩২-৩৩ সালের দুর্বৎসরেও ২৯,৫৭,০০০ টাকাব মাল রপ্তানী হইয়াছিল। এই সব ট্যানিন্‌যুক্ত পদার্থ অধিকাংশই আসে বিহার হইতে। প্রসঙ্গত বলিয়া রাখি, মাদ্রাজ চামড়া তৈয়ারী বা ট্যান করিয়া বিদেশে পাঠায়, এবং সেখান হইতে ট্যানিং উপাদান ৯।১০ লাখ টাকার বেশি যায় না; অর্থাৎ ট্যানিং শিল্পে সেদিককার ট্যানিং উপাদান প্রচুর ব্যবহৃত হয়।

বাংলার গ্রাম্য চর্ম-শিল্প ধ্বংসোন্মুখ। বাংলার মুচিরা চিরদিন এদেশের মৃত বা নিহত গো মহিষ ছাগ মেষের চর্ম দেশীয় পদ্ধতিতে পরিষ্কার করিত; সেসব চামড়া অত্যন্ত মোটা ধরণের, অপরিষ্কার—নিখুঁত আদৌ নহে। তবুও সেই সব চামড়া হইতে জুতা, ঘোড়ার জিন, লাগাম, ঢাক ঢোল, মৃদঙ্গ, তবলা, বাঁয়া প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র তৈয়ারী হইত। তারপর য়ুরোপের সহিত সংস্পর্শ স্বরু হইল, বিদেশে চামড়ার চাহিদা হইতে লাগিল। বিদেশ হইতে এই দেশীয় চামড়াই ফিরিয়া আসিল বিলাতী চামড়া ও বিলাতী জুতা হইয়া। এদেশের মুচিরা খুবই দক্ষ কারিগর; তাহারা বিলাতী জুতার অনুকরণে জুতা তৈয়ারী স্বরু করিল এবং বিলাতী নানা রকমের জুতার আমদানী হওয়া সত্ত্বেও এই শিল্পকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইতে দিলনা। কলে প্রস্তুত জুতার সঙ্গে তাহারা এখনো কেমন করিয়া টিকিয়া আছে, তাহাই আশ্চর্যের বিষয়। ভাল জুতা এখন অনেক শহরে তৈয়ারী হয়, কিন্তু বাংলার চর্ম শিল্প কিভাবে চলিতেছে, তাহা আমরা নিম্নে বর্ণনা করিব। মোট কথা, গ্রামের মুচিরা এখন নিরন্ন, অধিকাংশই ভূমিহীন শ্রমজীবী। কিন্তু এখনো

ইহাদের ছেলেদের কাজ শিখাইলে তাহারা কুশলী শিল্পী হইয়া উঠিতে পারে।

কলিকাতা হইতেছে বাংলার জুতা বা চর্ম শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। এই কারবার সম্পূর্ণরূপে ক্ষুদ্র শিক্ষা বা কুটীর শিক্ষার মতনই। চীনা ব্যবসায়ী ও কারিগরেরাই কলিকাতার প্রধান জুতা ব্যবসায়ী; তবে তাহারা নিজেরা কাজ করে এবং তার সঙ্গে বিহারী মুচিরা কাজ করে। চীনাদোকানীর সংখ্যা ৮০০, ও তাহাদের অধীন কাজ করে এমন বিহারী মুচির সংখ্যা ৬০০০। কলেজষ্ট্রীটের অধিকাংশ দোকানীই বিহারী মুচিদের নিকট হইতে মাল লয়। বাংলাদেশে মুচিসংখ্যা ২ লাখ ২০ হাজারের উপর। ইহাদের সমস্যা বাঙালীকেই পূরণ করিতে হইবে।

বাংলাদেশে বিদেশী জুতা আসে বহু লক্ষ টাকার; তাহার একটা তালিকা নিম্নে দিলাম :—

১৯২২-২৩	...	২,৯০,০০০
১৯২৩-২৪	...	৩,৫৭,০০০
১৯২৪-২৫	...	৪,১৯,০০০
১৯২৫-২৬	...	৭,৪২,০০০
১৯২৬ ২৭	...	১৫,৪৫,০০০

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে মাথাপিছু বাঙালী যে পরিমাণ চামড়ার জিনিষ ব্যবহার করিত, তাহা অপেক্ষা অনেক গুণ বেশি এখন ব্যবহৃত হইতেছে। জুতা, স্যাণ্ডেল, চামড়ার সুটকেস্, সিগারকেস্, মেয়েদের হাত-ব্যাগ, ব্রিফ্‌কেস্ বা খাতারাখিবার ব্যাগ, বইবাঁধাই ইত্যাদি হরেক রকমের সামগ্রী ধনী ও মধ্যবিত্ত ঘরে দেখা যায়। এই শতপ্রকারের কারবার বাংলায় জাগিয়াছে, অথচ বাঙালী কারিগর, বাঙালী জাত মুচি সেসব জায়গায় কোথায়?

চামড়ার জুতার প্রতিযোগী এখন অনেক,—কাপড়ের জুতা, রবারের জুতা। সোলের জন্য রবার ক্রেপ প্রভৃতি বিদেশ হইতে আসিতেছে। কারবারী আকারে বাটা (Bata) কোম্পানী জুতা তৈয়ারী করিতেছে; তাহারা কলিকাতার উপকণ্ঠে বাটানগর স্থাপন করিয়াছে। তাহারা এখন মুচিদের সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছে।

বিদেশের এই আক্রমণের ফলে বাংলার মুচি যাহাদের জাত-ব্যবসায়

হইতেছে জুতা ও অন্যান্য চর্মের সামগ্রী তৈয়ারী, তাহারা জাতব্যবসায় হইতে চ্যুত হইয়া নানা কর্মের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইতেছে; অধিকাংশক্ষেত্রেই তাহারা দিন মজুর। (*Rau. Leather Industry*, Cal. Univ. 1925)

বিবিধ কুটীরশিল্প

প্রাচীন শিল্প ছাড়া গত কয়েক বৎসরের মধ্যে কতকগুলি নূতন শিল্প এদেশে গজাইয়াছে। দেশলাই প্রথমে আসিত সুইডেন হইতে; তারপর যুদ্ধের সময় হইতে জাপান সে বাজার অধিকার করে। এখন অনেকগুলি দেশলাই-এর কারবার সুইডিস্ ও জাপানী মূলধনে চলিতেছে; কেবলমাত্র বাঙালীদেরই বড় কারখানা নাই বলিলেই চলে। এইসব কারখানার কথা অন্যত্র বলিয়াছি।

দেশলাই কুটীর শিল্প বা ছোট কারবার হিসাবে বাংলার নানাস্থানে ভদ্রলোকে গ্রহণ করিয়াছিল; কিন্তু বাহিরের প্রতিযোগিতা, জিনিষের নিকৃষ্টতা ও দেশের লোকের ধৈর্য ও সহানুভূতির অভাবে এইসব ক্ষুদ্র শিল্প ধ্বংস পাইতেছে। ১৯৩৪ সনের দেশলাই-এর উপর শুল্ক স্থাপনও এই শ্রেণীর কারখানার উচ্ছেদের অন্যতম কারণ। এই শুল্কের দ্বারা পুঁজিওয়ালা দেশলাই কোম্পানীগুলির কোনো ক্ষতি হয় নাই। মফঃস্বলের কারবারগুলি ধ্বংস-প্রাপ্ত হওয়ায় পুঁজিওয়ালা কারবারীরা একচেটিয়া সুবিধা ও সুযোগ সম্পূর্ণরূপেই পাইয়াছেন; দেশলাই-এর যে দর বাড়িয়াছে, তাহা ত' খাতকই দিতেছে।

কলিকাতার বাহিরে কারখানায় খরচ কম; ঘরবাড়ী কলকারখানা বাবদ অনেক টাকা আটকাইয়া রাখিতে হয় না। জাপানে দেশলাই-এর কারবার অনেকখানি কুটীরে হয়। কুটীরের বিভিন্ন টুক্‌রা টুক্‌রা কাজ কারখানায় সমবেত করিয়া সম্পূর্ণ দেশলাই প্রস্তুত হয়। বাংলাদেশেও তাহা হইতে পারে। খাদি প্রতিষ্ঠানের দেশলাইকে খাঁটি কুটীর শিল্প বলা যায়।

নবীন শিল্পের মধ্যে আরও কতকগুলির নাম করা যাইতে পারে, যেমন সেলুলয়েড্ কারখানা। সেলুলয়েডের পুতুল, চিরুণী, খেল্‌না, সাবানের বাক্স প্রভৃতি অনেক রকমের সামগ্রী প্রস্তুত হয়। বিদেশ হইতে বহু লক্ষ টাকার সামগ্রী বাংলায় আসে।

সেলুলয়েড শিল্প করিতে গিয়া দেখা গিয়াছে যে, বিদেশ হইতে সেলুলয়েড আমদানী করার থেকে, দুই একটি উপাদান আনিয়া এখানে উহা প্রস্তুত করায় খরচা অনেক কম পড়ে। যশোহরের চিরুণীর কারবারে প্রচুর সেলু-লয়েড ব্যবহৃত হয়। ফাউণ্টেন পেনের জন্যও এই উপাদানের প্রয়োজন হয়। বোতাম, চশমার ফ্রেম, ছবির ফ্রেম প্রভৃতি অনেক রকমের জিনিষ হয়।

কলম, পেন্সিল, নিব, ফাউণ্টেন পেন্ বহু লক্ষ টাকার বিদেশ হইতে আসে। বাংলায় এখন দুই চারিটি প্রতিষ্ঠান এইসব ব্যবসায়ে লাগিয়াছে; বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ফণীন্দ্রনাথ গুপ্তের পেন্সিল ও পেনের কারবার ও লাহাদের ভারতী ফাউণ্টেন পেন্ ওয়ার্কস্।

এইসব শিল্প দেশের ধনীদের ও সরকারের সদিচ্ছা হইলে অনায়াসে কুটীরে কুটীরে প্রবর্তন করা যাইতে পারে। তবে যে পর্যন্ত এই সব কারখানার সামগ্রী বিলাতী মালের সমতুল্য না হয়, সে-পযন্ত দেশবাসীকে কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতে ও ধৈর্য ধরিতে হইবে।

কুটীর শিল্প পুনরুদ্ধার ও নূতন শিল্প প্রবর্তনের মূলে অনেক সমস্যা আছে। প্রধান সমস্যা শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা; প্রথমত—যেসব জাতির যাহা পুরুষানুক্রমিক পেশা তাহাদিগকে সেইসব শিক্ষা বর্তমান কালের উপযোগী করিয়া দেওয়া। দ্বিতীয়ত—প্রত্যেক জেলায় সরকারী, বেসরকারী লোক এবং দেশ-কর্মী প্রভৃতিদের লইয়া সমিতি গঠন। উৎপন্ন মাল প্রস্তুত হইলে তাহা কেন্দ্রীয় ভাণ্ডারে আনয়ন ও বিক্রয়ের জন্য প্রচার-বিভাগ স্থাপন। শিল্পীকে যেন মাল ঘরে লইয়া বসিয়া থাকিতে না হয়, অথবা অর্থের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইয়া সময় নষ্ট করিতে না হয়। বিদেশী মালের শ্রেষ্ঠ নমুনা তাহাদের সম্মুখে রাখিয়া উৎকৃষ্ট মাল প্রস্তুত করিবার জন্য উৎসাহিত করা। প্রচারকগণ জেলার অধিবাসীকে এইসব জিনিষ ব্যবহার করিবার জন্য উৎসাহিত করিবেন। গবর্মেণ্ট বাৎসরিক মেলাগুলিতে এই শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিবেন ও নিজ কর্মচারীদের ঐসব মাল ব্যবহার করিতে বাধ্য করিবেন, তবেই শিল্প সঞ্জীবিত হইবে।

ষট্‌ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

বাংলার মজুর

শ্রম যে করে সেই শ্রমিক—এই সংখ্যা ধরিলে প্রায় প্রত্যেক লোকই এই কোঠায় পড়ে। তবে আমরা শ্রমিক বলিতে বুঝি—যে অন্যের জন্য পয়সা লইয়া দৈহিক পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জন করে; কিন্তু যে চাষা নিজে চাষ করে বা যে তাঁতি নিজে তাঁত বোনে তাহাকে আমরা শ্রমিক বলি না। যে লোক অন্যের জন্য নিজ শ্রম বিক্রয় করে, তাহাকে শ্রমিক বলে; সে-হিসাবে শ্রম বিক্রেয় শক্তি, যেমন বিজলি শক্তি বা অন্য কোনো প্রকারের transferable শক্তি। আবার এক হিসাবে 'শ্রম' শ্রমিকের মূলধন যা খাটাইয়া সে অর্থ রোজগার করে। শ্রমিকের বুদ্ধি ও স্বাস্থ্যই হইতেছে তাহার আসল মূলধন। শ্রমিকের হাতিয়ার ও হাতিয়ার ব্যবহারের নৈপুণ্যের উপর তাহার বেতন বা দাম নির্ভর করে।

শ্রমিককে বহু শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথমত—গ্রামের মধ্যে চাষের মজুর, 'মনিষ' মাহিনাদার, যাহারা মৃত্তিকা হইতে ফসল উৎপন্ন করে। চা সিন্‌কোনা প্রভৃতি বাগিচার কুলিরা এ শ্রেণীর মধ্যে স্পষ্টত না পড়িলেও ইহাদিগকে ইহার মধ্যে ফেলা হয়। দ্বিতীয়ত—যাহারা খনিতে কাজ করে, বা মৃত্তিকার ভিতর হইতে কয়লা, লৌহ প্রভৃতি বাহির করে। তৃতীয়ত—যাহারা কৃষি ও খনিজ পদার্থ হইতে শিল্পজাত সামগ্রী প্রস্তুতে সহায়তা করে। চতুর্থত—যাহারা ইঞ্জিনীয়ারিং, রেল, ষ্টীমার যানবাহনে মজুরি করে। শেষোক্ত দুইটি বিভাগে শ্রমিকগণ যন্ত্রশিল্পে বিশেষজ্ঞ হইয়া উঠে। এই সব কার্যের মধ্যে এক শ্রেণী হইতেছে যন্ত্রনিপুণ মজুর (skilled labour); অপর শ্রেণী সাধারণ মজুর (unskilled)। পঞ্চমত—যাহারা লোকের বাড়ীতে, আপিসে, কাছারীতে চাকরের বা বেয়ারার কাজ করে।

মোটামুটি এই কয় ভাগে শ্রমিককে ভাগ করা যায়। এইবার আমরা এক একটি শ্রেণীকে পৃথগ্‌ভাবে আলোচনার বিষয় করিব।

প্রথমেই ধরা যাক্ বাংলার ভূমিহীন মজুরদের কথা। বাংলার গ্রামের

অধিকাংশ নিম্ন শ্রেণী হিন্দু ও মুসলমানের নিজস্ব জমি নাই; তাহারা অপেক্ষাকৃত ধনী ও মধ্যবিত্তের জমি ভাগে বা 'বরগা'য় চাষ করে। তাহারা আমাদের আলোচনার মধ্যে পড়িবে না। কারণ ভাগিদারদের নিজস্ব বলদ, লাঙল, গাড়ী আছে ও তাহারা জমির উৎপন্নের এক-তৃতীয়াংশ বা অর্ধেক শ্রমের বিনিময়ে ভোগ করে।

যে-সব ভূমিহীন মজুর কেবলমাত্র নিজ দৈহিক শ্রম বিক্রয় বা ভাড়া দিয়া জীবিকা উপার্জন করে তাহারাই এই কোঠায় পড়ে। গ্রামের মধ্যবিত্ত শ্রেণী অনেক সময়ে চাষের জন্য ইহাদের মাহিনাদার নিযুক্ত করে। মালিকের হাল বলদ, খরচ খরচা সব; মাহিনাদার বৎসরে একটা বেতন, খাইবার ধান, তামাক, তেল নুনের পয়সা, কাপড় গামছা পাইয়া বিনিময়ে চাষ করে। সে বার মাসের চাকর; ইহাকে আমরা গৃহের ভৃত্যশ্রেণীর মধ্যে ফেলিলাম না; কারণ মাহিনাদার প্রধানত স্থানীয় লোক, চাষবাস, গো-সেবাই ইহাদের প্রধান কার্য; বেতন বৎসর হিসাবে হয়। এই বেতন জেলা-ভেদে, মাহিনাদারের কার্যকুশলতার তারতম্যের উপর নির্ভর করে; পশ্চিমবঙ্গে বছরে ১৮।২০ হইতে ৪০।৪৪ টাকা পর্যন্ত হয়। অন্য জেলায় যেখানে শ্রমিক দুষ্প্রাপ্য সেখানে বেশী দিতে হয়। মাহিনাদার নিজ মনিবের কাজ ছাড়া অন্য কাজ করিতে পারে না। গ্রামের সমবায়ের কাজে সে কাজ করে বটে, তবে তাহা মনিবের স্বার্থের জন্য।

বরগাদার ও মাহিনাদারের একটা স্থির আয় আছে। কিন্তু যাহারা বরগার জমি পায় নাই বা মাহিনাদারী পায় নাই, তাহারা হইতেছে ভূমিহীন শ্রমিকের তৃতীয় স্তর। ইহারা হইতেছে শিল্প হইতে চ্যুত, কৃষি হইতে বঞ্চিত যথার্থ ভূমিহীন দিন মজুর; অর্থাৎ দিন আনে দিন খায়,—যেদিন কাজ সেই দিন আহার। সাধারণত এই শ্রেণীর লোকেরা চাষের সময় ধান রোপায় ও ধান কাটায় চাষীকে সহায়তা করে; গ্রামের ঘরবাড়ী মেরামতি তৈয়ারী প্রভৃতিও করে। সাধারণত মধ্যবিত্ত বা ধনীর অবস্থা ভাল থাকিলে চাষীর কাজ প্রচুর হয়, মজুরিও ভাল মেলে; ধান পাটের দর না থাকিলে, চাষীর অবস্থা অসচ্ছল হইলে ইহাদের মজুরি কমে। তবে নিতান্ত দুর্ভিক্ষের সময় ছাড়া ইহাদের বেতন বা মজুরি বাজারের অন্য সমস্ত জিনিষের মূল্য-

হ্রাসের অনুপাতে কমে না, অবশ্য বড় চাকুরেদেরও কমে না। তবে খাদ্যশস্যের দাম শস্তা থাকিলে ইহাদের ঠিক অন্নাভাব হয় না; তবে স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব চিরদিনই আছে এবং সে-সম্বন্ধে তহোদের মনও 'পাথর' হইয়া গিয়াছে। তবে পূর্বের তুলনায় ইহাদের অবস্থা ভাল কি মন্দ হইয়াছে, তাহা আমরা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি।

মজুররা যে কাজ করে, তাহা কেবল হাত দিয়া হয় না, এক ধান রোপণ ছাড়া। প্রত্যেক কাজেই হাতের সঙ্গে হাতিয়ার লাগে; এই হাতিয়ারের ব্যবহারের উপর তাহার মজুরী নির্ভর করে। যে ঘরামী চাল ছায়, তার মজুরী তলপেটি বা যে নীচ হইতে খড় দেয়, তাহার চেয়ে বেশি; যে দেওয়াল দেয়, তার মজুরী যে 'কাদা করে' তার থেকে বেশি। মিস্ত্রির থেকে মজুরের বেতন কম। গ্রামের ছুতার থেকে শহরের ছুতারের মজুরী বেশি, কারণ তাহার হাতের কাজ ভাল, হাতিয়ারও বেশি আছে। সুতরাং হাত থেকে হাতিয়ারের দাম বেশি। বাংলায় বাঙালী শ্রমিক পর্যাপ্ত নহে। ধান রোয়া ও ধান কাটার সময়ে পশ্চিম বঙ্গে বহু সহস্র ডুমকার সাঁওতাল ও অন্য নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু প্রতি বৎসর কাজ করিতে আসে। এইসব মজুররা অসঙ্ঘবদ্ধ; নিজ দেশ হইতে আসে, কাজ সারিয়া চলিয়া যায়। গড়ে দৈনিক চার আনা ও খাওয়া পায়। বাঙালী মজুররা গ্রামে বা শহরের নিকটে বাস করে, সেখান হইতে গ্রামের মধ্যে বা শহরে কাজের সন্ধানে যায়। ইহাদের সকলেরই নিজ বাড়ী ঘর আছে; স্ত্রী পুত্র কন্যা আত্মীয়-স্বজন লইয়া গ্রামে বাস করে। সমাজ-শাসন, লোকমত তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করে; অনেক সামাজিক দায় পোহাইতে হয়।

বাংলার গ্রামের শ্রমিকদের দিনমজুরীর তথ্য নির্ণয়ের জন্য গবর্মেণ্ট বহুবার চেষ্টা করিয়াছেন। সরকারী বিভাগ হইতে Prices and Wages of Bengal নামে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হইত। বর্তমানে তাহা আর সঙ্কলিত ও প্রকাশিত হয় না। ১৯৩১ সালে সেন্সাস রিপোর্টে ১৯০৮, ১৯১১, ১৯১৬ ও ১৯২৫ সালের মজুরীর একটা তালিকা দেওয়া আছে। গ্রামের মজুর, ছুতার ও কামার ছাড়া আর কোনো শ্রমিকের

প্রয়োজন চাষীর বড় হয় না। গাড়ীর চাকা তৈয়ারী ও মেরামতী, ঘরের চাল তৈয়ারী, দরজা জানালা বানানো প্রভৃতি ছুতারের প্রধান কাজ; চাকার হাল বসানো প্রভৃতি ছোট খাটো লোহার কাজ করে কামারে। ছুতার ও কামার চাষী-জীবনের অন্তর্গত। সাধারণত গ্রামের এইসব মেরামতী কাজের জন্য গ্রাম্য কামার ও ছুতার চাষীর নিকট হইতে ধান পায়।

সমগ্র বৃটিশ বাংলার চাষের মজুরদের মজুরী গ্রাম-অঞ্চলে শেষ তিন বৎসরে দৈনিক ৮·৮৩ আনা, ৯·৮৪ আনা, ১০·৩৮ আনা ছিল। নিম্নে আমরা একটা তালিকা দিলাম।

চাষীর দৈনিক মজুরী আনায়

	১৯০৮	১৯১১	১৯১৬	১৯২৫
বাংলাদেশ	...	৮·৮৩	৯·৮৪	১০·৩৮
বর্ধমান বিভাগ	৫·১৪	৪·৪১	৫·৮৪	৯·৪৮
প্রেসিডেন্সি ,,	৪·৯০	৪·৮৫	৬·০	৯·৭৫
রাজসাহী ,,		৮·১	৭·২৯	১০·৮৯
ঢাকা ,,		৭·২১	৭·৫৯	১২·৫১
চট্টগ্রাম ,,		৯·১৫	৭·৩২	১০·৬৯

গ্রামের কামারদের মজুরী ১৯১১ সালে ৮·৫৯ আনা, ১৯১৬ সালে ১১·০৬ ও ১৯২৬ সালে ১৬·৮৪ আনা ছিল; ছুতারের ছিল যথাক্রমে ১০·০৮, ১১·৩, ১৭·৩। দশবৎসর পরে সাধারণ দিন-মজুরের বেতন চারি বা পাঁচ আনা করিয়া হইয়াছে। ১৯৩৫-৩৬এর প্রায়-বাংলাব্যাপী দুর্ভিক্ষের সময় মজুরের দৈনিক বেতন হইয়াছিল গড়ে ছয় পয়সা, দুই আনা।

যেখানে চাষ কারবারী আকার ধারণ করিয়াছে, সেইখানে মজুরীর রূপান্তর হইয়াছে। ইহা প্রধানত হইয়াছে চা বাগিচায়, মিল অঞ্চলেও ডকে। আসামের জনসংখ্যা কম; অথচ সেখানে চা-এর বাগিচার জন্য লোকের প্রয়োজন; তখন বাংলা ও বাংলার বাহির হইতে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক আমদানী করিয়া সেখানে লওয়া হইল। মজুরের এক নূতন রূপ ও সমস্যা সেখানে দেখা দিল। বাংলার মধ্যের চা বাগিচায় সে-সমস্যা তেমন হয় নাই; কারণ, স্বাধীন শ্রমিক উত্তর বঙ্গে

পাওয়া যায়। তবুও আমদানী কুলি বহু সহস্র আছে। ইহাদের মধ্যে নিপুণ ও অনিপুণ মজুর আছে। বাংলাদেশে তিনটি জেলার চাএর বাগানে এই 'কুলি' শ্রেণীর শ্রমিক দেখা যায়। এ দেশে ২৭৮টি চা বাগিচা আছে; দার্জিলিং ও তরাইতে প্রায় ৬৬ হাজার কুলি কাজ করে; দার্জিলিং-এর কুলি প্রায় সবই স্থানীয় নেপালী, ভুটিয়া। জলপাইগুড়ির বাগানে সাঁওতাল, কোল, মুণ্ডা, বাঙালী কাজ করে। ইহাদের সংখ্যা ১,২৫,৬৩২। চট্টগ্রামের বাগানে ৫৭৪৫ কুলি কাজ করে। পুরুষ, মেয়ে ও বালক সবরকম মজুরই আছে। মজুরীর হার মাসিক যথাক্রমে ১৩, ১১, ৭৲। কিন্তু ইহার মধ্য হইতে সর্দারদের ঘুষ প্রভৃতি দিতে যায় কিছু।

মাটি চাষের পর খনির কাজ। খনি বলিতে বুঝায় কয়লার খনি; কয়লা ছাড়া আর যেসব খনিজ পাওয়া যায়, তা সবই ছোট নাগপুরের মধ্যে পড়িয়াছে। লবণকে আমরা খনিজ বলিতে পারি না; বাংলা-দেশের সমুদ্রোপকূলে এককালে বহুলক্ষ নুনিয়া লবণ তৈয়ারী করিত; নুনের কাজ বন্ধ হওয়ায় তাহারা বেকার হয়। পুনরায় পুনরুদ্ধারের চেষ্টা হইতেছে। কয়লার খনি নূতন শিল্প; শতাধিক বৎসর পূর্বে রাণীগঞ্জের কয়লার খনি নগণ্য শিল্পের মধ্যে ছিল। বর্তমানে বাংলায় ২০৮টি খনি আছে ও সেগুলিতে ৪৪,৩০৩ জন শ্রমিক কাজ করে; ইহাদের মধ্যে খাদের নীচে কাজ করে প্রায় ত্রিশ হাজার। অন্য ধাতুর ৮টি অকিঞ্চিৎকর খনি আছে। সেগুলিতে ৮৭৪ জন লোক কাজ করে। পুরুষ ও মেয়ে উভয় শ্রেণীর কুলি খাদে কাজ করিত; অধুনা মেয়েদের খাদের মধ্যে নামিতে দেওয়া হয় না বলিয়া শ্রমিকদের নূতন আর্থিক সমস্যা দেখা দিয়াছে। শ্রমিকদের অধিকাংশই কোল, সাঁওতাল। ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা করিয়া ইহাদের খাটিতে হয়। খাদের নীচে গ্যালারী বা কয়লাকাটার জায়গায় অত্যন্ত ধুলা ও বিষাক্ত গ্যাস থাকে। খাদে কাজ তিন রকমের—কয়লাকাটা, গাড়ী বা বাল্‌তিতে ভর্তি করা ও খাদের মুখে ঠেলিয়া আনা। এসব কাজে পুরুষরা দৈনিক ॥০ হইতে ॥৶০ আনা এবং মেয়েরা ।/০ আনা হইতে ।৶০ আনা রোজগার করে। মজুরী টন্‌ হিসাবে দেওয়া হয়; একটা গ্যাঙে দৈনিক দু'টনের বেশি কাটিতে পারে না; সুতরাং তাহাদের উপার্জনটার একটা আন্দাজ পাওয়া যায়।

বাংলার খনিতে ১৯৩১ সালে ৫৫৯৬ স্ত্রীলোক খাদের ভিতর কাজ করিত। ১৯৩৭ হইতে খাদের নীচে স্ত্রীলোকের কাজ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

বাংলা ও বিহারে ১৯৩১ সালে ১৮৭ টন্ কয়লা একজন কুলি বৎসরে কাটে। রাণীগঞ্জের খাদের ভিতরে ফোরম্যান ও সর্দাররা দৈনিক গড়ে ১/৩ পাই, (ঝরিয়া ১।/০) খনিক ॥৶০, (ঝরিয়া ॥৶১০) তোলানী ॥/:০, (ঝরিয়া ॥৶১০), নিপুণ মজুর ॥৶১০ (ঝরিয়া ৸০), সাধারণ মজুর ॥৶১০ (ঝরিয়া ৸০), স্ত্রী মজুর ।৵১০ (ঝরিয়া ।৶০) পাইয়াছিল। বাহিরের কাজে প্রত্যেকেই এক আনা দুই আনা কম পায়।

এইবার শ্রমিকদের তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ যাহারা কৃষিজাত ও খনিজাত সামগ্রী প্রস্তুত করে, তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। ধান হইতে চাল করাটা বর্তমানে মিলের ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। বাংলা দেশে সাড়ে তিনশ' ধানের কলে প্রায় হাজার চল্লিশ লোক কাজ করে; তার মধ্যে কলিকাতার টালিগঞ্জে প্রায় ৭০টী ধান কল আছে, ও সেখানেই হাজার পনের লোক কাজ করে। কুলিদের মজুরী চারি আনা হইতে ছয় আনার বেশি নয়; তবে মিস্ত্রি, টিণ্ড্যাল প্রভৃতিরা বেশি মাহিনা পায়।

বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্প পাট; বাংলার পাট কলের সংখ্যা ৯৪টি। কিন্তু এই কয়টি কলে যে কুলি খাটে, তার সংখ্যা ১৯৩২ সালে ২,৫৪,০০০; ১৯২৫ সালে ছিল ৩,৩৮,০০০। ৮২,০০০ কুলি ছয় বছরে কমিয়াছে; ১৯২৯ সালের বৃদ্ধি ধরিলে প্রায় লাখো লোক তিন বছরে বেকার হইয়াছে। যাহা হউক বর্তমানে এই সংখ্যা বাড়িয়াছে।

বাংলার চটকলের অধিকাংশ মালিক সাহেব; কয়েকটি মাড়োয়ারীদের, একটি মাত্র বাঙালীর। শ্রমিকদের অধিকাংশই বাংলার বাহিরের লোক। মজুররা সপ্তাহ হিসাবে বেতন পায়; সপ্তাহে ৫০।৬৬ ঘণ্টা খাটিতে হইত; মন্দা বাজারে কাজ কমাইয়া, 'হপ্তা' কাটিয়া, তাঁত বন্ধ রাখিয়া, দর বাড়াইবার চেষ্টা হইয়াছে। যখন চারিদিনে হপ্তা হয়, তখন তাহারা মজুরী পায় ২৸৯ হইতে ৮৵৯ পাই; পাঁচদিনে 'হপ্তা' হইলে ৩।/৯ পাই হইতে ৯॥০ পর্যন্ত পায়; এগুলি হইতেছে রাতদিন যেসব তাঁত চলে তাদের হিসাব। ব্যক্তিগত তাঁতের কাজে মজুরদের ৪।/৩ পাই হইতে ৯॥০ পাওনা হয় হপ্তায়। এখানে

সাড়ে পাঁচদিনে 'হপ্তা' ধরা হয়। সুতরাং মাসে ১৩৷৷০ হইতে ৩৮/ টাকা পর্যন্ত রোজগার লোকে করে; কিন্তু এথেকে ৫৲ হইতে ১২৲ পর্যন্ত নানাভাবে সর্দারদিগকে ঘুষ দিতে তাহাদের যায়।

১৯৩২ সালের শেষে বাংলাদেশে নানা প্রকারের চালু ফ্যাক্টরীর সংখ্যা ছিল ১৪৮৭, ১৯৩১ সালের হইতে ১৬টি বেশি।

ফ্যাক্টরী বলিতে গবর্মেণ্টের আইনে বুঝায় যে কারখানায় ২০ জনের অধিক শ্রমিক কাজ করে; ফ্যাক্টরী আইনের মধ্যে পড়িলে কারখানার মালিকদের অনেক অনাচার সরকারী ইন্সপেক্টরদের চোখে পড়ে। সেইজন্য ছোট ছোট ফ্যাক্টরীতে কুড়ি জনের কম লোক রাখে এবং অনেক সময়ে একই কারখানাকে দুইতিনটি ভাগে বিভক্ত করিয়া দেয়। কিন্তু অধুনা ইন্সপেক্টরগণ বেশ কড়াকড়ি করায় মালিকদের জুয়াচুরি বন্ধ হইতেছে।

১৯৩২ সালের শেষে সকল প্রকার কারখানার শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৪,৫৪,০০০; ১৯৩১ সালে ৪,৮০,৪৩৯; ১৯৩০ সালে ৫,৬৩,৮৭৭; ১৯২৯ সালে ৫,৮০,৮৬০। সুতরাং দেখা যাইতেছে পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্য দুর্দিনে বাংলার প্রায় প্রত্যেক শিল্পই অল্পবিস্তর আঘাত পাইয়াছিল!

১৯২৩ সালে বাংলাদেশে সকল প্রকার বড় কারখানার সংখ্যা ছিল ৯৭৫; সেই হইতে কারখানার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া চলিয়াছিল এবং দশ বৎসরে ১৪৮৭ হইয়াছিল। এইসব ফ্যাক্টরীতে শ্রমিকদের সংখ্যা ১৯২৩এ ৫ লক্ষ ১৭ হাজার হইতে ১৯২৯-এ ৫ লক্ষ ৮০ হাজার পর্যন্ত উঠিয়াছিল। ইহার পর কমতির মুখে কারখানাগুলি চলিল; কারখানার সংখ্যা বাড়িল; কিন্তু শ্রমিক কমিল; এই কমতি বেশি হইয়াছে পাট কলে, জুট প্রেসে, রেলওয়ে ওয়ার্কশপে, জাহাজের কারখানায়, গবর্মেণ্টের ছাপাখানা ও আরও কয়েকটি কারখানায়।

কিন্তু শ্রমিকের সংখ্যা বাড়িয়াছে, কতকগুলি শিল্পে, প্রধানত ধান কলে, কাপড়ের কলে, দেশলাই-এর কারখানায়, গেঞ্জির কলে, কাগজের কলে, রবারের কারখানায়। বাংলায় নূতন নূতন শিল্প আরম্ভ হইতেছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ধানকলের কারখানা নূতন শিল্প; যুদ্ধের পূর্বে এই শিল্প বাংলাদেশে তেমন প্রসার লাভ করে নাই। যুদ্ধের পূর্বে জার্মেনি লক্ষ

লক্ষ মণ ধান আমদানী করিত ও চাল করিয়া য়ুরোপের নানাস্থানে পাঠাইয়া দিত। যুদ্ধের সময় সেখানকার সেই শিল্প নষ্ট হয়; বাংলাদেশ সেই সুযোগে ইহা গ্রহণ করে।

শিল্প সম্বন্ধে আর একটি জিনিষ বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে; বাংলাদেশের কতকগুলি শিল্প বিশেষ কেন্দ্রে গড়িয়া উঠিয়াছে। বাংলার অধিকাংশ শিল্পকেন্দ্র নূতন শহর বা পল্লীতে গড়িয়া উঠিতেছে। কলিকাতা, ২৪-পরগণা, হাওড়া ও হুগলী হইতেছে বারো-আনি শিল্পের কেন্দ্র; কতকগুলি শিল্প কেবলমাত্র কলিকাতা ও গঙ্গার উভয় তীরে অবস্থিত, যেমন পাটকলগুলি। কাপড়ের কল অধিকাংশই কলিকাতা হইতে ১৫।২০ মাইল বৃত্তের মধ্যে। বাংলার ৩৩০টি ধান কলের মধ্যে ২৪-পরগণাতেই ১২৯টি অবস্থিত। ট্যানারীগুলি কলিকাতাতেই।

ট্যানারী সম্বন্ধে আমরা বিস্তৃতভাবে অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি; এখানে সংক্ষেপে বলিয়া রাখি, বড় ফ্যাক্টরী অনেকগুলিই উঠিয়া গিয়াছে বটে তবে ছোট ছোট কারখানা বহু শত গজাইয়াছে। এগুলির মালিক ধাপাগাঠের চীনা ও বালিগঞ্জের রেলের ধারের পাঞ্জাবী চামাররা। পরিবারের লোকেরা দুই চার জন কুলি লইয়া এক একটি ছোট কারখানা খুলিয়াছে।

ফ্যাক্টরীর মজুরের কথা ছাড়িয়া দিয়া যানবাহনের চালক-বাহকের কথা ধরা যাক্। রেলওয়ে কারখানায় ১১।১২ হাজার লোক লিলুয়া, কাঁচরাপাড়া, খড়্গপুর, সোদপুর, পাহাড়তলীর কারখানায় কাজ করে; এছাড়া রেলওয়ে কুলি, পথ-মেরামতির কুলি, কণ্ট্রাকটার মিস্ত্রিদের সঙ্গের কুলি, ইঞ্জিনের ড্রাইভার, ফায়ার-ম্যান প্রভৃতি বহু সহস্র লোক কাজ করে। ইহাদের মধ্যে খাঁটি বাঙালী শ্রমিক কম হইলেও যাহারা কাজ করে, তাহাদের অধিকাংশই বাংলার বাসিন্দা। ষ্টীমার জাহাজের লস্কররা নোয়াখালি ও চট্টগ্রামের লোক; ইহারা পূর্বসাগরের সকল শ্রেণীর জাহাজেই দক্ষতার সহিত কার্য করিয়া আসিতেছে। গত পনের বৎসরের মধ্যে মোটর বাসের চলন পৃথিবীতে অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে; য়ুরোপ ও আমেরিকার মোটর-শিল্পিগণ অজস্র মেসিন নির্মাণ করিয়া সর্বত্র সস্তায় চালান দিতেছে; বাংলাদেশেও চলাফেরার এই নূতন সুলভ ও দ্রুত যান আসিয়াছে ও শহরে গ্রামে যেখানে

রাস্তা একটু ভাল সেখান দিয়া চলাফেরা সুরু করিয়াছে। বাংলাদেশে কমপক্ষে প্রায় ৫০ হাজার লোক আজ মোটর চালাইবার লাইসেন্স পাইয়াছে। কলিকাতার ট্রাম কোম্পানীতে বহু শত লোক কাজে নিযুক্ত; ইহারা ২৪৲ বেতন পায়; ইন্সপেক্টার ৪৫৲ করিয়া। দুই শিফ্‌ট কাজ করে। বাসের ও ট্যাক্সির কাজ অনেক সময়ে মালিকরা নিজেরাই করে।

বাংলার কলের শ্রমিকদের অধিকাংশই অবাঙালী। বর্ত্তমানে শ্রমিকদের শতকরা ৯০ ভাগ আসে বাঙলার বাহির হইতে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বাংলার কলকারখানা যদিও এত উন্নতি লাভ করে নাই, তথাচ তখনকার প্রয়োজনীয় শ্রমিক অধিকাংশই বাংলাদেশ হইতে পাওয়া যাইত। টিটাগড়ের কাছে কয়েকটি কলে ১৯০২ সালে বাঙালী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২৮ ভাগ, ১৯১৬ সালে তাহা হ্রাস পাইয়া হয় শতকরা ১০ ভাগ মাত্র, বর্ত্তমানে ২ ভাগ কিনা সন্দেহ।

বাংলাদেশের মিলগুলির মালিক বিদেশী, মিলগুলির শ্রমিক পরদেশী! ভদ্রেশ্বরের একটি চট্‌কলে ১৯২৯ সালে ৬,২০০ জন লোক কাজ করিত, ইহার শতকরা ১২ জন মাত্র বাঙালী, অবশিষ্ট ৮৮ জন অবাঙালী। এই মিল ১৯২৮ সালে ১৬'৪৬ লক্ষ টাকা শ্রমিকদের মজুরী হিসাবে দেয়; ইহার মধ্যে ডাকঘর মারফৎ ঐ স্থান হইতে উক্ত বৎসরে ৩'৮৮ লক্ষ টাকা বাংলার বাহিরে যায়। ১৯২৮-২৯ সালে জুট-মিলে ৩,৪০,০০০ শ্রমিক কাজ করিত; শ্রমবিনিময়ে তাহারা ৮'৫০ কোটি টাকা পাইয়াছিল; ইহার মধ্যে ৭'৬৫ কোটি টাকা অবাঙালীদের প্রাপ্য হয়। ২ কোটি টাকা ইহারা নিজ গ্রামে ডাকযোগে পাঠায়; এছাড়া ছুটির সময়ে, আত্মীয়-স্বজনদের হাত দিয়া কত টাকা পাঠায়, তাহার হিসাব পাওয়া যায় না।

সমগ্র বাঙলায় শ্রমিকগণ কত রোজগার করে, ইহার কত অংশ বাংলাদেশে থাকে এবং কত অংশ বাহিরে যায়, তাহার কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। বাঙালীর এই দুর্গতির কারণ কি? প্রথমেই দেখা যায় বাঙালী অবাঙালী হইতে শারীরিক শক্তিতে হীন; ইহার প্রধান কারণ বলাই বাহুল্য, বাঙলার ম্যালেরিয়া। দ্বিতীয়ত বাঙালীর ঘরসংসারের আদর্শ বাহিরের জাতি হইতে উচ্চ। মিল-মণ্ডলে মানুষ যেভাবে বাস করে, তাহা সাধারণ বাঙালীর পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব। বাঙালীর মেয়েরা সহজে বস্তিতে বাস করিতে রাজি হয় না।

বাংলার মিলমগুলের বস্তির অবস্থা যে কি শোচনীয়, তাহা সাধারণে বেশি জানেন না; এবিষয়ে কাগজপত্রেও বেশি আলোচনা হয় না; কেন হয় না তাহার গূঢ়তত্ত্ব আমরা জানি না। ১৯২৭ সালে বৃটীশ পার্লামেন্টের দ্বারা নিয়োজিত রয়্যাল শ্রমিক কমিশন ভারতের শ্রমিকদের অবস্থা দেখিবার জন্য এদেশে আসেন। নৈহাটির নিকটবর্তী ভাটপাড়া ম্যুনিসিপালটির অন্তর্গত কলের 'বস্তি'গুলি দেখিয়া জনৈক সদস্য যে প্রতিবেদন দেন, তাহা পাঠ করিলে বুঝা যায়, এদেশে জনমত বস্তিসম্বন্ধে কত নীরব। বাংলার খাদ্য-বিভাগের কর্তা লিখিয়াছিলেন যে, এখানকার শিশুদের খুব কম সংখ্যাই দশ বৎসর পর্যন্ত বাঁচে; ঘর, বাড়ী, পায়খানা, উঠান অসম্ভব নোঙরা; সেখানে অর্ধেক শিশু বাঁচে না। বস্তির নৈতিক অবস্থা আরও শোচনীয়; বাংলা সাহিত্যে এ সম্বন্ধে যেসব গল্প বাহির হয়, তার অনেকগুলি প্রত্যক্ষদর্শীর লেখা।

বাংলার স্বাস্থ্য, বাঙালীর স্বাস্থ্য, নৈতিক ও আর্থিক জীবন,—সমস্ত আজ মরণ-পথে চলিয়াছে; গবর্মেণ্ট, কংগ্রেস ও লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান সমূহ একযোগে কাজ না করিলে বাঁচিবার উপায় নাই। বাংলার এই শ্রমিক অসঙ্ঘবদ্ধ ছিল; কিন্তু ইহাদের মধ্যে ট্রেড্ য়ুনিয়ন হইতেছে, বিশেষভাবে ডক্ শ্রমিকদের য়ুনিয়ন উল্লেখযোগ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় ধনিকদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার চেষ্টামাত্র করিলেই তাহাকে নষ্ট করিবার জন্য কেবল মালিকরা দাঁড়ান তাহা নহে, গবর্মেণ্টও ধনিকদের সহায়তা করেন; কারণ তাঁহারা ইহার মধ্যে 'কম্যুনিজম্' আশঙ্কা করেন। বাংলাদেশে গুটি ৪০।৫০ য়ুনিয়ন আছে; কিন্তু বোম্বাই-এর শ্রমিক য়ুনিয়ন অধিক কৃতকার্য হইয়াছে; তাহার কারণ সেখানকার অধিকাংশ মজুরই মারাঠী ও মালিকরা হয় পার্শী, নয় ভাটিয়া। মারাঠী-কুলিদের অনেকেই লেখাপড়া জানে। তাহারা একই ভাষা বলে ও বোঝে, তাহাদিগকে য়ুনিয়ন-এর কথা বুঝানো কঠিন নহে। বাংলার শ্রমিকরা, বেহারী, হিন্দুস্থানী, বাঙালী, ওড়িয়া, সাঁওতাল ইত্যাদি, ধর্মে—হিন্দু ও মুসলমান। বাংলায় খুব আধুনিক সময়ে পাটকল, চটকল, দিশলাই-কল, কাপড়কল প্রভৃতির শ্রমিকরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ট্রেড্ য়ুনিয়ন গঠন করিয়াছে। ১৯৩৭-এ পাটকলের মজুররা যে শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট করে, তাহার ইতিহাস সর্বজনবিদিত। য়ুনিয়দের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন উঠিয়া ইহাদের বিভক্ত করিতেছে।

১৯২১ সালের পূর্বে strike বা ধর্মঘট এদেশের কলে অজ্ঞাত ছিল গত কয় বৎসর strike ও অন্যান্য ধরণের বিবাদ কিভাবে হইয়াছে, তাহার তালিকা দেওয়া গেল :—

	বিবাদ	কত লোক জড়িত	কত দিন কাজ নষ্ট হইয়াছে
১৯২১	৩৯৬	৬,০০,৩৫১	৬৯,৮৪,৪২৬
১৯২২	২৭৮	৪,৩৫,৪৩৪	৩৯,৭৩,৭৩৭
১৯২৩	২১৩	৩,০১,০৪৪	৫০,৫১,৭০৪
১৯২৪	১৩৩	৩,১২,৪৬২	৮৭,৩০,৯১৮
১৯২৫	১৩৪	২,৭০,৪২৩	১,২৫,৭৯,১২৮
১৯২৬	১২৮	১,৭৬,৮১১	১০,৯৭,৪৭৮
১৯২৭	১২৯	১,৩১,৬৫৫	২০,১৯,৯৭০
১৯২৮	২০৩	৫,০৬,৮৫১	৩,১৬,৪৭,৪০৪
১৯২৯	১৪১	৫,৩২,০১৬	১,২১,৬৫,৬৯১
১৯৩০	১৪৮	১,৯৬,৩০১	২২,৬১,৭৩১
১৯৩১	১৬৬	২,০৩,০০৮	২৪,০৮,১২৩
১৯৩২	১১৮	১,২৮,০৯৯	১৯,২২,৪৩৭
১৯৩৩	১৪৬	১,৬৪,৯৩৮	২১,৬৮,৯৬১

(The Statesman, 23 June 1934, p. 4).

১৯৩৩ সালের ১৪৬টি বিবাদের মধ্যে ৮৭টি কাপড়ের ও পশমের কলে হয়। ;প্রায় শতকরা ৩০% বিবাদ কাপড়ের কলে।

সপ্তত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

বাণিজ্য

প্রাচীন কালের বাণিজ্য ছিল স্থানিক; স্থানীয় প্রয়োজন স্থানীয় শিল্পীর দ্বারা পূরণ হইত; সেযুগের রাস্তা ঘাট না ছিল ভারী যানবাহনের উপযুক্ত, না ছিল নিরাপদ। সুতরাং বাণিজ্য বলিতে বুঝিত স্থানিক হাট, বাজার, মেলায় সমবেত হইয়া জিনিষপত্রের ক্রয়-বিক্রয় বা বিনিময়। মুদ্রা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ও মহার্ঘ্য ছিল, অল্প মুদ্রায় প্রচুর সামগ্রী পাওয়া যাইত। সেইজন্য অধিকাংশ বিকিকিনি হইত বিনিময়ে। উত্তর ভারতের দুইটি প্রধান বন্দর ছিল, একটি পশ্চিমে ভৃগুকচ্ছ বা বরোচ, অপরটি পূর্বে তাম্রলিপ্তি। এইখান হইতে হিন্দু বণিক্‌রা সিংহল, সুবর্ণদ্বীপ, যবদ্বীপ-মালয় প্রভৃতি স্থানে যাইত। পরে আরবরা বাণিজ্য করিতে আসিল। তখন গৌড় বাংলার রাজধানী; মুসলমান যুগ আরম্ভ হইয়াছে। পূর্বদ্বীপালি হইতে নানাবিধ মশলাপাতি, শঙ্খ, বাংলায় আসিত; বাংলা হইতে লঙ্কা-মরিচ, কাপড়, চিনি কিছু কিছু রপ্তানী হইত। এমন সময়ে পর্তুগীজরা ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ায় বাংলায় আসিল; পশ্চিম ভারতের 'গোয়া'য় ছিল তাহাদের প্রধান আড্ডা। ১৫১৭-১৮ সাল হইতে তাহারা বাংলাদেশে আসিতে সুরু করে; তখন স্বাধীন পাঠানরা বাংলার রাজা। সপ্তগ্রাম ও চট্টগ্রাম বাংলার শ্রেষ্ঠ বন্দর (১৫৩৬-৩৭)। ইতিপূর্বে গৌড় মড়কে উৎসন্ন গিয়াছিল। সাতগাঁও-এর সহিত দিল্লী সংযোজিত করিবার জন্য শের শাহ্ এক রাজপথ নির্মাণ করেন। ইহাই বর্তমানে Grand Trunk Road নামে পরিচিত। সাতগাঁও ও পরে হুগলী পর্তুগীজদের ব্যবসার বড় কেন্দ্র হইয়া উঠিল (১৫৮০)। পর্তুগীজরা আসিয়াছিল বাণিজ্য করিতে। প্রথম প্রথম জাহাজ লইয়া আসিয়া মালপত্র বেচিয়া কিনিয়া চলিয়া যাইত। পর্তুগীজদের পরে আসিল ডাচ্ বা ওলন্দাজগণ। পর্তুগীজরা পূর্ব এশিয়া হইতে মশলাপাতি, চীন হইতে নানারূপ

সৌখীন জিনিষ আনিয়া বিক্রয় করিত। কালে পূর্ব দ্বীপালির আরব-বাণিজ্য তাহারা কাড়িয়া লইল। যেমন করিয়া এককালের হিন্দুবাণিজ্য আরবদের কাছে পরাভূত হইয়াছিল, তেমনি ভাবেই। পর্তুগীজরা কেবল বাণিজ্য করিয়া খুশী রহিল না; রাজ্য জয়ের চেষ্টা, দেশে লুঠতরাজ, অধিবাসীদিগকে খৃষ্টান করিবার জন্য উগ্র চেষ্টা করিতে লাগিল। এই সব কারণে ইহারা মুসলমান শাসনকর্তাদের চক্ষুশূল হইয়া উঠিল ও অবশেষে শাহ্‌জাহানের সময় তাহারা বাংলাদেশ হইতে বিতাড়িত হইল।

ইংরেজ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৬০১ সাল হইতে পূর্বভারতীয় দ্বীপালিতে বাণিজ্য সুরু করে; বাংলাদেশে তাহারা বাণিজ্য সুরু করে ১৬৪০ সালে। এদেশ হইতে কাপড় বিশেষভাবে মসলিন, রেশম, চিনি প্রভৃতি রপ্তানী হইত; হুগলী, কাশিমবাজার পাটনায় তাহাদের কুঠি ছিল। তখন মেশিন আবিষ্কৃত হয় নাই; তবে শিল্পী ও শ্রমিকদের কারখানায় আনিয়া কাজ করিবার প্রথা এই সময়ে প্রবর্তিত হয়।

সায়েস্তা খাঁ যখন সুবেদার সেই সময়ে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান কর্তা John Child সর্বপ্রথম ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখেন। তিনি চট্টগ্রাম কাড়িয়া লইবার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু অকৃতকার্য হন। তখন সায়েস্তা খাঁ ইংরেজদিগকে হুগলী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। ইংরেজরা মক্কাগামী জাহাজ আটকাইয়া ইহার প্রতিশোধ লইতে সুরু করিলে আওরঙজেব প্রমাদ গণিলেন এবং ইংরেজদিগের সহিত সন্ধি করিয়া কলিকাতার গ্রামে বাস করিবার ও বাংলায় বাণিজ্য করিবার অনুমতি দিলেন। ১৬৯০ সালে জব চার্ণক কলিকাতা স্থাপন করিলেন। ১৬৯৮ সালে কোম্পানী কলিকাতা, সুতানটি ও গোবিন্দপুরের তালুক ক্রয় করিলেন। ১৭০০ সালে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম নির্মিত হইল। আওরঙজেবের মৃত্যুর পরে তাহারা অনেক উন্নতি করিয়া লয়। ১৭১০ সালে কলিকাতা-ফোর্টের ইংরেজ গবর্ণর নিযুক্ত হয় ও সেই হইতে ধারাবাহিকভাবে গবর্ণরের ধারা চলিয়া আসিতেছে।

১৭১৭ সালে কোম্পানী দিল্লীসম্রাট্ ফরাকশায়ারের নিকট হইতে বাংলাদেশে বাণিজ্য করিবার ফরমান লাভ করে। ইহার ইতিহাস হইতেছে এই: ১৬৫৬ সালে সুবাদার শাহ্ সুজা ইংরেজকে তিন হাজার টাকা খাজনায়

বাংলায় বাণিজ্য করার অনুমতি দেন। কিন্তু পরবর্তী সুবেদার মুর্শিদকুলি খাঁ খুব পাকা অর্থনীতিবিদ্ ছিলেন; তিনি পুরাপুরি শুল্ক আদায় করিতেন। তখন কোম্পানী দিল্লী গিয়া ফরমান আনে; এই ফরমান অনুসারে ইংরেজ কোম্পানী বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিবার অনুমতি পায়। মুর্শিদকুলি খাঁ এই দস্তকানুযায়ী আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্য-শুল্ক ছাড়িলেন, কিন্তু আভ্যন্তর বাণিজ্যে-শুল্ক লইতেন। কিন্তু তখনো আভ্যন্তর বাণিজ্য তেমন বিস্তার লাভ করে নাই।

কোম্পানীর এই বাণিজ্য-সুবিধা হওয়ায় কলিকাতা অল্পকালের মধ্যে বহু জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল। ১৭৫৬-এ কলিকাতায় বহির্বাণিজ্যের মূল্য ১০ লক্ষ পাউণ্ড দাঁড়ায় এবং বৎসরে খান ৫০ জাহাজ বন্দরে আসিত যাইত। ১৭০৬ অব্দে কলিকাতার জনসংখ্যা ছিল হাজার বাইশ; পঞ্চাশ বৎসর পর লক্ষাধিক হইয়াছিল। হুগলি বহুকাল পর্যন্ত বড় বন্দরই ছিল; ১৭২৮ সালে 'সৈয়ব বক্সবন্দর' বা বিদেশীমালের উপর শুল্কের আয় ছিল ২,২১,৯৭৫৲ টাকা; শুল্কের হার ছিল ২॥০%। এ ছাড়া নয়টি 'গঞ্জ' হইতেও প্রায় আড়াই লাখ টাকা আয় হইত।

কোম্পানীই যে কেবল বাণিজ্য বিনাশুল্কে করিতে লাগিল তাহা নহে,— সম্রাটের 'দস্তক' কোম্পানী নিজ কর্মচারী বা বাহিরের লোকের কাছে বিক্রয় করিয়া বিনাশুল্কে ব্যবসায় চালাইতেন। যাহা হউক ইংরেজ কোম্পানীর বাণিজ্য বাহিরে ও ভিতরে নানা বাধা সত্ত্বেও বাড়িতেছিল। একটা হিসাব হইতে জানা যায় যে, ১৭১১ সালে কোম্পানী যে মাল ৪৩,০০০ পাউণ্ডে ক্রয় করে, তাহা ফ্রান্সে ১,৫০,০০০ পাউণ্ডে বিক্রীত হয়। ফরাসীরা ছিল ভারতীয় রেশম, মস্‌লীন প্রভৃতির বড় খরিদ্দার।

বাংলাদেশে কোম্পানী আসিয়া এখানকার বস্ত্র, রেশমী কাপড়, রেশম, সোরা রপ্তানী করিত। ১৬৬৬ সালে কোম্পানী সর্বপ্রথম ঢাকাই মসলিন ইংলণ্ডে পাঠায় এবং অল্পকালের মধ্যে এই কাপড়ের নানারূপ ব্যবহারের ফ্যাশান ধনীদের মধ্যে দেখা দেয়। শুধু মস্‌লিন নহে, রঙীন ছিটও তাহাদের খুব পছন্দ হইত। সপ্তদশ শতাব্দীতে এই সব মাল বিলাতে খুব চলিয়াছিল, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়া হইতে ইংলণ্ডে বাংলার কাপড় ও রেশমের বিরুদ্ধে খুব একটা অভিযান সুরু হয়। ইংরেজদের ধারণা ছিল—বাংলাদেশ

ইংলণ্ড হইতে সোনা-রূপা টানিয়া লইয়া যাইতেছে। পার্লামেণ্ট আইন করিয়া বাংলার কাপড় প্রবেশ নিষেধ, পরিধান নিষেধ করিয়া দিলেন। ইহাতে কোম্পানীর বাণিজ্যের খুব ক্ষতি হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলাদেশ কোম্পানীর কবলে পড়িল; তখন হইতে কোম্পানী বাংলার শাসক ও ব্যবসায়ী একাধারে হইল। পলাশীর যুদ্ধের পর (১৭৫৭) পঁচিশ বৎসরের মধ্যে বাংলা হইতে ইংলণ্ডে নানাভাবে প্রায় ৩ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড গিয়াছিল, তাহা সাধারণ ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন; এ ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে বহু লক্ষ টাকা সে-দেশে যায়; বোম্বাই, মান্দ্রাজের যুদ্ধের জন্য খরচ বাংলা থেকে যোগান হইত। এই সব নানা কারণে বাংলার বাসিন্দা নিঃস্ব, বাংলার রাজকোষ শূন্য হইয়া গেল। বাংলার টাকা ইংলণ্ডে নূতন ব্যবসায়, বাণিজ্য, আবিষ্কার প্রভৃতিতে মূলধন যোগান দিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে ষ্টীম এঞ্জিন, কলের তাঁত, কলের চরকা প্রভৃতি নানা যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত ও রাসায়নিক বিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি হইল। বাংলার সঙ্গে যে প্রতিযোগিতা ছিল, তাহা উল্টাইয়া গেল; বাংলাদেশ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত শিল্পজাত সামগ্রী রপ্তানী করিত; তারপর হইতে ধীরে ধীরে বিলাতী শিল্পজাত দ্রব্য আমদানী স্থরু করিল, বাংলাদেশ চিরদিনই কাঁচামাল সরবরাহের কৃষিক্ষেত্র ছিল না। ফরাসী বিপ্লবের ফলে বিশেষভাবে ভারতীয় সূক্ষ্মবস্ত্র, গন্ধাদি দ্রব্যের চাহিদা য়ুরোপে লোপ পাইল; তারপর নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধের সময়ে য়ুরোপের বাজারে ভারতের জিনিষপত্র বিক্রয় প্রায় উঠিয়া গেল।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৮৪৬) বাংলাদেশে রেলপথ খোলা স্থরু হয়। রেলপথ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী বাণিজ্য বহুগুণ বাড়িয়া গেল। সিপাহী বিদ্রোহের পর রেলপথ অতিদ্রুত নির্মিত হইতে থাকিল; রেলপথ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী মাল দেশের ভিতর ও কাঁচামাল বন্দরে সহজে আমদানী হইতে লাগিল। কিন্তু তখনো জাহাজ আসিত আফ্রিকা ঘুরিয়া; ষ্টীমার কেবলমাত্র পালতোলা জাহাজের স্থান অধিকার করিয়াছে। ১৮৬৯ সালে স্থয়েজ খাল কাটা হইলে ভারতীয় বাণিজ্যে যুগান্তর উপস্থিত হইল।

পথ কমিয়া গেল, জাহাজের সময় কম লাগিল ; ফলে যাওয়া-আসার খরচ কমিয়া গেল। সুতরাং বলা যাইতে পারে ১৮৭৭ সাল হইতে বিদেশী কারবার দ্রুত প্রসার লাভ করিতে আরম্ভ করিল।

বহু প্রকারের বাণিজ্য দেশের অর্থাগমে সহায়তা করে। যথা :— (১) আন্তর-বাণিজ্য, (২) আন্তর-প্রাদেশিক বাণিজ্য, (৩) সীমান্ত-বাণিজ্য, (৪) উপকূল-বাণিজ্য, (৫) বৈদেশিক বাণিজ্য।

আন্তর-বাণিজ্য

প্রথমতঃ আন্তর-বাণিজ্য ; অর্থাৎ দেশের মধ্যে যেসব সামগ্রী বা শস্য বা কাঁচামাল প্রস্তুত হয়, তাহা দেশের মধ্যেই ক্রয়-বিক্রয় হয়। এইসব মাল মানুষের মাথায়, গরুর গাড়ীতে, নৌকায়, রেলে, ষ্টীমারে, মোটর লরীতে একস্থান হইতে অন্যস্থানে স্থানান্তরিত হয়। পাঁচ কোটি লোকের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য-সামগ্রী, গো-মহিষের খাদ্যশস্য খৈল ভুষি প্রভৃতি, দেশের মধ্যে প্রস্তুত কাপড়-চোপড়, তা ছাড়া বিদেশ হইতে আমদানী মাল হাটে, বাজারে, দোকানে বিক্রয় হয়, ফেরিওয়ালারা ফিরি করিয়া বিক্রয় করে। এইভাবে প্রকাণ্ড আন্তর-বাণিজ্য দেশের মধ্যে চলিতেছে ; ইহার মূল্য যে কত তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য। তবে গড়ে যদি মাথাপিছু ত্রিশ টাকাও খাওয়ার জন্য খরচ ধরা যায়, তবে বৎসরে লটকান বা মুদির দোকান বা হাটে বাজারে বিকি-কিনির পরিমাণ খুব কমসে-কম ১৫০ কোটি টাকা হইবে অনুমান করা যাইতে পারে। এ ছাড়া কাপড়, ঔষধ প্রভৃতি বহুবিধ সামগ্রী প্রয়োজনীয়। ইহার মূল্য ১৫০ কোটী টাকার কম হইবে না।

তবে কতকগুলি মাল কলিকাতার বন্দরে আসে রপ্তানীর জন্য ; সেগুলিকে আমরা ঠিক আন্তর-বাণিজ্যের মধ্যে ফেলিতে পারি না।

আন্তর-প্রাদেশিক বাণিজ্য

আন্তর-বাণিজ্যের পরই আন্তর-প্রাদেশিক বাণিজ্য ; বাংলাদেশে উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ বন্দর রহিয়াছে। যুক্তপ্রদেশ, বিহার-উড়িষ্যা, আসামের আমদানী মাল অনেকখানি বাংলার ভিতর দিয়া যায় এবং রপ্তানীর মালও বাংলার উপর দিয়া যায়। এ ছাড়া বাংলাদেশ বিহার হইতে কয়লা, দাইল, তরি-

তরকারী, আখ প্রভৃতি আমদানী করে নিজ ব্যবহারের জন্ত; যুক্তপ্রদেশ হইতে গম, ছোলা, সরিষা প্রভৃতি ক্রয় করে খাদ্যের জন্ত; আসাম হইতে চা ও শস্ত আনে, বোম্বাই হইতে তুলা, বস্ত্র ইত্যাদি আনে। ছোট খাটো জিনিষের নাম বাদ দিলাম। আবার বাংলাদেশ পাঠায় পাটের ছালা, ব্যাগ, ঔষধ, তামাক, চা ইত্যাদি। মোট কথা, বাংলাদেশ যা কেনে, তা কাঁচা মাল নিজ ব্যবহারের জন্য, আর যা পাঠায় যেমন পাটজাত সামগ্রী তার মালিক বাঙালী নয়, তার মালিক স্কচ পুঁজিপতিরা। কাঁচা পাট কেনে মাদ্রাজ। এই আন্তর-প্রাদেশিক বাণিজ্য চলে রেলে ও জলে।

আন্তর প্রাদেশিক বাণিজ্যের অনেক জিনিষ বাংলায় আসে, কিন্তু সবটাই যে বাংলায় ব্যবহৃত হয়, তাহা নহে। এসম্বন্ধে ১৯২০-২১ সাল পর্যন্ত গবর্মেণ্ট কৃত-তালিকা পাওয়া যায়; ইহার পর সেই তালিকা প্রকাশ করা বন্ধ হইয়াছিল। অধুনা আবার প্রকাশিত হইতেছে। ১৯২০-২১ সালের সংখ্যা ও তালিকা হইতে ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে, বাংলাদেশ কেবল নিজ ব্যবহারের জন্ত ১৪ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকার মাল বাহিরের প্রদেশ হইতে ক্রয় করে। বিদেশে রপ্তানী করিয়া যেটা উদ্বৃত্ত থাকে, সেইটাই বাংলায় ব্যবহার হইয়াছে এরূপ ধরা যায়; অন্য প্রদেশে ও বিদেশে রপ্তানী করিয়া বাংলাদেশে ১৯২০-২১ সালে কতখানি মাল ছিল ও তাহার মূল্য কত তাহা দেখা যাক্ :—

	বাংলায় ব্যবহৃত	মূল্য
কয়লা	১,৩০,৬০,০০০ হন্দর	৭৮,২৬,০০০৲
দাইল, ছোলা	৩১,২৭,০০০ ,,	৩,৫৫,৯৬,০০০৲
গম	৩০,৮৭,০০০ ,,	৪,১৮,৭৭,০০০৲
রেঢ়িবীজ	২২,৯৪,০০০ ,,	৩৮,৯২,০০০৲
চীনাবাদাম	৩,৬৬,০০০ ,,	৩২,৩২,৭০০৲
তিসী	১,৭৩,০০০ ,,	২৭,৭১,০০০৲
সরিষা	২৮,২৬,০০০ ,,	৪,৮০,২২,০০০৲
তিল	১৭,০০০ ,,	২,৯৪,০০০৲
		১৪,৩৫,৩৫,৭০০৲ টাকা

এই ১৪ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকার কাঁচা মাল ছাড়া শিল্পজাত সামগ্রীর যাহা অন্য প্রদেশ হইতে আসে তাহার মূল্য প্রায় ৭ কোটি টাকা। ডক্টর লাহা অনুমান করেন ১৯২৭-২৮ সালে বাংলাদেশে অবাংলার ৪৩ কোটি ৮২ লক্ষ গজ কাপড় আমদানী হয়, ইহার মূল্য ৫½ কোটি টাকা। লবণ বাংলাদেশে এক ছটাক তৈয়ারী হইত না; বিলাতী বা বিদেশী লবণ ছাড়া ভারত সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থান হইতে আমদানী লবণের মূল্যই ৬৪ লক্ষ টাকা (১৯৩১-৩২)। করোগেট চাদর ও অন্যান্য লোহা জামসেদপুরে টাটার কারখানা হইতে বাংলাদেশে আসে। কেবল মাত্র করোগেট ও প্লেন চাদর বাংলায় আসে প্রায় ৪১ লক্ষ টাকার। এছাড়া অন্য লোহাও আছে। বাংলায় কাপড়ের কলের জন্য বহু লক্ষ টাকার তুলা আসে বাহির হইতে; অন্য প্রদেশ হইতে আসে ৪৬ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকার।

এখন দেখা যাক্ বাংলাদেশ হইতে কি কি জিনিষ ও কত টাকার মাল অন্য প্রদেশে যায়। বাংলার প্রধান রপ্তানী মাল হইতেছে চাউল, পাটের জিনিষ, চা, কাগজ ইত্যাদি। ১৯২০-২১ সালের হিসাব পাওয়া যায়:—

সামগ্রী যাহা রপ্তানি হইয়াছিল	হন্দর	টাকা	নেট রপ্তানীর মূল্য টাকা
চাউল ...	৬১৭২৮২১	৯,২৫,৯২,০০০	
বাদ আমদানী	১৬৯২৫৮১	২,৩৬,৯৬,০০০	
মোট আমদানীর মূল্য			৬,৮৮,৯৬,০০০
পাটসামগ্রী	২০,৩৯,০৬৩		৫,০৭,৫০,০০০
চা	১৮৯,১৮৮		১,০৫,৯৪,০০০
কাগজ (পেস্টবোর্ড ছাড়া)	২,৩৫,৯৭৩		২৭,১৯,০০০
			টাকা ১৩,২৯,৬০,১৮১

এই যে রপ্তানী মালের তালিকা দেওয়া গেল, ইহার মধ্যে যেসব শিল্পজাত সামগ্রীর নাম করা গেল তার অধিকাংশই বিদেশী ধনিকদের কারবার-জাত। বাংলাদেশ ২১ কোটি টাকার কাঁচামাল কেনে, তার অধিকাংশই খাদ্যশস্য সুতরাং সাধারণ বাঙালী কেনে; আর পাঠায় মাত্র ১৩ কোটি টাকার মাল।

সুতরাং প্রতিবৎসর বাংলা ৮ কোটি টাকা বাহিরের প্রদেশকে বাণিজ্যের হিসাবে দেয়। অবাঙালী যাহারা বাংলায় চাকুরী ব্যবসায় করিয়া লাভের অংশ নিজদেশে পাঠায় তাহার অঙ্ক পাওয়া যায় না; সেটি প্রত্যক্ষ বাণিজ্যের অন্তর্গত না হইলেও পরোক্ষ ভাবে পড়ে।

আন্তর বাণিজ্যের বিস্তৃত বিবরণ ও সংখ্যা (Statistics) পাওয়া যায় না বটে, তবে রেলে ও নদীতে কত টাকার জিনিষ আমদানী-রপ্তানী হয়, তাহাব হিসাব মোটামুটি পাওয়া যাইত। এই হিসাব দুই রকমের; একটি হইতেছে প্রদেশের মধ্যে আমদানী-রপ্তানী, অপরটি হইতেছে প্রদেশান্তরের আমদানী-রপ্তানী। অন্য প্রদেশ হইতে কলিকাতা ও অন্যান্য রেলষ্টেশন বা ষ্টীমারঘাটে যে মাল আসে, তাহার মূল্য যুদ্ধের পূর্বে ১৯১৩-১৪ সালে ছিল ৫৮ কোটি টাকার, ১৯২০-২১ সালে ৮০ কোটি, ১৯২১-২২ সালে ৬৭ কোটি। কলিকাতা ও অন্য স্থান হইতে রপ্তানীর ১৯২১-২২ সালে ছিল ৮৫ কোটি টাকা; ১৯১৩-১৪ সালে ছিল ৫৯ কোটি।

বাংলার নানাস্থান হইতে কলিকাতায় আমদানী মালের মূল্য ঐসময়ে ৪৯ কোটি হইতে ৬০ কোটি টাকা হয়। আর কলিকাতা হইতে বাংলার নানাস্থানে রপ্তানীর মূল্য ৪০ হইতে ৪৯ কোটিতে দাঁড়ায়।

দশ বৎসরে ১৯১২-১৩ হইতে ১৯২১-২২ পর্যন্ত বাংলার আন্তর, প্রদেশান্তর বাণিজ্যের মূল্য ১৭৩ কোটি হইতে ২৬২ কোটি টাকা হয়; মাঝে যুদ্ধের পর যখন জিনিষপত্রের দাম খুব চড়ে সেই সময়ে (১৯১৯-২০) মূল্য ৩১১ কোটি টাকার উপর ওঠে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ইহা হইতেছে রেল ও ষ্টীমার ষ্টেশনে লিখিত হিসাব হইতে পাওয়া তথ্য। কিন্তু গ্রামে গ্রামে হাটে হাটে যেসব জিনিষ বিকি-কিনি হয়, তাহার হিসাব ও সংখ্যা পাওয়া যায় না। সেসব ধরিলে বোধ হয়, বাংলার আভ্যন্তর বাণিজ্য ও ব্যবসায় ৫০০ কোটি টাকার উপর হইবে।

Dr. N. N. Law, Inter-provincial Trade of Bengal, Prafullachandra Ray Memorial Volume.

আন্তর প্রাদেশিক ও আন্তর বাণিজ্য

(হাজার টাকা)

	১৯২১-২২	১৯২০-২১	১৯১৯-২০	১৯১৩-১৪	১৯১২-১৩
১। অন্য প্রদেশ হইতে কলিকাতা ও অন্যত্র আমদানী	৬৭,৮০,২২	৮০,১৬,১৪	৮৯,৬৪,৩৪	৫৮,২৮,১৮	৪০,৮৫,৫৪
২। কলিকাতা ও অন্য স্থান হইতে অন্য প্রদেশে রপ্তানী	৮৫,৭৮,৬৬	৮৩,৭৫,২৪	৯১,৬৫,৩২	৫৯,২৮,০৪	৫৯,০০,৩৬
৩। বাংলার নানা স্থান হইতে কলিকাতায় আমদানী	৬০,২২,৫৯	৬৮,২৯,১৪	৭৯,২৬,৫৬	৪৯,৭২,৪৮	২৮,৮২,৭০
৪। কলিকাতা হইতে বাংলার নানা স্থানে রপ্তানী	২৯,০৩,০৯	৫২,৩১,৬৫	৫০,২২,৬১	৪০,২৬,৯৬	৪৪,৮০,৬৪
	২৬২,৮৪,৫৬	২৮৪,৫২,১৮	৩১১,৪৮,৮৩	২০৭,৫৫,৬৬	১৭৩,৪৯,২৮

সীমান্ত-বাণিজ্য

প্রদেশান্তর বাণিজ্য হইতে সীমান্ত-বাণিজ্য সম্বন্ধে পৃথক্ তথ্য সংগৃহীত হয়। বাংলার সীমান্ত বলিলে বুঝায় নেপাল, সিকিম, ভুটান ও তিব্বত। মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে, বাংলার সহিত নেপালের সংযোগ-সীমান্ত অতি সামান্যই; এতৎ সত্বেও সীমান্তের সেরা বাণিজ্য চলে নেপালের সঙ্গেই। কিন্তু নেপালের সীমানা বর্তমানে বেশির ভাগ পড়ে বিহারের ভাগে; রাক্সল ছিল কাঠমাণ্ডু ও নেপালে যাবার প্রধান সীমান্ত-নগর; সুতরাং বেশির ভাগ আমদানী-রপ্তানী হয় সেখান দিয়া। কিন্তু নেপাল হইতে যেসব জিনিষ আমদানী হয়, তার অনেকখানিই পরে বাংলায় আসে, আবার নেপালে যেসব মাল যায়, তার অধিকাংশই কলিকাতা হইতে কেনা হইয়া চালান হয়। সেইজন্য আমরা সীমান্ত বাণিজ্যকে কেবল বাংলার সংখ্যা দ্বারা বুঝাইব না, বিহারের সংখ্যাও ইহার সঙ্গে আলোচনা করিব। বঙ্গ ও বিহারের সীমান্ত বাণিজ্যের মোট মূল্য ছিল ১৮৯০-৯১ সালে ২ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা, ১৯০১ সালে ৩ কোটি টাকা, ১৯১১ সালে প্রায় ৪ কোটি, ১৯২০-২১ সালে ৭ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা মূল্যের, অর্থাৎ ত্রিশ বৎসরে তিনগুণ বাণিজ্য বাড়িয়াছে।

সীমান্ত দেশের সঙ্গে আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যের হিসাব নিকাশে দেখা যায়, বাংলা আমদানী করে বেশি টাকার মাল, রপ্তানী করে কম টাকার, অর্থাৎ বাণিজ্যের সুবিধা সীমান্তদেশগুলিরই থাকে; ১৮৯০-৯১ সালে বাংলা ও বিহারে আমদানী ছিল ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকার মাল, রপ্তানী ছিল ৯৯.৮ লক্ষ টাকার; ১৯২০-২১ সালে বাংলা-বিহারে আমদানী হয় ৫ কোটি ২৮ লক্ষ; সীমান্তপারে ২ কোটি ১৬ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হয়। পরবর্তী তালিকায় পাঠক দেখিবেন বরাবরই বাংলায় রপ্তানী হইতে আমদানীর মূল্য বেশী।

নেপাল, সিকিম, ভুটান ও তিব্বতের সহিত বাংলা-বিহারের সীমান্ত-বাণিজ্য

(লক্ষ টাকা)

	মোট বাণিজ্য			বাংলা বিহারে আমদানী		বাংলা বিহার হইতে রপ্তানী	
	বাংলা	বিহার	মোট				
১৯২৪-২৫	২০৩	৫৩৭	৭৪০	১৪০	৩৩৭	৬৩	১৯৯
১৯২৩-২৪	২১২	৫৫৮	৭৭০	১৬৪	৩৪৮	৪৮	২১০
১৯২২-২৩	২০৩	৪৯৭	৭০০	১৫৬	২৯৭	৪৭	১৯৯
১৯২১-২২	১৯৮	৫৪০	৭৩৮	১৬৯	৩৫৯	৩৫	১৮১
১৯২০-২১	২৪৪	৫২৪	৭৬৮	২০৫	৩১৫	৪৪	২০৯
১৯১৯-২০	২০২	৫৪০	৭৪২	১৫৭	৩১৭	৪৮	২২৩
১৯১৮-১৯	১৫৭	৫১১	৬৬৮	১২৩	৩৩১	৩৪	১৮০
১৯১৭-১৮	১৪৭	৩৮৯	৫৩৬	১১৯	২১৮	৩৪	১৭১
১৯১৬-১৭	১২৮	৪৪৮	৫৭৬	৯১	২৯৪	৩৬	১৫৪
১৯১৫-১৬	১১৯	৪১৫	৫৩৪	৮১	২৫৬	৩৭	১৫৯
১৯১৪-১৫	১১৩	৩৭২	৪৮৫	৭৬	২৪১	৩৬	১৩২
১৯১৩-১৪	১২৮	৪৩৫	৫৬৩	৮৫	২৯৫	৪৩	১৪০
১৯১২-১৩	৯৮	৪৫৮	৫৫৬	৪৯	৩২৪	৪৯	১৩৪
১৯০০-০১			৩০০	১৬৯		১৩১	
১৮৯০-৯১			২১৯	১২০		৯৯·৮	

উপকূল-বাণিজ্য

বাংলার বাণিজ্যের হিসাবে উপকূল-বাণিজ্য পৃথগ্‌ভাবে দেখানো হয় এবং বহির্বাণিজ্যের মধ্যে তাহার অঙ্ক ধরা হয় না। উপকূল-বাণিজ্য বলিতে বুঝায় বাংলার সহিত জাহাজে করিয়া যে বাণিজ্য বর্মার বা ভারতের নানা বন্দরের সহিত চলে। বলা বাহুল্য, এই উপকূল-বাণিজ্যের চৌদ্দ আনা চলে বর্মার সহিত। আমদানী মালের প্রধান জিনিষ হইতেছে বর্মার কেরোসিন

তেল, মোটর গাড়ীর তেল, কাঠ, চাল। অইল্ ইঞ্জিন প্রভৃতির প্রচলনের জন্য তেলের চাহিদা বাড়িয়া চলিয়াছে। মাদ্রাজ হইতে আসে নারিকেল তৈল, তুলা, মশলাপাতি; বোম্বাই থেকে আসে তুলা, লবণ; কোচিন থেকে আসে নারিকেলের দড়ির জিনিষ পত্র।

রপ্তানীর মধ্যে প্রধান হইতেছে ধান, চাল, দাইল, গম। পাটের ছালা, চট; চা একটা বড় রপ্তানী সামগ্রী; এ ছাড়া বিদেশী মালপত্র যা আসে, তার কিছু অংশ কলিকাতার বন্দর হইতে পুনরায় রপ্তানী হয়।

বাংলাদেশের এই উপকুল-বাণিজ্যের মূল্য ছিল ১৯১২-১৩ সালে ২৩ কোটি টাকার, ১৯২২-২৩ সালে ৩৮ কোটি, ১৯২৮-২৯ সালে ৪৩ কোটি। ইহার পর বাণিজ্যের মূল্য কমিতে থাকে; ১৯৩১-৩২ সালে ৩২ কোটি টাকাতে নামিয়া যায়। অবশ্য সে বৎসব ছিল মন্দার বৎসর।

বাংলার দুইটি বন্দর—কলিকাতা ও চট্টগ্রাম; চট্টগ্রাম হইতে সামান্যই মাল আমদানী-রপ্তানী হয়। কলিকাতায় যে মাল আসে বা কলিকাতা হইতে যে মাল অন্যান্য প্রদেশে যায়, তার সবখানির কৃতিত্ব বাংলার একার নহে; কলিকাতা সমস্ত উত্তর ভারতের অন্যতম বন্দর; সুতরাং কলিকাতার বাণিজ্য-গৌরবের জন্য যুক্তপ্রদেশ, বিহার-উড়িষ্যা, আসামও দায়ী। আমরা নিম্নের তালিকায় এই উপকুল-বাণিজ্যের হিসাব দিলাম।

উপকূল-বাণিজ্য সম্বন্ধে যে তালিকাটি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা ধীর চিত্তে পাঠ করিলে পাঠক দেখিবেন যে, যুদ্ধের পূর্বে বর্মা হইতে বাংলায় আমদানীর মূল্য কোনো বৎসরে কম ছিল এবং কম যে বৎসরে হইত না, সে বৎসরেও আমদানী ও রপ্তানীর মধ্যে ব্যবধানমাত্র দেড় কোটি টাকা ছিল। কিন্তু যুদ্ধের পর দেখা যাইতেছে, বাংলার উপকূলে রপ্তানী ও আমদানী দুইই বাড়িয়াছে। কিন্তু আমদানীর মূল্য ও রপ্তানীর মূল্যের মধ্যে পার্থক্য খুবই অর্থাৎ প্রতি বৎসর রপ্তানী হইতে আমদানীর মূল্য ৭ হইতে ১০ কোটি টাকা অধিক। অর্থাৎ বাংলাদেশ যে পরিমাণ জিনিষ বিক্রয় করে, তাহা হইতে অধিক মূল্যের জিনিষ ক্রয় করে।

ইহার প্রধান দুইটি কারণ; প্রথমত বাংলাদেশ বর্মা হইতে ৩ হইতে ৯ কোটি টাকার ধান, চাল আমদানী করিয়াছিল। পূর্বে বাংলার এমন

দশা ছিল না; সে অতিরিক্ত ধান ও চাল রপ্তানী করিতে পারিত; কিন্তু এখন বাণিজ্যের পাল্লা উল্টাইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়ত গত মহাযুদ্ধের সময় রুশ ও আমেরিকা হইতে কেরোসিন কম আসে। তখন বর্মার তেলের কোম্পানীগুলি এখানকার বাজার দখল করে; তারপর ১৯২১ সালের পর হইতে এদেশে মোটরকার ও মোটর বাসের বিশেষ প্রচলন হওয়ায় প্রচুর পরিমাণে পেট্রোলের প্রয়োজন হইতেছে; বর্তমানে এরোপ্লেন ও অয়েল-ইঞ্জিনের জন্যও তেল লাগিতেছে। ফলে বাংলাকে তেল কিনিবার জন্য বহু কোটি টাকা দিতে হয়। যুদ্ধের পূর্বের সহিত এই আমদানী-রপ্তানীর অঙ্কগুলি তুলনা করিলে দেখা যায় যে, রপ্তানী যেখানে ১৯১২-১৩ সালের ১৩ কোটি হইতে বাড়িয়া ১৯২৮-২৯এ ১৬ কোটি হইয়াছিল, আমদানী সেখানে ৯ কোটি হইতে বাড়িয়া ২৬ কোটি হইয়াছিল; একথা সত্য, বাংলাদেশকে পেট্রোল, কেরোসিন বিদেশ হইতে কিনিতেই হইবে, কিন্তু ধান চাল কিনিবার জন্য যে কোটি কোটি টাকা বাংলা দিতেছে, তাহা সে চেষ্টা করিলে রাখিতে পারিত।

বাংলাদেশ হইতে যেসব জিনিষ রপ্তানী হয়, তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে চট বা পাটের সামগ্রী। ইহার পর তামাক, বিড়িপাতা, ঔষধ প্রভৃতি ধরা হয়। বর্মা থেকে যে সব জিনিষ আসে যেমন চাল ও তেল, তার মালিক হইতেছে বিলাতী কোম্পানীরা। বর্মার বড় বড় চালের কল সবই সাহেবদের; বর্মা অয়েল কোম্পানীও তাহাদের। সুতরাং বাংলায় আমদানী মালের মুনাফা পায় তাহারা। আবার রপ্তানী মালের মধ্যে পাটজাত সামগ্রীর মালিক বিদেশীরা, সেক্ষেত্রেও লাভের অংশ যায় তাহাদের হাতে। মোট কথা, উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য-সম্বন্ধ থাকাতে বাঙালীর কোনো লাভ হইতেছে কিনা তাহা গভীর গবেষণার বিষয়।

বাংলার উপকূল বাণিজ্য

(লক্ষ টাকা)

	রপ্তানী	আমদানী	মোট বাণিজ্যের মূল্য
১৯৩২-৩৩	১০,৫৭	১৭,২৭	২৭,৮৫
১৯৩১-৩২	১০,৮৬	১৭,০৮	২৭,৯৫

(লক্ষ টাকা)

	রপ্তানী	আমদানী	মোট বাণিজ্যের মূল্য
১৯৩০-৩১	১২,৩৭	১৯,৭৩	৩২,১০
১৯২৯-৩০	১৫,০০	২৩,২২	৩৮,২২
১৯২৮-২৯	১৬,৯৬	২৬,৮২	৪৩,৭৮
১৯২৭-২৮	১৬,৭১	২৪,৯৩	৪১,৬৫
১৯২৬-২৭	১৭,৫০	২০,৭১	৩৮,২১
১৯২৫-২৬	১৬,৮৯	২১,৬৮	৩৮,৫৮
১৯২৪-২৫	১৭,৮২	২৩,৩৮	৪১,২০
১৯২৩-২৪	১৬,৬৮	২৩,৫৩	৪০,২১
১৯২২-২৩	১৬,২৭	২২,৫১	৩৮,৭৮
১৯২১-২২	১৭,৮৫	২৪,৪৩	৪২,২৮
১৯২০-২১	১৪,১২	২৪,৩৭	৩৮,৪৯
১৯১৯-২০	১৩,২৭	২৩,৬৮	৩৬,৯৬
	গত মহাযুদ্ধের পূর্বে		
১৯১২-১৩	১৩,৩২	৯,৭২	২৩,০৪
১৯১০-১১	৯,৩৩	৮,১৮	১৭,৫২
১৯০৯-১০	৮,৯২	১০,০৪	১৮,৯৭

বৈদেশিক বাণিজ্য

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, বৈদেশিক বাণিজ্য যথার্থভাবে আরম্ভ হয়, রেলপথ নির্মাণের পর হইতে ও সবেগে চলিতে সুরু করে সুয়েজখাল কাটার পর হইতে। গত মহাযুদ্ধের পূর্বে ভারতীয় বন্দরে ইংরেজ বণিকের পরই জার্মান বণিক ছিল য়ুরোপীয়দের মধ্যে প্রধান ব্যবসায়ী; কিন্তু ডাচ্‌রা পূর্ব দ্বীপালি হইতে চিনি আমদানী করিত বলিয়া বিদেশী বাণিজ্যের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিত তাহারা; মার্কিন রাজ্যের আমদানী-বাজারে নাম ডাক ছিল। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে জাপান ভারতের বিদেশী বাণিজ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে এবং ইংরেজ ছাড়া প্রায় সকল দেশকেই সে প্রায় ভারত-ছাড়া করিয়াছে।

ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের সম্বন্ধ যে কেবল রাজনৈতিক তাহা নহে, ইহা প্রধানত আর্থিক; ইংরেজের সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধের ইতিহাস হইতেছে

অর্থনৈতিক বা ব্যবসায়িক। ইংলণ্ডের বাণিজ্য এখন পৃথিবীব্যাপী, ইহার অতিক্ষুদ্র অংশ হইতেছে ভারতবর্ষ। অনেকের ধারণা ভারতবর্ষের উপর ইংলণ্ডের সমস্ত শিল্প-বাণিজ্য নির্ভর করিতেছে; এ ধারণা যে ভুল, তাহা নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে। ইংলণ্ডের মোট বাণিজ্যের মূল্য ও এশিয়া ও ভারতের সহিত তাহার সম্বন্ধটি নিম্নের তালিকা হইতে স্পষ্ট হইবে।

বৃটেনের মোট আমদানী

		এশিয়া হইতে আমদানী	মোট আমদানী	ভারতবর্ষ হইতে আমদানী	
	পাউণ্ড	পাউণ্ড	শতকরা	পাউণ্ড	
১৯১৩	৭৬৮,৭৩৫,০০০	৯৭,৭০৬,০০০	১২·৭%	৪৮,৪২০	৬·৩%
১৯২৪	১,২৭৭,৪৩৯,০০০	১৬২,৮৭৩,০০০	১২·৮%	৬৫,৮৪০	৫·৬%
১৯২৮	১,১৯৬,৯৪০,০০০	১৪৭,২২৪,০০০	১২·৩%	৬৪,৪৯১	৫·৬%
১৯৩৪	৭৩১,৪১৪,০০০	—	—	৪২,১৬২	৭·৩%
১৯৩৫	৭৫৬,৯৩৬,০০০	৮৮,৩০১,০০০	১২·৬%	৪১,১২৯	৬·৯%

	বৃটেন হইতে রপ্তানী	এশিয়াতে (হাজার পাউণ্ড)		ভারতবর্ষে রপ্তানী (হাজার পাউণ্ড)	
১৯১৩	৫২৫,২৫৪	১৩২,৩৬৪	২৫·২%	৭০,২৭৩	১৩·৪
১৯২৪	৮০০,৯৬৭	১৯৪,৬৩৫	২৪·৩%	৮৫,০৪৫	১২·৬ (১৯২৭)
১৯২৮	৭২৩,৪২৭	১৭১,০১৮	২৩·৬%	৮৩,৯২১	১২·১
১৯৩৪	৩৯৫,৯৮৬	—	—	৩৬,৬৭৫	৯·৯৮%
১৯৩৫	৪২৫,৯২১	—	—	৩৭,৮১৫	৯·৬৩%

বৃটেন ভারতবর্ষে যে মাল পাঠায়, তাহার মূল্য ইংলণ্ডের সমগ্র রপ্তানী বাণিজ্যের মাত্র ১২·২%; ১৯১৩ হইতে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের বাণিজ্য মূল্যের মাত্র ১·২ হার হ্রাস হইয়াছে। ইংলণ্ড পৃথিবীর নানা দেশ হইতে কাঁচামাল সংগ্রহ করে; তাহার মূল্যের শতকরা মাত্র ৫·৬% ভারতবর্ষ হইতে গ্রহণ করে।

ইংলণ্ডের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্বন্ধ দ্বারা ইংলণ্ডের যে লাভ হয়, তাহা আমরা নিম্নে দেখাইতেছি। ১৯১৩ সালে ইংলণ্ডের জনসংখ্যা ছিল ছিল ৪০ মিলিয়ান (৪ কোটি); মোট রপ্তানী মালের মূল্য ছিল ৫২৫ মিলিয়ান পাউণ্ড। মাথাপিছু এই বাণিজ্যের মূল্য হয় ১১ পাঃ ৯ শি ১০ পে। এই

রপ্তানীর মধ্যে ভারতের অংশ (ভারতের পক্ষে আমদানী) ৭০ মিলিয়ান পাউণ্ড, অর্থাৎ ইংলণ্ডের লোকের মাথাপিছু ১ পাঃ ১১ শিঃ করিয়া পাঠাইয়াছিল।

যুদ্ধের পর ১৯২২ সালে মোট রপ্তানীর মূল্য ৭২০ মিলিয়ান পাউণ্ড অর্থাৎ মাথাপিছু ১৬ পাঃ ১৫ শিঃ ; ভারতের অংশ ৯১ মিলিয়ান পাউণ্ড ; অর্থাৎ ইংরেজের মাথাপিছু ২ পাঃ ২ শিঃ বাণিজ্য ছিল ভারতের। দশ বৎসর পরে ১৯৩২ সালে বৃটিশ রপ্তানী ৩৬৫ মিলিয়ান পাউণ্ড হইয়া অর্ধেক হইয়াছে, অর্থাৎ মাথাপিছু ৭ পাঃ ১৬ শিঃ হইয়াছিল। ভারতের অংশ ছিল ৩৪ মিলিঃ পাঃ বা মাথাপিছু ১৪ শিলিং মাত্র।

ভারতবর্ষের সঙ্গে বৃটিশ বাণিজ্য কি পরিমাণ শিথিল হইয়াছে, তাহার প্রমাণ এই। ১৯২২এ যেখানে ভারতীয় বাণিজ্য প্রত্যেক ইংরেজের আয়তে ২ পাঃ ২ শিঃ করিয়া জোগান দিয়াছিল, ১৯৩২এ তাহা মাত্র ১৪ শিলিঙে পরিণত হইয়াছিল।

কিন্তু ইংলণ্ডের কাছে ভারতের বাণিজ্য শতকরা হিসাবে নগণ্য হইলেও ইহার মূল্য ইংলণ্ডীয়দের কাছে সামান্য নহে। কিন্তু ভাবতীয়দের কাছে ইংলণ্ডের সহিত এই সম্বন্ধ আরও অসামান্য; কারণ, ১৯২৩ সালে ভারতের মোট আমদানীর ৬৪'১% ভাগ ছিল বৃটিশের। ভারত হইতে রপ্তানী মাল সে লইত প্রায় সিকি।

কিন্তু বৃটিশ বাণিজ্য পতনোন্মুখ। নিম্নের তালিকায় দ্রষ্টব্য :—

		ভারতের আমদানীর	বৃটেনের রপ্তানীর
১৯১৩-১৪	...	৬৪'১	
১৯২১-২২	...	...	১৩'৪%
১৯২৬-২৭	...	৪৭'৮	
১৯২৭-২৮	...	৪৭'৭	
১৯২৮-২৯	...	৪৪'৭	১২'২%
১৯২৯-৩০	...	৪২'৮	
১৯৩০-৩১	...	৩৭'২	৮'৩%
১৯৩১-৩২	...	৩৫'৫	৯'৩%
১৯৩৪-৩৫	...	৩৯'৯	৯'৬%

গত বিশ বৎসরে স্বদেশী আন্দোলনের ফলে দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য ও জার্মেনী, জাপান ও আমেরিকার প্রতিযোগিতার ফলে ভারতে ইংরেজের বাণিজ্য হ্রাস পাইয়াছে। বিশ বৎসরে বৃটিশ বাণিজ্যের শতকরা প্রায় ২৫ কমিয়াছে।

সমগ্র ভারতের বহির্বাণিজ্য গত অর্ধ-শতাব্দীর মধ্যে আশ্চর্যরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৮৮২ সালে ভারতের বাণিজ্য ছিল ৮৩ কোটি টাকা, ১৯২৬-২৭এ ৪২৮ কোটি, ১৯২৯-৩০এ ৪৫২ কোটি, ১৯৩১-৩২এ ৩৪৩ কোটি, ১৯৩৩-৩৪এ ৩৫৫ কোটি, ১৯৩৪-৩৫এ ৩৮৮ কোটি। ভারতবর্ষের প্রধান বন্দর বোম্বাই, তারপরই কলিকাতা। বাংলাদেশে চট্টগ্রামের বন্দরেও আমদানী-রপ্তানী বাড়িতেছে। যুদ্ধের পূর্বে গড়ে প্রতি বৎসর কলিকাতায় ১৫৯,৭৮ লক্ষ টাকার বাণিজ্য ও চট্টগ্রামে ৭,৪৭ লক্ষ টাকার বাণিজ্য হয়; যুদ্ধের পূর্বে যথাক্রমে ১৬২,৫০ লক্ষ ও ৬,৯৩ লক্ষ ছিল; যুদ্ধের পর হয় যথাক্রমে ২৪৭,১৭ লক্ষ ও ১০,৭৮ লক্ষ। তাহার পর কিভাবে এই দুই বন্দরের বাণিজ্য-মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা নিম্নের তালিকা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

	কলিকাতা (লক্ষ টাকা)	চট্টগ্রাম (লক্ষ টাকা)	বাংলা মোট বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল্য (লক্ষ টাকা)
১৯২০-২১	২,৫৯,৮৪	৭,৮৫	২,৬৭,৭০
১৯২১-২২	২,২৬,৩৬	৭,৭০	২,৩৪,০৬
১৯২২-২৩	২,২৯,৭৮	৯,৮২	২,৩৯,৬০
১৯২৩-২৪	২,৩৮,২৭	১১,৮২	২,৫০,১০
১৯২৪-২৫	২,৬৪,১০	১৪,০৮	২,৮০,২০
১৯২৫-২৬	২,৫৫,১৩	১৪,৩২	২,৬৯,৫৬
১৯২৬-২৭	২,৩৮,০৬	১৪,১৮	২,৫২,২৫
১৯২৭-২৮			২,৭৯,০০
১৯২৮-২৯	২,৬০,২২	১৫,২০	২,৭৫,৪২
১৯২৯-৩০	২,৪০,২৩	১২,৯২	২,৫৩,১৫
১৯৩০-৩১	১,৫৭,৬০	১০,৭৫	১,৬৮,৩৫

উপরের তালিকায় বৈদেশিক বাণিজ্য ও উপকূল বাণিজ্য একত্র ধরা হইয়াছে।

বাংলাদেশের আমদানী-রপ্তানী

(হাজার টাকা)

	আমদানী		রপ্তানী		
	সরকারী মালের মূল্য সমেত	সোনারূপা আমদানী হাজার টাকা	সরকারী মালের মূল্য সমেত	সোনারূপা রপ্তানী হাজার টাকা	মোট বাণিজ্য সোনারূপা বাদ
১৮৯০-৯১	২৬,০৮,০৩	৩,৯১,৮৪	৩৭,২৫,৯৩	১৬,৯০	৬৩,৩৩,৯৬
১৯০০-০১	৩১,৮৬,৯১	৫,৭৪,৯৩	৫৫,১৪,৪৪	৬৩,৭৪	৮৭,০১,৩৫
১৯০৩-০৪	৩৩,৬৪,৫৪	৯,৪৭,৬৯	৫৯,৯৬,১০	৪০,০২	৯৩,৬০,৬৪
১৯১০-১১	৪৮,৫৪,০৮	৫,০৬,০০	৭৮,৮৬,৪০	৪৫,১৪	১২৭,৪০,৪৮
১৯২০-২১	১০২,৭৩,০০	৬৮,০০	৯০,৪৬,১১	৪২,০০	১৯৩,১৯,১১
১৯২১-২২	৮৫,৫১,৭৪		৯১,৪৩,২৬		১৭৬,৯৫,০০
১৯২২-২৩	৮৬,৬১,৬১		১১৯,৮২,২০		২০৬,৪৩,৮১
১৯২৩-২৪	৮২,৭৯,০০		১৩২,৬৬,০০		২১৫,৪৫,০০
১৯২৪-২৫	৯০,১২,০০		১৫২,৪৫,০০		২৪২,৫৭,০০
১৯২৫-২৬	৮৬,০০,০০		১৫৪,৪৫,০০		২৪০,৪৫,০০
১৯২৬-২৭	৮৫,০০,০০		১৩৬,০০,০০		২২১,০০,০০
১৯২৭-২৮	৯০,০০,০০		১৪৮,৩৯,০০		২৭৯,০০,০০
১৯২৮-২৯	৯১,৩৯,০০		১৪৫,৯৫,০০		২৫৮,০০,০০
১৯২৯-৩০	৮৬,২০,০০		১৩৪,০০,০০		২২০,২০,০০
১৯৩০-৩১	৫২,৯৪,০০		৮৭,৪৬,০০		১৪০,৪০,০০
১৯৩১-৩২	৩৫,৪৮,০০		৬৫,১৪,০০		১০০,৬২,০০
১৯৩২-৩৩	৩৫,৮৩,১০		৫৬,৪৩,০০		৯২,২৬,০০
১৯৩৩-৩৪	৩২,১২,৮৩		৫৮,১১,৫০		৯০,২৩,৮৩
১৯৩৪-৩৫	৩৬,২৮,৪৯		৬৪,৫৭,৭৮		১০০,৮৬,২৭

উপরের তালিকায় দেখা যাইতেছে যে, বাংলার আমদানীর চেয়ে রপ্তানীর মূল্য বেশি; অর্থাৎ বাংলা যত জিনিষ কেনে, তার থেকে বেশি টাকার জিনিষ বিক্রয় করে। সুতরাং বাংলা এই আন্তরজাতিক ব্যবসায়ে লাভবান্। সংখ্যা দেখিলে সেই ধারণা মনে হয়। কিন্তু যথার্থ বাংলা লাভবান্ হয় না; কারণ বাংলার প্রধান রপ্তানী সামগ্রী হইতেছে পাট ও পাটজাত বস্তু। আমরা পাট অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে দেখাইয়াছি যে, বাংলার পাটের দ্বারা যথার্থ লাভ হয় স্কচ বণিকের। সুতরাং রপ্তানী মূল্যের উদ্বৃত্ত টাকা হইতে বাঙালী তেমন লাভবান্ হয় না, যেমন হয় সাহেব মালিক ও অ-বাঙালী শ্রমিক; উদ্বৃত্ত লাভ কেহই বাংলায় রাখে না। বাংলায় আমদানীর মূল্য চরমে উঠিয়াছিল ১৯২৮-২৯ সালে—৯১ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা; বাংলা হইতে রপ্তানীর মূল্য ১৯২৫-২৬ সালে চরমে উঠে—১৫৪ কোটি টাকা। ইহার পর দুইই হ্রাস পাইতে থাকে। রপ্তানীর মূল্য সাত বৎসরে প্রায় ১০০ কোটি টাকা কমিয়াছিল, ১৯৩২-৩৩ সালে ৫৬ কোটিতে রপ্তানীর মূল্য দাঁড়াইয়াছিল। ইহার পর কিছু বাড়ে ও ১৯৩৫-৩৬ রপ্তানীর মূল্য হয় ৬৪,৫৭,৭৮,৬৬৫ টাকা। ঐ বৎসর আমদানীর মূল্য ছিল ৩৬,২৮,৪৯,৩৪৬৲ টাকা; সুতরাং বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত লাভ হয় ২৮,২৯,২৯,৩১৯৲ টাকা; আমদানীর মূল্য তেমন কমে নাই—ইহার ঘাটতি হইয়াছিল ছয় বৎসরে ৫৬ কোটি। বলা বাহুল্য, এই রপ্তানীর মূল্যে ঘাটতি হওয়ায় সমগ্র দেশ আঘাত পাইয়াছিল। বাংলা ও বাংলার সংলগ্ন বিহার ও আসামে বহু প্রকারের ব্যবসায়ী ফসল, (commercial crop) উৎপন্ন হয়,—যথা, বহুবিধ তৈলবীজ, পাট, চা। বিদেশে এই সব মাল রপ্তানী করিয়াই বাংলার লাভ। এই সব কাঁচামাল বিদেশে বিক্রয় না করিতে পারিলে চাষী বিদেশ হইতে আমদানী শিল্পজাত সামগ্রী, ঔষধ, পথ্য, বিলাসের ও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করিতে পারে না। রপ্তানী মালের মূল্য যতই সে কম পাক্ না কেন, তাহাকে সেই অর্থ দিয়া বিদেশী পণ্যদ্রব্য কিনিতেই হয়, কারণ তাহার অধিকাংশ প্রয়োজনীয় সামগ্রী দেশে প্রস্তুত হয় না।

রপ্তানী বাণিজ্য

বাংলার বন্দর দিয়া আমদানী হয় শিল্পজাত সামগ্রী, রপ্তানী হয় কাঁচামাল বিদেশের কলের জন্য। প্রায় ষাট বৎসর পূর্বে ১৮৮১-৮২ সালে বঙ্গদেশের (তৎকালীন) বৈদেশিক ও উপকূল বাণিজ্য ছিল ৬৭ কোটি টাকা; ১৯২১-২২ সালে সেই বাণিজ্য দাঁড়ায় ২৩৪ কোটি টাকায়; ১৯২৮-২৯ সালে ২৭৫ কোটি টাকা পর্যন্ত ওঠে।

ষাট বৎসর আগে বাংলার রপ্তানী সামগ্রীর তালিকা একটু অন্যরূপ ছিল; আফিম ছিল প্রধান রপ্তানীর মাল; প্রায় সাড়ে সাত কোটি টাকার ঐ মাল রপ্তানী হইত। নীল তখন রপ্তানী হইত ৩ কোটি টাকার। অ্যানিলিন রঙ তখনো কারবারী আকারে জারমেনী প্রস্তুত করে নাই। কালে এই দুটি বাণিজ্য উঠিয়া গিয়াছে; চীন আফিম ত্যাগ করাতে আফিমের চাষ বাংলায় উঠিয়া গিয়াছে; জারমেনীতে অ্যানিলিন্ রঙ প্রস্তুত হওয়ায় নীলের চাষ উঠিয়া গিয়াছে। পাটের কোনো পূরক সামগ্রী যতদিন না হয়, ততদিন পাটের চাহিদা থাকিবে। বাংলার পাটের চাহিদা পৃথিবীর সর্বত্রই। বর্তমানে বাংলাদেশ হইতে পাট, পাটজাত সামগ্রী, চা, শস্য, চামড়া, তৈলবীজ, লাক্ষা, ধাতু ও খনিজ প্রধানত রপ্তানী হয়। সমগ্র রপ্তানীর শতকরা ৪০।৪৫ ভাগ হইতেছে পাট ও পাটজাত সামগ্রী। চা'র পরিমাণ ১৮ ভাগ। চব্বিশ বৎসর আগেও বাংলাদেশ থেকে (১৯০৮-০৯) প্রায় ৩৮ লক্ষ টাকার রেশম রপ্তানী হইত; ১৮৮১-৮২ সালে রেশম ও রেশমের কাপড় ৪০ লক্ষ টাকার রপ্তানী হইয়াছিল। এখন রেশম রপ্তানী ত হয়ই না, বরং বিদেশ হইতে আসে। ধান, চাল, গম বা শস্যের রপ্তানী গত মহাযুদ্ধের পূর্বে গড়ে প্রতি বৎসর হইত ৮ কোটি টাকার উপর। যুদ্ধের সময় ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার কমিয়া গড়ে পাঁচ বছর যায়; তারপর খুব কমিয়া যায়। ১৯২৯-৩০ সালে ৩ কোটি টাকার, ১৯৩০-৩১ সালে ২,৩৬ লক্ষ টাকার, ১৯৩১-৩২ সালে ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকার মাত্র রপ্তানী হয়।

বাংলার রপ্তানী-বাণিজ্যের গতি কিভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহা

দেখাইবার জন্য আমরা কয়েক বৎসরের রপ্তানী সামগ্রীর তালিকা ও মূল্য নিম্নে তুলনার জন্য দিতেছি :—

১৮৮১-৮২ সালের রপ্তানী

			শতকরা রপ্তানী
১।	আফিম	৭,৪৭ লক্ষ টাকা	২৮.৭
২।	পাট	৪,৫৮ ,,	১৭.৬
৩।	চাল, গম	৪,৩৪ ,,	১৬.৭
৪।	চা	৩,৫২ ,,	১৩.৫
৫।	নীল	৩,১৫ ,,	১২.০৭
৬।	তৈলবীজ	২,৫২ ,,	৯.৭
৭।	চামড়া ও ছাল	১,৮৩ ,,	৭.০
৮।	সোরা	৪০ লক্ষ	১.৫৩
৯।	রেশম ও রেশমী কাপড়	৩৯ ,,	১.৫০
১০।	চিনি	১৫ ,,	.৫৭
		২৬ কোটি	১০০%

১৮৯০-৯১ সালের রপ্তানী

১।	পাট ও পাটজাত সামগ্রী	১০,০৩ লক্ষ টাকা	২৬.৬৫
২।	আফিম	৫,৯৭ ,,	১৬.০০
৩।	চা	৫,০৪ ,,	১৩.৫
৪।	শস্য—ধান, গম ইত্যাদি	৪,১১ ,,	১১.৩
৫।	তৈলবীজ	৩,৪৯ ,,	৯.৩
৬।	চামড়া ও ছাল	২,০৭ ,,	৫.৫
৭।	নীল	২,০৫ ,,	৫.৫
৮।	তুলা ও সুতি কাপড়	১,১২ ,,	৩.০

৯।	লাক্ষা	৭৮ ,,	২.১
১০।	রেশম ও রেশমী কাপড়	৬৫ ,,	১.৭
১১।	সোরা	৩৭ ,,	.৯৯
১২।	তৈল	৩২ ,,	.৮৬
১৩।	কয়লা	২.৬২ ,,	
১৪।	বিবিধ	১.১৮ ,,	৩.
	ধনরত্ন	১৬ ,,	
		৩৭ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা	১০০%

১৯০০-০১ সালের রপ্তানী

			রপ্তানীর শতকরা
১।	পাট ও পাটজাত সামগ্রী	১৮,৬৩ লক্ষ টাকা	৩৩.৭
২।	চা	৯,০৭ ,,	১৬.৪
৩।	আফিম	৬,১২ ,,	১১.০৯
৪।	চামড়া ও ছাল	৫,৫৫ ,,	১.০১
৫।	শস্য	৪,৬৮ ,,	৮.৪
৬।	তৈল-বীজ	৪,১১ ,,	৭.৬
৭।	নীল	১,৫৬ ,,	২.৮
৮।	লাক্ষা	১,০৪ ,,	১.৯
৯।	তুলা ও সুতি কাপড়	৭৭.৪৪ ,,	১.৪
১০।	কয়লা	৫৯.২২ ,,	১.০৭
১১।	রেশম ও রেশমী কাপড়	৫৭.৭৫ ,,	১.০৪
১২।	সোরা	৩৩.২৭ ,,	.৬
১৩।	বিবিধ	১,৭৫ ,,	৩.১৮
	ধনরত্ন	৬৩.৭৫	
		৫৫ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা	১০০%

১৯১০-১১ সালের রপ্তানী

			রপ্তানীর শতকরা
১ ।	পাট ও পাটজাত সামগ্রী	৩০,৫৪ লক্ষ টাকা	৩৮·৯
২ ।	আফিম	১০,৬১ ,,	১৩·৫
৩ ।	চা	৮,৪৫ ,,	১০·৭৮
৪ ।	শস্য—গম, ধান	৬,৯৫ ,,	৮·৮৮
৫ ।	চামড়া	৬,৮৫ ,,	৮·৭
৬ ।	তৈলবীজ	৬,০৭ ,,	৭·৮
৭ ।	লাক্ষা	২,১০ ,,	২·৬
৮ ।	তূলা	৯৪,৮৪ হাজার টাকা	১·২
৯ ।	কয়লা	৭৬,৯২ ,,	·৯৮
১০ ।	রেশম কাঁচা	২৭,৫৬ ,,	·৩৫
১১ ।	নীল	২৪,৯৬ ,,	·৩১
	বিবিধ লইয়া মোট	৭৮ কোটি ৩৩ লক্ষ	১০০%

১৯২১-২২ সালের রপ্তানী

			রপ্তানীর শতকরা
১ ।	পাটের সামগ্রী	২৯,৯১ লক্ষ টাকা	৩৪·৮৩
	পাট	১৩,৭১ ,,	১৫·৯৬
	মোট	৪৩,৬২ ,,	৫০·৭৯
২ ।	চা	১৩,১৩ ,,	১৫·২৯
৩ ।	লাক্ষা	৭,৯০ ,,	৯·২১
৪ ।	চামড়া ও ছাল	৩,৮২ ,,	৪·৪৫
৫ ।	তূলা	৩,৬৮ ,,	৪·২৯
৬ ।	তৈলবীজ	৩,০৫ ,,	৩·৫৬
৭ ।	আফিম	২,০৫ ,,	২·৩৯

			রপ্তানীর শতকরা
৮।	পোষ্টাল রপ্তানী	১,৪৫ লক্ষ টাকা	১'৬৯
৯।	ধাতু ও খনিজ	১,১৪ ,,	১'৩৪
১০।	শস্য	৯৪ ,,	১'১০
১১।	অভ্র	৫৫ ,,	'৬৫
১২।	সার	৫৩ ,,	'৬২
১৩।	সোরা	৩৮ ,,	'৪৫
১৪।	রঙের ও ট্যানিনের উপযুক্ত মালপত্র	৩৮ ,,	'৪৫
১৫।	খৈল	৩৩ ,,	'৩৯
১৬।	নীল	৩২ ,,	'৩৮
১৭।	পশমী জিনিষ	২৮ ,,	'৩৪
১৮।	গাঁজার আঁশ	২৬ ,,	'৩১
১৯।	খাদ্যাদি	২৫ ,,	'২৯'
		৮৭ কোটি টাকা	১০০%

১৯২৭-২৮ সালের রপ্তানী

			রপ্তানীর শতকরা
১।	পাটের সামগ্রী	৫৩,৪৬ লক্ষ টাকা	৩৮'৮৪
	পাট	২৯,০৮ ,,	২১'১৩
	মোট	৮২,৫৪ ,,	৫৯'৯৭
২।	চা	২১,৫২ ,,	১৫'৬৪
৩।	লাক্ষা	৬,৯১ ,,	৫'০২
৪।	চামড়া ও ছাল	৫,৭৮ ,,	৪'২০
৫।	শস্য	৩,৫৯ ,,	২'৬১
৬।	ধাতু ও খনিজ	৩,৩৭ ,,	২'৪৫
৭।	বীজ	৩,১৫ ,,	২'২৯
৮।	আফিম	১,৯৯ ,,	১'৪৫

			রপ্তানীর শতকরা
৯।	রঙের ও ট্যানিনের জিনিষ	৮০'৭৫	'৫৯
১০।	অভ্র	৭৮'৯১	'৫৭
১১।	কয়লা	৭৬'৩৬	'৫৫
১২।	খৈল	৭৩'৪৮	'৫৩
১৩।	তুলা	৭১'৭৭	'৫২
১৪।	পোষ্টাল রপ্তানী	৬১'১৩	'৪৪
১৫।	সার	৫৬'০৬	'৪১
১৬।	গাঁজা	৫৩'৬৭	'৩৯
১৭।	পশমী জিনিষ	৪৬'৫৭	'৩৪
১৮।	মশলাপাতি	৩৯'১২	'২৮
১৯।	খাদ্য	২৭'১৯	'২০
২০।	প্যারাফিন মোম	২৬'০৬	'১৯
২১।	পোষাক পরিচ্ছদ	১৮'৬৬	'১৪
২২।	Kapok	১৬'৩২	'১২
২৩।	তৈল	১৩'৯৯	'১০
২৪।	ঔষধপত্র	১৩'৬৩	'১০
২৫।	যন্ত্রপাতি	১৩'৪১	'১০
২৬।	তামাক	১৩'৩৩	'১০
২৭।	দড়িদড়া	১০'৮২	'০৮
২৮।	সোরা	৯'৭৯	'০৭
২৯।	লোম, কুচি (Bristle)	৭'৬৩	'০৬
৩০।	জীবন্ত প্রাণী	৭'২৬	'০৫
৩১।	ফলমূল	৫'৯৭	'০৪
৩২।	চামড়া (তৈয়ারী)	৫'৭৭	'০৪
৩৩।	পশুখাদ্য	৫'১৮	'০৪
৩৪।	অন্যান্য	৪৩'৩৮	'৩২
		১৩৭,৬৭,৩৮,৭৭৯ টাকা	১০০%

বাংলার রপ্তানী

জিনিষের নাম	১৯৩২-৩৩ টাকা	১৯৩৩-৩৪ টাকা
ছালা, চট	২১,৬৫,০১,০১৪	২১৩৩২৭৮৯০
চা	৯,৪২,১৬,৬১৭	১১৫৯৯৫৭০১
কাঁচা পাট	৯,৩৪,৭০,৩১৮	১০১৬৫৮৩২৭
চামড়া	১,৮৬,৬৫,৩৯৭	২৮০৪০৩৬৩
গালা	১,২৩,৮০,৮০৯	২৪৫৪০০৭৫
বীজ	৫৯,৮২,১২৪	২১১৫২২০৩
ধাতু দ্রব্য	১,৫৯,০৩,৮১২	১৫৮৬০৪৯৪
শস্য—ডাল, ময়দা	১,৬২,২৭,১২২	১১৭৭৬৮৭৮
আফিম	১১,২৪,০০০	৭২৬৪০০০
পশমী জিনিষ	৪৬,৪৭,৬২৯	৫৪২২৪৫৯
তুলা	২১,৮৩,৩৮৪	৪০৬৮৪১১
কয়লা	৪৪,০৪,৫৭১	৩৭২৬৭৯৯
অভ্র	২৬,০৩,৪৬৫	৩৫৫৮৮৬২
চামড়া ট্যান ও রং কবিবার জিনিষ	২৯,৫৭,০৬৮	২৪৬৪২২৯
খৈল	৪৪,০৯,৯৫৪	২৪১৫৭২৮
শণ	২২,৬৯,২৫৭	২৪০৭৩৬৩
চামড়া (লেদার)	১২,৩৯,২৯৩	১৯৭৯১২৮
হাড়	১৫,৯৩,৬৩২	১৫৫৮২৫৩
ডাকে প্রেরিত জিনিষ	১৮,৮০,৪৮৪	১৩৮৬০৭৭
মশলা	১৫,৯৩,৫৯১	১৩৩৮৯১৯
খাদ্যদ্রব্য	১৪,৭৮,৬১১	১২৩২২৪৫
সার	৭,০৩,২৯৪	১০৭৫৯৪০
সোরা	৮,৫৮,৮৪৮	১০১১৭১০

	১৯৩২-৩৩ টাকা	১৯৩৩-৩৪ টাকা
মোম	৩৫,৪৯,৭৭৭	৯৫৮৮৮৫
পোষাক	৭,০১,৮২০	৯০২১১৪
তামাক-সিগারেট	৬,৬২,৪৩৬	৬৩২০৭৯
তৈল	৫,৯৮,২৬৩	৫৭৭৪৭৯
যন্ত্রপাতি	৪,৪৮,৭২৮	৪২৬৬৩৪
শিমুল তুলা	৪,৬৩,২৬১	৪১৩৭৭১
ঔষধ	১৪,৫৪,৮২৯	৩৪১৮৩০
দড়ি	৩,৬৫,৩২২	৩২৯৬৫২
রং ও রঞ্জন দ্রব্য	৪,৬৮,০৫৫	১৭৬৬৮৩
বিবিধ জিনিষ	৩১,৯০,০৫৫	৩১৩০২৩৫
মোট	৫১,১২,৩৭,৫৭৫	৫৮,১১,৫০,৪১৬

এতদ্ব্যতীত বিগত ১৯৩৩-৩৪ সালে বিদেশ হইতে আমদানী করা ৩৪,৪৯,৩৭২৲ টাকার মালপত্র বাংলা হইতে সমুদ্রপথে বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৩২-৩৩ সালে ৩২,৩৪,৮৩৪৲ টাকার এই ধরণের মাল রপ্তানী হইয়াছিল।

পাঠকগণ স্থিরভাবে এই তালিকাগুলি দেখিলেই বুঝিবেন, গত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে বাংলার রপ্তানী শিল্পের কি পরিবর্তন হইয়াছে। ১৯২৭-২৮ সালে রপ্তানী-বাণিজ্যে সব চেয়ে বেশি টাকার অঙ্ক দেখা যায়। নিম্নের তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, কিভাবে এই রপ্তানীর মূল্য বাড়িয়াছিল; তারপর হইতেই পৃথিবীব্যাপী মন্দা সুরু ও কয়েক বৎসরের মধ্যে উহা অভাবনীয়রূপে হ্রাস পাইয়াছিল।

সাল		রপ্তানীর মূল্য কোটী টাকা
১৮৮১-৮২	...	২৬
১৮৯০-৯১	...	৩৭
১৯০০-০১	...	৫৫
১৯১০-১১	...	৭৮
১৯২১-২২	...	৮৭
১৯২৭-২৮	...	১৩৭

ইহার পর রপ্তানী হ্রাস পাইতে থাকিল।

সাল			কোটী টাকা
১৯২৮-২৯		...	১৩৬·৯২
১৯২৯-৩০		...	১২৬·৪০
১৯৩০-৩১	পৃথিবীব্যাপী মন্দা বাজার সুরু	...	৮০·৭২
১৯৩১-৩২		...	৫৭·৮১
১৯৩২-৩৩		...	৫১·৯২
১৯৩৩-৩২	বাজার স্বাভাবিক	...	৫৮·১১
১৯৩৪-৩৫		...	৬৪·৫৭

এই তালিকাগুলি বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করিলে পাঠক বুঝিবেন যে, গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে রপ্তানী মালের পর্যায়ের অনেক উলটপালট হইয়াছে। তবে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য হইতেছে এই যে, গত শতাব্দীর প্রথমভাগে বাংলাদেশ হইতে শিল্পজাত সামগ্রী রপ্তানী হইত; কিন্তু বর্তমান যুগে কেবল কাঁচামাল সরবরাহের জন্য বাংলাদেশের খ্যাতি।

উপরের তালিকাগুলি হইতে দেখা যাইতেছে যে, ১৮৮১ সালে আফিম ছিল তৎকালীন বাংলা প্রদেশের প্রধানতম রপ্তানী। কিভাবে আফিমের ব্যবসায় লোপ পাইল, তাহা নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

সাল	মূল্য কোটী টাকা	সমগ্র রপ্তানী
১৮৮১-৮২	৭·৪৭	২৮·৭%
১৮৯১-৯২	৫·৯৭	১৬·০%
১৯০০-০১	৬·১২	১১·০৯%
১৯১০-১১	১০·৬১	১০·৫%
১৯২১-২২	২·০৫	২·৩৯%
১৯২৭-২৮	১·৯৯	১·৪৫%
১৯৩৩-৩৪	·৭২	×

১৯১১ সালের পর চীন স্বাধীন হইয়া আফিমের নেশা বর্জন করায় অকস্মাৎ ঘাটতির উপস্থিত হয়।

১৮৮১-৮২ সালে রপ্তানী সামগ্রীর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিল পাট ও

পাটজাত সামগ্রী। এখন পর্যন্ত এই পদার্থ বাংলার শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ হইয়া আছে; কিভাবে উহা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

সাল	মূল্য কোটী টাকা	সমগ্র রপ্তানীর শতকরা
১৮৮১-৮২	৪·৫৮	১৭·৬
১৮৯১-৯২	১০·০৩	২৬·৬৫
১৯০০-০১	১৮·৬৩	৩৩·৭
১৯১০-১১	৩০·৫৪	৩৮·৯
১৯২০-২২	৪৩·৬২	৫০·৭৯
১৯২৭-২৮	৮২·৫৪	৫৯·৯৭
১৯৩৩-৩৪	৩১·০০	৩৩·০০
১৯৩৪-৩৫	৩৭·২০	৩৩·১

আমরা পাট সম্বন্ধে অন্যত্র বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি। ১৯২৭-২৮ সালে যে ৮২ কোটী টাকার মাল রপ্তানী হয়, তাহার মধ্যে ৩৩ কোটী টাকার হইতেছে পাটজাত সামগ্রী। বর্তমানে পাট হইতে পাটের সামগ্রীই বেশি যাইতেছে। প্রায় ৪০ ভাগ হইতেছে তৈয়ারী মাল, অবশিষ্ট ১৫।২০ ভাগ কাঁচা পাট।

নূতন-বাণিজ্য ফশলের মধ্যে প্রধান হইতেছে পাট, তারপরেই চা। চা-এর চাহিদা ক্রমশই বাড়িয়া চালিয়াছে; কিভাবে গত পঞ্চাশ বৎসরে বৈদেশিক বাণিজ্যে এই সামগ্রীর স্থান হইয়াছে দেখা যাক্ :—

	চা-এর মূল্য কোটী টাকা	রপ্তানীর শতকরা
১৮৮১-৮২	৩·৫২	১৩·৫
১৮৯১-৯২	৫·০৪	১৩·৫
১৯০০-০১	৯·০৭	১৬·৪
১৯১০-১১	৮·৪৫	১০·৭৮
১৯২১-২২	১৩·১৩	১৫·৩৯
১৯২৭-২৮	২১·৫২	১৫·৬৪
১৯৩৩-৩৪	১১·৫৯	×
১৯৩৪-৩৫	১৯·৮২	১২·৩৫

যুদ্ধের পর ইহার মূল্য খুব বাড়িয়াছিল; কিন্তু বিশ্বব্যাপী দুর্গতিতে চা-এর বাজার সাময়িকভাবে নষ্ট হইয়াছিল। তবুও ২৫ বৎসরে ইহার মূল্য ৬ গুণ বাড়িয়াছে।

বাংলাদেশে এককালে প্রচুর খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইত ও রপ্তানীও হইত; কিন্তু গত ৬০ বৎসরের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, খাদ্যশস্যের রপ্তানী হ্রাস পাইতেছে এবং বিদেশের শস্য আমদানী হইতেছে; অর্থাৎ কাঁচামাল প্রস্তুত বিষয়েও বাংলার প্রগতি আশানুরূপ নহে।

	রপ্তানী শস্যের মূল্য কোটী টাকা	মোট রপ্তানীর শতকরা
১৮৮১-৮২	৪·৩৪	১৬·৭
১৮৯১-৯২	৪·১১	১১·৩
১৯০০-০১	৪·৬৮	৮·৪
১৯১০-১১	৬·৯৫	৮·৮
১৯২১-২২	·৯৪	১·১
১৯২৭-২৮	৩·৫৯	২·৬
১৯৩৩-৩৪	১·১৭	×

রপ্তানীর অনুপাত পঞ্চাশ বৎসরে কিভাবে হ্রাস পাইয়াছে তাহা খুবই স্পষ্ট।

ষাট বৎসর পূর্বে বাংলার রপ্তানী-বাণিজ্যের তালিকায় এমন কতকগুলি জিনিষের নাম ছিল, যাহার উল্লেখ এখন সামান্যই দেখা যায়, যেমন নীল, সোরা, চিনি, রেশমী কাপড় ও রেশম। এখন তাহাদের মূল্য সামান্যই। কাঁচা মালের চাহিদা বিদেশে বাড়িয়া চলিয়াছিল; চামড়া ও ছাল ১৮৮১ সালে ছিল ১·৮৩ কোটি টাকা, ১৮৯১ সালে ২·০৭ কোটি, ১৯০১ সালে ৫·৫৫ কোটি, ১৯১১ সালে ৬·৮৫ কোটি, ১৯২১ সালে ৩·৮২ কোটি, ১৯২৭-২৮ সালে ৫·৭৮ কোটি, ১৯৩৩-৩৪ সালে কমিয়াও ২·৮০ কোটি ছিল।

তৈলবীজ রপ্তানীমালের একটা মোটা অঙ্ক পূরণ করে।

১৮৮১	২·৫২ কোটি	৯·৭%
১৮৯১	৩·৪৯ ,,	৯·৩%

১৯০১	৪·১১	৭·৬%
১৯১১	৬·০৭ ,,	৭·৮%
১৯২১	৩·০৫ ,,	৩·৫%
১৯২৮	৩·১৫ ,,	২·৩%

বর্তমানে বাংলার নানাবিধ তৈলবীজ হইতে তৈল নিষ্কাশিত হইতেছে; সাবানের ব্যবসায় বাড়িতেছে ও বার্নিস প্রভৃতির কাজও বাড়িয়াছে; এইসব শিল্পোন্নতির জন্য তৈল শিল্প দায়ী।

১৯২৯-৩০ সালের পরই পৃথিবীব্যাপী অর্থসঙ্কটে ভারতের রপ্তানী মালের চাহিদা কমিল সঙ্গে সঙ্গে দামও কমিল। যদিও ১৯৩৪-৩৫ সালে প্রায় ১৭ কোটি টাকার বেশি মাল বিক্রয় হইলেও ১৯৩০-এর বাজারের সঙ্গে সমান হইতে পারে নাই।

রপ্তানী-মাল পৃথিবীর নানাদেশে যায়; বিশেষভাবে, পাটের সামগ্রী যায় না, এমন দেশ পৃথিবীতে কম; তবে অ-ইংরেজ দেশে পাট সামগ্রী হইতে পাটের চাহিদা বেশি। গ্রেটবৃটেন ভারতের কাঁচামালের সিকি মাত্র ক্রয় করে, বৃটীশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য দেশ ভারতীয় কাঁচামালের বড় খরিদ্দার। অটোয়া চুক্তির বলে তাঁহারা সকলেই শস্তায় ভারতীয় মাল পান! ইহার পরই মার্কিন দেশ, জারমেনী, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি দেশ খরিদ্দার। বেলজিয়ম, ফ্রান্স ছাড়া কোনো দেশেই আমদানী হইতে রপ্তানীর জন্য মূল্য বেশি দেয় না। আমদানীর মূল্য অনুপাতে জাপান সবচেয়ে কম টাকার মাল কেনে। অনেকের ধারণা জাপান এদেশ হইতে অনেক টাকার মাল কেনে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভুল। রপ্তানীর সহিত জাপানী মালের আমদানী তুলনীয়। কোন্ দেশ বাংলার রপ্তানী মালের কতখানি করিয়া লয়, তাহাই দেখা যাক। বলাই বাহুল্য, ইংরেজই বাংলার তথা ভারতের কাঁচামালের প্রধান খরিদ্দার।

বাংলার রপ্তানী মাল কোন্ দেশ কত অংশ ক্রয় করে

	১৯০৮-০৯	১৯০৯-১০	১৯১০-১১	১৯১১-১২	১৯১২-১৩	১৯১৩-১৪	১৯১৪-১৫	১৯১৫-১৬	১৯১৬-১৭	১৯১৭-১৮	১৯১৮-১৯	১৯১৯-২০	১৯২০-২১
গ্রেটবৃটেন	২৫·৪	২৫·৩	২৪·৩	২৮·৭	২৫			৩৬·১	৩২	২৩·৮	২৬·৬	৩১	২০·৮
মার্কিন দেশ	১৬·৭	১৬·৪	১৪·৩	১৫·২	১৬			১৯·৮	২৫·৫	৩১·৯	২৮·৪	২৯·৫	৩১·৩
জারমেনী	১১·৩	৯·৭	৯·৩	১১·৩	১১·৩	যুদ্ধ পর্ব						·১	২·৬
চীন	৮·৪	৮·৯	১০·৯	২	১·৯								
ফ্রান্স	৪·৮	৪·৬	৪·৫	৩·৮	৩·৯			৩·৮	৩·৪	৩·৪	৪·৩	৫·২	৩·৫
দঃ আমেরিকা	৪·৭	৩·৯	৩·২	২·৭	৪·৭			৫·৫	৫·৪	৪·৮	৬·৭	৬·৪	৭·৮
অষ্ট্রিয়া	৩·৯	২·৬	২·৮	৩·৪	৩·২	যুদ্ধ পর্ব							
ইতালি	২·৬	২·২	২·৫	২	২·৪			৪·৯	২·৫	২·১	২·০	১·৫	১·১
অন্যান্য বৃটিশরাজ্য				১৭·৭	১৬·৭			১৩·৬	১৩·৩	১৯·৮	১৮·৬	১০·৩	১৫·৬
রাশিয়া								৫·৯	৫·৮	·৯			
জাপান								২·১	২·৩	৩·০	৩·৪	৪·৮	৩·০
জাভা								১·৩	১·৭	২·২	২·৪	১·৩	২
বেলজিয়াম												২·৪	২·২
অন্যান্য দেশ	২২·৪			১২·২	১৪·			৭·০	৮·০	৭·৮	৭·৬	৭·৫	১০

বাংলার রপ্তানী মাল কোন্ দেশে কত অংশ ক্রয় করে

	১৯২১-২২	১৯২২-২৩	১৯২৩-২৪	১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯	১৯২৯-৩০	১৯৩০-৩১	১৯৩১-৩২	১৯৩২-৩৩
গ্রেটবৃটেন	২৫·৪	২৪·১	২৬·৮	২৫·২	২৩·৩	২১·৬	২৪·১	১৯·৪	২১·২	২৩·৪	২৬·৮	২৬·৭
মার্কিন দেশ	২৫·৬	২৬·৮	২২·৯	২০·৮	২২·৯	২২·৬	২১·৭	২৩·২	২২·৬	২০·৩	১৮·৭	১৫·২
জারমেনী	৬·৬	৬·৮	৬·৭	৮·৪	৭·৪	৭·৭	৮·৮	৮·৮	৭·৮	৬·২	৫·৫	৫·৫
চীন												
ফ্রান্স	৩·২	৩·৪	৩·৭	৩·৭	৪·৮	৪·১	৩·৯	৪	৪·৩	৩·২	২·৮	৩·৪
দঃ আমেরিকা	৩·৯	৪	৫·৪	৫·৬	৬·৫	৭·৩	৭·৫	৭·৮	৭·৬	৬·	৩·৮	৬·৮
অষ্ট্রিয়া												
ইতালি	১·৪	১·৯	২·২	২·৩	২·৬	১·৮	১·৭	২	২	১·৭	১·৮	১·৭
অন্যান্য বৃটিশ রাজ্য	১৩·	১৪·৪	১৪·২	১৪·৪	১৩·৪	১৬·	১৩·৮	১৪·৩	১৪·৩	১৬·২	১৭·৮	২০·৭
জাপান	৬·১	২·৯	৩·২	৩·	২·৫	৩	২·৭	৩	৩	২·	৩·২	২·৭
জাভা	২·১	১·৫	১·২	১·২	২·	১·৯	১·৪	২	১·৬	২·৪	১·৯	·৯
বেলজিয়াম	১·৮	২·১	২·৫	৩·১	২·৪	২·৪	২·০	২·৬	২·৬	২·৭	২·৮	২·৩
অন্যান্য দেশ	১০·১	১২·	৯·২	১২·৩	১২·২	১১·২	১১·৯	১২·৩	১২·৫	১৫·৪	১৪·৫	১৩·৬
												১০০

আমদানী

বাংলাদেশ তথা ভারতের আমদানী মালের অধিকাংশই হইতেছে শিল্পজাত সামগ্রী ; রপ্তানী মালের বিশেষত্ব যেমন কাঁচামাল, তেমনি আমদানী সামগ্রীর বিশেষত্ব হইতেছে শিল্পজাত বস্তু।

১৮৮১-৮২ সালে বাংলাদেশ বিদেশ হইতে ২৭ কোটি টাকা মূল্যের মাল আমদানী করে ও ১৯২১-২২ সালে করে ১০২ কোটি টাকার ; যুদ্ধের পর দশ বৎসরে যে-মাল আমদানী হয়, তাহার মূল্য গড়ে ৮১ কোটি টাকা ছিল ; অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসরে আমদানীর মূল্য তিনগুণ বা শতকরা ৩০০% ভাগ বাড়িয়াছিল। জিনিষের পরিমাণ ইহা অপেক্ষা বেশি হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়, কারণ জিনিষের দাম কমিয়াছে। পরিশিষ্টে একটি তালিকা দিলাম।

ঐ পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে রপ্তানী সামগ্রীর যেমন পরিবর্তন হইয়াছে, আমদানী সামগ্রীর তেমনি পরিবর্ধন হইয়াছে, অর্থাৎ পূর্ব হইতে বর্তমানে নানাবিধ বিলাতী মাল আসিতেছে। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিদেশ হইতে অতি সামান্য জিনিষই আসিত ; পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বাংলার অভাবনীয় পরিবর্তন হইয়া গেল। রেলওয়ের সামগ্রী, পাটকলের কলকব্জা প্রভৃতি আমদানী বাণিজ্যে দেখা দিল। ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে লবণ তৈয়ারী হইত ; উহা ঐ বৎসরে সরকারী আজ্ঞায় বন্ধ হইল এবং বিলাতের লবণ আমদানী সুরু হইল। চিনি, রেশম রপ্তানী হইত ; বর্তমানে সেগুলি আমদানীর সামগ্রী। আমদানী সামগ্রীর মধ্যে প্রধান হইতেছে বস্ত্র, সূতা প্রভৃতি ও সূতা বা তূলার জিনিষ। চল্লিশ বৎসরে বাংলাদেশে আমদানী বিদেশী বস্ত্রের মূল্য ১১ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা হইতে ৩৭ কোটি টাকায় পর্যন্ত উঠিয়াছিল। আমদানী মাল যা যা আসে, তা সবটাই বাংলায় থাকে না, যুক্তপ্রদেশ, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রদেশেও যায়।

আমদানী সামগ্রী কিভাবে পরিবর্তন হইয়া আসিয়াছে, তাহাই আমরা নিম্নের তালিকাগুলিতে দেখাইব।

	আমদানী	শতকরা
	১৮৮১-৮২ সালের	
সুতা ও সুতি বস্ত্র ইত্যাদি	১১,৪৩ লক্ষ	৪৬%
লোহালক্কড়	১,৭৩ ,,	
কলকব্জা	৪৩ ,,	
অন্যান্য বিবিধ	১৩,৫৯	
	২৭,২৩ লক্ষ	

	১৮৯০-৯১ সালের	১৯০০-০১ সালের
সুতা, সুতির বস্ত্র ইত্যাদি	১৪,৫৭ লক্ষ	১৫,৯০ লক্ষ
লোহালক্কড়	২,৬৮ ,,	৩,৯৬ ,,
তৈল	১,৪৮ ,,	১,৭৯ ,,
কলকব্জা	৮১·৩২	১,০১ ,,
পশমী কাপড়	৭৫·১০	৮৬·৭৮
চিনি	৬৯·০১	১,৫০·০০
লবণ	৬৩·৬২	৪৫·৮৮
মদ	৪৮·০২	৪৮·৯২
পোষাক-পরিচ্ছদ	৪২·৩০	৪৪·৬১
রেলওয়ের জিনিষ	২৭·৯৩	৫৮·৫৭
খাদ্যদ্রব্য	২৭·৬২	৩৫·৬৫
মশলাপাতি	২৬·৫৬	৪২·৪৭
ঔষধ পত্র	২৩·৫৫	৪৪·৭৩
কাঁচের জিনিষ	২১·৫৪	২৯·২৪
জীবন্ত প্রাণী	১১·৪২	২০·৮৩
অন্যান্য	২,১৫·৪৭	৩,০০·০০
ধনরত্ন	৩,৯১·৮৪	৫,৭৪·৯৩
	২৬,০৮·০৩	৩১,৮৬·৯১

১৯১১-১২ সালের আমদানী

স্থতির জিনিষ	২২,৭৪ লক্ষ	ঔষধ	৭৯'৭৬
লোহালক্কড়	৬,০৩ ,,	পশমী কাপড়	৮৮'৬১
চিনি	৫,২০	মশলা	৬৬'৬৪
রেলওয়ে	১,৫১	মদ	৬২'৪৫
তৈল	১,৭৫	লবণ	৬৪'৮১
লোহার জিনিষ	১,২৬	তামাক	২৩'৪৫
পোষাক	৮০'০৭		

১৯২১-২২ সালের আমদানী

স্থতির জিনিষ	২৭,১৯ লক্ষ	পোষ্টে আমদানী	৮০'৪৫
মেসিনারী	১৬,৯৬ ,,	খাদ্যাদি	৭৮'৯৫
চিনি	১২,৪৪ ,,	রাসায়নিক দ্রব্য	৭৭'৯৭
খনিজ ও ধাতু	১০,৫৩	মশলা	৭৭'৬৩
রেলওয়ের সরঞ্জাম	৮,৭০	কাঁচ	৭২'০৪
তৈল	২'৯৭	কাগজ পেষ্টবোর্ড	৬৫'৯২
ধান	২,২৯	দেশলাই	৬১'৮৭
কলকজা	২,১৩	রবারের জিনিষ	৬১'৩৭
লোহালক্কড়	২,১২	ঔষধ পত্র	৫৫'২৭
লবণ	১,১৩	রঙ	৪৯'১২
মদ্যাদি	১,০৫	তামাক সিগারেট	৪৮'৯৫
মোটর গাড়ী ইত্যাদি	৯১'৩৩	চা-এর বাক্স	৪৩'৫৬
ইঞ্জিনীয়ারিং জিনিষ	৮৫'৮২		
		মোট	১০২'৭৩ লক্ষ

আমদানী

	১৯৩২-৩৩	১৯৩৩-৩৪
কলকজা	১৩,৮১,০২,০৯৯	৪,৯৫,৬৮,৬৬৯
কার্পাস বস্ত্র	৭,১২,৫৪,৮৫৯	৪,৮৬,১৭,৮৬২
ধাতুদ্রব্য	৩,০৪,০০,৯১৭	৩,২১,৩৫,৩০২

	আমদানী	
তৈল	২,৪৬,৪৮,১৭০	২,৩৪,৭৪,১৪৬
যন্ত্রপাতি	১,৩৮,৮৫,৩৯৬	১,৪১,৪৩,৪৫৯
রাসায়নিক দ্রব্য	১,০৫,০২,০১৩	১,০৮,৩৭,৮৯৯
লোহার জিনিষ	৯৫,৭৪,২৪৪	৯১,২৬,০৪৯
কাগজ ও পেষ্ট বোর্ড	৮০,৮৩,৫২৫	৮১,৩৮,৮৯৪
মোটর যান	৫৪,৮০,১১৬	৭০,৩২,১৫৬
খাদ্যদ্রব্য	৭০,১৮,১৭৯	৬৯,৪৮,৪৫৪
ঔষধ	৬২,১১,৩১৫	৬৮,৪৯,৫৩৪
মশলা	৬৬,১৩,৫৬১	৬৩,৫৮,৩৯৬
ডাক পার্শেলে প্রাপ্ত জিনিষ	৬৫,৬২,৭১৩	৬০,৮৬,৫৮৮
মদ মেথিলেটেড স্পিরিট ইত্যাদি	৬৩,৭১,৭৬৮	৬০,৪২,১৩৭
পশমী জিনিষ	৪৬,৭৫,১৬৭	৪৬,৩২,৫৮০
রবার	৪০,২১,৫৫৬	৪১,৫৪,৮৩২
লবণ	৫৪,৯১,৬৯৫	৩৭,২৩,৪৬৮
কাঁচ ও কাঁচের জিনিষ	৩৮,০৪,৮৮০	৩৫,৭২,৭৫৬
চায়ের বাক্স	২৮,৩৩,০৭৩	৩৩,৩২,২৭৮
চিনি	১,২২,৩৬,৬৩০	৩০,৭১,৭২০
রং ও রঞ্জনদ্রব্য	৩১,০৭,৪৭৭	২৯,২০,১৫৪
বাইসিকেল	২৬,৫৯,২২৫	২৮,৫৫,১৪৪
জুতা	২৬,৭০,২৯৬	২৭,৬৪,৩১২
কৃত্রিম রেশম	৩৯,৫৭,৬৫৭	২৬,৩৩,৬৬৫
রেল গাড়ী	১৫,৪৩,৭৯০	২৫,৩৬,৩৮১
কাগজের মণ্ড	১৯,৭৬,৪২৩	২৪,০৬,৬৭৩
চামড়া ট্যান করিবার জিনিষ	২৫,০০,০২৯	২৩,২৮,৩৯২
খেলনা ও খেলার সরঞ্জাম	১৬,৫৪,৮৮৯	২১,১১,২৪৮
ষ্টেশনারী জিনিষ (কাগজ বাদে)	২৩,০৭,৪৬৮	২০,৭৯,৪১৮
পুস্তক ও সংবাদপত্র	১৭,৭৩,২৮০	১৮,৮৪,৫৮৫

	আমদানী	
কাঁচা পশম	১৮,০৮,৮২৯	১৬,৮৯,৪৫৫
সার	১১,৩৬,২৩৪	১৬,৮৯,১৮৩
প্রসাধন সামগ্রী	১৭,৯৯,২৯৩	১৬,৫১,৮০৬
ইমারতী ও পূর্ত কার্য সংক্রান্ত জিনিষ	১৯,৯১,৭৫০	১৬,১৮,৭৭১
পোষাক	১৪,৬৪,৮৭১	১৫,২৫,৮৩১
রেশমী জিনিষ	২৫,০৪,১৭৭	৫৫,১৭,১৪৬
কলকব্জা চালাইবার ফিতা	১৬,০১,৫৬৮	১৪,৯৭,৪৮১
কাঠ	১৪,৮৬,৫১৬	১৪,৩৮,০৯৬
চামড়া	১২,৪৩,৯৩৪	১৩,৪০,৭০১
ছাতা প্রস্তুতের সরঞ্জাম	১২,৭৮,৫০২	১২,৭৪,২৯০
হীরা, চুনি, পান্না প্রভৃতি মূল্যবান্ প্রস্তর	১৯,৬০,৯৪৬	১২,৭২,৮৪৬
সাবান	১৩,৩৬,৩৪২	১২,৫৫,৯৬১
ফিতা, জরি, পাড় প্রভৃতি পোষাকের সরঞ্জাম	১০,৬৫,১৫৫	৯৪,১৪,৪৫
শস্য, ডাল, ময়দা	২৪,০৭,৩৯৬	৬৪,৫৭,০৯
অলঙ্কার	২১,১৬,১২৫	১১,৬৪,৩৩
বিবিধ জিনিষ	১,৪৭,৪৪,৭০৭	১,৬৪,৯০,২৯৮
মোট	৩৪,৭১,৭৪,৬১০	৩২,১২,৮৩,২৬৪

গত যুদ্ধের পর যখন জাহাজের অভাব, ভাড়া খুব চড়া, জিনিষ দুষ্প্রাপ্য, তখন আমদানী মালের দর চরমে উঠিয়াছিল; ১৯২০-২১ সালে ১১৯ কোটি টাকা, ১৯২১-২২ সালে ১০২ কোটি টাকা, পূর্বে বা পরে কখনো এত ওঠে নাই। আমদানীর মূল্য হ্রাস পাইতে আরম্ভ হইয়াছে ১৯২৮-২৯ সাল হইতে। ১৯৩৩-৩৪ সালের আমদানী মালের মূল্য ত্রিশ বৎসর পূর্বের সমান হইয়াছে। ১৯০১ সালে ছিল ৩১·৮৬ কোটি, ১৯৩৩-৩৪ সালে হইল ৩২.১২ কোটি।

ত্রিশ বৎসরের আমদানী তালিকা হইতে এখন তালিকার পরিবর্ধন

হইয়াছে: মোটর গাড়ী, ইঞ্জিনীয়ারিং জিনিষ, রবারের জিনিষ (টায়ার, টিউব প্রভৃতি), সাইকেলাদি নূতন আমদানী তালিকায় অগণিত। আমদানীর প্রধান মাল হইতেছে, সূতা, সূতার কাপড় ও হোসিয়ারী বা গেঞ্জি-মোজা ইত্যাদি।

ষাট বৎসর পূর্বে ১৮৮১-৮২ সালে বাংলাদেশে ১১ কোটি টাকার উপর বিলাতী বস্ত্র আমদানী হইয়াছিল; সে-সময়ে বাংলার মাথাপিছু বিলাতী কাপড়ের জন্য ব্যয় হইত ২ শিলিং ৬ পেন্স। সমগ্র রপ্তানীর ৪৬% ভাগ ছিল বস্ত্র ও সূতা। দশ বৎসর পরে ১৮৯০-৯১ সালে বিলাতী বস্ত্রের মূল্য উঠে ১৪ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা অর্থাৎ সমগ্র রপ্তানীর ৫৫.৯% ভাগ। আরও দশ বৎসর পরে ১৯০০-০১ সালে ১৫.৯০ লক্ষ টাকার মাল অর্থাৎ ৪৯.৯% ভাগ আমদানী হয়। ১৯০৫ সালে বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলন উপস্থিত হয়; তাহার ফলে আমদানী কাপড়ের অনুপাত কিছু কমে বটে, মূল্য কমে নাই; অর্থাৎ মোট বাণিজ্যের তুলনায় বস্ত্র কম আসিয়াছিল। ১৯০৯-১০ হইতে ১৯১৩-১৪ পর্যন্ত যুদ্ধের পূর্বের পঞ্চবার্ষিকী পর্বে গড়ে ২৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার করিয়া বস্ত্র কলিকাতায় আমদানী হয়। ইতিমধ্যে যুরোপের একচেটিয়া বাণিজ্যের ক্ষীণ প্রতিদ্বন্দ্বী দেখা দিল। রুশ-জাপানের যুদ্ধের পর জাপান ভারতে আমদানী বাণিজ্যে প্রবেশ করিল; ইতিপূর্বেই সে চীন ও পূর্বদ্বীপালীতে ভারতীয় মিলের প্রস্তুত মোটা কাপড়ের বাজারে প্রতিযোগী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ১৯১০-১১ সালে ইংলণ্ড প্রায় শতকরা ৯৪ ভাগ সূতির জিনিষ আমদানী করিতেছিল, জাপান তখন করে মাত্র ২.৩% ভাগ।

যুদ্ধের পর্বে ১৯১৪-১৯১৯ বিলাতী জাহাজ কমিয়া আসে; মালপত্র আসা হ্রাস পায়। ১৯১৩-১৪ সালে যেখানে ১৪০০ মিলিয়ন গজ বস্ত্র আমদানী হইয়াছিল, সেখানে কমিতে কমিতে ১৯১৮-১৯ সালে হইল ৫১২ মিলিয়ন গজ; দামও অসম্ভব চড়িয়া গেল। বাংলাদেশ যে কত অসহায়, সে-যে নিজ লজ্জা নিবারণ করিতেও অক্ষম, এটি কয় বৎসরের দারুণ অভাবে স্পষ্ট হইল। যুদ্ধের পূর্বে বস্ত্রের দাম গজ-প্রতি গড়ে ছিল ৵১০, আমদানী হইয়াছিল ১৪০০ মিলিয়ন গজ; ১৯১৮-১৯এ দাম হইল ।৵১০ গজ, ১৯১৯-২০তে ।৶০, ১৯২০-২১তে ।৵১১ পাই। শেষোক্ত বৎসরে কাপড় আমদানী হয় মাত্র ৬৩৬

মিলিয়ন গজ, কিন্তু ইহার দাম দিতে হয় ৩৭ কোটি টাকার উপর! এত কম কাপড়ের জন্য এত টাকা কখনো বাংলাকে দিতে হয় নাই। এই কাপড়ের দুর্ভিক্ষ যখন চরমে উঠিয়াছে, তখন বোম্বাই, আহমাদাবাদ মিল শতকরা ৭৫ টাকা পর্যন্ত ডিভিডেণ্ড দিয়াছিলেন।

যুদ্ধের সময় জাপান ভারতের অনেক বাণিজ্য হাতাইয়া লয়; কিন্তু সব সে রাখিতে পারে নাই; প্রথমত ভারতের বাজার দখল করিবার জন্য তাড়াতাড়িতে যে-সব মাল প্রস্তুত করিতেছিল তাহা অত্যন্ত কদর্য ছিল। যুদ্ধ শেষের কয়েক বৎসর পর জার্মানী আসিল। ইংলণ্ড গা ঝাড়া দিয়া উঠিল; কাপড়ের বাজার সে কিছু কালের মত ফিরিয়া পাইল; কিন্তু হোসিয়ারির বাজার পাইল না। ১৯২১-২২ সালে দেখি জাপান হোসিয়ারির ৭৮ ভাগ আমদানী করিতেছে। অন্যান্য ধুতি চাদর, ছিট প্রভৃতিতে ৯৭।৯৮ ভাগ তখনো ইংলণ্ড রক্ষা করিতেছিল। গত পনের বৎসরে ইহার যুগান্তর হইয়াছে।

ইহার পর হইতে ধীরে ধীরে জাপান ভারতের বস্ত্র সরবরাহে প্রতিযোগী হইয়া উঠিল। ১৯২৪-২৫ সালেই আধুনিক সময়ের বস্ত্র আমদানীর চরম উন্নতির বৎসর। মোট আমদানীর ৪০·৮৭% ভাগ ছিল সুতির জিনিষ—ইহার মূল্য ছিল ৩৫·৪৮ লক্ষ টাকা; বস্ত্র আসিয়াছিল ৯০৪ মিলিয়ন গজ। কিন্তু ইহার পর হইতেই বিদেশী বস্ত্রের আমদানী কমিতে আরম্ভ হইল; জাতীয় আন্দোলন, বিশেষভাবে 'বয়কট' নীতি এই ক্রমশ হ্রস্বমান বাণিজ্যের জন্য দায়ী; তারপর আসিল পৃথিবীব্যাপী মন্দা। জাপানের বাণিজ্য-চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রথম ১৯২৮-২৯ সালে বিলাতের নানা কোম্পানী একত্র হইয়া 'কম্বিনেশন' করিলেন*; কিন্তু তাহাতে ফল বিশেষ ফলিল না; শ্রমিক সমস্যা শ্রমিকদের কর্মাক্ষমতা প্রভৃতি নানা কারণে ইংলণ্ডের বস্ত্রশিল্প ভীষণভাবে আঘাত পাইতেছিল। ১৯২৮-২৯ সালে ২৪ কোটি টাকার মালের মধ্যে প্রায় ১৭ কোটি ছিল ইংলণ্ডের, সাড়ে তিন কোটির উপর ছিল জাপানের। ১৯২৯-৩০ সালে বৃটিশ ধূষর শার্টিং কাপড়কে জাপান বাংলা থেকে একেবারে তাড়াইল; এ বৎসর ইংরেজের মাল ছিল ১৪ কোটি টাকার, জাপানের ছিল ৫ কোটি ৩১ লক্ষর। ১৯৩০-৩১ সালে পৃথিবীময় মন্দা; ইংরেজী মাল আসিল ৪ কোটি টাকার,

* Bengal Ad. Rep. 1928-29, p 95

জাপানী আসিল ২'৫৭ কোটির ; সকলের মোট আসিয়াছিল মাত্র ৮'৫ কোটি। ১৯৩১ সালে ইংরেজ পাঠায় ৩ কোটি, জাপান পাঠায় ২'২১ কোটির ; পর বৎসরে প্রায় আধাআধি ইংরেজ ও জাপানের মধ্যে ভাগাভাগি দেখা যায়। ১৯৩০-৩১ সালের বাংলার সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে, চারি বৎসরে ইংলণ্ড প্লেন্ কোরা কাপড়ে শতকরা ৮৭ হইতে ৪০ ভাগে নামিয়াছে, ধোয়া কাপড়ে ৯৭ হইতে ৮১, রঙ্গীন ছিটে ৭০ হইতে ৬৪ ; আর সেই চারি বৎসরে জাপান প্লেন্ কোরা কাপড়ে শতকরা ১৩ হইতে ৫২, ধোয়া কাপড়ে ১ হইতে ১৭, রঙীন কাপড়ে ২৩ হইতে ৩২ এ উঠিয়াছিল। ১৯১০-১১ সালে জাপানের বাণিজ্য ছিল ২'৩% অংশ, ইংরেজের ছিল ৯৩'৬, কিন্তু কুড়ি বৎসর পরে ১৯৩০-৩১ সালে জাপানের অংশ দাঁড়াইয়াছে ৪২'২%, ইংরেজের আমদানী বাণিজ্য ৫৭'৭ অর্থাৎ বিশ বৎসরে বস্ত্র আমদানীতে জাপান আগাইয়াছে ৪০% হারে, ইংরেজ হটিয়াছে ৩৭% হারে।

জাপানকে কিভাবে বাধা দিবার চেষ্টা হইয়া আসিতেছে এবং জাপান কিভাবে সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া বাণিজ্য চালাইতেছে, তাহা বস্ত্রশিল্প পরিচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে।

বাংলার বন্দরে বিদেশী বস্ত্রের আমদানীর হিসাব।

	মোট আমদানীর শতকরা	লক্ষ টাকা	
১৯৩২-৩৩	২০'৫২%	৭,১২	জাপান প্রায় অর্ধেক আমদানী করিতেছে
১৯৩১-৩২	১৫'৪৬%	৫,২৩	২২,৩০ লক্ষ গজ জাপান ২,২১ লক্ষ টাকা(৪২'২%) ইংলণ্ড ৩,০২ লক্ষ টাকা (৫৭'৭%)
১৯৩০-৩১	১৭'৫৩%	৮,৬৫	৩৪,২০লক্ষ গজ, জাপান ২,৫৭ ; ইং ৪,০৮
১৯২৯-৩০	২৮'৪৬%	২৩,১৩	জাপান ৫,৩১ ; ইং ১৪,৩২
১৯২৮-২৯	২৭'৮১%	২৪,১০	জাপান ৩,৬১ লক্ষ ; ইং ১৬,৯৮
১৯২৭-২৮	৩৩'৬২%	২৮,১০	
১৯২৬-২৭	৩৪'০৬%	২৭,২৯	
১৯২৫-২৬	৩৪'৯৭%	২৭,৬৫	৭৬,৬০ লক্ষ গজ

	মোট আমদানীর শতকরা	লক্ষ টাকা	
১৯২৪-২৫	৪০·৮৭%	৪৫,৪৮	৯০,৪০ লক্ষ গজ
১৯২৩-২৪	৩৬·৪৯%	২৮,৭৯	
১৯২২-২৩	৪০·৭৩%	৩৩,৬৬	
১৯২১-২২	২৬·৭৮%	২৭,১৯	৬৫,২০ লক্ষ গজ। হোসিয়ারি জাপান ৭৮%
১৯২০-২১	৩১·২৭%	৩৭,১১	৬৩,৬০ লক্ষ গজ। ইং ৯৫% এখনো পাঠায় প্রতি গজের দাম ।৵১১ পাই
১৯১৯-২০	৩৩·৮৯%	২৮,২১	৫৮,৫৯ লক্ষ গজ, ।৶০ প্রতি গজের মূল্য
১৯১৮-১৯	৩৬·৮৯%	২৩,৪৭	৫১,৪৭ লক্ষ গজ
১৯১৭-১৮	৪৩·৫৮%	২৫,২৭	৭১,৬০ লক্ষ গজ
১৯১৬-১৭	৪১·৩৫%	২৩,২০	৯৭,৫০ লক্ষ গজ
১৯১৫-১৬	৩৯·৭৮%	২০,৫৮	১১৬,৭০ লক্ষ গজ
১৯১৪-১৫		২৪,৫৮	
১৯১৩-১৪		২৯,৭৯*	১৪০,০৪ লক্ষ গজ। প্রতি গজ ৵৬ পাই ইংলণ্ড ৯৪% মাল
১৯১২-১৩	৪৭·৬%	২৯,২২	
১৯১১-১২	৪২·২৩%	২২,৭৪	
১৯১০-১১	৪২·৩%	২০,৫৪	১১৪,৯০ লক্ষ গজ। মূল্য ১৮ কোটি ; ইংলণ্ড ৯৩·৬% জাপান ২·৪%
১৯০৯-১০	৪৪·৪%	২০,২১	ইংলণ্ড ৯৪·৬%
১৯০৩-০৪	৪৬·৩৭%	১৫,৬০	
১৯০০-০১	৪·৯৯%	১৫,৯০	
১৮৯০-৯১	৫৫·৯%	১৪,৫৭	
১৮৮১-৮২	৪৬%	১১,৪৩	

(১৯১৪-১৫ হইতে ১৯১৮-১৯:) ।৵৬ পাই প্রতি গজের মূল্য গড়ে প্রতি বৎসর ২৩,৪১ লক্ষ টাকা আমদানী হয়

---

* ১০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম ১৮১৩-১৪ এ বিলাতী কাপড় আমদানী হয়, উহার মূল্য ৯২ হাজার টাকা, ১৮১৪-১৫এ ৪৫ হাজার টাকা।

রেশম ও পশম আমদানী

রেশমী কাপড় এককালে বাংলার রপ্তানীর বিশেষ সামগ্রী ছিল। বিলাতে রেশম বোনার তাঁত আবিষ্কৃত হওয়ায়, বাংলা দেশ হইতে রেশমী-কাপড়ের চাহিদা প্রায় বন্ধ হইল, চাহিদা বাড়িল রেশমের সুতার অর্থাৎ কাঁচামাল সরবরাহের তাগিদা আসিল। ফলে বাংলার শিল্পী ও কারিগর বেকার হইল। তারপর ইতালি, ফ্রান্স, রেশম প্রস্তুত করিতে লাগিল; চীন, জাপান রেশম চালান দিতে লাগিল। বাংলার রেশমের বাজারও য়ুরোপে নষ্ট হইল। ১৮৮২ সালেও দেখি বাঙলা দেশ হইতে ৩৯ লক্ষ টাকার রেশম ও রেশমী কাপড় রপ্তানী হইতেছে; ১৮৯১ সালে ৬৫ লক্ষ টাকা, ১৯০১ সালে ৫৭ লক্ষ টাকার মাল কলিকাতা হইতে রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯১১ সালে কাঁচা রেশম ২৭ লক্ষ টাকার রপ্তানী হয়। তারপর তাহাকে তালিকায় আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

বর্তমানে রেশম ও কৃত্রিম রেশম ও রেশমী কাপড় বিদেশ হইতে আসিতেছে; চীন, জাপান প্রধান রপ্তানীকার; তাছাড়া ইতালীয় ও ফরাসীয় সিল্ক ও সুতা প্রচুর আসিতেছে। কৃত্রিম রেশম বৃটেন হইতে প্রচুর আসে। এই কৃত্রিম রেশম বাংলার সূক্ষ্মবস্ত্র শিল্পের সর্বনাশ সাধন করিতেছে। বৎসরে ৫৭।৫৮ লক্ষ টাকার কৃত্রিম রেশম কয় বৎসর আসিয়াছে।

সূতা ও সূতির কাপড়, রেশম ও রেশমী কাপড় ছাড়া বাংলা দেশে প্রচুর পরিমাণে পশমী কাপড় আসে; বাংলা দেশে পশমের কারখানা নাই বলিলেই চলে। উত্তর ভারতে বর্তমানে কয়েকটি কল হইয়াছে। কিন্তু য়ুরোপের সস্তা মালের চাহিদা ও কাটতি খুব। বাজারে যে সব সস্তা 'শাল' আলোয়ান, 'র‍্যাপার' বিক্রয় হয় তার অধিকাংশই বিলাতী, বিশেষভাবে ছিল জারমেনীর। যুদ্ধের পূর্বে ৭৫।৮০ লক্ষ টাকার মাল বিদেশ হইতে আসিত। গত যুদ্ধের পর ইতালী প্রধানত এই সস্তা কম্বল, র‍্যাগ, গরম কাপড় আমদানী করিয়াছিল। ১৯৩০-৩১ সালে বিলাতী দ্রব্যের বরকট আন্দোলনের ফলে বৃটীশ পশমী জিনিষের বিক্রয় খুবই কমিয়া যায়। ইতালিই পশমী জিনিষের বড় রকম

রপ্তানী করা হইল ; জাপানও পশমী মাল আনিতেছে। এছাড়া পোষাক পরিচ্ছদ ২২।২৪ লাখ টাকার আসে।

তুলা, রেশম, কৃত্রিম রেশম, পশম নির্মিত বহুবিধ কাপড় চোপড় ছাড়া, পরিধানের জন্য জুতাই আসিয়াছিল (১৯৩০-৩১ সালে) প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার। এই জুতার আমদানী ভীষণ বাড়িয়াছে, ১৯২৪-২৫ সালে ছিল ৪.১৯ লক্ষর, ১৯২৬-২৭ এ ৫.৪৫ লক্ষ এবং যখন সব জিনিষের চাহিদা কমিয়াছে, সেই ১৯৩০-৩১ সালে দেখা যায় জুতা আনিয়াছিল ৩৯.১৪ লক্ষ টাকার !

কাপড় চোপড়, জুতা মোজা বা তাহার সরঞ্জামের তালিকা হইতেছে আমদামীর মোটা অঙ্ক। ইহার পরেই আসে কলকব্জা, মেশিনারী। বাঙালী বা বাংলাদেশ ক্রমশই য়ুরোপের ইন্ডাষ্ট্রিয়েলিজম্‌কে গ্রহণ করিতেছে ; ইহার প্রধান প্রমান হইতেছে যে, বাংলা প্রচুর পরিমাণে মেশিনারী, মিলের সরঞ্জাম (যেমন কাপড়ের, পাটের, তেলের কল ইত্যাদি), লোহালক্কড় (Hardwar), ধাতু ও ধাতুজ সামগ্রী (যেমন লোহার চাদর, পিতল, তামা, এলুমিনিয়মের চাদর ইত্যাদি), বীক্ষণ যন্ত্রপাতি (Instruements), রাসায়নিক দ্রব্য, মোটর গাড়ী, সাইকেল, রেলের সরঞ্জাম, বারের জিনিষ-পত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং ও গৃহনির্মাণের উপযোগী মালপত্র আমদানী করিতেছে। ত্রিশ বৎসর পূর্বে বাংলার এইসব জিনিষ কিনিবার যে শক্তি ছিল তাহা হইতে বহুগুণ সে শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাংলাকে বিদেশী কলকব্জা, যন্ত্রপাতি কিভাবে তাকে আধুনিক করিয়া তুলিতেছে তাহা নিম্নের কতকগুলি সামগ্রীর আমদানী দেখিলে বুঝা যাইবে ; ইহার সঙ্গে পাঠক বাংলার শিল্প বিশেষভাবে পাট, বস্ত্র, চাল, তিল, সাবান, চিনি প্রভৃতি শিল্পের উন্নতির ইতিহাস তুলনা করিবেন। মেশিনারী ও মিলের সরঞ্জাম কি ভাবে এদেশে আসিতেছে, তাহা এই তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

	(হাজার টাকা)	মোট আমদানীর শতকরা
১৯০৯-১০ হইতে ১৯১৩-১৪ গড় বার্ষিক	২,১৫,১৩	
১৯১৪-১৫ হইতে ১৯১৮-১৯ যুদ্ধপর্ব, গড় বার্ষিক	২,১৮,৪৯	

	মোট আমদানীর শতকরা (হাজার টাকা)
১৯১৮-১৯ হইতে ১৯২৩-২৪ পর্যন্ত গড় বার্ষিক	১০,০৩,১২,০০০
১৯২৪-২৫ হইতে ১৯২৮-২৯ পর্যন্ত পাঁচ বৎসরে গড়	৫,০২২৪,০০০
১৯২৯-৩০	৬,৬৯,২৯
১৯৩০-৩১	৫,৩০,৭২
১৯৩১-৩২	৩,১১,১১

অন্যান্য আমদানীর মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে মোটর গাড়ী ও তাহার সরঞ্জাম। গত মহাযুদ্ধের পূর্বে বত্রিশ লক্ষ টাকার মাল আসিয়াছিল; যুদ্ধের পর ১৯১৯—২০ সালে দেখি ১ কোটি ৪১ লক্ষ, ১৯২০-২১এ ৪ কোটি ৯০ লক্ষ; তার পরবৎসরে হঠাৎ ৯১ লক্ষ! ইহার কারণ একস্‌-চেঞ্জের প্রতিকূল অবস্থার জন্য ভারতকে ন্যায্য মূল্যের অনেক বেশি দাম দিতে হইয়াছিল। ইহার পর এই মালের কিভাবে প্রগতি হইয়াছে দেখা যাক। ১৯২৮-২৯এর পর হইতে পৃথিবীব্যাপী দুর্গতি স্থরু হয় এবং গাড়ীর আমদানীও সঙ্গে সঙ্গে কমিতে থাকে।

	(হাজার টাকা) শতকরা		(হাজার টাকা) শতকরা
১৯২১-২২	৯১,৩৩ (·৯০)	১৯২৮-২৯	১,৯২,১৫ (২·২২)
১৯২২-২৩	৬৫,৬৭ (·৭৯)	১৯২৯-৩০	১,৬৩,৯৩ (২·০০)
১৯২৩-২৪	৯২,৬৯ (১·১৭)	১৯৩০-৩১	১,১৪,২৫ (২·২৯)
১৯২৪-২৫	৯৭,৯০ (১·১৫)	১৯২১-৩২	৬৫,৪৯ (১·৯৬)
১৯২৫-২৬	১,৩১,৫৪ (১·৬৬)	১৯৩২-৩৩	৫৪,৮০
১৯২৬-২৭	১,৪৯,৫৯ (১·৮৭)	১৯৩৩-৩৪	৭০,৩২
১৯২৭-২৮	১,৭৬,৮৩ (২·১২)	১৯৩৬-৩৭	

পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশই নিজ নিজ গাড়ী নির্মাণ করিতেছে; বাংলা-দেশের পক্ষে সে বিষয়ে কল্পনা করাও অসম্ভব। অতি আধুনিক সময়ে মোটর-শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা শোনা যাইতেছে। তবে বাংলাদেশে এখনো তাহার ঢেউ আসিয়া পৌঁছায় নাই। মোটর গাড়ীর বৃদ্ধির সহিত সর্বদেশেই

বিচিত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে ; রবারের শিল্প—অর্থাৎ টায়ার টিউব প্রস্তুত শিল্প, পেট্রোল মোবিল তৈল প্রভৃতির ব্যবসায়, মোটরের যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের কারখানা দেশ মধ্যে গড়িয়া উঠে। কিন্তু আমাদের দেশের প্রায় সামগ্রীই বিদেশ হইতে আমদানী হইতেছে।

বাংলায় কত রকমের জিনিষ আসে তাহার তালিকা অতিদীর্ঘ ; রাসায়নিক ঔষধপত্র কোটি টাকার উপর আসে ; ভারতের দেশীয় চিকিৎসা প্রণালী বিজ্ঞানসম্মত নহে—এই অজুহাতে তাহা গবর্মেণ্টের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত। দেশের গাছগাছড়াজাত ঔষধপত্র প্রায় অচল অথচ বিলাতের অনেক ঔষধের উপাদান এদেশের গাছগাছড়া, ফলমূল ; কিন্তু ঔষধ আসে বিদেশ হইতে।

বাংলাদেশে বস্ত্র, লবণ, জুতা, মোজা, মোটর গাড়ী, সাইকেল, রেল, খেলনা, বিস্কুট, তাশ, রঙ, পেন্সিল, কাগজ এইরূপ হাজারো রকমের নিত্য প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য বিদেশ থেকে আসে ; পৃথিবীতে এমন পরমুখাপেক্ষী 'সভ্য' জাত আর আছে কি না সন্দেহ।

পরিশিষ্ট—১

১৯১২ হইতে ১৯৩২ এই কুড়ি বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশে বৃটিশ মালের আমদানী কিভাবে হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা নিম্নের তালিকায় পাওয়া যাইবে। উপরের সংখ্যাটি বৃটিশ আমদানীর মূল্য কোটি টাকার, নিম্নের সমগ্র বাংলার মোট রপ্তানীর মূল্য।

কোটি টাকা

১৯১১-১২	বৃটিশ আমদানী	৩৬	১৯১৫	বৃটিশ আমদানী	৪২
	বাংলার রপ্তানী	৫২		বাংলার রপ্তানী	৫৭
১৯১২-১৩	বৃটিশ আঃ	৪৪	১৯১৬	বৃটিশ আঃ	৩৪
	বাং-রঃ	৬২		বাং-রঃ	৫২
১৯১৪	বৃটিশ আঃ	৫১	১৯১৭	বৃটিশ আঃ	৩৬
	বাং-রঃ	৭২		বাং-রঃ	৫৬

১৯১৮	বৃটিশ আঃ	৩৩
	বাং-রঃ	৫৮
১৯১৯	বৃটীশ আঃ	২৯
	বাং-রঃ	৬৪
১৯২০	বৃটিশ আঃ	৪৬
	বাং-রঃ	৮৩
১৯২০-২১	বৃটিশ আঃ	৭৮
	বাং-রঃ	১১৯
১৯২২-২৩	বৃটিশ আঃ	৫৮
	বাং-রঃ	৮৩
১৯২৩-২৪	বৃটিশ আঃ	৫২
	বাং-রঃ	৭৯
১৯২৪-২৫	বৃটিশ আঃ	৫৫
	বাং-রঃ	৮৭
১৯২৫	বৃটিশ আঃ	৪৮
	বাং-রঃ	৮০
১৯২৬	বৃটিশ আঃ	৪৬
	বাং-রঃ	৮১
১৯২৭	বৃটিশ আঃ	৫০
	বাং-রঃ	৮৬
১৯২৮	বৃটিশ আঃ	৪৬
	বাং-রঃ	৮৯
১৯২৯	বৃটিশ আঃ	৪১
	বাং-রঃ	৮৩
১৯৩০	বৃটিশ আঃ	২২
	বাং-রঃ	৫১
১৯৩১-৩২	বৃটিশ আঃ	১৩
	বাং-বঃ	৩৪

পরিশিষ্ট—২

কোন্ দেশ হইতে কতমাল আসিয়াছিল—

	যুদ্ধের পূর্বে	সর্বোচ্চ ক্রয়ের বৎসর	সর্বনিম্ন ক্রয়ের বৎসর
	১৯১৩-১৪	১৯২৮-২৯	১৯৩১-৩২
	(হাজার টাকা)		
বৃটিশ	৫১,,৪৬,৬২	৪৬,২৭,৬৪	১৩,৫০,৮১
এডেন	৮,৭৫	৪৬,৩৪	৪৮,৮৯
স্ট্রেট সেট্‌ল্‌মেণ্ট	১,৩৪,৫৮	২,৩২,৪১	১,৩২,৯৭

	যুদ্ধের পূর্বে	সর্বোচ্চ ক্রয়ের বৎসর	সর্বনিম্ন ক্রয়ের বৎসর
	১৯১৩-১৪	১৯২৮-২৯	১৯৩১-৩২
	(হাজার টাকা)		
হংকঙ	৪,৯৬	৯,৮৪	৬,০৬
মিশর	১২,৫৪	২৫,২৩	৯,৩৮
মরিশাস	৩৬,৯৭	২৬	০
কানাডা	৭	৭০,৭৩	৪,৩০
অষ্ট্রেলিয়া	৩১,৫৮	৪,৯৯,২৪	৯০,৯৮
রুশিয়া	৭৬	৩৯,১০	১৮,৪৮
জারমেনী	৩,৭৪,২০	৪,১৩,৯৪	২,৩১,৫১
বেলজিয়াম	১,১৬,৩৯	১,৭১,৩৯	৫৯,২৬
ফ্রান্স	৪১,৭৪	৮১,০৩	৩৫,৯৭
ইনিষ	৫১,২০	১,৬৩,০৮	৮০,৯৯
অষ্ট্রিয়া	১,১৫,৬৩	৩২,৪৭	১৭,৬০
জাভা	৫,৮২,৮৫	৬,৪৯,৭৩	১,৮৮,৯০
বোর্নিও (ওলন্দাজ)	৫৫,৪১	১,১০,৭৮	৪৩,৯৩
চীন	৯,২০	৮৯,১৮	৪৩,৯৩
জাপান	১,৫৫,৫২	৫,৯৭,৫৩	৪,১২,৯৪
মার্কিণ	১,৯০,৩৫	৫,২৭,৭১	৩,৪৪,১০
অন্যান্য	১,৩৩,১৬	৪,১৩,১৫	৩,১৭,৪৩
	৭২,০৮,০৯	৮৯,০০,৮৯	৩৪,৬৬,০৯

পরিশিষ্ট—৩

বাংলার আমদানীর মূল্য

	বেসরকারী	সরকারী	মোট (ধনদৌলত সহ)
	লক্ষ টাকা		
১৮৮১-৮৩	২৭,২৩		
১৮৯০-৯১	২৬,০৮		

বাংলার আমদানীর মূল্য

	বেসরকারী	সরকারী লক্ষ টাকা	মোট (ধনদৌলত সহ)
১৯০০-০১	৩১,৮৬		
১৯১১-১২	৫৩,৩৮		
১৯১২-১৩	৬৩,১৮	৫,৯৩	৮৮,১১
১৯১৩-১৪	৭২,০৮	৫,৯৪	৭৮,০২
১৯১৪-১৫	৫৭,১৬	২,৬৮	৫৯,৮৪
১৯১৫-১৬	৫২-২৮	২,৬৬	৫৪,৯৪
১৯১৬-১৭	৫৬,৫৪	১১,৮১	৬৮,৩৫
১৯১৭-১৮	৫৮,৩৯	১৪,৪২	৭২,৮১
১৯১৮-১৯	৬৪,০৪	৪৯,৮৮	১১৩,৯২
১৯১৯-২০	৮৩,৭৬	২৯,৭৪	১১৩,৫০
১৯২০-২১	১১৯,৮১	৩,২২	১২৩,০২
১৯২১-২২	১০২,৭২	৩,২২	১০৫,৯৮
১৯২২-২৩	৮৩,৫১	১,৯৯	৮৫,৫৩
১৯২৩-২৪	৭০,৪৮	২,৯৫	৯২,৭৯
১৯২৪-২৫	৮৬,৮৩	৩,২৯	৯০,১২
১৯২৫-২৬	৭৯,০৮	৫,০০	৮৪,০০
১৯২৬-২৭	৮০,১২	৪,৮৮	৮৫,০০
১৯২৭-২৮	৮৩,৬০	৬,১৬	৮৯,৭৬
১৯২৮-২৯	৮৬,৬৫	৪,৭৪	৯১,৩৯
১৯২৯-৩০	৮১,৩০	৫,৭০	৮৬,০০
১৯৩০-৩১	৪৯,৮৬	৩,০৮	৫২,৯৪
১৯৩১-৩২	৩৩,৮৪	১,৬৪	৩৫,৪৯
১৯৩২-৩৩	৩৪,৭১		
১৯৩৩-৩৪	৩২,১২		
১৯৩৪-৩৫	৩৬,২৮		

অষ্টত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

বাংলার রাস্তাঘাট

বাংলাদেশ নদীপ্রধান দেশ; সেইজন্য প্রাচীনকাল হইতে নদীই ছিল বাংলার চলাফেরা গতায়াতের রাজপথ। বড় বড় গ্রাম, গঞ্জ, বাজার, নদীর ধারেই জমিয়াছিল। পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গেই নৌতার্য নদী বেশি; পশ্চিম বঙ্গ বা রাঢ় অঞ্চলের পার্বত্য নদীগুলি নৌতার্য নহে। এককালে সমুদ্রগামী ডিঙা ভাগীরথী বাহিয়া গৌড় পর্যন্ত যাওয়া-আসা করিত। ক্রমে নদীর মুখের দিকে চর পড়িতে লাগিল, নূতন নূতন দেশ সেখানে গড়িয়া উঠিল এবং বাংলা-দেশের বাণিজ্যকেন্দ্র ক্রমশই দক্ষিণে সরিতে লাগিল; রাজধানী গৌড় হইতে রাজমহল. সপ্তগ্রাম, ঢাকা ঘুরিল; পরে হইল মুসিদাবাদ। সেখান হইতেও বাণিজ্যকেন্দ্র ধীরে ধীরে দক্ষিণ দিকে চলিল, হুগলী, বান্দেল, শ্রীরামপুর—অবশেষে আসিল কলিকাতায়। বিজ্ঞানের ও বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় জাহাজ হইতে লাগিল; সেসব জাহাজের পক্ষে ভাগীরথী বাহিয়া উত্তরে অধিক দূর যাওয়া ক্রমশই কঠিন হইল; তারপর নদীর গর্ভ মাটি ভরিয়া উঁচু হইয়া উঠিল। বহরমপুর মুর্সিদাবাদে শীতকালে সাধারণ নৌকাই আজ-কাল চলে না; এখন গঙ্গার অধিকাংশ জল যায় পদ্মার খাদ দিয়া। এদিকে দক্ষিণ বঙ্গের অনেক নদীই মজিয়া গিয়াছে ও যেগুলি আছে, সেগুলির বহতা অত্যন্ত ক্ষীণ; যশোহর, নদীয়ার নদীসমূহের দশা অত্যন্ত শোচনীয়। এতৎসত্ত্বেও প্রায় তিন হাজার মাইল জলপথ নৌকা ও ষ্টীমারযোগে চলাফেরা করা যায়। নদী বাণিজ্যের ও চলাফেরার একটা বড় পথ ছিল; বাংলার এই নদীগুলিকে রক্ষা করা এক সমস্যা হইয়াছে। কিন্তু এই নদীপথ ঠিক না রাখিতে পারায় বাংলার স্বাস্থ্য ও গমনাগমনের পথ নষ্ট হইয়াছে।

শক্ত শুক্‌না মাটি ছাড়া ভাল রাস্তা হয় না। প্রাচীনকালে গৌড় হইতে একটি রাস্তা মুর্সিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর হইয়া পুরী-শ্রীক্ষেত্র পর্যন্ত গিয়াছিল; এই রাস্তা অতি প্রাচীন; ইহারই এক শাখা গিয়াছিল

তাম্রলিপ্ত বা তমলুক পর্যন্ত, ইহা ছিল প্রাচীন বাংলার বা প্রাচ্য ভারতবর্ষের বন্দর। ফা-হিয়েন, হুয়েন-সাঙ সকলেই এই পথ দিয়া বাংলাদেশ পরিভ্রমণ করেন। মুসলমান যুগে এই পথই সংস্কার করা হয়; এই পথের নাম হয় বাদশাহী শড়ক। এ পথের চিহ্ন এখনো আছে। প্রাচীন গৌড় হইতে আর একটি রাস্তা নির্মিত হয় দিনাজপুর হইয়া কামরূপের দিকে।

মুসলমান যুগে দিল্লীর সহিত বাংলার সম্বন্ধ সুদৃঢ় করিবার জন্য পাঠান সম্রাট শেরসাহ সপ্তগ্রাম হইতে দিল্লী পর্যন্ত এক বিরাট রাজপথ নির্মাণ করেন। সপ্তগ্রাম ছিল তখনকার যুগের শ্রেষ্ঠ বন্দর—আজকালকার কলিকাতা, প্রাচীনযুগের তাম্রলিপ্ত। সপ্তগ্রামের চিহ্ন এখন নাই। শেরসাহের পথ এখন গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড নামে সুপরিচিত, ইহা ১৫০০ মাইল দীর্ঘ। বৃটীশ যুগে বেণ্টিঙ্ক সর্বপ্রথম রাস্তাঘাটের উন্নতির দিকে দৃষ্টি দেন; পরে ডালহৌসি শেরসাহের রাস্তা সুসংস্কৃত করেন; এখন এই রাস্তা কলিকাতা হইতে পেশোয়ার পর্যন্ত গিয়াছে। ইহাকে আমরা শেরসাহ্ শড়ক বলিব।

বাংলাদেশের রাস্তাঘাটের উন্নতির দিকে প্রথম দৃষ্টি পড়ে লর্ড মেয়োর। ১৮৭১ সালে 'রোড সেস্ এক্ট' পাশ হয়; এই কর প্রদেশের অন্তর্গত রাস্তাঘাট নির্মাণ ও মেরামত করিবার জন্য ব্যয়িত হইবে বলিয়া গবর্মেণ্ট দেশবাসীকে আশ্বাস দেন। এই কর ধার্য হইলে গবর্মেণ্ট রাস্তাদি নির্মাণের জন্য যে টাকা পূর্বে ব্যয় করিতেন তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন; রোড্ সেস্ হইতে যতখানি আদায় হইত, তাহার উপর রাস্তাঘাটের উন্নতি ছাড়িয়া দেওয়া হইল। কিন্তু এই নূতন কর ধার্য হওয়ায় পথঘাট যে বিশেষ উন্নতি লাভ করে নাই, তাহা বাঙালীর অবিদিত নহে।

বাংলাদেশের রাস্তা চারিভাবে নির্মিত ও রক্ষিত হয় (১) প্রাদেশিক বা যাহার ব্যয় বাংলা সরকার বহন করেন। (২) জেলাবোর্ড জেলার প্রধান রাস্তাগুলি সংরক্ষণ করেন। (৩) শহরের ভিতরের রাস্তাগুলি ম্যুনিসি-প্যালিটির উপর ন্যস্ত। (৪) গ্রামের রাস্তা য়ুনিয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে মেরামত হয়, গবর্মেণ্ট অনেক সময়ে টাকা সাহায্য করেন।

বাংলাদেশে ম্যুনিসিপ্যাল এলাকার মধ্যস্থিত রাস্তাগুলি সাধারণত ভাল। প্রত্যেক জেলাবোর্ডের তত্ত্বাবধানে কয়েক শত মাইল করিয়া রাস্তা আছে;

বোর্ডগুলি এইসব রাস্তা মেরামতের জন্য ৩৫।৩৬ লক্ষ টাকা বৎসরে ব্যয় করেন। জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিঙের রাস্তাগুলি সর্বোৎকৃষ্ট; ইহার কারণ চা-বাগিচার উন্নতি হওয়ায় পথঘাটগুলির জন্য অর্থ ব্যয়করা বোর্ডের পক্ষে সম্ভব। বিহার-ছোটনাগপুরের রাস্তা বাংলার তুলনায় অনেক ভাল। গ্রামের রাস্তা য়ুনিয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে; সেগুলি অর্থাভাবে অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত; অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্ষাকালে চলাফেরা করা কঠিন।

১৯২০ সালের পর হইতে এদেশে মোটর বাসের চলন আরম্ভ হয়; ইহার ফলে রাস্তাঘাট মেরামতের জন্য স্থানীয় সরকার ও জেলাবোর্ডের খরচ খুবই বাড়িয়া যায়। কোনো কোনো প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট রাস্তাঘাট উন্নতির জন্য রোড-বোর্ড গঠন করেন। অবশেষে ১৯২৭ সালে ভারত গবর্মেণ্ট ১৫ জন সদস্য মনোনয়ন করিয়া নিখিল-ভারত পথ-উন্নতি সভা স্থাপন করেন; মিঃ জয়কার ইহার সভাপতি হন। কিভাবে পথঘাটের উন্নতি করিতে পারা যায়, কোথা হইতে টাকা আসে ইত্যাদি বিষয় এই কমিটি সুপারিশ করেন।

মোটর গাড়ীর ও মোটর তৈল আমদানীর শুল্ক হইতে ভারত গবর্মেণ্টের প্রভূত আয় বাড়িয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা এই আয় হইতে প্রাদেশিক সরকারদের জন্য বিশেষ কিছু ছাড়িতে নারাজ। অথচ মোটর গাড়ীর উৎপাতে রাস্তাঘাট বেমজবুত হইয়া পড়িতেছিল; ইহার সমস্ত ব্যয় বহন করিতে হইতেছিল প্রাদেশিক অধিবাসীদিগকে। এই অভিযোগ দূর করিবার জন্য গবর্মেণ্ট ঠিক করিলেন পেট্রোলের উপর যে শুল্ক ছিল, তাহা বাড়াইয়া গ্যালনে ছয় আনা করা হইবে। ট্যাক্সির উপর ট্যাক্স, লাইসেন্স ফী, প্রভৃতি হইতে যে আয় হইবে স্থির হইল তাহা প্রাদেশিক রাস্তা-ঘাটের উন্নতির জন্য ব্যয়িত হইবে। এই টাকা প্রত্যেক প্রদেশকে নিজ নিজ পেট্রোলাদির আয়ের অনুপাতে দেওয়া হয়। সেই টাকা হইতে কতকগুলি রাজপথ নির্মিত হইতেছে। পূর্বে এই বড় বড় পথগুলি প্রাদেশিক সরকারের খরচে মেরামত হইত, এখন রোড-বোর্ডের আয় হইতে হয়। সুতরাং প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে এখন সেই উদ্বৃত্ত টাকা জেলাবোর্ডের হাতে দেওয়া সম্ভব হইল। ফলে জেলার বড় বড় রাস্তার উন্নতি হইবে আশা করা যায়। ১৯৩০ সালে নিখিল-ভারতের প্রথম রোড-কন্‌ফারেন্সে পেট্রোল ট্যাক্স হইতে প্রাপ্ত

টাকার বণ্টন হয়। বোম্বাই ১৭'২০ লক্ষ টাকা, বাংলা ১৩'২০ লক্ষ, মাদ্রাজ ১২'৭৩ লক্ষ, দেশীয় রাজ্য ১০ লক্ষ, পঞ্জাব ৮'১৫ লক্ষ, যুক্তপ্রদেশ ৪'৬৪ লক্ষ, মধ্যপ্রদেশ ৩'৭৫, বিহার-উড়িষ্যা ২'৮৮ লক্ষ টাকা পায়। (Jather & Beri, Indian Economics, Vol. II, p. 216)

বাংলা গবর্মেণ্ট নিখিল-রোড্-বোর্ড কমিটি হইতে কি পরিমাণ টাকা পাইয়াছে তাহা নিম্নের তালিকায় দিলাম :—

		হাজার টাকা
১৯২৯-৩০	...	১৩,৯৯
১৯৩০-৩১	...	১৩,২৮
১৯৩১-৩২	...	১৩,৭৯
১৯৩২-৩৩	...	১২,৭৩
১৯৩৩-৩৪ (ছয় মাস)	...	৬,৯
মোট	...	৬০,৪০ হাজার

বাংলার রোর্ড-বোর্ড কমিটি ১৩টি রাস্তার পরিকল্পনা করিয়াছেন, ইহার দৈর্ঘ্য মাত্র ৩২৬ মাইল ; এই কয় মাইল রাস্তা করিতে খরচ হইবে ৬৬ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা। গবর্মেণ্ট পঞ্চ-বার্ষিকী একটা প্ল্যান খাড়া করিয়াছেন, এবং এই সময়ের মধ্যে মাত্র ২০০ মাইল পাকা রাস্তা হইবে স্থির হইয়াছে। বাংলা-দেশে ৩,৪৮৯ মাইল পাকা রাস্তা, ৩৬,৮১৯ মাইল কাঁচা রাস্তা আছে। এই রেটে বাংলার রাস্তা যদি তৈয়ারী হয়, তবে বাংলায় সমস্ত রাস্তা নির্মিত হইতে প্রায় হাজার বছর লাগিবে এবং এই রেটে অর্থাৎ মাইল প্রতি যদি বিশ হাজার টাকা লাগে তবে এই রাস্তা করিতে লাগিবে ৮০ কোটি টাকা। এতকাল অপেক্ষা ও এত টাকা ব্যয় যদি করিতে পারা যায়, তবেই বাংলায় মোটর গাড়ীর চলার উপযুক্ত পাকা পথ হইবে।

বাংলাদেশের রাস্তা (মাইল)

জেলার নাম	সরকারী পূর্ত বিভাগের পাকা রাস্তা	সরকারী পূর্ত বিভাগের কাঁচা রাস্তা	জেলা-বোর্ড ইঃ বোর্ড মিঃটির প্রভৃতির পাকা রাস্তা	জেলা-বোর্ড ইঃ বোর্ড মিঃটির প্রভৃতির কাঁচা রাস্তা	মোট পাকা রাস্তা	মোট কাঁচা রাস্তা
বর্ধমান	১০৭	...	৪০০	১,১৮৩	৫০৭	১,১৮৩
বীরভূম	...	...	২৪০	৭৩০	২৪০	৭৩০
বাঁকুড়া	৫৮ ৩/৮	...	২৫০	৭২৭	৩০৮ ৩/৮	৭২৭
মেদিনীপুর	১১২ ৩/৪	...	৪৪০ ৩/৪	১,১৯৩ ১/২	৫৫৩ ১/২	১,১৯৩ ১/২
হুগলী	৪২ ১/২	...	১০৪ ১/৮	১,০৪৩	১৪৬ ৫/৮	১,০৪৩
হাওড়া	২৪ ৭/৮	...	৬১ ৩/৪	৬৮৬ ১/২	৮৬ ৫/৮	৬৮৬ ১/২
২৪-পরগণা	৯০ ১/৫	...	২৩৪ ৩/১০	৩,১৫৪ ১/৫	৩২৪ ১/২	৩,১৫৪ ১/৫
কলিকাতা	১৪	...	...	...	...	...
নদীয়া	...	...	১১৪ ৩/৪	২,০০৮	১১৪ ৩/৪	২,০০৮
মুর্শিদাবাদ	...	...	৫৪·৭	১,৫৭৪ ৩/৫	৫৪·৭	১,৫৭৪ ৩/৫
যশোহর	৪১·৩	...	১৪০ ১/২	২,০১৯	১৮১ ৪/৫	২,০১৯
খুলনা	...	...	৩৩	১,৯৭০	৩৩	১,৯৭০
ঢাকা	১৯	১০ ১/১৬	১৩ ৩/৫	৭৭১·৭	৩২ ৪/৫	৭৮২
মৈমনসিং	...	...	৮৫·৭	৩,৬৯৩	৮৫·৭	৩,৬৯০
ফরিদপুর	...	...	১৪ ১/২	৭৭১ ১/৫	১৪ ১/২	৭৮১ ২/৫
বাখরগঞ্জ	...	...	২৫ ২/৫	১,২৬৮·৩	২৫ ২/৫	১২৬৮·৩
চট্টগ্রাম	৬·৩	৪৩	১৪ ৩/৫	২,৬০০	২০·৯	২,৬৪৩
নোয়াখালী	১	২২ ৪/৫	৬ ১/৪	১,০৩১	৭ ১/৪	১,০৫৩ ৪/৫
ত্রিপুরা	৪ ২/৫	৪৭ ৩/৫	১২ ১/৪	৯৫০	১৬ ৩/৫	৯৯৭ ৩/৫
চট্টগ্রাম পার্বত্য প্রদেশ	৪/৫	২৭৯ ৩/১০	...	...	৪/৫	২৭৯ ৩/১০
রাজসাহী	...	...	৬৬ ১/২	১,৪১৩ ১/৮	৬৬ ১/২	১,৪১৩ ১/৮
দিনাজপুর	১৪·৯	...	৩৫	১,৪১৯	৪৯·৯	১,৪১৯
জলপাইগুড়ি	১৩২·০	৫৬	৭৫ ৩/৪	৭৩৯	২০৮ ১/২	৭৯৫

জেলার নাম	সরকারী পূর্ত বিভাগের পাকা রাস্তা	সরকারী পূর্ত বিভাগের কাঁচা রাস্তা	জেলা-বোর্ড ইঃ বোর্ড মিঃটির প্রভৃতির পাকা রাস্তা	জেলা-বোর্ড ইঃ বোর্ড মিঃটির প্রভৃতির কাঁচা রাস্তা	মোট পাকা রাস্তা	মোট কাঁচা রাস্তা
রঙ্গপুর	...	...	২০	২,৪৯৮	২০	২,৪৯৮
বগুড়া	১$\frac{১}{২}$	...	১৭$\frac{১}{৯}$	৬০০	১৮	৬০০
পাবনা	...	...	৩৭	১,০৩৩	৩৭	১,০৩৩
মালদহ	...	...	৩৬$\frac{৩}{৪}$	৬০৩	৩৬$\frac{৩}{৮}$	৬০৩
দার্জিলিঙ	২২২$\frac{২}{৩}$	১৩১	১৮	৪০৬$\frac{২}{৫}$	২৪০	৫৩৭
সিকিম	৩২	১৩৫	...	...	৩২	১৩৬
কেন্দ্রীয় সরকার হইতে	৯২৬	৭২৫	২,৫৬৩	৩৬,০৯৪	৩,৪৮৯	৩৬,৮১৯

ঊনচত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ

বাংলার রেলপথ

নদীপথ ও রাস্তা ছাড়া রেলওয়ে বর্ত্তমান গতায়াতের একটি বড় রকম পথ। ১৮৫৪ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কলিকাতা (হাওড়া) হইতে খোলা হয়; সুতরাং রেলওয়ের ইতিহাস হইতেছে ৮৭ বৎসরের ইতিহাস। তখন বিহার প্রদেশ বাংলার অন্তর্গত ছিল; সুতরাং প্রথম যে ১৪১ মাইল পথ খোলা হয়, তাহা বাংলা প্রদেশের মধ্যেই ছিল। সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতবর্ষে দ্রুত রেলপথ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হয়। ১৮৫৮ সালে ঈষ্টার্ণ বেঙ্গল ষ্টেট্ রেলওয়ের ১১০ মাইল পথ নির্ম্মিত হয়।

১৮৬৯ সালে সুয়েজখাল খোলা হয়; ১৮৭০ সালে জি. আই. পি. রেলপথ বোম্বাই হইতে জব্বলপুর পর্যন্ত আসে এবং ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়েও জব্বলপুর পৌঁছায়। এই বৎসর হইতে কলিকাতা-বোম্বাই রেলপথে যোগ হইল। ১৮৭১ সালে লণ্ডন-বোম্বাই সাপ্তাহিক মেল আসিবার ব্যবস্থা হয়; বোম্বাই-কলিকাতা রেলপথ সংযুক্ত হইলে কলিকাতায় বিলাতী সাপ্তাহিক মেল্ বিলির ব্যবস্থা হয়।

বর্ত্তমানে বড় বড় রেলওয়েগুলি ভারত গবর্ণমেণ্টের অধীন। ইহার আয় ব্যয়, লাভ-ক্ষতি, ব্যবস্থা, ইজারা সমস্তই ভারত-সরকারের খাশ ব্যবস্থাধীন। বাংলা সরকারের তত্ত্বাবধানে মাত্র পাঁচটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাইট্ রেলওয়ে (২০০ মাইল)। বাংলার বৃহৎ রেলওয়েগুলি কোন্ সময়ে নির্ম্মিত হয় তাহার তালিকা নিম্নে দিলাম :—

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে (E.I.R.)	...	১৮৫৪
ঈষ্ট বেঙ্গল (E.B.R.)	...	১৮৫৮
কলিকাতা-সাউথ-ঈষ্টার্ণ (E.B.R., Southern Section)		১৮৫৯
বেঙ্গল নাগপুর (B.N.R.)	...	১৮৮৬
ঈষ্ট বেঙ্গল-ঢাকা শাখা (E.B.R.)	...	১৮৮৫
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল (খুলনা লাইন) (E.B.R.)	...	১৮৮২
আসাম-বেঙ্গল (A.B.R)	...	১৮৯৫

এদেশের রেলপথ ভারত সরকারের একচেটিয়া ব্যবসায়। তবে রেলওয়ের সব কাজই গবর্মেণ্ট স্বয়ং করেন না; তাঁহারা বিলাতী কোম্পানীর হাতে কতকগুলি সর্তে রেলপথ নির্মাণের ভার ও পরিচালনার জন্য দীর্ঘকাল ইজারা দেন। সর্ত-সময় উত্তীর্ণ হওয়ায় অনেকগুলি রেলপথ এখন খাশ সরকারী সম্পত্তি হইয়াছে। রেলের ভাড়া, মাশুল প্রভৃতি সম্বন্ধে সরকার-ই একমাত্র নিয়ামক; কোনো প্রকার প্রতিযোগিতা নাই বলিয়া এসব ক্ষেত্রে যথেচ্ছাচার হইলেও লোকদের মানিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

বিগত য়ুরোপীয় যুদ্ধের পর হইতে ভারতের সর্বত্র মোটরগাড়ীব ব্যবহার বাড়িয়াছে। এখন প্রায় প্রত্যেক রেল ষ্টেশন হইতে মোটর বাস্ বা ট্যাক্সি করিয়া দূরের গ্রামে যাওয়া যায়। কলিকাতা হইতে অনেক যাত্রী মাল মোটরে করিয়া মফঃস্বলে যায় এবং কলিকাতায় বহুমাল ও যাত্রী মোটরে আসে। মফঃস্বলেও বহু স্থলে ট্রেন ও মোটরে রীতিমত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতেছে এবং বহুক্ষেত্রে রেল কর্তৃপক্ষ মোটর কোম্পানীগুলির ক্ষতি করিবার জন্য বিধিবদ্ধ চেষ্টাও করিতেছে।

বাংলাদেশের প্রধান দুই রেলওয়ে কেন্দ্র হইতেছে শিয়ালদহ (কলিকাতা) ও হাওড়া। ঈষ্ট বেঙ্গল রেলপথ শিয়ালদহ হইতে এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া ও বেঙ্গল নাগপুর রেলপথ হাওড়া হইতে বাহির হইয়াছে।

শিয়ালদহ ঈষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ের কেন্দ্র; সেখান হইতে নানা শাখা-রেল বাহির হইয়াছে। প্রধান লাইন কলিকাতা হইতে শিলিগুড়ি পর্যন্ত গিয়াছে; —শিলিগুড়ি হইতে লাইট্ রেলওয়ে করিয়া দার্জিলিঙ যাওয়া যায়। পূর্বে দামুকদিয়া পর্যন্ত ব্রডগেজ (৫′—৬″ইঞ্চি) রেল ছিল; তারপর সারাঘাটে পদ্মা নদী পার হইয়া মিটার গেজ (৩′—৩″) লাইনে উঠিতে হইত; শিলিগুড়ি পর্যন্ত এই গেজ্ ছিল। এখন সারা ব্রীজ্ (হার্ডিংজ ব্রাজ) নির্মিত হওয়ায় ও উত্তরাংশে সমস্ত পথটাই ব্রড গেজ হওয়ায়, গাড়ী কলিকাতা হইতে সোজা শিলিগুড়ি যাইতে পারে। এই রেল সম্পূর্ণভাবে বাংলার মধ্যে।

শিয়ালদহ হইতে একটি শাখা পথ খুলনার দিকে গিয়াছে। নৈহাটির সহিত ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে যুক্ত হইয়াছে; এইখানে গঙ্গার উপর সেতু আছে। রাণাঘাট একটি বড় জংশন; এখান হইতে একটি শাখা গিয়াছে

যশোহরের দিকে, অপর একটি গিয়াছে মুর্সিদাবাদ বহরমপুর হইয়া লালগোলা-ঘাট পর্যন্ত ; লালগোলাঘাট হইতে গঙ্গা পার হইয়া উত্তর-পশ্চিম বঙ্গে যাইতে হয়। প্রধান লাইনের উপর অবস্থিত পোড়াদহ হইতে একটি শাখা চলিয়া গিয়াছে গোয়ালন্দর দিকে ; পথে একটি শাখাপথ গিয়াছে ফরিদপুরে। গোয়ালন্দ পদ্মার তীরে। এখান হইতে ষ্টীমারযোগে পূর্ববঙ্গের নানা স্থানে (নারায়ণগঞ্জে, চাঁদপুরে) এবং আসামে যাওয়া যায়। গোয়ালন্দ একটি বড় ষ্টীমার ঘাট। নারায়ণগঞ্জ হইতে যে লাইন ঢাকা ও মৈমনসিং জেলার মধ্য দিয়া গিয়াছে তাহা ঈ. বি. রেলওয়ের অন্তর্গত। ইহার অনেক শাখা আছে ; একটি শাখা ব্রহ্মপুত্র তীরে জগন্নাথগঞ্জ পর্যন্ত গিয়াছে।

সারা ব্রীজ পার হইয়া ঈশ্বরদি হইতে একটি লাইন গিয়াছে পূর্ব-উত্তর দিকে ব্রহ্মপুত্রতীরে সিরাজগঞ্জ পর্যন্ত। এই সিরাজগঞ্জ হইতে ষ্টীমারযোগে জগন্নাথগঞ্জে নামিয়া মৈমনসিং জেলার নানাস্থানে যাওয়া যায়। ঈশ্বরদির পর পর আবদুলপুর হইতে লাইন গিয়াছে রাজসাহীর আমনুরা জংশন ; আমনুরা হইতে গোদাগাড়ি ঘাট পর্যন্ত আসিলে অপরপারে লালগোলার ঘাট পাওয়া যায় ; আমনুরা হইতে মালদা, কাটিহার যাওয়া যায়। আজকাল এই পথ দিয়া রাজসাহী যাওয়া যায় ; পূর্বে ষ্টীমারযোগে যাইতে হইত।

সান্তাহার হইতে একটি লাইন পুনরায় পূর্ব-উত্তর দিকে গিয়াছে ; এই পথে ধুবড়ী যাওয়া যায়। প্রধান পথ ধরিয়া আরও উত্তরে যাইলে পার্বতীপুর একটি বড় জংশন। বিহার হইতে একটি লাইন এখান দিয়া গিয়াছে আসামের দিকে ; সেই লাইন পূর্বদিকে সান্তাহার লাইনের সহিত কৌনিয়া জংশনে মিলিত হইয়াছে এবং পূর্বদিকে রাঙাপাড়া পর্যন্ত গিয়াছে। পথে রাঙ্গিয়া হইতে বাঁকিয়া ব্রহ্মপুত্র তীরে আমিনগাঁও পর্যন্ত রেলপথ আসিয়াছে। নদী পার হইয়া সেখান হইতে আসাম-বেঙ্গল রেলপথ পাণ্ডুঘাট ষ্টেশন হইয়া লাম্‌ডিঙে গিয়াছে। পাণ্ডু হইতে মোটরযোগে শিলঙ যাওয়া যায়।

ঈ. বি. রেলওয়ের সকল শাখার বিস্তৃত বর্ণনা সম্ভবপর নয় ; তবে এই রেলপথকে বাংলাদেশের বিশেষ রেল পথ বলা যায়।

আসাম-বেঙ্গল রেলপথ চট্টগ্রাম হইতে উত্তর-আসামের তিনশুকিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ত্রিপুরা জেলার মধ্য দিয়া গিয়া উহা সিলেট

ও কাছাড় গিয়াছে। লাক্সাম হইতে একটি লাইন চাঁদপুর, একটি নোয়াখালি গিয়াছে। চাঁদপুর হইতে গোয়ালন্দে ষ্টীমারে আসা যায়। কাছাড় জেলার পার্বত্য অংশ অতিক্রম করিয়া পুনরায় আসামে সমতল ভূমিতে রেলপথ পড়িয়াছে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সহিত সমুদ্রপথের যোগ হইয়াছে এই রেল দিয়া। গোয়ালন্দ হইতে ষ্টীমারে করিয়া চাঁদপুর ও তথা হইতে রেলযোগে চট্টগ্রামে মেল যায়; আসামে বা সিলেটে যাইতে হইলেও এই রেলপথে যাইতে হয়। সিলেট হইতে মোটরযোগে এখন শিলং যাওয়া যায়। শিলং যাইবার অপর পথ পার্বতীপুর হইয়া। এখান হইতে যে রেলপথ পূর্বদিকে গিয়াছে, তাহারই এক ষ্টেশন আমিনগাঁওএ ব্রহ্মপুত্র নদ পার হইয়া পাণ্ডু বা গৌহাটিতে আসিতে হয়, সেখান হইতে মোটরযোগে শিলং যাওয়া যায়। পূর্বে আসামের অন্তর্গত সিলেট ও কাছাড়ের লোকদের শিলং যাইতে হইলে লাম্‌ডিং হইয়া পার্বত্য অংশের পথ ঘুরিয়া পাণ্ডু হইয়া যাইতে হইত; ইহাতে সময় ও ব্যয় অত্যন্ত লাগিত; সিলেট হইতে মোটর সার্ভিস হওয়ায় এখন আসামের দুই অংশের মধ্যে দ্রুত গতায়তের সুবিধা হইয়াছে।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে বাংলার আদি রেলপথ। এই রেলপথের উপর রেলগাড়ী চলিবার প্রধানতম উপাদান কয়লার খনি আছে। উত্তর ভারতের অধিকাংশ রেল-ইঞ্জিন চলিতেছে বর্ধমান জেলার ও বিহারেব কয়লা হইতে। ঈ. আই. রেলপথ পশ্চিম ভারতের সহিত বাংলাকে যুক্ত করিয়াছে। এই রেলের প্রধান তিনটি পথ পশ্চিমে গিয়াছে—মেন্ লাইন বা কর্ড, গ্রাণ্ড কর্ড ও লুপ। মেন্ লাইন গিয়াছে শ্রীরামপুর, চন্দননগর, বর্ধমান, আসানসোল প্রভৃতি বড় বড় শহরের মধ্যে দিয়া; এই লাইন মধুপুর, বৈদ্যনাথ, জসেদি, ঝাঁঝা প্রভৃতি হইয়া কিউলে গিয়া লুপ লাইনের সহিত মিশিয়াছে। লুপ বর্ধমানের উত্তরে খানা জংশন হইতে ভাঙিয়া উত্তর দিকে বীরভূম জেলার মধ্য দিয়া গিয়াছে। এই লাইনে বোলপুর, সাঁইথিয়া, রামপুরহাট, নলহাটি, পাকুড়, বরহওরা, সাহেবগঞ্জ প্রভৃতি ষ্টেশন। বরহওরায় লুপ লাইনের আর একটি শাখা ব্যাণ্ডেল হইতে বাহির হইয়া গঙ্গার ধার ধার দিয়া আসিয়া এখানে মিশিয়াছে; এই লাইনে কাল্‌না, কাটোয়া পড়ে; কাটোয়ার সহিত ছোট (লাইট্) লাইনের দ্বারা বর্ধমান ও লুপ লাইনের আমদপুর যুক্ত।

আজিমগঞ্জের সহিত নলহাটি পর্য্যন্ত রেল আছে। লুপ লাইন সাহেবগঞ্জ-ভাগলপুর হইয়া কিউলে মেন্ লাইনের সহিত মিলিত হইয়াছে। সাহেবগঞ্জে গঙ্গা পার হইলে মনিহারি ঘাট; সেখান হইতে কাটিহার পর্য্যন্ত ট্রেন আছে। কাটিহার হইতে একটি লাইন পূর্ব-পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে; সেই লাইনের উপর দিনাজপুর, পার্বতীপুর, রঙ্গপুর, কৌনিয়া, লালমণিরহাট, জিতলদহ, গোলকগঞ্জ (ধুবড়ী) ও আমিনগাঁও; এই আমিনগাঁও হইতে শিলং যাওয়া যায় ও তারপর রাঙ্গাপাড়া। এই লাইনের সহিত পার্বতীপুরে ঈ. বি. রেলের মিলন হইয়াছে; তিস্তা জংশনে সান্তাহার লাইনের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে। আবার কাটিহারের সহিত ঈ. বি. আর. মেন লাইনে আবদুলপুরের সংযোগ হইয়াছে মালদহ রাজসাহীর ভিতর দিয়া।

ঈ. আই. আর-এর বর্ধমান, খানা ছাড়াইয়া আসানসোল হইতে গ্রাণ্ড কর্ড লাইন ভাঙ্গিয়া পূর্ব-উত্তর দিকে গয়া প্রভৃতি স্থান দিয়া মোগল-সরাইতে মেন্ লাইনের সহিত মিলিত হইয়াছে।

বাংলার মধ্যে ঈ. আই. রেলের বর্ধমান-হাওড়া কর্ড লাইন, শেওড়াফুলি তারকেশ্বর লাইন উল্লেখযোগ্য। সাঁইথিয়া হইতে অণ্ডাল লাইনের উপর সিউড়ী, দুবরাজপুর প্রভৃতি স্থান; সিউড়ী বীরভূমের সদর, দুবরাজপুরের নিকট বক্রেশ্বর তীর্থ। আহম্মদপুর হইতে একটি লাইট্ রেলওয়ে কাটোয়া পর্যন্ত ও কাটোয়া হইতে বর্ধমান পর্যন্ত গিয়াছে। রামপুরহাট জংশন নহে, তবে দুমকা যাইবার ষ্টেশন, কুলি সংগ্রহের ডিপো। নলহাটি হইতে একটি শাখা গঙ্গার তীরে আজিমগঞ্জ পর্যন্ত গিয়াছে; গঙ্গা পার হইয়া জিয়াগঞ্জ ঈ. বি. রেলওয়ের উপর; মুর্সিদাবাদের সহিত বীরভূমের যোগ হইয়াছে এই রেল দিয়া। আবার এই রেল পথ বরহওরায় লুপ লাইনের সহিত মিলিয়াছে।

বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথ হাওড়া হইতে বাহির হইয়াছে; হাওড়া জেলা, মেদিনীপুর জেলা ভেদ করিয়া একটি শাখা গিয়াছে বোম্বাই-এর দিকে, একটি গিয়াছে উড়িষ্যা হইয়া মাদ্রাজের দিকে; খড়্গপুর একটি বড় জংশন। এখান হইতে একটি শাখা মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর হইয়া আদ্রায় আসিয়া ঈ. আই. আর-এর সঙ্গে মিলিয়াছে। আদ্রা হইতে পুরুলিয়া ও পুরুলিয়া হইতে রাঁচি যাওয়া যায়। [দ্রষ্টব্য—বাংলার ভ্রমণ, পূর্ববঙ্গ জলপথ হইতে প্রকাশিত]

চত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ

জলপথ ও জলযান

বাংলার নদী পথে যেসব নৌকা ও ষ্টীমার চলে, তাহা গবর্মেণ্টের নয়। নৌকার মালিক দেশীয় লোক—বর্তমানে পশ্চিম-বঙ্গে বহু হিন্দুস্থানী এই কাজ করিতেছে। এক হিসাবে ইহাও এই শ্রেণীর লোকদের একচেটিয়া ব্যবসা। তবে ষ্টীমার কোম্পানীগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদেশী পুঁজিওয়ালার সম্পত্তি ও বাংলার নদীপথ ও সমুদ্র-উপকূল তাহাদের জমিদারী বলা যাইতে পারে। পৃথিবীর কোন সভ্য স্বাধীন দেশের আভ্যন্তরীণ নদীবক্ষে বা উপকূলে বিজাতীয় কোম্পানীর জাহাজ চলিতে দেওয়া হয় না। কিন্তু বাংলাদেশেব বিদেশী ষ্টীমার কোম্পানীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া অনেক দেশী জাহাজ কোম্পানী দেউলিয়া হইয়াছে। মাশুল ও ভাড়া সম্বন্ধে তাহারা যথেচ্ছাচারী; এবং ভাড়া কমাইয়া দেশীয়দের এই একচেটিয়া ব্যবসায়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার চেষ্টাকে বহুবার সমূলে নষ্ট করিয়াছে।

বাংলার বাহিরে—মাদ্রাজ, সিংহল, বর্মা, সিঙাপুর প্রভৃতি স্থানের সহিত উপকূল-বাণিজ্য (Coastal Trade) চলে। চট্টগ্রামে একটি কোম্পানী গঠিত হইয়াছিল; তাহারা রেঙ্গুনে জাহাজ চালাইত। বর্তমানে উহা সিন্ধিয়া ষ্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে চলিতেছে।

কিন্তু বাংলার দশা চিরকাল এইরূপ ছিল না. বাংলার ডিঙি সিংহল ও মলয় দ্বীপে যাইত, তাহার কাহিনী বাংলা সাহিত্যে: পাওয়া যায়। অত প্রাচীন কথা ছাড়িয়া দিই। বাংলাদেশের বন্দর হইতে বাংলার কাঠের তৈয়ারী জাহাজ ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত সমুদ্রে চলাফেরা করিত। ১৮০০ সালে লর্ড ওয়েলেসলী লিখিয়াছিলেন যে, কলিকাতার বন্দরে প্রায় ১০,০০০ টনের জাহাজ ছিল, সেগুলি ভারতেই তৈয়ারী। বোম্বাই-এর সেগুণ কাঠের জাহাজ, বিলাতী ওকের তৈয়ারী জাহাজ হইতে ভাল বলিয়া তিনি নির্দেশ করেন (Digby, p. 85-6)। তারপর লৌহনির্মিত জাহাজের চল হইল,

বিলাতে দেশীয় জাহাজ যাওয়া-আসা সম্বন্ধে নানাবিধ আইন প্রণীত হইল; ফলে ভারতের তথা বাংলার একটা প্রকাণ্ড শিল্প ও উপজীবিকা নষ্ট হইল।

ভারতের উপকূল ও নদীপথে যেসব ষ্টীমার কোম্পানী বর্ত্তমানে কাজ করিতেছে, তাহাদের অধিকাংশই বিদেশী কোম্পানী। বৃটিশ ভারতের বন্দর সমূহে যে সব জাহাজ আসে ও যায়, তাহার টনেজের শতকরা ৬৯।৭০ খানি বৃটিশ, ২৮।২৯ খানি অন্যান্য বৈদেশিক পণ্যের ও মাত্র ১।১'৩ খানি ভারতীয়!

		যুদ্ধেরপূর্ব্বে গড়ে		১৯১৪-১৯—গড়ে		১৯২৯-৩০	
		সংখ্যা	টন্ (হাজার)	সংখ্যা	টন্ (হাজার)	সংখ্যা	টন্ (হাজার)
ষ্টীমার	বৃটীশ	২,৬১২	৬,৬০৬	১,৪৬৯	৩৯৩৪	২,১৩৯	৭,১২৯
	ভারতীয়	৪৮০	৩৪৮	২৮০	১৬৮	২৩৮	৪৪৫
	বৈদেশিক	৫৯৬	১,৩৩৬	৪৬০	১১২৬	৬৭৭	২,৩৮৭
পণ্যের জাহাজ	মোট	৫৭	৮	৭৭	১৬	১০	১
কলিকাতার বন্দরে		৩,৬৫৫	৮,২৯৮	২,২৮৬	৫,২৪৪	৩,০৬৪	৯,৯৬২
চট্টগ্রাম		১,০৮৫	৭৮৪	২,২১৯	৫৮৭	২,২০৫	১,২৮৮*
মোট বাংলাদেশ		৪,৭৪০	৯,০৮২	৪,৫০৫	৫,৮৩১	৫,২৬৯	১০,২৫০

১৯২৯-৩০ সালে ১,০২,৫০,০০০ টনের মধ্যে ভারতীয় জাহাজের অংশ মাত্র ৫,৯০,০০০ টন্!

শ্রীযুক্ত হাজির অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে, ১৯২৮-২৯ সালে জাহাজ কোম্পানীগুলির বাৎসরিক আয় আনুমানিক ৫৭ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে ৫০ কোটি টাকা বিদেশী কোম্পানীরা পায় (৯ কোটি উপকূল-বাণিজ্যে, ৩৮ কোটি সমুদ্র-বাণিজ্যে ও ৩ কোটি যাত্রীর ভাড়া হইতে)।

বর্ত্তমানে বাংলা তথা ভারতের বহির্বাণিজ্যের ও উপকূল-বাণিজ্যের বিদেশী কোম্পানীরা সকলে মিলিয়া একটা 'জোট' বা মনোপোলি গড়িয়াছে; তাহাদের বিপুল অর্থবল। সরকারী ডাক, সরকারী মালপত্র বিদেশ হইতে আনিবার একমাত্র ভার তাহারাই পায়। এদেশ হইতে যেসব কোম্পানী মালপত্র

* ভারতীয় জাহাজে ১৪৫ হাজার মাত্র।

বিদেশে চালান দেয়, তাহাদিগকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য নানারূপ রিবেট্ দানের ব্যবস্থা আছে। বিশেষ কতকগুলি জাহাজ কোম্পানীর সহিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ করিতে পারিলে দরের যে সুবিধা পাওয়া যায়, তাহা ব্যবসায়ীর পক্ষে কম লাভের ও লোভের বস্তু নয়! এ ছাড়া এক বন্দর হইতে অন্য বন্দরে মাল লইতে যে দর ফেলা আছে, তাহারও বিস্তর সুবিধা দেওয়া হয়। বিদেশে মাল চালান করিবে এদেশের লোক, অথচ তাহাদের জাহাজ নাই, এবং জাহাজের ভাড়া বা নিয়মকানুন সম্বন্ধে দেশীয় শাসনতন্ত্রের কোনো ক্ষমতা নাই—এই অসম্ভব পরিস্থিতির জন্য বাংলাকে প্রতিবৎসর বহু কোটি টাকা লোকসান দিতে হইতেছে।

কলিকাতা ও চট্টগ্রাম কেবল বাংলার বন্দর নহে। যুক্তপ্রদেশের পূর্বার্ধ, বিহার-উড়িষ্যার একমাত্র বন্দর কলিকাতা। আসাম ও পূর্ববঙ্গের বন্দর কলিকাতা ও চট্টগ্রাম। কলিকাতা ও বর্মার মধ্যের বাণিজ্যকে উপকূল-বাণিজ্যই ধরা হইত। উপকূল-বাণিজ্য সকল দেশেই দেশীয় লোকেরা করে; কিন্তু এদেশে তাহা হয় না। শ্রীযুক্ত হাজি এ বিষয়ে যে বিল্ আনেন, তাহা অর্থনৈতিক দিক হইতে অসাধ্য বলিয়া গবর্মেণ্ট চাপা দেন; কিন্তু হাজির লেখা পড়িলে তাহা মনে হয় না। বর্তমানে বাংলার নিজস্ব কোনো জাহাজ নাই; তাহার বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পূর্ণ বিদেশী জাহাজ-ওয়ালার কৃপার উপর নির্ভর করিতেছে। বিগত যুদ্ধের সময় বুঝা গিয়াছিল, জাহাজের অভাবে বাংলাকে কি কষ্ট পাইতে হয়।

আমরা পূর্বে যে সংখ্যা দিয়াছি, সেটি হইতেছে বাংলার বন্দর হইতে সকল শ্রেণীর জাহাজ যা আসে ও যায় তাহার তালিকা। ইহার মধ্যে প্যাসেঞ্জার জাহাজ যা সপ্তাহে তিনবার ছাড়ে, উপকূল-বাণিজ্যের জাহাজ সবই ধরা আছে। কিন্তু কেবলমাত্র মাল লইয়া বিদেশ হইতে যেসব জাহাজ যতবার আসে, তাহার সংখ্যা সমগ্র ভারতের জন্য হইতেছে ১৯২৯-৩০ সালে ৭০২০ খানি (টনেজ ১,৭২,৩৩,২৬১ টন), বৃটিশ ভারতের (বর্মা সমেত) ১৮টি বন্দরে ৫,৬৩০ খানি। ইহার মধ্যে জাহাজের সংখ্যা ও টনেজ হিসাবে বোম্বাই প্রধান। তারপর টনেজ হিসাবে কলিকাতা দ্বিতীয়, রেঙ্গুন তৃতীয়, মাদ্রাজ চতুর্থ, করাচী পঞ্চম; কিন্তু জাহাজের সংখ্যায়

করাচী দ্বিতীয়। ১৯৩০-৩১ সালে টনেজে রেঙ্গুন দ্বিতীয় বন্দর, কলিকাতা তৃতীয়। ১৯২৯-৩০ সালে কলিকাতা বিদেশী মাল জাহাজের টনেজ ছিল ২,৯৬১,৭৮৫ টন। ইহার পর হইতে হ্রাস পাইতে থাকে।*

বিলাতের ডাক ও যাত্রীরা সাধারণত বোম্বাই হইতে ষ্টীমারে চড়ে; কিন্তু কলিকাতা হইতেও প্রতি সপ্তাহে নানা কোম্পানীর জাহাজ য়ুরোপাভিমুখে যায়। য়ুরোপ ছাড়া কলিকাতা হইতে জাহাজ মাদ্রাজ ও কলোম্বো যায়, আফ্রিকায় যায়। বর্মা, পেনাঙ, সিঙাপুর, চীন, জাপান, অষ্ট্রেলিয়ার জাহাজও কলিকাতা হইতেই ছাড়ে। বর্তমানে অনেকগুলি জাপানী কোম্পানীর জাহাজ কলিকাতা হইতে ছাড়ে।

জাহাজ তৈয়ারীর বিপুল শিল্প হইতে বাঙালী বঞ্চিত; জাহাজ চালনার বিদ্যা হইতে সে বঞ্চিত। বাংলার দক্ষিণে বিশাল সাগর—এই সাগর রক্ষাব জন্য নৌবাহিনীর প্রয়োজন, অথচ এই উপকূল রক্ষার কোন উপায় বাঙালীর নাই। নৌবাহিনী গঠনের শিল্প, নৌ-সৈনিকের পেশা হইতেও বাঙালী বঞ্চিত। বঙ্গের ও বাঙালীর পরিচয় দিতে গিয়া বলিতে হয় যে, বাঙালীব বাণিজ্যের জাহাজ নাই, বাঙালীর নৌবাহিনী নাই।

* (Statistical Abstract, 10th Issue, No. 258.

একচত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ

পোষ্টাফিস

পোষ্টাপিস নিখিল ভারতীয় বিভাগ। বাংলা ও আসাম লইয়া ইহার প্রাদেশিক বিভাগ গঠিত; স্থতরাং যেসব সংখ্যা পাওয়া যায়, তাহা বাংলা ও আসামের, কেবল বাংলার নহে। বাংলার পোষ্টাপিস বিভাগ একজন পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের অধীন। সমগ্র বাংলাদেশটি কয়েকটি পোষ্টাল জেলায় বিভক্ত; সে-ভাগ ঠিক শাসনবিভাগের জেলা ভাগের মত নহে। প্রত্যেক পোষ্টাল জেলায় একজন করিয়া স্থপার-ইনটেনডেণ্ট থাকেন।

বাংলাদেশের প্রধান পোষ্টাপিস কলিকাতার জেনারেল পোষ্টাপিস। সমগ্র দেশে (বাংলা-আসাম) ১৯৩১ সালে ৪,৫০৯টি ডাকঘর ছিল; ইহার মধ্যে শহর অঞ্চলে ৫৬৬টি ও গ্রামে ৩,৯৪৩টি ছিল। ডাকঘরগুলির মধ্যে ৩৯টি হেড্ আপিস্ (প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া আছেই); সাব্-আপিস ১১০৬। ব্রাঞ্চ আপিস ৩৩৬৪। পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ আপিসের সংখ্যা ৭৩৯। গড় হিসাব ধরিলে প্রতি ৩৩·৫৯ বর্গ মাইলে একটি ডাকঘর আছে এবং ১২,৩২৭ জন লোক বা গড়ে ২,৪৬৫টি পরিবার তাহার স্থবিধা পায়। ডাক বাক্সের সংখ্যা ১১,৭৫২; শহরে ২,৫৭৮, গ্রামে ৯,১৭৪; ৯ বর্গ মাইলে একটি ডাক বাক্স আছে; ৩১৪৮ জন লোক একটি বাক্সের স্থবিধা পায়। বাংলাবই গ্রামের সংখ্যা প্রায় একলক্ষ।

মনিঅর্ডার ছাড়া ২৯ কোটি ৫৭ লক্ষের উপর পোষ্টাল চিঠি, পার্শেল প্রভৃতি যাতায়াত করে। বাংলা-আসামের জনসংখ্যা-প্রতি এই পোষ্টাল সামগ্রীর সংখ্যা ৫·৩২; কিন্তু বোম্বাইতে ৬·৯৫; পাঞ্জাবে ৬·১৯; উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধু দেশে ৯·২৭। অর্থাৎ ঐ সব প্রদেশ হইতে বাংলার লোকে পোষ্টাপিস কম ব্যবহার করে। তবে ১৯০৩-০৪ সালে এদেশে মাত্র দুটি করিয়া পুলিন্দা মাথাপিছু ডাকঘর দিয়া যাইত। ১৯৩০-৩১এ পোষ্টাল ও টেলিগ্রাফিক মনিঅর্ডারের মূল্য প্রায় ২০ কোটি ৭০ লক্ষ; পূর্ব বৎসরে ছিল

২৩ কোটি ৭৪ লক্ষ। সমগ্র ভারতে ৯৮ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা ছিল। বাংলার সহিত তুলনা অন্য কোনো প্রদেশের হয় না। ডাক বিভাগ কমিশন পাইয়াছিল ৩০ লাখের উপর। ৩০ বৎসর পূর্বে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যায় মনিঅর্ডার ইস্যু ছিল আট কোটি টাকার; আজ আসাম-বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় সেই জায়গায় ২৭ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে অর্থাৎ ৩০ বৎসরে সাড়েতিন গুণ মনিঅর্ডার বাড়িয়াছে।

পোষ্টাপিসে সেভিংস ব্যাঙ্ক আছে; এখানে লোকে অর্থ গচ্ছিত রাখে। ১৯৩০ সালে বাংলার পোষ্টাপিসে ৯ কোটি টাকা ছিল, খতিয়ান ছিল ৫,৩৭,০৭৯ জনের। পর বৎসরে নূতন আমানতকারী হয় ১,১১,২৬৬; ও ৭,০২,৯৮,০০০ টাকা আমানত দেয়। স্থদ জমা হয় ২৬ লক্ষ। এই বৎসরে ৬,৯৭ লক্ষ টাকা উঠানো হয়; বৎসরান্তে ৯,৩২,০৯,৮৫৮ টাকা জমা ছিল; সমগ্র ভারতে ছিল ৩৭ কোটি টাকা জমা। বোম্বাই প্রদেশে ৩,১৪,১৪০ জন আমানতকারীর ৬ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ছিল; মাদ্রাজের ৩,৪০,৬৮৮ জন আমানতকারীর ২,৫৬ লক্ষ টাকা জমা ছিল। কোন প্রদেশের আমানতকারীর গড়ে কত করিয়া টাকা ছিল, তাহার একটা সংখ্যা এখনে দিলাম।

পাঞ্জাব ও উ. প. সী. প্রদেশ	...	১৯৯'৭৬
বোম্বাই	...	১৯৪'২২
মধ্যপ্রদেশ	...	১৮১'৯৫
যুক্তপ্রদেশ	...	১৮১'০২
সিন্ধু প্রদেশ	...	১৭৯'৭৯
বিহার-উড়িষ্যা	...	১৭১'৪৪
বাংলাদেশ	...	১৫৪'২০
বর্মা	...	১৫০'১৫
মাদ্রাজ	...	৭৫'২৩

১৯২৮-২৯ সালে সমগ্র ভারতে প্রতি আমানতকারীর গড়ে ১৭০'৬৭ টাকা। ১৯২৯-৩০ সালে ১৬১'১০ টাকা ছিল।

সমগ্র ভারতে পোষ্টাল ক্যাশ-সার্টিফিকেট বিক্রীত হয় ৭,১৬,০০,৭১০ টাকার। ইহার মধ্যে বোম্বাইতে হয় ২ কোটি ১৩ লক্ষ; বাংলায় হয় ১,০৯,১০,৮১৩ টাকা। বাংলা-আসামে এই বৎসর ক্যাশ সার্টিফিকেট লোকে উঠাইয়া লয় ৮৮ লক্ষ টাকার, স্থদ পায় ১৬ লক্ষ ৪৬ হাজার।

দ্বাচত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ

সমবায় আন্দোলন

'দশে পাঁচে করি কাজ হারি জিতি নাই লাজ'—এই প্রবাদ ছিল বাংলাদেশে। এদেশের সামাজিক ও আর্থিক সংস্থানের মধ্যে সমবায় বা একত্র হইয়া কাজ করিবার নির্দেশ ছিল। গ্রামের চাষ-কাজে—যেমন ধান রোপা, ধান কাটা, জলসেচ, আখমাড়া প্রভৃতি ব্যাপারে এখনো নিবিড় ঐক্য দেখা যায়। এতদ্‌ব্যতীত হিন্দুধর্মের আদর্শানুসারে কোন লোকের পক্ষে অপর কোনো লোকের পেশা গ্রহণ করা পাপ ছিল; পরস্পর পরস্পরকে সহায়তা করিতে, একজন একজনের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য ছিল; Interdependence ছিল আদর্শ। কেহ অপরের বৃত্তি কাড়িয়া লইবে, সমাজ-শাসন হইতে স্বতন্ত্র হইয়া একটা কিছু কেহ খাড়া করিয়া তুলিবে, এমন ব্যবস্থা সমাজে ছিল না। তাছাড়া সামাজিক ব্যবস্থানুসারে বৎসরের মধ্যে ও প্রত্যেকের জীবিতকালে বহুবার নিজ সঞ্চিত ধনকে সর্ববর্ণ বা পেশার জন্য দান করা ছিল তাহার অবশ্যকর্তব্য। সুতরাং গ্রামের মধ্যে সে সঙ্কট ও জীবন-সংগ্রাম উপস্থিত হয় নাই, যাহা আজ বাংলার গ্রামে দেখা দিয়াছে। তাছাড়া অধুনা গ্রামের কুটীর-শিল্প ধ্বংস হওয়ায় শিল্প ও কৃষির মধ্যে যে সমতা ছিল তাহা লোপ পাইয়াছে; বাংলাদেশ একপক্ষে অধিক 'গ্রাম্য' হইয়াছে। অপরদিকে পাশ্চাত্যভাবে লোকে 'শহুরে' হইয়া উঠিয়াছে। আধুনিক শহুরে আদর্শের সহিত মধ্যযুগীয় ভূমি ব্যবস্থার সামঞ্জস্য হইত না; ভূমিবন্দবস্ত অত্যন্ত সেকেলে ধরণের; ফলে বাংলার চাষার হাতে উদ্বৃত্ত কোনো অর্থ থাকে না। তারপর বাংলাদেশে নানারূপ ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া একদল লোক ধনী হইয়া জমির মালিক হইয়াছে; সাধারণত অনেকের সহিত জমির কোনো যোগ নাই, চাষীর প্রতি দরদ নাই। ইহারা জমিজমা ক্রয় করে কৌলীন্যলাভ করিবার জন্য। ইহারা হইতেছে গ্রামের জমিদার মহাজন। বনিয়াদী জমিদারের মহত্ত্ব, ঔদার্য ও ক্ষমা ইহাদের স্বভাবে নাই;

ফলে এই নব-অভিজাতদের হাতে চাষীর ধন ও প্রাণ নিরাপদ হয় নাই বলিয়াই বিশ্বাস।

চাষীর পক্ষে চাষের জন্য ঋণ করিতে হয়; কেবল আমাদের দেশে নয়, সকল দেশেই একই রীতি; এই ঋণ সে করে গরু, গাড়ী, সার, বীজ বা সস্তায় জমিজমা কিনিবার জন্য। ভাল ফশল হইলে সে তাহা শোধ দেয় সুদসমেত। চাষী টাকা ধার লইয়া যে লাভ করে, তাহারই ভাগ সে মহাজনকে দেয়। কিন্তু এ ছাড়া সামাজিক নানা কর্তব্য পালনের জন্য—যেমন বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদির জন্য তাহাকে যে দেনা করিতে হয়, তাহাই তাহাকে যথার্থ ঋণজালে গাঁথিয়া ফেলে। এই দেনা সে প্রায়ই শোধ করিতে পারে না। তখন সে মহাজনের কবলে গিয়া পড়ে; তাহার জমিজমা বেহাত হইয়া যায়। এইভাবে বাংলার জমিহীন মজুরের সংখ্যা প্রতি বৎসর বাড়িয়া চলিয়াছে।

কিন্তু এভাবে জমির মালিক জমি হইতে বিতাড়িত হইতে থাকিলে আর্থিক সাম্য ও শান্তি দেশে থাকিতে পারে না। বিশেষভাবে কয়েকটি দুর্ভিক্ষের পরে গবর্মেণ্টের নিকট ইহা পরিষ্কার হইল যে, চাষীদের দুর্গতি দূর করিবার একমাত্র উপায় তকবী ঋণদান। খাদ্যশস্য উৎপন্নকরা চাষীদের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়; কিন্তু কাঁচামাল ও বিশেষভাবে বাণিজ্য কৃষি (Commercial agriculture) করাও আবশ্যক। কারণ ভারতবর্ষ হইতেছে য়ুরোপের ও বিশেষভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যের কাঁচামাল সরবরাহের একটা বড় চাষবাড়ী। সুতরাং এদেশের চাষীকে রক্ষা করিতেই হইবে। ভূমিহীন দিনমজুরের জমি চাষ ও দরদী চাষীর জমি চাষের মধ্যে তফাৎ অনেক। পঞ্জাব ছিল এককালে বিলতে গম চালাবার চাষবাড়ী। সেখানকার চাষীদের দুর্দশা দূর করিবার দিকেই সরকারের সর্বপ্রথম দৃষ্টি পড়ে। লর্ড কর্জনের চেষ্টায় সর্বপ্রথম পঞ্জাবে কৃষকদের রক্ষার জন্য Land Alionation Act পাশ হয়; এই আইনানুসারে চাষীর জমি মহাজনদের টাকার দায়ে বিক্রয় হইতে পারিবে না ঠিক হয়। কিন্তু এটা হইল নিষেধাত্মক আইন; চাষীর চাষবাস করিবার জন্য অর্থের প্রয়োজন। সুতরাং গবর্মেণ্ট গঠনমূলক ব্যবস্থার কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন।

চাষীদের দুর্দশা ও বিশেষভাবে তাহাদের ঋণভারের বিষয় নানা সময়ে গবর্মেণ্টের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে ; যেসব জায়গায় কৃষকরা প্রত্যক্ষভাবে সরকারকে রাজস্ব দেয়, সেসব স্থলে তাহাদের দারিদ্র্য ও ঋণভার সম্বন্ধে গবর্মেণ্ট একেবারে উদাসীন হইতে পারেন না ; সেইজন্য বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশে এ বিষয়ে তদন্ত হইয়াছিল। এসব হইয়াছিল উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তমদশকে। তারপর ১৮৯২ সালে মাদ্রাজ গবর্মেণ্টের অনুরোধে মিঃ ফ্রেডরিক নিকলসন্ সেই দেশের 'নিধি' ব্যাঙ্ক বা দেশীয় ঋণদান ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করেন। ১৯০০ সালে মিঃ ডুপেরনো নামে একজন I. C. S. ফ্রান্স ও ইতালি ভ্রমণ করিয়া আসিয়া উত্তর-ভারতে পীপ্ল্স্ ব্যাঙ্ক কিভাবে করা যায় ও কিভাবে চাষীকে ঋণভার হইতে মুক্ত করা যায়, সে বিষয়ে একখানি গ্রন্থ লেখেন। কিছুকাল হইতে ইংলণ্ডে, জারমেনী, ফ্রান্স ও ইতালির সমবায় আন্দোলন সম্বন্ধে গবেষণা চলিতেছিল। মিঃ উল্ফ্ ছিলেন ইহার অগ্রণী ; তাঁহার গ্রন্থাদি এদেশের সরকারী কর্মচারীদের ও বে-সরকারী লোকহিতাকাঙ্খী নেতাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

১৯০০ সালে বাংলাদেশে চারিটি সমবায় সমিতি গঠিত হয় ; ইহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ উকিল। বাংলাদেশে সমবায়ের কথা সর্বপ্রথম তিনিই বাঙালীকে শোনান। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে এ ধরণের কোনো চেষ্টা কৃতকার্য হইতে পারে না। এমন সময়ে লর্ড কর্জনের গবর্মেণ্ট সমবায় পদ্ধতিকে সফল করিবার জন্য ১৯০৪ সালে প্রথম আইন পাশ করেন। এই আইনানুসারে বাংলাদেশের সমবায় বিভাগের প্রথম রেজিষ্ট্রার হইলেন মিঃ গুরলে (Gourlay)।

প্রথম আট বৎসর পরীক্ষার ফল বিশেষ আশাপ্রদ হয় নাই। ১৯০৪ সালের আইনের মধ্যে বিভিন্ন সমিতিগুলির মধ্যে সমবেত হইবার কোনো ব্যবস্থা ছিল না ; সমবায়ের মূল সূত্র হইতেছে নিজেদের মধ্যে অর্থ সংগ্রহ করিয়া পরস্পরের সুবিধার জন্য ব্যবস্থা করা। ১৯১২ সালে আইনের সংস্কার হয় ; এই সময়ে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক বা কেন্দ্রীয়-কোষ স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। গ্রাম্য সমবায় সমিতির উদ্বৃত্ত টাকা এইখানে থাকে, আবার এইখান হইতে গ্রাম্য-সমিতিরা টাকা ধার পায়।

১৯০৪ সালে অখণ্ড বাংলায় যখন সর্বপ্রথম সমবায় বিভাগ খোলা হইল, তখন ৫৮টি অ-রেজিষ্টারী সমিতি ছিল। ১৯১২ সালে বর্তমান বাংলা প্রেসিডেন্সি গঠিত হয়, তখন মোট ৯৪৩টি সমিতি ছিল; কেন্দ্রীয়-কোষ ছিল মাত্র ৭টি, ৮৭৫টি ঋণদান সমিতি, ১টি উৎপন্নকারীর সমিতি। সভ্য সংখ্যা ছিল ৮৮,৫৬৯ ও মূলধন ছিল ২৬ লক্ষ টাকার কিছু উপর মাত্র।

বাংলাদেশে এই সমবায় আন্দোলন কিভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা আমরা প্রবন্ধ শেষে দেখাইয়াছি।

১৯১৭-১৮ সালে বাংলার সমবায় বিভাগের উপর সরকারী ও বেসরকারী লোকের দৃষ্টি পড়ে ও 'বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতি' (Bengal Co-operative Organisation Society) গঠিত হয়। দেশের মধ্যে সমবায় নীতি শিক্ষাদানকল্পেই এই সমিতি গঠিত হয়; সমিতি হইতে 'ভাণ্ডার' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার সাহায্যে বাংলার দূরতম গ্রামেও সমবায়ের বাণী পৌঁছাইতেছে। তখন ইহার উদ্যোক্তা ছিলেন শ্রীসুধীরচন্দ্র লাহিড়ী।

১৯১৮ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কোষ বা বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। ইহাও কয়েকজন বে-সরকারী লোকের চেষ্টায় হয়। এই ব্যাঙ্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য বিভিন্ন কেন্দ্রীয়-কোষের মধ্যে সম্বন্ধ ও ঐক্য স্থাপন। অনেক সময়ে কোনো কেন্দ্রীয়-কোষে (Central Bank) গচ্ছিত তহবিল অতিরিক্ত হইয়া যায়; তখন সেই টাকা প্রাদেশিক-কোষে জমা দেওয়া হয়। সেই সময়েই আবার অন্য কোনো কেন্দ্রীয়-কোষে অর্থের প্রয়োজন হয়; তখন তাহারা প্রাদেশিক কোষ হইতে টাকা কর্জ করিতে পারে। গ্রাম্য সমবায় সমিতিগুলিকে যেমন কেন্দ্রীয়-কোষ একত্রে গ্রথিত করিয়াছে, কেন্দ্রীয় কোষ-গুলিকে তেমনি প্রাদেশিক কোষ একসূত্রে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়াছে।

প্রাদেশিক ব্যাঙ্কে ব্যক্তিবিশেষের টাকা ও কেন্দ্রীয়-কোষের টাকা গচ্ছিত থাকে। গবর্মেণ্ট কোনো টাকা ঋণদান করিবার জন্য সমবায় বিভাগের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখেন না।

ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশে এই আন্দোলন কিভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা আমরা পরিশিষ্টে-সংলগ্ন তালিকায় দেখাইব। এই তালিকা হইতেই

দেখা যাইবে বাংলাদেশে এই আন্দোলন তেমনভাবে শিকড় গাড়ে নাই। পঞ্জাব, বোম্বাই, মান্দ্রাজে লোকদের মধ্যে কিছু প্রসার হইয়াছে; তবে তাহাও কত সামান্য! একশতজন লোকের মধ্যে তিন জনও সমিতির সভ্য নয়; বাংলাদেশে শতকরা দুই-এরও কম (১.২৯)।

সমবায় সমিতি কত রকমের আছে এবং কিভাবে তাহাদের কাজকর্ম হয়, তাহার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা নিম্নে দিতে চেষ্টা করিব।

(১) ঋণদান সমিতি, (২) উৎপন্নকারী ও বিক্রেতাদের সমিতি, (৩) ক্রয়-বিক্রয় সমিতি, (৪) বীমা ও (৫) বিবিধ।

(১) ঋণদান সমিতি দুইভাগে বিভক্ত: যেমন (ক) কৃষি-ঋণদান-সমিতি ও (খ) সাধারণ ঋণদান সমিতি প্রভৃতি।

এই ঋণদান সমিতি যে-কোনো শহর বা গ্রামের দশজন লোক সমবেত হইয়া গঠন করিতে পারে। সাধারণত একশত লোকের বেশী একটি সমিতিতে সভ্য হইতে দেওয়া হয় না; ইহার কারণ প্রত্যেক লোককে প্রত্যেকের ঋণের জন্য দায়ী হইতে হয়; সংখ্যা অধিক হইলে সেরূপ দায়িত্ব গ্রহণ করা কঠিন হয়। গবর্মেণ্টের ইচ্ছা প্রত্যেক গ্রামে যাহাতে একটি করিয়া সমিতি হয়; বাংলার বারআনি গ্রামের জনসংখ্যা পাঁচ শতের নীচে, অর্থাৎ একশ' বা তাহার কম পরিবারের বাস। সমিতি গঠন করিয়া প্রত্যেক সদস্যের আর্থিক অবস্থা, তাহাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা, তাহাদের দেনাপাওনার নানাবিধ তথ্য রেজিস্ট্রারকে জ্ঞাপন করিতে হয়; সমিতি গঠন করিবার জন্য চাঁদা ও অংশ ক্রয় করিয়া কেন্দ্রীয়-কোষের নিকট ঋণের জন্য আবেদন করিতে হয়। কেন্দ্রীয়-কোষের সুপারভাইজার বা পরিদর্শক আবেদনকারীদের তথ্যগুলি স্থানীয় অনুসন্ধানের ফলে সত্যাসত্য নির্ণয় করিয়া রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। রিপোর্ট অনুকূলে হইলে সমিতিকে ঋণ দেওয়া হয়। এই ঋণের দায়িত্ব কোনো ব্যক্তিবিশেষের নয়; এই ঋণের জন্য সমগ্র সমিতি দায়ী; কেন্দ্রীয়-কোষ ঋণের জন্য ঋণগ্রস্ত সমিতির কোনো ব্যক্তিবিশেষকে তাগিদ দেন না; তাঁহারা তাগিদ দেন সমিতিকে। সমগ্রের এই দায়িত্ব থাকায় সমিতি স্থাপনের সময়ে ও পরে প্রত্যেক সদস্যই সাবধান থাকেন এবং কোনো সদস্যবিশেষ জমি হস্তান্তর বা বেনামী করিবার চেষ্টা করিলে অন্যে

ধরিয়া ফেলে। তবে আইনানুসারে সমবায় বিভাগের ঋণই প্রথম দেয়। কিন্তু তদ্‌সত্ত্বেও কোন কেন্দ্রীয়-কোষেরই আদায় আশাপ্রদ নহে এবং এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে ভাবাইয়া তুলিয়াছে।

গ্রাম্য ঋণদান সমিতিগুলি গণতন্ত্রমূলক। ইহার সদস্যগণ সকলেই অবৈতনিক। প্রত্যেক সমিতির দুইটি সভা থাকে; একটি সকল সদস্যদের লইয়া গঠিত। দ্বিতীয়টি অধ্যক্ষ সভা; কয়েকজন বিশিষ্ট সভ্য নির্বাচিত হইয়া উহা গঠিত হয়। সমিতির যাবতীয় কাজ এই অধ্যক্ষ সভা করেন।

এইবার দেখা যাক্ সমিতি ঋণের টাকা কোথা হইতে কেমনভাবে পায়। এই টাকা আসে দুইভাবে; প্রথমতঃ সদস্যদের নিজ টাকা; দ্বিতীয়তঃ বাহিরের কর্জ্জকরা টাকা। নিজ টাকা হইতেছে প্রবেশিকা ফী, অর্থাৎ সমিতি গঠন করিবার সময় যাহা দিতে হয়; তারপর প্রত্যেক সভ্যকে শেয়ার বা অংশ কিনিতে হয়। এ ছাড়া অপেক্ষাকৃত সচ্ছল বা ধনী মহাজন সমিতিতে টাকা গচ্ছিত রাখিতে পারেন। কিন্তু এ টাকা ঋণদানের পক্ষে যথেষ্ট নয়। সেইজন্য বাহির হইতে টাকা ধার করিতে হয়। এইসব ঋণদান সমিতিকে টাকা কর্জ্জ দেয় কেন্দ্রীয়-কোষ। এক একটি কেন্দ্রীয়-কোষের এলাকায় ৩০০।৩৫০ করিয়া গ্রাম্যসমিতি থাকে।

এইসব ঋণ গৃহীত হয় নানা কাজের জন্য। প্রথমেই চাষীরা ধার গ্রহণ করে চাষের উন্নতির জন্য, মহাজনের দেনা শোধ করিবার জন্য অথবা সাংসারিক কাজের জন্য। অকেজো উদ্দেশ্যে ঋণ দেওয়া হয় না—এই হইতেছে নিয়ম; কিন্তু তাহা না দিলেও উপায় নাই; কারণ চাষীর পক্ষে পুনরায় মহাজনের হাতে পড়ারই সম্ভাবনা বেশী।

চাষী ঋণ গ্রহণ করে চাষের পূর্ব্বে; তারপর ধান বা পাট বা গুড়—যেখানকার যা প্রধান বিক্রেয় ফশল, তাহা বিক্রয় করিয়া সমিতির ঋণ শোধ করে। কয়েক বৎসর হইতে ফশলের দাম হ্রাস পাওয়ায় অধিকাংশ কেন্দ্রীয়-কোষে সমিতির নিকট বহু টাকা অনাদায়ী হইয়া পড়িয়া আছে। বর্ত্তমানে মাসিক পরিশোধের কড়া ব্যবস্থা হওয়ায় কোনকোন কেন্দ্রীয়-কোষে কর্জ্জের টাকা ধীরে ধীরে আসিতেছে; তবে অধিকাংশের অবস্থা নিতান্ত মন্দ।

সমবায় সমিতির সুদ, জরিমানা প্রভৃতি হইতে যে লাভ হয়, তাহা অন্যান্য

বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের ন্যায় অংশীদারদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয় না; উহা রিজার্ভ ফাণ্ডে গচ্ছিত হয় এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য দানাদি কর্মে ব্যয়িত হয়। 'ডিভিডেণ্ড' বা লভ্যাংশ পাওয়া সমবায় ঋণদান সমিতির উদ্দেশ্য নয়।

সমবায় সমিতির দায় সকল সদস্যের, সেকথা পূর্বেই বলিয়াছি; যদি কোনো সমিতি কর্জ পরিশোধ করিতে অপারগ হয়, তখন তাহার প্রাপ্য টাকা আদায়ের ব্যবস্থা খুবই সহজ; ম্যাজিষ্ট্রেটের সমনের বলে, আর কোনো আদালতে নালিশ না করিয়াই, অনাদায়ী টাকা আদায় করা যাইতে পারে।

কোনো কোনো সমিতির প্রতিষ্ঠাকালে সভ্যদের আর্থিক অবস্থা ভাল করিয়া তদন্ত করা হয় না; সেইসব সমিতি শেষ পর্যন্ত ঋণ শোধ করিতে পারে না; তখন সেগুলিকে 'দেউলিয়া' বলিয়া ঘোষণা করা হয়। তবে এই ধরণের লিকুডেশন বা দেউলিয়া বলিয়া ঘোষণা সহজে করা হয় না।

পূর্বে যে সমিতির কথা বলিলাম সেগুলি কৃষি-ঋণদান-সমিতি; এছাড়া অন্যান্য সমবায় সমিতি ঋণদান করিয়া থাকে। অ-কৃষি ঋণদান সমিতির সংখ্যা ১৯৩২-৩৩ সালে ছিল ৫২৬টি; সভ্যসংখ্যা ১,৮৮,৫৩২; মূলধন ৩'৫৪ লক্ষ টাকা।

সমবায়ের সকল কর্মই যে ঋণদানে পর্যবসিত, তাহা নহে। বিদেশে ঋণদান সমিতি অপেক্ষা ঐক্যবদ্ধ উৎপন্নকারীদের সঙ্ঘ, ক্রেতাদের সঙ্ঘ অধিক জনপ্রিয়। বাংলাদেশে উৎপন্নকারীদের সমবায় সমিতি খুব কমই; বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য সমিতি হইতেছে নওগাঁর গাঁজা সমিতি, বাঁকুড়ার শিল্প সমবায়, কলিকাতার দুগ্ধ সমিতি, কলিকাতা ধান্য সমবায় সমিতি ইত্যাদি। এছাড়া ছোট ছোট অনেক সমিতি আছে।

সমবায় ভাণ্ডারের সংখ্যা ৫৫টি; ইহাদের মূলধন ২'৫৮ লক্ষ। বাংলাদেশে সমবায় ভাণ্ডার মোটেই সফল হয় নাই। শিল্পী ও কারিগরদের সমবায় ঋণদান সমিতিগুলি আদৌ ভালভাবে চলিতেছে না। অধিকাংশ শিল্পী ও কারিগর বাঙালী ও মাড়োয়ারী মহাজনদের হাতের মধ্যে আছে; দাদন দিয়া তাহারা শিল্পীদের খাটায়।

বাংলাদেশে জেলিয়াদের সমিতির সংখ্যা ১০৬টি; সভ্যসংখ্যা মাত্র ৩৯১৪ জন; ইহা হইতে বুঝা যায়, ঐ জাতি কত কম সঙ্ঘবদ্ধ। তাঁতিদের সমিতির সংখ্যা ৩৩০টি মাত্র। এই সমিতিগুলির মধ্যে বাগেরহাটের বয়ন

সঙ্ঘ এখন একটি মিল খুলিয়াছে। মাত্র ৫৮৫০ জন তাঁতি সঙ্ঘবদ্ধ। রেশম শিল্পীদের সঙ্ঘ মাত্র ৭৭টি। এ সমিতিগুলি ক্রমশই অধঃপাতে যাইতেছে। অ-কৃষি ঋণদান সমিতির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে ৯২৭টি অ্যান্টি-মেলেরিয়া-সোসাইটি। এই সমিতিগুলি রায় বাহাদুর গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উৎসাহে গঠিত হইয়াছে। জমিদারদের কয়েকটি সোসাইটি ও নারী সমিতি আছে।

ঋণদান সমিতির প্রয়োজনীয় অর্থ সভ্যদের গচ্ছিত অর্থ হইতে যথেষ্ট হয় না বলিয়া ইহাদিগকে কেন্দ্রীয়-কোষ হইতে টাকা কর্জ করিতে হয়। বাংলা-দেশে বর্তমানে ১১৯টি কেন্দ্রীয়-কোষ আছে। ইহাদের অধীন ২০,১৬০টি সমিতি আছে। কেন্দ্রীয়-কোষের মূলধন ৫,১৩,৭২,০০০৲ টাকা। ইহার মধ্যে ব্যক্তিগত গচ্ছিত টাকা ২,৯০,১৯,০০০৲; প্রাদেশিক-কোষ হইতে গৃহীত কর্জ ১,২১,৩৮,০০০৲।

গত তিনচারি বৎসর কৃষকদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় যাইতেছে; শস্যের দাম নাই, অথচ রাজস্ব, রেলভাড়া, মোকদ্দমা খরচ, ষ্ট্যাম্পের খরচ ঔষধের দাম কিছুই কমে নাই। তাহারা কেন্দ্রীয়-কোষের ধারশোধ ও এমনকি সুদ পর্যন্ত দিতে পারিতেছে না। বকেয়া টাকা শোধ করিতে পারিতেছে না বলিয়া বর্তমানে আর নূতন সোসাইটি হঠাৎ খুলিবার দিকে গবর্মেণ্টের উৎসাহ নাই; এবং পুরাতন সমিতিগুলিকেও খুব বিবেচনার সহিত ধার দেওয়া হইতেছে। সেইজন্য দেখা যাইতেছে, কয়েক বৎসর হইতে গ্রাম্য-সমিতি সমূহের নূতন ঋণের পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে; অথচ বলা বাহুল্য অভাবের সময়েই তাহাদের ঋণ পাওয়া কঠিন হয়। এদিকে পুরাতন মহাজনেরাও ধার দিতে নারাজ, কারণ পূর্ব হইতেই চাষীরা সমিতির নিকট ঋণী; কেন্দ্রীয়-কোষ ম্যাজিষ্ট্রেটের সার্টিফিকেটের বলে চাষীর জমি গ্রাস করিতে পারে, মহাজন কিছুই পাইবে না; সেই ভয়ে সমিতির সভ্যকে মহাজন ঋণ দিতে পারে না। ইহার উপর চাষী ও খাতকের ঋণসালিসী বোর্ড এবং মহাজনী আইন পাকা হওয়ায় চাষীর পক্ষে গ্রামে ঋণ পাওয়া কঠিন হইয়াছে। এইসব বিপদ হইতে চাষীকে রক্ষা করার জন্য গবর্মেণ্ট 'জমি বন্ধকী আইন' পাশ করিয়াছেন।

গত কয়েক বৎসরের আর্থিক দুর্গতি হেতু অধিকাংশ কেন্দ্রীয় কোষ

প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের টাকার সুদ বা আসল কিছুই দিতে পারিতেছে না; তবে মাসিক টাকা শোধের ব্যবস্থা গ্রাম্য সমিতিতে প্রবর্তিত হওয়ায় কেন্দ্রীয়-কোষও মাঝে মাঝে টাকা পাইতেছে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমবায় কোষ বা বেঙ্গল প্রভিন্সিয়েল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সদস্য সংখ্যা ১৫৫; ইহার মধ্যে ১১৯টি হইতেছে কেন্দ্রীয়-কোষ, অপরগুলি হইতেছে ব্যক্তিবিশেষের। ১৯৩২-৩৩ সালে ২১৯.৫০ লক্ষ টাকা মূলধন ছিল; প্রদত্ত শেয়ার ক্যাপিটল ১৬.৬৮ লক্ষ; এবং রিজার্ভ ফাণ্ডে গিয়াছে ৩.৬৪ লক্ষ; বিশেষ রিজার্ভে আছে ৭.২০ লক্ষ। সভ্যদের নিকট হইতে গচ্ছিত টাকা প্রায় ২ কোটি আছে। ক্রমশই প্রভিন্সিয়েল ব্যাঙ্কের উপর দেশের লোকের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বাড়িতেছে।

বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতির সদস্য সংখ্যা ১৮,৩৩৮। শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার লাহিড়ী এই সমিতির অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। তাঁহারই অদম্য চেষ্টায় এই সমিতি কাজ করিয়াছিল।

কয়েক বৎসর পূর্বে এই বিভাগ একটি বীমা বিভাগ খোলেন; যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রোথিত হয় নাই বলিয়া উহার কাজ আরম্ভ করিয়াই বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ১৯৩৩ হইতে তাহারা জীবনবীমার কায আরম্ভ করিয়াছে।

বাংলার সমবায় বিভাগকে ভূতপূর্ব রেজিষ্ট্রার রায় বাহাদুর যামিনী মিত্র মহাশয় সর্বপ্রথম জনপ্রিয় করিয়া তোলেন। তাঁহার পেনশনের পর সুশীলকুমার গাঙ্গুলী ও তৎপরে মিঃ আর্শেদ আলি এই কার্য গ্রহণ করেন। রেজিষ্ট্রার এই বিভাগের কর্তা; তাঁহার অধীন পাঁচটি বিভাগে পাঁচ জন সহকারী আছেন। ইঁহাদের নীচে আছে ৮২ জন স্থায়ী (এবং ১০ জন অস্থায়ী) ইন্সপেক্টর। হিসাবপত্র তদারক করিবার জন্য ২৪১ জন অডিটার আছেন, ইঁহাদের বেতন বাংলা গবর্মেণ্ট দিয়া থাকেন। কেন্দ্রীয়-কোষের তত্ত্বাবধানে ৬০৯ জন সুপারভাইজর আছেন; ইঁহাদের মধ্যে মাত্র ২৭জনের বেতন গবর্মেণ্ট দেন; অবশিষ্ট বেতন সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলি দেয়। বর্তমানে কয়েকটি জেলায় জেলা সহকারী রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইয়াছে।

সমবায় আন্দোলন বাংলা তথা ভারতের সর্ববিধ আর্থিক সমস্যার সমাধান

করিতে পারে নাই, এমনকি, যে গ্রাম অঞ্চলে ইহার প্রসার সর্বাপেক্ষা অধিক সেখানেও চাষীকে ঋণমুক্ত করিতে পারে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া যে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইয়াছে তাহাও বলা যায় না। গ্রামের মধ্যে লোকে আজ সভাসমিতি নিয়ন্ত্রণ করিতে শিখিয়াছে, সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য করিবার অভ্যাস হইয়াছে। এ ছাড়া দেশীয় মহাজনদের স্থদের হার কমিয়াছে। কিন্তু দেশের মধ্যে ইহা শিকড় গাড়ে নাই। তাহার প্রধান কারণ—এই আন্দোলন জারমেনীর ন্যায় দেশের অভ্যন্তর হইতে উদ্ভূত হয় নাই। ইংলণ্ড যখন ইহার উপকারিতা দেখিলেন, তখনই এদেশে ইহার প্রবর্তনের ব্যবস্থা করেন। এ দেশের লোকে কেবলমাত্র শস্তায় টাকা ধার পাওয়াকেই সমবায় সমিতি গঠনের প্রধান কর্ম বলিয়া বিবেচনা করে। ফলে, এই দরিদ্র দেশে সমবায় আন্দোলন তেজারতি ব্যবসায়ে পর্যবসিত হইয়াছে; সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা খুবই কম হইয়াছে। একটি গ্রামে দেড়শ' ঘর তাঁতি আছে; সপ্তাহে একদিন হাট হয়। দেখিলাম প্রত্যেক তাঁতি নিজ নিজ মাল লইয়া হাটে উপস্থিত হইতেছে; মাল বিক্রয় হইল ত ভাল; সুতা কিনিয়া তাঁতিরা ঘরে গেল। এইভাবে চাষীরা ধান বিক্রয় করে, পাট বিক্রয় করে; ফলে, তাহাদের সময় ও শক্তি প্রচুর নষ্ট হয়। সুতরাং যেদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত সেটি হইতেছে ক্রয় ও বিক্রয় সমবায়ের দিকে। চাষীর নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে ক্রয়ের জন্য ও তাহার বিক্রেয় ফসল বা শিল্পজাত সামগ্রী সঙ্ঘবদ্ধভাবে বিক্রয়ের জন্য সমিতি স্থাপন আশু প্রয়োজন। তবে ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইতে পারে না, যদি আর্থিক ব্যবস্থা সুদৃঢ় না হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, পাটের কথা। পাট-চাষী কাঁচা পাট উঠিবামাত্র বাজারে বিক্রয় করে; তখন সে উপযুক্ত দাম পায় না। এমন সমবায় প্রতিষ্ঠান হওয়া উচিত, যাহা চাষীর পাট কিনিয়া রাখিবে ও দর চড়িলে ছাড়িয়া দিবে। ইহার দ্বারা যে লাভ হইবে তাহা যাহারা এই মূলধনদানে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহারা পাইবেন এবং লভ্যাংশ চাষীর খাতে জমা হইবে। রাষ্ট্র ও সমাজের সহায়তা ব্যতীত এরূপ প্রতিষ্ঠান গড়িতে পারে না।

১৯৩২-৩৩ সালে বাংলাদেশে ২৩,৬৬৭টি সমিতি ছিল; পূর্ববৎসর হইতে ১১০টি সমিতি কম। সদস্য-সংখ্যা ৮,১৯,৭২৮, তৎপূর্ব বৎসর হইতে ১৯০০ জন

অধিক। সমগ্রের মূলধন ছিল ১৮,১৬,৪৫,২৮৩ টাকা; পূর্ব বৎসর হইতে ৮২,৭৫,০০০ টাকা বেশী।

(১) কৃষি সমবায় সমিতির সংখ্যা ২১,৩৪২; পূর্ব বৎসর হইতে ১৮৭টি কম; সদস্য-সংখ্যা ৫,২৩,৪৩৯। পূর্ব বৎসর হইতে প্রায় সাত হাজার কম। মূলধন ৫,৯২,০৩,০০০৲; পূর্ব বৎসর হইতে ১৩ লক্ষ টাকার উপর বেশী।

উপরিউক্ত সংখ্যার মধ্যে কৃষি ঋণদান সমিতি হইতেছে ১৯,৯৭৬টি; ১৯৩১-৩২ হইতে ১৮৩টি কম। এতগুলি ঋণদান সমিতির মধ্যে প্রথম বা 'এ' শ্রেণীর সমিতি খুবই কম এবং গত তিন বৎসরে যথাক্রমে ১৩৬, ৯৫, ৩৬২ ছিল। বেশ দেখা যাইতেছে, পূর্বে যে সকল সমিতি প্রথম শ্রেণীর ছিল, অর্থাৎ যাহারা কেন্দ্রীয়-কোষের সহিত ভালভাবে লেনদেন করিত, তাহারাও এখন আর টাকা শোধ করিতে পারিতেছে না। 'বি' শ্রেণীতেও কমিতেছে, কিন্তু বাড়িয়া চলিয়াছে তৃতীয় শ্রেণীর সমিতির সংখ্যা।

(২) ক্রয়-বিক্রয় সমিতির সংখ্যা ৮৫ (পূর্ব বৎসরে ৮৯ ছিল); সদস্য-সংখ্যা ১১,৪৬৮; মূলধন ৬,৬১,২৪৯৲ টাকা।

(৩) জলসেচন সমিতি ৯৩২; সদস্য ২২,৮৩২; মূলধন ৪,৬৯,২৫১ টাকা।

(৪) উৎপন্নকারীর সমিতি ২৭২টি; ইহার মধ্যে দুগ্ধ সমিতি ২৬৯। নওগাঁর গাঁজাচাষ সমিতি ও অপর দুইটি পান সমিতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। দুগ্ধ সমিতির সদস্য-সংখ্যা ১০৪৫৪; মূলধন ১,৮৩,০৪৭৲ টাকা; ইহার লাভ হয় ৯৩৯৫৲ টাকা। নওগাঁর গাঁজা সমিতির সভ্য-সংখ্যা ৩৮৪৫; ইহার মূলধন ৭,৬২,৫২০৲ টাকা; লাভ হইয়াছিল ৮৩,৫১৮৲ টাকা।

(৫) অকৃষি ঋণদান সমিতির সংখ্যা ৫২৬; সদস্য সংখ্যা ১৮৮,৭৩২; মূলধন ৩৫৪ লক্ষ টাকা।

(৬) বিবিধ সমিতির সংখ্যা ১০৪৪; ইহার মধ্যে অ্যান্টি-মেলেরিয়ার সমিতির সংখ্যা ৫২৭; সদস্য-সংখ্যা ১৮,২৭০। সমিতিগুলির মূলধন ছিল ৫০,৫০৫৲ টাকা। বিবিধর অন্তর্গত অন্যান্য সমিতি হইতেছে শিল্প—১২, শ্রমিক —৯, মহিলা—৮, জমিদারী—৩, গ্রাম-সংস্কার—১৯ ইত্যাদি।

(৭) বাংলাদেশে ১১৯টী কেন্দ্রীয় কোষ আছে। এ সম্বন্ধে পূর্বে বলা হইয়াছে।

	কেন্দ্রীয় কোষ	অধীন সমিতি	কৃষি-সমিতি	মূলধন টাকা
২৪ পরগণা	৫	৬৯৮	৬৭৮	৮,৮৮,৮০২
নদীয়া	৫	৯৭৫	৯৪৪	২০,৮৮,৮৬৯
যশোহর	৪	৭৪৪	৭৪০	১৯,৬৫,০১৭
খুলনা	৩	৬৯৫	৬৫৪	১১,৪১,২২৫
মুর্শিদাবাদ	৪	৬৪১	৬২০	১৭,২০,৪৬৪
বর্ধমান	৪	৯২৮	৯১১	৩৫,৭৩,৮৪৪
বীরভূম	৪	১,১৬৪	৯৩২	১৭,১৬,৭২৪
বাঁকুড়া	২	৪৩০	১৭৭	৫,৪২,৩৬০
মেদিনীপুর	৭	১,২১৬	১,২১৬	২৩,৮০,৩১৪
হাওড়া	২	৬০	৫৯	৪৬,০৯০
হুগলী	২	২৬৯	২৫৪	১০,৯০,৭৮৭
ঢাকা	৯	১,৪৮৮	১,৪৬৭	৪৪,৪৬,৯৭৪
বাখরগঞ্জ	৮*	১,১৬২	১,১২৪	৩৫,২৮,৬৫৫
মৈমনসিং	১১	১,৮১৫	১,৭৮৬	৬৮,৪২,৩২১
ফরিদপুর	৪	১,১২৬	১,১০৮	২৫,০৯,২৮৯
চট্টগ্রাম	২	২৯৫	২৫৯	৮,১৪,৩৭১
ত্রিপুরা	৮	১,৭৯৫	১,৭৭০	৪৯,৪৯,২৮৬
নোয়াখালি	৬	৮৪২	৮২২	১৯,৬৪,১০২
দিনাজপুর	৩	৩৯০	৩৬৪	৬,৫৯,৪৬৬
মালদহ	৪	৩৪৭	৩১৮	৭,০০,৬৩৮
রাজশাহী	৪	৭৩১	৭২০	১২,৬৪,৮২৫
পাবনা	৫	৮৬৬	৮২৩	২৪,০৫,৬৭৮
বগুড়া	৫	৬৭৫	৬৬৮	২০,৩৪,০৭৪
রঙ্গপুর	৪	৫৩৫	৫২৪	১৪,৩৫,৯৩০

* দুইটির কাজ হইতেছে না।

কেন্দ্রীয় কোষ		অধীন সমিতি	কৃষি-সমিতি	মূলধন টাকা
জলপাইগুড়ি	১	১২০	১০৫	১,৬৮,১৬৪
দার্জিলিঙ	৩	১১৩	১০৭	৪,৯৪,২৪৪
১৯৩২-৩৩ মোট	১১৯	২০,১৬০	১৯,১৫০	৫,১৩,৭২,৫১৩
পূর্ব বৎসর ১৯৩১-৩২	১১৭	২০,৩২০	১৯,৩২৪	৪,৯৫,৭৫,১৩৭

(Annual report on the working of Co-operative Society in the Presidency of Bengal for the year ending 30th June, 1933).

পরিশিষ্ট—১৯২৮ খৃঃ অঃ

	সমিতির সংখ্যা	লাখ-করা অধিবাসী প্রতি	সমিতির সভ্য	জনসংখ্যার শতকরা কয়জন সভ্য	মূলধন (হাজার টাকা)	মাথা পিছু
বঙ্গদেশ	১৮,০৬০	৩৮·৭	৬,০১,৮৩৯	১·২৯	১১,০১,৭৬	২।৵০
মাদ্রাজ	১৪,৫১০	৩৪·৭	৮,৯৭,৫৩৮	২·১২	১৫,২৮,০৫	৩॥৵০
বোম্বাই	৫,৩৩০	২৭·৬	৫,২৭,৬৭৬	২·৭৩	১১,১৯,১৬	৫৸০
পঞ্জাব	১৮,০৩৪	৮৭·১	৫,৪১,৮২৩	২·৬২	১৪,৮০,৮৩	৯৲
যুক্তপ্রদেশ	৬,০৮১	১৩·৪	১,৫৯,৪৬৬	·৩৫	২,০১,৩২	।৶০
বিহার-উড়িষ্যা	৮,৫৮৭	২৫·৩	২,৪৩,৬২৬	·৭২	৫,০২,২৬	১॥০
মধ্যপ্রদেশ	৪,০৪৯	২৯·১	৭৫,৫৬৪	·৫৪	৪,৭৮,৪৬	৩।৶০
আসাম	১,১৯৭	১৫·৭	৫৯,৩৪৯	·৭৮	৫৪,২৮	॥৶০
উঃ পঃ সীঃ প্রদেশ	৬০	২·৬	২,১৮১	·০৯	৩,৫৭	৵০
বর্মা*	৫,২৪০	৪৪·৮	১২৫,২৫৭	১·০৭	৪,৯,৯৯১	৪।০
সমগ্র বৃটীশ ভারত	৮২,২৩৬	৩৩·৫	৩২,৭০,৩৪৭	১·৩৩	৭০,৪৫,০৪	২৸৵০
দেশীয় রাজ্য	১৩,৮৫৫	৪০·৯	৫,০৯,৮২৬	১·৫০	৬,২৫,৮৩	১৸৵০
মোট	৯৬,০৯১	৩৪·৪	৩৭,৮০,১৭৩	১·৩৫	৭৬,৭০,৮৮	২৸০

* কুর্গ, আজমীড় দিল্লী প্রভৃতির সংখ্যা উল্লেখ করি নাই। সমগ্র বৃটিশভারতের সংখ্যার মধ্যে সেগুলি সন্নিবিষ্ট। (Jathar and Berri, vol. I, p. 286)

নির্ঘণ্ট

বিষয়	পৃষ্ঠা
অ	
অকর্মণ্য	৯৪
অক্ষম	৯৪
অক্ষয়কুমার দত্ত	১৮৬
অগ্ন্যুৎপাত	১০
অঙ্গ	১১৪
অজৈব	২৩
অটোয়া কনফারেন্স	৪৭১
অটোয়া চুক্তি	৪৭৬
অতীশ দীপঙ্কর	১১৭
অধ্যক্ষ-সভা	১৯১
অনাবাদী জমি	৩৬৭
অনার্য	৯৭
অনুশীলন সমিতি	১৪০
অন্তরীণ	৩৫৭
অন্ত্যজ	১৬৫
অন্ধ	৯৪
অন্ধ বালকবালিকা	১৬৯
'অন্নদা মঙ্গল'	১৮৪
অপভ্রংশ	৩৩
অবাধ বাণিজ্যনীতি	৪৭৩
অভিজাত সম্প্রদায়	২৮০
অভ্রের খাদ	৩৯০
অরবিন্দ ঘোষ	১৮৮
অর্জুন	১৯
অর্থশাস্ত্রীমহাশয়	৩৩৪
অর্থসচিব	২০১
'অল্ডারম্যান'	২৭২
'অষ্টম করা'	২৮৪
অসবর্ণ বিবাহ	৫৫
অসহযোগ আন্দোলন	৪১৭
অস্পৃশ্য	৯৯
আ	
আউস ও আমন	৩৮০
আওরঙজেব	৫৫০
আকবর	১২০
আকাড়া চাল	৩৮১
আঁকুড়ি ডোম	৫৫
আখ	৪০৫
আগা খাঁ	২০৬
আস্তরি	১০৫
আগ্নেয়াস্ত্র	২৩
আতপ চাল	৩৮১
আত্রাই	৩
আদম সুমারী	৮৫
'আনন্দমঠ'	১৩৯

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
আনিলিন্	৪৩৩	আলাউদ্দীন হোসেনশাহ	১১৯
আন্তর বাণিজ্য	৫৫৩	আলিবর্দী খাঁ	১২২
আন্তর প্রাদেশিক বাণিজ্য	৫৫৩	আলুমিনিয়াম	৫
আন্তর্জাতিক অর্থসঙ্কট	৪৬৩	আঁশাল সামগ্রী	৩৭১, ৫২২
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য	৪৪৫	আশুতোষ কলেজ	১৬২
আন্দামান	৪৯৪	আশ্রিতের সংখ্যা	৮৪
আপীল আদালত	২২০	আসানসোল	৪৩২
আফিম্	৫৬৮	আসাম	৬৭
আবগারী	২৯৮	আসাম বেঙ্গল রেলপথ	৬০৬
আবগারী বিভাগের আয়-ব্যয়	৩৩৮	আসামী	২৩৬
আবহবিদ্যা	১৭	অ্যাণ্টি সার্কুলার সোসাইটী	১৪০
আবহমানচিত্র	১৭	ই	
আবহাওয়া	৭১	ইউনিভার্সিটী এক্ট	১৪৫
আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়	১৫০	—ফেলোশীপ্	১৭৫
আবোয়াব	৮১	—লেকচারশীপ্	১৭৫
আমদানী	২৪, ৫৮২	ইক্যুটেবল কোল কোম্পানী	৪৩৩
আমদানীর হিসাব	৫৮৯	ইক্ষু	৪০৫
আমবেদকার	২০৭	ইজারা	৩২৯
আমোনিয়া	৫৩০	ইটের পাঁজা	৪৩২
আয়কর	৩১৮	ইডেন ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ	১৬২
আয়তন	৪৩	ইডেন খাল	২৫৪
আয়ুষ্কাল	৬১	ইতিহাস	১১৪
আরাবল্লী পর্বতশ্রেণী	৯	ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ	২৩৭
আর্যাবর্ত	২৮	ইন্ডাষ্ট্রিয়েল কমিশন	৪২৯
আলকাতরা	৪৩৩	ইন্ডাষ্ট্রিয়েলিজম্	৫৯২
আলবুমেন	৪২৮	ইন্ডেন্চার কুলি	৪৭১
আলমবাজার	৪৯৪	ইনশিওরেন্স	৪৭৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইণ্ডিয়া কাউন্সিল এক্ট	১২৫
ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশান	১৩৭
ইণ্ডিয়ান্ পুলিশ সার্বিস	২১৬
ইণ্ডিয়ান্ ল-রিপোর্ট	২৩২
ইণ্ডিয়ান্ সিবিল সার্বিস	২১৪
ইন্সপেক্টর জেনারেল অব্ রেজিষ্ট্রেশন	৩৪৫
ইন্দ্রশাল ধান	৩৮১
ইমপিরিয়েল টোবাকো কোম্পানী	৪১৫
ইলবার্ট বিল	১২৬
ইলেট্রিক্ ইঞ্জিনীয়ার	২৫২
'ইসভী'	৪৯৪
ইসলামিয়া কলেজ	১৬৬
ঈ	
ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী	১৪৪
ঈষ্টার্ণ সার্কেল	২৫৩
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	১৮৬
ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে	৬০৪
ঈষ্টার্ণ বেঙ্গল ষ্টেট্ রেলওয়ে	৬০৪
উ	
উইলকিন্স সাহেব	১২৪
উকিল	২৩০
উজিরপুর	৫২১
উৎপন্ন চিনির পরিমাণ	৪১১
উদ্ভিজ্জ বিভাগ	১৯৫
উদ্ভিদ্	১৯
উন্মাদ	৯৪
উপকূল বাণিজ্য	৫৫৯,৬০৯
উপজীবিকা	৮১
উপনিবেশ	৪০,৩৯০
উপভাষা	৩২
উপসামগ্রী	৪৩৩
উলুখড়	২০
এ	
এক্জিকিউটিভ অফিসার	২৭২
একসাইজ্ কমিশনার	৩৩৭
একান্নবর্ত্তী পরিবার	৩২৮
এজেন্সী প্রজা	৪৩৮
এড্ভোকেট	২৩০
এনামেল	৫১৬
এণ্ডিগুটি	৫১২
এরোপ্লেন	৫৬১
এসিস্টেণ্ট সার্জ্জেন	২২৩
এসেস্ড ট্যাক্স	৩১৮
এংলো ইণ্ডিয়ান্	২১০
ও	
ওট	৩৭৪
ওভারশিয়ার	২২৩
ওয়ারেন হেষ্টিংস	২২৩
ওয়েলবী কমিশন	২৯৯
ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া ম্যাচফ্যাকটরী	৪৯৪
ওয়েলেসলি	৬০৯
ওরাওঁ জাতি	২৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
ওলন্দাজ	৭
ওষধি	২০
ঔ	
ঔদরিক ব্যাধি	৭৪
ক	
কংগ্রেস	১,১২৬
কগ্নিজেব্ল কেস	২৩৬
কচুরি পানা	৫
কনট্রোলার	৪৩৮
কপিরাইট	১৯৫
কফি	৯৮
কভেনেণ্টেড সিবিল সার্বিস	২১৫
কম্যুনিজম	৫৪৭
কয়লা	৭৯,৪৩২
কয়লার খাদ	৩৯০
করদ রাজকর	৩০৮
করোগেট টীন	২০,৫৫৫
কর্কট ক্রান্তি	১৩
কর্ড লাইন	৬০৭
কর্ণস্থবর্ণ	১১৬
কর্ণেল রেনেল	৫১০
কর্পোরেশন	২৭৬
কর্মকার	১০২
কলাভবন	১৬৮
কলিকাতা—	
—বিশ্ববিত্থালয়	১২৪
—গেজেট	২০৩
—কর্পোরেশন	২৭১
—কর্পোরেশনের আয়-ব্যয়	২৭৬
—ট্রেডস এসোসিয়েসন	২৭২
—পোর্টট্রাষ্ট	২৭২
—জন-সংখ্যা	২৭৫
—বর্গফল	২৭৬
—বসতবাটীর সংখ্যা	২৭৬
—আয়-ব্যয়	২৭৬
—মিটিওরলজিক্যাল অফিস	১৬
—সিল্ক সোসাইটী	৪২৭
কলিঙ্গ	১১৪
কলু	৩৯৭
কলেক্টর	২১৮
কষায় নির্যাস	৫২৯
কষায়ীন ছাল	৫৩৪
কষায়ীন উদ্ভিজ্জ	৩৭৪
কাউন্সিলার	১৯১
কাউন্সিল অব ষ্টেট	১৯২
কাকিয়া বোম্বাই	৩৮৪,৪৬৬
কাগজের কল	৪৮৮
কাঁচা চামড়া	৫২৮
কাঁচা মাল	৩২২
কাছাড়	২
কাছারী	২২৮
কাটারীভোগ চাল	৩৮১
কাটুনী	৫০৬
কাঠের কাই	৫১৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
কাণপুর	৫৩০
কাথিবাড়	৩১০
কাপালী	৪৫১
কামরূপ	১১৬,৫৯৯
কামারের কাজ	৫২০
কামিনী রায়	৮২
কায়স্থ	১০১
কারখানা	৭৯
কার্জন, লর্ড	৬১৬
কার্তিক বসুর কারখানা	৪৪৬
কার্পাস বস্ত্র	৫০৯
কালকেতু ব্যাধের গল্প	১৮১
কালবৈশাখী	১৩
কালাজ্বর	৭৩
কাশীরাম দাস	১৮২
কাসটাম হাউস	৩১৩
কাঁসারী	৮২,১০২
কুইনাইন সিঙ্কোনা	৭৩
কুকি	৬
কুটীর শিল্প	৪১৬,৫০২
কুপার কোম্পানী	৪৮৯
কুপারহিল কলেজ	২৫৩
কুম্ভকার	৮২,১০২
কুষ্ঠব্যাধি	৯৪
কেটের কাপড়	৫১২
কেন্দ পাতা	৪১৬
কেন্দির (Kendyr)	৪৬৫
কেন্দ্রানুগশাসন ব্যবস্থা	২৯৮
কেভেণ্টার	৪২৬
কেমিক্যাল রঙ	৪৯৮
কেরোসিন	৫৫৯
কেশবচন্দ্র সেন	১২৫
কোড়া	৯৮
কোরফা রায়ত	২৮৩
কোরা কাপড়	৪৭৫
কোরাণ স্কুল	১৬৫
কোল	৫৪২
কোর্ট ফী	৩৪২
কৃত্তিবাস	১৮১
কৃত্রিম রেশম বা রেয়ন	৫১১
কৃষি	৪৮৫
কৃষি ও বাণিজ্য	৩৬৬
ক্যাণ্টনমেণ্ট	৭৯
ক্যাবিনেট	১৯১
ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুল	১৫৪
ক্যালকাটা কেমিক্যাল ওয়ার্কস	৪৪৬
—মেডিক্যাল স্কুল	১৫৪
—সোপ ওয়ার্কস	৪৪৬
ক্রিকেট	৫২৬
ক্রিমিন্যাল ইনভেষ্টিগেশন ডিপার্টমেণ্ট	২৩৭
ক্রিমিয়ান যুদ্ধ	৪৫২
ক্রোকী জমি	২৮৯
ক্রোম ট্যানিং	৫২৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
ক্রোম লেদার	৫৩০
ক্লাইব	১২৩
ক্ষয়রোগ	৭৩
ক্ষয়িষ্ণু গ্রাম ও সহব	২৬৮
ক্ষুদ রপ্তানী	৩৮১
ক্ষৌম বস্ত্র	৫০৯

খ

বিষয়	পৃষ্ঠা
খস্ত	৯৪
খতিয়ান	২৮৫
খদ্দর	৫০৮
খনি	১৯৫
খনিজ সম্পদ্	৪৩২
খবর ছাপার কাগজ	৪৯০
খাগড়ার বাসন	৫১৭
খাদি প্রতিষ্ঠান	৫৩৬
খাদ্যশস্যের জমি	৩৭১
খাশ বাসিন্দা	৬৬
খাশি জাতি	৯৮
খাসমহল	২৮৬
খিলাফৎ আন্দোলন	১৪১
খৃষ্টান মিশনারি	৪৮৯
খেলনা শিল্প	৫২৪
খৈল	৩৯৭
খোয়াড়	২৬০

গ

বিষয়	পৃষ্ঠা
গঙ্গারাঢ়	১১৫
গণ্ডওয়ানাযুগ	১০
গন্ধবণিক	১০২
গম	৫৬০
গয়াল	২৪
গাজনের গান	১৮৪
গাঁজাশন	৪১৭
গাদাবন্দুক	৫২০
গারো	৯৮
গারোখাসি	২
গালালাইট	৫২৩
গিরিধি	৪৩২
গুগ্‌লি	১১
গুটিপোকা	৫১০
গুড়	৪০৪
গুর্খা	৪০
গোগৃহ (Dairy)	৪২৬
গোপালন	৪২১
গোবর সার	৩৮২
গোবিন্দদাস	১৮৩
গোবিন্দপুর	৫৫০
গোমস্তা	২৮৭
গোয়া	৫৪৯
গোয়ালন্দ	৩,৬০৬
গোশালা	৪২৩
গোহত্যা	৪২৫
গোষ্ঠী	৩২
গৌড়	১,৫৯৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
গৌর	২৪
গ্রহবিপ্র	৯৯
গ্রাণ্ড কর্ড লাইন	৬০৭
গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড	১২০,৫৪৯,৫৯৯
গ্রাম	৭৫
গ্রাম সমবায় প্রথা	২৫৭
গ্রামোফোন রেকর্ড	৫১৪
গ্রীষ্মমণ্ডল	১৩
ঘ	
ঘন বসতি	৪৫
ঘরামী	৫৪০
ঘাটতি	২৯৮
'ঘাটোয়ার'	২৮৫
ঘৃতপক্ক দ্রব্য	৪২৬
চ	
চটকল	৪৫১
চণ্ডীদাস	১৮১
চণ্ডীমঙ্গল	১৮৪
চতুর্দশপদী কবিতাবলী	১৮৬
চতুর্দশ লুই	৫০৩
চতুষ্পাঠী	১৪৪
চন্দ্রবংশ	১১৬
চরমপন্থী	১৪০
চর্যাপদ	৩৫
চষা জমি	৩৬৮
চা'এর হিসাব	৪৬৮
চাক্‌মা	৬
চাকরাণ	২৩৭
চাঁচ গালা	৫১৪
চাঁটগাঁ	৪২৮
জ্ঞানদাস	১৮৩
জ্যাকার্ড মেশিন	৫০৭
জ্বালামুখীতীর্থ	১২
ঝ	
ঝরিয়া	৪৩২
ঝিঙেশাল ধান	৩৮২
ঝিনুকের বোতাম	৫২৩
ট	
টনেজের হিসাব	৬১১
টলেমী	১১৫
টাকু	৪৭৮
টাটার কারখানা	৫২৯
টালার ট্যাঙ্ক	২৭৭
টিকলবিটা	৫১৭
টিকলি	৫১৪
টিটাগড় পেপার মিলস্‌	৪৮৯
টিনের খেলনা	৫২৫
টিনের মাছ	৪৩০
টিপ্‌রা	৬
টেনিস	৫২৬
টেলিগ্রাফ আফিস	৬১৩
টেলিগ্রাফিক মনি অর্ডার	৬১৩
টোল	১৪৪
ট্যাক্‌স	২৬৯

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ট্যাক্সিডার্মি বিদ্যা	৫৩০	ড্রেন	২৭৭
'ট্যান' করা	৫২৯	ঢ	
'ট্যানিন' বা কষায়িন	৫২৯	ঢাউস নৌকা	৭
ট্যারিফ বোর্ড	৪৭৫	ঢাকা	৭৫,৫৯৮
ট্রাম লাইন	২৭৬	ত	
ট্রেজারী	২৩৬	তকবী ঋণদান	৬১৬
ট্রেড য়ুনিয়ন	৫৪৭	'তৎভব' শব্দ	৩৬
ঠ		'তৎসম' শব্দ	৩৬
ঠকঠকি তাঁত	৫১১	তরজা	১৮৫
ড		তসর	৫১২
ডক	৫৪৭	তহশীলদার	২৯২
ডাকঘর	৬১৩	তাঁতি	১০২
ডাকবাক্সের সংখ্যা	৬১৩	তামাক	৪১৩
ডাচ্	৪৭১	চাপদানী	৪৬
ডালহৌসি	৫৯৯	চা-বাগান	৬৭
ডিমের গুড়া	৪২৮	চামড়া ও জুতার কারখানা	৪৯৯
ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকশান	১৪৬	চামড়ার শিল্প	৫২৬
		চামরী গাই বা য়াক্	২৪
ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার	২২৩	চাল উৎপন্নের হিসাব	৩৮০
ডিষ্ট্রীক্ট কমিটি	২৫৬	চালমুগরা	৪০০
ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড	১২৬	চালমুগরার ইনজেকশন	৯৫
ডিষ্ট্রীক্ট শাসন কমিটি	২৫৭	চাষ	৮১
ডুয়ারস্	২৮১	চাষী কৈবর্ত	১০১
ডেপুটী কমিশনার	২২২	চিকিৎসালয়	২৬৭
ডেপুটী মেয়র	২৭২	চিত্তরঞ্জন দাশ	২৭২
ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট	২২১	চিনি, চিনির আমদানী	৪০৪,৪১২
ড্রেজিং কল	৭	চিনেবাদাম	৪০০

বিষয়	পৃষ্ঠা
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত	১২৪
চীনাংশুক	৫০৯
চীনামাটী	৫১৬
চীফ্ ইঞ্জিনিয়ার	২৫২
চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক	৪০০
চেশায়ার সল্ট কোম্পানী	৪৩৯
চৈতন্য মহাপ্রভু	১২০
চোলরাজ রাজেন্দ্র	১১৭
চোলাইখানা	৩৩৫
চৌকিদার	২৩৫
জ	
জগদানন্দ রায়	১৮৮
জঙ্গীলাট	১৯১
জজ	২২৯
জনক্ষয়	৬৪
জন গণনা	৫৭
জন সংখ্যা	৪৩
জন্মনিরোধ	৫৫
জন্মহার	৬২
জবচার্ণক	৫৫০
জব্বলপুর	৬০৪
জমাট দুধ বা গুঁড়া দুধ	৪২২
জমিদার	২৭৯
জমিদারীর আয়	২৯২
জমি বন্দোবস্ত	২৭৯
জমিহীন মজুর	৬১৬
জয়দেব	১১৮
'জয়ন্তি' জাতি	৯৮
জলচলনীয় জাতি	৯৯
জলপথ ও জলযান	৬০৯
জলবায়ু	১৩
জলসেচন বিভাগ	২৫৪
জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্	১৬৮
জাভা	৪৫২
জামসেদপুর	৫৫৫
জারমেন রঙ	৪৪৬
জারমেন সিলভার	৫১৮
জাহাজের কারখানা	৫৪৪
জাহাজের সংখ্যা	৬১১
'জাহান কোষ'	৫২০
জি. আই. পি. রেলওয়ে	৬০৪
জীবজন্তু	২৩
জুতা শিল্প	৫৩০
জুরি	২২৪
জেনারেল পোষ্ট অফিস	৬৯৩
জেলা বোর্ড	১৫৯
—আয়	২৬৫
—ব্যয়	২৬৬
জোলা	৫০৬
তামাক ও তামাকজাত সামগ্রীর আমদানী	৪১৬
তাম্রচূর	১১৫
তাম্রলিপ্তি বা তম্‌লুক	১১৫,৫৪৯,৫৯৯
তাড়ি	২০

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
তার বিভাগ	১৯৫	দিয়াশলাই	৪৯৩
তাস	৫২৬	দিয়াশলাইয়ের কারখানা	৪৯৪
ত্রিবাঙ্কুর	৫২৩	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮৮
তিল্	৩৯৮	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	১৮৮
তিস্তা	৮	দেউলিয়া	২৮৬
তিসি	৩৯৯	দেওয়ানী	১২৩
তুষার নদী	১০	—আদলত	২১৯
তুলা	৪১৮	—মামলা	২৩২
তুলার চাষে বাংলার অবস্থা	৪১৮	দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮৬
তৈল	৩৯৫	দেশী ঘানিগাছ	৩৯৭
থ		দেশী চামড়া	৫২৮
থানা	২৩৬	দেশীয় করদাতা মিত্ররাজ্য	১৯১
থান্নার সংখ্যা	২৪৭	দেশীয় চিকিৎসা	৫৯৪
দ		দ্বৈত শাসন	২১৮
দক্ষিণায়ন	১৪	দ্বৈরাজ্য	২০১
দখলিস্বত্ববিশিষ্ট	২৮২	দোলো চিনি	৪০৪
দখলিস্বত্বশূন্য	২৮২	দ্রাবিড়	৯৭
দশসালা বন্দবস্ত	২৮০	ধ	
দাইডোম	৫৫	ধর্ম্মঘট	৪৭৫
দাইল	৫৬০	ধর্ম্মাবলম্বী লোক, বিভিন্ন	২৭৩
দাক্ষিণাত্য	১০	ধর্ম্মের ষাঁড়	৪২৩
দাদাভাই নৌরজী	১৩৯	ধাতুশিল্প (Metallurgy)	৪৩৭
দাতব্য চিকিৎসালয়	২৬৯	ন	
দামোদর খাল	২৫৪	নওগাঁ	৪১৭
দারোগা	২৩১	নগরীর সংখ্যা	২৭২
দার্জ্জিলিং	৬০৫	নদীয়ার যুগ	৩৯১
দিনেমার	৭	নন্দবংশ	১১৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
নবদ্বীপ	৫১৭
নবশাখ	৫৭
নমঃ ব্রাহ্মণ	১০২
নরমপন্থী	১৪০
নরেন্দ্রনাথ লাহা	৫৫৪
নর্থ ওয়েষ্টার্ণ ট্যানারী	৫৩০
নলকূপ	৪২৪
নাগাজাতি	৯৮
নাম্নুর	১৮১
নায়েব নাজিম	২১৮
নারিকেল	৫২৩
নারীর সংখ্যা	৫৬
নিকা	৫৫
নিকারি	২৫
নিখিল-ভারত পথ-উন্নতি	৬০০
নিখিল-রোড্-বোর্ড	৬০৯
নিজামত	২১৮
'নিম্‌কি' এজেণ্ট	৪৩৮
নিরক্ষর লোক	১৬০
নীল চাষ	১২৫
নীলদর্পণ	১২৫
নৃতত্ত্ব	২৭
নেপাল	৫৫৮
নেপিয়ার ঘাস	৪২৪
নেমিয়ার, ওটো	৩৩৩
নৈহাটী	৬০৫
নোবেল পুরস্কার	১৮৮
নৌতারণ সমিতি	৪৯৬
নৌবাহিনী গঠন শিল্প	৬১২
নৌ-শিল্প	৭৯
নৌ-সৈনিকের পেশা	৬১২
ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্স	১৩৯
—মেডিকেল স্কুল	১৫৪
—সোপ	৪৪৬
প	
পচুই	৩৩৫
পঞ্চবার্ষিকী প্লান	৬০১
পঞ্চায়েৎ	২৩৭
পটাস্	৫৩০
পটাশিয়াম সালফেট	৪২০
পত্তনিদার	৮৫, ২৮৪
'পদমাবৎ'	১৮৩
পয়ঃপ্রণালী	২৫১
পরোক্ষ কর	৩০৭
পলু বা পোকা	৫১২
পশম	৫১৪
পশু চিকিৎসক	৪২৫
পশুর সংখ্যা	৩৭৫
প্রজাস্বত্ব	২৮৪
প্রতাপাদিত্য	১২১
প্রবাসী	১৯০
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	১৮৮
প্রভিন্সিয়েল কাউন্সিল	২২০
—সার্ভিস	২১৪

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
পাইপের পাতা	৪১৫	প্লীডার	২৩০
পাগান গ্রাস	৫২৪	পুণা প্যাক্ট	২০৭
পাঁচালী	১৮৫	পুরাতত্ত্ব বিভাগ	১৯৫
পাটকল	৭৮	পুলিশ কমিশনার	২৩৯
পাটনাই চাল	৩৮১	পুলিশের খরচ	২৪৫
পাট সমবায় সমিতি	৪৫৭	পুলিশ বাহিনী	২৪১
পাট্টা	২৮৩	পুলিশ বিভাগ	২৩৫
পাদরী	১৪৩	পুলিশের সংখ্যা	২৪০
পাব্লিক প্রসিকিউটার	২৩৬	'পুস্ত' বা পুস্তক	৪৮৮
পার্চমেণ্ট	৪৮৮	পূর্ত্তবিভাগ	২২৩, ২৫১
পার্লামেণ্ট	১৯১	পৃথিবীব্যাপী মন্দা	৫৮৮
পারাণী ঘাট	৩০৭	পেটেণ্ট	১৯৫
পালবংশ	১১৭	পেট্রোলিয়াম	১৯৫, ৩১২, ৪৩৩, ৫৬১
পাইলের কাপড়	৫০৬		
পাহাড়পুর	১১৭	পেনশন	১৯২
প্রাইম মিনিষ্টার	১৯১	পেনাল্ কোড্	২২৯
প্রাক্-আর্যবাসিন্দা	৯৬	প্রেসিডেণ্ট বা প্রাদেশিক গভর্ণর	২৯৭
প্রাকৃত ভাষা	৩৩	পোলিং ষ্টেশন	২০২
প্রাণীজ শিল্প	৫১৪	পোষ্টাফিস্	৬১৩
প্রাণীতত্ত্ব বিভাগ	১৯৫	পোষ্টাল ক্যাশ-সার্টিফিকেট	৬১৪
প্রাদেশিক আয়-ব্যয়	৩৩৩	—চিঠি	৬১৩
প্রাদেশিক শাসনের আয়	৩০৬	—জেলা	৬১৩
প্রায়শ্চিত্ত	১০৩	পৌণ্ড্রবর্দ্ধন	১১৫
প্রিভিকৌন্সিল	২২৯	প্যাকিং কাগজ	৪৯০
পীঠস্থান	৭	**ফ**	
পীরালী	৯৯	ফণীন্দ্রনাথ গুপ্ত	৫৩৭
পীরের ষাঁড়	৪২৩	ফরাক শায়ার	৫৫০

বিষয়	পৃষ্ঠা
ফরাসী	১৯৩
ফরাসী চন্দননগর	৪৩৯
ফরাসী বিপ্লব	৫০৩
ফাউন্টেন পেন	৫৩৭
ফায়ার ব্রিগেড	২৩৯
ফারশী	১৪৩
ফা-হিয়ান	১১৬, ৫৯৯
ফুঁকা	৪২৫
ফুলিয়া গ্রাম	১৮১
ফেডারেল শাসনতন্ত্র	২০৭
ফেমিন কোড্	৩৮৬
ফোর্ট উইলিয়ম	২৭১
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ	১৪৫
ফৌজদারী মামলার হিসাব	২২৬
'ফ্যাকাল্‌টি', বিশ্ববিদ্যালয়ের	১৫১
ফ্যাক্টরীর সংখ্যা	৫০০
ব	
বকর্ ঈদ	৪২৫, ৫২৭
বকেয়া বাকি ও জমিদারী	২৮৮
বক্রেশ্বর খাল	২৫৪
বক্রেশ্বর তীর্থ	৬০৭
বক্সা দুর্গ	৬
বঙ্কিমচন্দ্র	১৩৯
বঙ্গদেশ	১, ১১৪
বঙ্গচ্ছেদ	১২৬
বঙ্গদর্শন	১৯০
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন	৫০৬
বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্	৪৮৫
বনভূমি হইতে আয়	৩৪৪
বন-মোরগ	৪২৮
বন্দর	৫৬৫
বন্দরে শুল্ককর	৩১৬
বয়কট আন্দোলন	৪৭৬, ৫৮৮, ৫৯১
বয়নশিল্প	৮২
বরগাদার	৮৫, ৫৩৯
বরজ, পানের	৪০৪
বরাকর কোল কোম্পানী	৪৩৩
বরিশালের মসুরী	৩৯১
বরেন্দ্রভূমি বা বারীন্দ্র	১
বর্ণ হিন্দু	১১৩
বর্স্টেল স্কুল	১৬৯
বল্লাল সেন	১১৮
'বসুমতী'	১৯০
বস্ত্র বয়ন	৭৮
বাউরিয়া কটন মিলস্	৪৭৩
বাংলার আমদানী ও রপ্তানী	৫৬৬
—আমদানীর মূল্য	৫৯৬
—আয়কর	৩২৬
—উৎপন্ন সূতা	৪৮৮
—পাট	৩১৩
—ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্ণরগণ	১২৭
—ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্ণর জেনারেলগণ	১২৮
—মজুর	৫৩৮

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
—রপ্তানী মাল কোন্ কোন্ দেশ কত অংশ ক্রয় করে	৫৮০	বার্ক ট্যানিং	৫২৯
—রাজস্ব ও সেস্	২৯৩	বার্ণিয়ার	৫০৯
—রাস্তা	২৬৭	বার্ণিস	৫৭৯
—রাস্তাঘাট	৫৯৮	বালাম চাল	৩৮১
—রাস্তা (মাইল)	৬০২	বালি পেপার মিলস্	৪৮৯
—রেলপথ	৬০৪	'বালির' কাগজ	৪৮৯
—রোড বোর্ড	৬০১	বিক্রমাদিত্য	৫০৩
—শিল্প	৪৪৪	বিচার বিভাগ	২১৮
বাখর	৩৩৫	বিজয় সিংহ	১১৬
বাজরা	৩৭২	বিটচিনি	৪০৫
বাজার	২৭৭	বিড়িপাতা	৫৬১
বাজনে ডোম	৫৫	বিদেশী চিনির আমদানী	৪০৯
বাটা	৫৩১	বিদ্যাপতি	১৮২
বাটানগর	৫৩৫	বিদ্যাসাগর বাণীভবন	১৬৮
বাণিজ্য	১৯৫, ৫৪৯	বিদ্যুৎ কারখানার উপর কর	৩৪৮
বাণিজ্য-কেন্দ্র	৭৯	বিনোদ কর	৩৪৮
বাণিজ্য কৃষি	৬১৬	বিবাহ জন্ম মৃত্যু	৫৫
বাণিজ্য দুর্গতি	৪৭০	বিবেকানন্দ স্বামী	১৬৮
বাণিজ্য সঙ্ঘ	৫০৬	বিলাতী চামড়া	৫২৮
বাদশাহী সড়ক	১২০, ৫৯৯	বিশেষ নির্বাচক মণ্ডলী	২০০
বাদ্যযন্ত্র	৫৩৪	বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক	১৭৩
বান্দেল	৫৯৮	বিশ্বভারতী	১৬৮, ৫২৪
বাফ্তা চাদর	৫১২	বিষ্ণুপুর	৫১৭
বাবলা গাছ	২১	বিহার	৪৪৪
বারুই	৪০৪	বীমা কোম্পানী	৩২১
বারেন্দ্র	৯৯	বুদ্ধদেব	১১৪
		বৃটিশ মালের আমদানী	৫৯৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
বুরুকাঠ	৪২৩
বেঙ্গল ইম্যুনিটি	৪৪৬
—কেমিক্যাল	৪৪৬
—কোল কোম্পানী	৪৩৩
—জেল কোড	৩৮৬
—টেন্যান্সী অ্যাক্ট	২৮৩
—নাগপুর রেলপথ	৬০৫
পেপার মিলস্	৪৮৯
বেকার সমস্যা	৩৫৮
বেথুন কলেজ	১৬১
বেনাগড়িয়া	৯৮
বেলভেডিয়ার	৩৫৬
বেসরকারী বিদ্যায়তন	১৬৮
বেহুলা-লখিন্দর	১৮১
বৈদেশিক সম্বন্ধ	১৯৫
বৈদ্য	১০২
বৈশ্য	১০২
বৈষ্ণব সাহিত্য	১৮৩
বোড়ো ধান	৩৮০
বোনপাশ	৮৩
বোবা-কালা	৯৪
বোম্বাই	৬০৪
বোর্ড অব কণ্ট্রোল	১৪৫
বোলপুর	৪৪৫
ব্যবসায়ী ফসল	৫৬৭
ব্যবস্থাপক সভা	১৯১
ব্যাঙ্কিং	১৯৫
ব্যাধি ও স্বাস্থ্য	৭১
ব্রজবুলি	১৮২
ব্রজমোহন কলেজ	১৬২
ব্রডগেজ রেল	৬০৫
ব্রহ্মপুত্র	৬০৬
ব্রাহ্মসমাজ	১২৪

ভ

বিষয়	পৃষ্ঠা
'ভক্তমাল'	১৮৩
ভাইটামিন	৪০২
ভাইসরয়	১৩০
ভাগলপুর সিল্ক ইনস্টিটিউট	৫১২
ভাগীরথী	৩, ৫৯৮
ভাটপাড়া	৪৬
ভাতা	২৯৮
ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী	১৮২
ভারতবর্ষ	১৯০
ভারতের গভর্ণর জেনারেলগণ	১২৯
ভারত রক্ষা	১৯৫
ভারত সরকারের আয়	৩০৪
ভারত সচিব	১৩০
ভারতে কলের সংখ্যা	৪১১
ভারতে কাগজের কল	৪৯২
ভারতে কয়লা তোলার তালিকা	৪৩৪
'ভারতী'	১৯০
ভারতী ফাউণ্টেন পেন ওয়ার্কস	৫৩৭
ভারতীয় কটন-শুল্ক এক্ট	৪৭৩
ভার্জিনিয়া তামাক	৪১৬

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ভাষা	৩২	মরিশাস	৪০৬
ভাসামাণিক ধান	৩৮১	মস্‌লিন	৪১৮
ভুটিয়া	২৮	মসিনা	৩৯৬
ভূতত্ত্ব বিভাগ	১৯৫	মোরব্বা	৪০৩
ভূমি বন্দবস্ত	৬১৫	মহম্মদ বিন্ বখতিয়ার	১১৮
ভূর্জপত্র	৪৮৮	মহাবীর	১১৪
ভৃগুকচ্ছ বা বরোচ	৫৪৯	মহাত্মাজী	২০৬
ভেজাল দুধ	৪২২	মহারাণী ভিক্টোরিয়া	২২৭
ভেরাণ্ডা	৫১২	মহীপাল	১১৭
ভোটার	২৫৯	মহুয়ার বীজ	৪০০
ভ্যাক্সিন	৪২৫	মহাজন	৫০৮
ম		মাথা তামাক	৪১৩
মকতব	১৬৫	মাছের পট্‌কা	৪৩০
মকররী মৌরসী	২৮২	মাড়োয়াড়ী	২৭৮
মড়ক	৭, ৭৩, ৭৭, ৪২৪	মাতৃমঙ্গল সমিতি	৭২
মণি অর্ডার	৬১৩	মাথাপিছু রাজস্ব আদায়	৩০২
মণিপুরী	৯৮	মাদার গাছ	১৯
মধ্যস্বত্ব, জমির	২৮৪	মাদ্রাসা	১৬৫
মনসার ভাসান	১৮১	মানসিংহ	১২১
মন্ত্রী পরিষদ্	১৯৬	'মালাঙ্গি'	৪৩৮
মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট	২০০	মাহিনাদার	৫৩৯
মণ্ট-ফোর্ড শাসন সংস্কার	২৫২	ম্যাঞ্চেষ্টার	৪৭৬
মণ্ডপ বা কাই	১৯	ম্যাজিষ্ট্রেট	২২০
মণ্ডীখাল	৩৬৯	'ম্যানিলা' শণের দড়ি	৫২৩
মন্বন্তর	৪২২	মিটার গেজ	৬০৫
মণ্ড (pulp)	৪৯১	মিলমহল	২৬৮
ময়দার কল	৪৯৬	মিলিটারী বোর্ড	২৫১

বিষয়	পৃষ্ঠা
মিলের নাম	৪৮৭
মিশনারী	১৭০
মীরজাফর	১২২
মীরণ	১২৩
মুগাগুটি	৫১২
মুঘল	৯১
মুচি	৫৩১
ম্যুজিয়ম	৫৩০
মুদ্দাফরাস	২৪
মুদ্রাযন্ত্র	১২৪
মুণ্ডা	৫৪২
মুণ্ডারী	৯৭
ম্যুন্সিপালটী	৭৭, ২৭০
মুন্সেফ	২২১
মুয়ালিস ট্রেনিং স্কুল	১৬৫
মুর্শিদকুলি খাঁ	১২২, ৫৫১
মুর্শিদাবাদ	৭৫, ১২২, ৫৯৮
মুসলমান শিক্ষা	১৬৫
মৃত্যুহার	৬২
মেঘনাদবধ কাব্য	১৮৬
মেটিয়াবুরুজ	৪৯৪
মেতুর বাঁধ	৩৬৯
মেদিনীপুর খাল	২৫৪
মেয়র	২৭১
মেয়েদের কলেজের শিক্ষা	১৬১
মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা	১৬২
মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষা	১৬২

বিষয়	পৃষ্ঠা
মেয়ো, লর্ড	৫৯৯
মেলেরিয়া	৭২
মেশিনারী	৫৯২
মেস্টন কমিটি	৩০০
মোটরগাড়ী	৫৯২
মোটর শিল্প	৫৯৩
মোদক বা ময়রা	১০২
মোবিল তেল	৫৯৪
মোম	৫১৪
মোরব্বা	৪০৩
'মোহিনী মিল্স'	৪৮৫
মৌখার রাজ	১১৬
মৌর্য বংশ	১১৪
মৌশুমি বায়ু	১১
য	
যৌথ ঋণদান সমিতি	৪৯৬
যৌথ কারবার	৪৯৫
যাদুঘর	৫২৬
য়ুনিয়ন ট্যাক্স	২৬১
য়ুনিয়ন বোর্ড	২৬৩, ২৬৪
যন্ত্রনিপুণ মজুর	৫৩৮
যন্ত্রশিল্প	৫০৫
য়ুরোপীয় শিক্ষা	১৬৭
যশোহরের চিরুণী	৫৩৭
র	
রক্সবার্গ সাহেব	৪৫২
রজনীকান্ত সেন	১৮৮

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
রপ্তানী	৩১২	রিট্রেঞ্চমেণ্ট কমিটি	৩৩৭
রপ্তানী বাণিজ্য	৫৬৮	রিলীফ কার্য	৩৯৪
রপ্তানী মালের শুল্ক	৩১৫	রিশরা	৪৬, ৪৫২
রবার ক্রেপ	৫৩৫	রিসার্চ ষ্টুডেণ্ডশিপ্	১৭৫
রবারের শিল্প	৫৯৪	রুরকী কলেজ	২৫৩
রবীন্দ্রনাথ	১৮৭	রুশিয়া	৪৬৫
রবীন্দ্র-যুগ	১৮৮	রুশ-জাপানের যুদ্ধ	৫৮৭
রয়্যাল শ্রমিক কমিশন	৫৪৭	রূপনারায়ণ	৩
রাজকীয় কমিশন	৪৭১	রেগুলেটিং এক্ট	১২৪
রাজকৃষ্ণ রায়	১৮২	রেজিষ্ট্রার	২২৩
রাজপ্রতিনিধি	১৯১	রেজিষ্ট্রেশন	৩৪৪
রাজভাষা	১৪৩	রেজিষ্ট্রেশন অপিষ	৭৫
রাজমহল	৫৯৮	রেভেনিউ বোর্ড	২১৮, ২৮৭
রাজস্ব আদায়	২১৮	রেভেনিউ ষ্ট্যাম্প	৩৪২
রাজস্ব কমিশনার	২২১	রেলওয়ে	১৯৫
রাজস্ব সচিব	৩১৮	রেলওয়ে কারখানা	৭৯
রাজস্বের শতকরা অংশ	৩০৮	রেলওয়ে ও ট্রাম কোম্পানী	৪৯৬
রাজশ্রী	১১৬	রেলওয়ে নির্মাণের সময়	৬০৪
রাণাঘাট	৬০৫	রেশম	৪৪৬
রাণীগঞ্জ	৪৩২, ৫৪২	রেশম ও পশম আমদানী	৫৯১
রাণীগঞ্জ কোল্ এসোসিয়েশন	৪৩৩	রোড-আইল্যাণ্ড মুরগী	৪২৮
রামমোহন রায়	১২৪	—কনফারেন্স	৬০০
রায়ত	২৮০	—সেস	২৮৩
রাষ্ট্রসভা	৩২০	রোড সেস এক্ট	৫৯৯
রাসায়নিক পদার্থ	৪২০	রোমান সাম্রাজ্য	৫০৯
রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণ	৫৯৯	ল	
রিজার্ভ পুলিশ	২৩৬	লবণ	৪৩৮

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
লবণ-কর	৩৩০	শান্তিপুর	৫০৭
লবণ প্রস্তুত করিবাব স্থান	৪৪১	শাসন বিভাগ	১৯১
লাইসেন্স ফী	৬০০	শাসন দায়িত্ব	২৪৭
লাউসেন রাজার উপাখ্যান	১৮১	শাসন বিভাগেব ব্যয	৩৬৪
লাক্ষা	৫১৪	শাহজাহান	৫০৯
লাক্ষা কীট	২১	শাহ্ সুজা	৫৫০
লাখবাজ জমি	২৮৫	শিক্ষা	১৪৩
লিথোগ্রাফী	৫১৪	শিক্ষার অবস্থা	২৭৪
লিনোলিযাম	৪৫১	শ্রমিক যুনিয়ণ	৫৪৭
লুপ লাইন	৬০৭	*শ্রমিক সংখ্যাব বাড্তি কম্তি	৫৪৪
লুশাই	৯৮	শিক্ষাক্ষেত্র	২৭৩
লেগ্‌হর্ণ	৪২৮	শিডুইল্ড ট্যাক্স	৩৩৫
লেজিস্‌লেটিভ্ এসেম্‌ব্লী	১৯২	শিবনাথ শাস্ত্রী	১৮৮
লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্সিল	২০৮	শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ	২৫৩
লেপচা	২৮	শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন	৪৫২
লোকাল বোর্ড	১২৬	শিমুল তুলা	৪৯৪
লোহার খনি	৭৯	শিয়ালদহ	৬০৫
ল্যাঙ্কাসায়াব	৩১২	শিল্প নগর	৭৫
শ		শিল্প নগরী বা ফ্যাক্টরী	৪৪৪
শণ	৩৯৯	শিলাবৃষ্টি	১৫
শর	৪৯১	শিলিগুড়ি	৫০৫
শর্করা	৪০৫	শিশুনাগ বংশ	১১৪
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায	১৮৮	শিশুমঙ্গল সমিতি	৭২
শহর	৭৫	শিশু মৃত্যুহার	৬৪
*শ্রমদাস	৬৯	‘শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন’	১৮১
শাঁখারি	১০২	শ্রীনিকেতন	১৬৮
শান্তি নিকেতন	১৬৮	শ্রীরামপুর	৪৫২, ৫৯৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীরামপুর কলেজ	৪৮৯
শ্রীহট্ট	২
শুল্ক	১৯২
'শূণ্যপুরাণ'	১৮৩
শূর বংশ	১০০
শের শাহ	১২০, ২৭৯, ৫৯৯
শের শাহ শড়ক	৫৯৯
শেরিফ	২৩২
শ্বেতাঙ্গ	৯৭
শ্যাময় (chamois)	৫৩০
ষ	
ষ্টীম কয়লা	৪৩৬
ষ্ট্যাম্প	৩৪২
ষ্ট্যাম্পের আয়	৩৪৩
স	
সঙ্কর বরাজ	৩৬৯
সতীদাহ	১২৪
সত্যপীর	১০৪
সত্যাগ্রহ আন্দোলন	১৪১
সপ্তগ্রাম	১১৯, ৫৯৮
সপ্তশতী ব্রাহ্মণ	৯৯
'সবুজ পত্র'	১৯০
সমবায় আন্দোলন	৬১৫
সমবায় ভাণ্ডার	৫০৮
সমতট	১১৫
'সমাচার দর্পণ'	১৯০

বিষয়	পৃষ্ঠা
সরকারী চাকুরী	২১৪
সরকারী ব্যয়	৩৫৬
সরকারী ষ্ট্যাটিষ্টিক	৫০৬
সরগুজা	৩৯৬
সরিষা	৩৯০
সরোজনলিনী শিল্পাশ্রম	১৬৮
সংরক্ষণ নীতি	৫০৫
সংশোধনী বিদ্যালয়	১[illegible]৯
স্বদেশী আন্দোলন	২৩৮
স্বর্ণকুমারী দেবী	১৮৮
স্বরাজ দল	১৪১
স্মলকজ্ কোর্ট	২২৮
সাইকেল	৫৮৭
সাইক্লোন বা ঘূর্ণি ঝড়	১৩
সাইমন কমিশন	১৯৯
সাঁওতালী	৫০৮
সাধারণ নির্বাচকমণ্ডল	২০০
সাব্ অর্ডিনেট্ সার্বিস	২১৪, ২৫৩
সাব্ ইন্সপেক্টর	২৩৬
সাব্ ডেপুটি	২১৬
সাব্ রেজিষ্ট্রার	২১৬
সাবুই ঘাস	২১, ৪৯১
সাময়িক প্রবন্ধ	১৯০
সামসুদ্দিন্ ইলিয়াস্	১১৯
সাম্প্রদায়িক নির্বাচন	১৯৮
সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা	১৪২
সাম্য	১৩৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
সায়েন্স এসোসিয়েশান	১৫২
সায়েস্তা খাঁ	৫৫০
সাব্ আফিস	৬১৩
সার্ চার্জ	৩২০
সার্জেন	২২৩
সার্ভে বিদ্যালয়	১৬৮
সার্ভে	১৯৫
সাবাঘাট	৬০৫
সারাব্রীজ (হার্ডিংজ ব্রীজ)	৬০৫
সালপ্যুরিক এসিড	৫৩০
সাহিত্য	১৮১
স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন আইন	১২৬
স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি	২৮২
স্বাধীনতার বাণী	১৩৬
স্বায়ত্ত শাসন	২৫৬
স্বামী বিবেকানন্দ	১৪০
স্বাস্থ্য	৭১
স্যার ইলিজা ইম্পে	২১৯
স্যার চার্লস ট্রেভেলিয়ান	৫০৪
স্যার জর্জ বার্ডউড	৫১৯
স্যার জন শোর	২৮০
স্যার বার্নেস পীকক্	২২৯
স্যার সামুয়েল হোর	১৪২
সিগার ও সিগারেট	৪১৩
সিন্কোনা	৫১৮
সিণ্ডিকেট	১৫০
সিন্ধীগোরু	৪২৩
সিন্ধীয়া ষ্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানী	৬০৯
সিন্ধু	১
সিপাহী বিদ্রোহ	১২৪
সিবিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১২৫
সিভিলিয়ান্	৩৬০
সিভিল সার্জেন	২২৩
সিরাজ উদ্দৌলা	১২২
সিংহভূম জেলা	৪৩৭
সীতানাথ তত্ত্বভূষণ	১৮৮
সীমান্ত	৪০
সীমান্ত বাণিজ্য	৫৫৮
স্ত্রী শিক্ষা	১৬০
সুইডিশ কোম্পানী	৪৯৪
সুঁদরী গাছ	৪
সুতানটি	৫৫০
সুন্দরবন	৪
সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার	২৫২
সুপ্রীম কোর্ট	১২৪
সুবর্ণ গ্রাম	১১৯
সুয়েজ খাল	৫৫২, ৬০৪
সুরমা	২
'সুলভ সমাচার'	১৯০
সূর্যাস্ত আইন	২৮৭
স্তূপ	৪৪৪
সেক্রেটারিয়েট্	১৯২
সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট্স্ ফর্ ইণ্ডিয়া	১৯১

বিষয়	পৃষ্ঠা
সেটেলমেণ্ট	২৮৫
সেণ্ট্রাল সার্কেল	২৫৩
সেন্সাস	৫২, ৫৪০
সেভিংস ব্যাঙ্ক	৬১৪
সেমেটিক জাতি	১০৩
সেবেস্তা	২৮৩
সেলুলযেড্ কাবকানা	৫৩৬
সেলুলেস	৫১৩
সেসন-জজ	২২১
সৈন্ত বিভাগ	১৯৫
'সৈয়ব বক্স বন্দব'	৫৫১
সোনার খনির কোম্পানী	৪৯৬
হ	
হবিজন	৫৩
হরিতকী	৫২৯
হাইকোর্ট	১৯৪
হাইড্রোক্লোবিক্ এসিড	৫৩০
হাউস অব্ কমন্স	২০১
হাওডা	৬০৫
হাওডাব পুল	২৭৬
হাজি বিল	৬১০
হাড-গুঁডা	৪২০
হাতী দাঁতেব খেলনা	৫২৫
হাব্শী	১১৯
হামবুর্গ	৫৩১
হার্ডিংজ ব্রীজ (দ্রঃ সাবা ব্রীজ)	
হালুইকব	৪২৬
হাঁস ও মুবগী পালন	৪২৭
হিজলিব খাল	২৫৪
'হিতবাদী'	৫০৫
'হিন্দু পেটবিয়ট'	১২৫
হিন্দুমেলা	১৩৮
হিন্দু-সমাজ-তত্ত্ববিদগণ	৫৯
হিমালযেব তবাই বা ডুযাবেব জঙ্গল	৫
হিংলী	৪১৬
হীবেন্দ্রনাথ দত্ত	১৮৮
হুগলী	৫৯৮
হুমাযুন	১২০
হুযেন-ৎসাঙ	১১৬, ৫৯৯
হেড আফিস	৬১৩
হেঁডেল বা হুডাব	২৩
হেস্টিংস, ওযাবেন	২২৩
হোমচার্জ	৩০১
'হোয়াইট পেপাব'	২০৭
হোসিযাবী	৫৮৭